আল্লামা শিবলী নু'মানী

# ইসলামী দর্শন

# ইসলামী দর্শন

আল্লামা শিবলী নু'মানী

# ইসলামী দর্শন

## প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড



মুহাম্মদ আবদুল্লাহ অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পঞ্চদশ শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ইসলামী দর্শন ঃ
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
এম. এম., এম. এ. (ট্রিপল), এম. ফিল
সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু-ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ৯৮৭
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগার
ইসলাম-দর্শন
২৯৭.০১

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর, ১৯৮১
ভাদ্র, ১৩৮৮
জিল্কদ, ১৪০১

প্রকাশ করেছেন ঃ
মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ
এম. এ. কাইয়ুম

ছেপেছেন ঃ
তাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৬এ/১, কোর্ট হাউজ স্ট্রীট, ঢাকা-১

বেঁধেছেন ঃ
সোসাইটি বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
২৬, কুমারটুলী লেন, ইসলামপুর রোড, ঢাকা-১

মূল্য ঃ ৪০.০০

---

ISLAMI DARSHAN : Islamic Philosophy written by Allama Shibli Numani in Urdu and translated by Muhammad Abdullah into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah.

Price Tk. 40·00 ; U. S. Dollar : 5·00

# প্রসংগ-কথা

কোন্ কোন্ মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্-রসূল, কুরআন-হাদীস, ইহকাল-পরকাল, শরীঅত-তরীকত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করা অপরিহার্য—এসব জানা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এ ছাড়া কি তত্ত্ব বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো এবং ফলে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সম্পর্কে নানা মতবাদের উদ্ভব হলো, তা অনুধাবন করাও আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে যুগে যুগে অন্য ধর্মাবলম্বী ও বিধর্মীদের দিক থেকে ইসলামের ধর্মীয় মতবাদ, সামাজিক বিধি-বিধান, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও নির্দেশনা এবং সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, আবার অন্য দিক থেকে ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্যের গুণ-গানও করা হয়েছে এবং এই সৌন্দর্য-সুরভির আকর্ষণে মোহিত হয়ে বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং তাদের শক্তি-সামর্থ্য, তাদের ভাবধারার প্রগতিশীলতা আর যুগোপযোগিতাও জগদ্বাসীর সামনে দিন দিন ভাস্বর থেকে ভাস্বরতর হয়ে উঠছে। আমাদের কর্তব্য, আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিধর্মীদের দিক থেকে ইসলামের বিধি-বিধান যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে বা হচ্ছে এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে মুসলিম তরুণদের মনে নিজ ধর্ম সম্পর্কে যে সব সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে, তা নিরসন করা, অন্যদিকে অমুসলিম মহল থেকে ইসলামের যেসব সর্বজনীন মূল্যবোধের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে, তা তুলে ধরা।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা নাস্তিকদের দিক থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনীত হয়েছে বা আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের মনে নিজ ধর্ম সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ে যেসব প্রশ্ন জাগে, সে বিষয়ে তিনি সম্যকভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও আধুনিক পদ্ধতিতে উর্দু ভাষায় 'ইল্মুল-কালাম' ও 'আল-কালাম' নামক দু'টি বই রচনা করেন। প্রথমোক্তটিতে তিনি 'ইল্মে কালাম' তথা

ধর্মীয় বিশ্বাস শাস্ত্রের মূলনীতি, 'ইল্‌মে কালাম'-এর ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরেন। শেষোক্তটিতে ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলো এবং ইসলামী বিধি-বিধানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিবৃত যাবতীয় বিষয়ের খুঁটিনাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

বাংলা সাহিত্যে এরূপ একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল্লামা শিবলী রচিত 'ইল্‌মুল-কালাম' ও 'আল-কালাম' নামক গ্রন্থদ্বয় বাংলায় রূপান্তরিত করে 'ইসলামী দর্শন' নামে অভিহিত করেন এবং তা দু'খণ্ডে বিভক্ত করেন। প্রথম খণ্ডে 'ইল্‌মুল-কালাম' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'আল-কালাম-এর অনুবাদ স্থান লাভ করে। অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলা সাহিত্যের এ প্রয়োজন পূরণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্-কে জানায় আন্তরিক মুবারকবাদ।

**এ. জেড. এম. শামসুল আলম**
মহাপরিচালক,
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাং, ঢাকা—২২।৮।৮১

# উৎসর্গ

স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ
আমার পত্নী ওয়াযীফা বেগম-কে

—অনুবাদক

## সূচী

### প্রথম খণ্ড

### ইলমুল-কালাম

# দ্বিতীয় খণ্ড

## আল-কালাম

# প্রথম খণ্ড

## ইল্‌মুল্-কালাম

# আল্লামা শিবলী নু'মানী

## ।। মোহাম্মদ ইকবাল সলীম গহন্দরী ।।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে আজমগড় জেলার অন্তর্গত বিন্দাওল্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে আজমগড় শহরের স্বীয় বাসভবন—শিবলী মন্জিলে ওফাত প্রাপ্ত হন। ইন্তেকালের সন্ধিক্ষণে তিনি আপন গ্রন্থাগার, বাসভবন এবং তৎসংলগ্ন বাগানবাড়ীটি 'দারুল মুসাননিফীন' প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াক্ফ্ করেন। বাগানবাড়ীর পাশে ছিল শিবলী প্রতিষ্ঠিত একটি হাই স্কুল। স্কুলটি বর্তমানে একটি জাঁকালো কলেজে পরিণত হয়েছে। এটি 'শিবলী কলেজ' নামে অভিহিত।

আল্লামা শিবলী নু'মানী ছিলেন একাধারে গবেষক, কবি, অধ্যাপক, বাগ্মী, মহৎ সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার এবং তদুপরি ছিলেন এক অভূতপূর্ব আলিম শ্রেণীর জনক। ওফাতের পূর্বে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও উপশিষ্যদের নিয়ে বিশেষজ্ঞদের এমন একটি দল সৃষ্টি করেন, যাঁরা সারা দেশে তাঁর ব্রতকে কেবল জিন্দাই রাখেন নি, বরং তার যথেষ্ট অগ্রগতিও সাধন করেন। তাঁদের জ্ঞান সাধনার ফলে জাতি গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এঁদের শিষ্যরাও শিবলীর অভিযানকে আরো ত্বরান্বিত করেন। এজন্যই আল্লামা শিবলীকে বিশেষ ব্যক্তিরূপে অভিহিত না করে 'জ্ঞান ও সাহিত্য সেবা প্রতিষ্ঠান-' রূপে আখ্যায়িত করা হয়। জ্ঞান সাধনা ও সাহিত্যচর্চা ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ চিন্তাধারার উদ্গাতারূপে পরিগণিত। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দু'চারজনকে খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, এঁদের প্রত্যেককেই এক একটি বিদ্যাপীঠ বলা যায়।

মওলানা শিবলী নু'মানীর শিষ্যদের মধ্যে ঃ

১। **মওলানা যফর আলী খান** ছিলেন সাংবাদিকতা, কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। যাঁরা

তাঁর পরশ পেয়ে ধন্য হন, তাঁদের সবাই আজ উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত।

২। **মওলানা সৈয়দ সুলাইমান নাদবী** ছিলেন বিদ্যাবুদ্ধির মধ্যমণি। তিনি জ্ঞানের আলো বিকিরণ করে বিশ্বকে উদ্ভাসিত করেন। গবেষণা ও ধর্মীয় জ্ঞানক্ষেত্রে তিনি যেন অকূল সমুদ্র। তাঁর কাছে শত শত বিদ্বান ও লেখক শিক্ষালাভ করেন, যাঁরা আজ আমাদের জন্য গৌরবের পাত্র।

৩। **খাজা আবদুল ওয়াজেদ নাদবীর** নিকট শিক্ষালাভ করে শত শত লোক বিশিষ্ট বিদ্বান ও লেখকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

৪। **মওলানা আবদুস সালাম নাদবী** একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। তিনি 'উসওয়া-এ-সাহাবা' (সাহাবাদের আদর্শ) এবং জ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা।

৫। **ইকবাল সুহাইল** হলেন ইউ. পি. পরিষদের সদস্য, কবি, বাগ্মী ও সমালোচক।

দেখুন! এ হলো মাত্র পাঁচজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শিবলী নু'মানী এহেন জ্ঞান-গবেষণা শক্তিসম্পন্ন লোকের একটি বড় দল সৃষ্টি করেন। এঁদের শিষ্য ও অনুশিষ্যরা শিবলীর আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করে চলেছেন।

আল্লামা শিবলী উর্দুর 'চার স্তম্ভের' একজন। উর্দু সাহিত্যে, বিশেষত, জ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধক্ষেত্রে তিনি যে রচনাশৈলী অবলম্বন করেন, তা জনপ্রিয় ও প্রচলিত। তাঁর রচনাভঙ্গি সম্পর্কে কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি যে মন্তব্য করেন, তা আজ লোকমুখে প্রচলিত। মন্তব্যটি হলো এইঃ শিবলীর রচনাশৈলীতে এমন একটি আকর্ষণ রয়েছে, বিরুদ্ধবাদী লোকেরাও তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লিখতে গেলে তাঁর লেখনীভঙ্গির অনুসরণ না করে পারেন না।

আল্লামা শিবলীর রচনায় সারল্য, মাধুর্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যের যে মনোরম সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়, তার তুলনা খুঁজে মেলা ভার। তাঁর লেখা জ্ঞানমূলক হোক বা সাহিত্য বিষয়ক, গবেষণা-ধর্মী হোক বা রসাত্মক, পদ্য হোক বা গদ্য—সব ক্ষেত্রেই তিনি যা দিয়েছেন, তা উচ্চমানের এবং বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তাঁর রচনাবলীতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখা দৃষ্ট হয় না। তাঁর

গ্রন্থাবলী কেবল উর্দু ভাষার জন্যেই গৌরবের বস্তু নয়, যে সব ভাষায় সেগুলো অনূদিত হয়েছে, তাদের জন্যেও অমূল্য জ্ঞানসম্পদ-রূপে বিবেচিত।

আল্লামা শিবলী বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'আল-ফারুক', 'শেরুল-আজম', 'সীরাতুন নবী', 'সীরাতুন্‌নুমান'সহ বেশ কয়েকখানি কিতাব ফার্সী, ইংরেজী, আরবী ও তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। যদি তাঁর সাবলীল লেখনীধারা অথবা বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়াদিতে গবেষণা শক্তির চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করতে হয়, তবে তাঁর গ্রন্থদ্বয়—'আল্-কালাম' ও 'ইলমুল কালাম' প্রণিধান করুন। এতে রয়েছে ইলমে কালামের ইতিহাস এবং ইসলামী দর্শনবিদদের নিয়ে আলোচনা। এ রচনার ফলে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ আধুনিক ইলমে কালাম। এ বিষয়ে লিখিত এর চাইতে অধিকতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উর্দু, তুর্কী বা ইংরেজীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফার্সী তো দূরের কথা, আরবীতেও এর চাইতে উত্তম গ্রন্থ পরিলক্ষিত হয় না।

জ্ঞান পিপাসুদের উপকারার্থে আমরা গ্রন্থটির উভয় খণ্ড একত্রীভূত করে প্রকাশ করছি।

'অ-মা-তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ'—আল্লাহ্ ছাড়া সহায় নেই।

## 'ইলমে কালাম' এর উপকারিতা

সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের যুগকে দর্শনের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। এঁরা মৌলিক চিন্তাধারার প্রাচুর্যে তহযিব-তমদ্দুনের কায়ায় নবপ্রাণ সঞ্চার করেন; বিশ্ব, আত্মা এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। এসব মতবাদ ক্রমশ বিপ্লবের আকার ধারণ করে। ফলে, এমন একটি চিন্তাধারা গড়ে উঠে, যার বহুল প্রচার ও প্রভাব দীর্ঘকাল যাবত আকায়েদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস-দেহে আঘাত হানতে থাকে। এর অশুভ পরিণতির কথা ভেবে কেবল রাজনীতিবিদরাই নয়, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেরা লোকেরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এর আরো একটি প্রতিক্রিয়া এই দাঁড়ালো যে, পরবর্তী বংশধরেরা জীবন দর্শনের প্রত্যেকটি দিক নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামাতে আরম্ভ করে।

দর্শন জন্ম নেয় সন্দেহের গর্ভে এবং তা জীবনীশক্তি লাভ করে ধর্ম এবং আকায়েদের সংস্পর্শ ছাড়াই। সুতরাং, দর্শনের বহুল চর্চা

এবং সূক্ষ্ম আলোচনা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিকে জড়সড় করে তোলে। দার্শনিকগণ আল্লাহ্ এবং বিশ্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাঁরা যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণে উঠে পড়ে লাগলেন।

ইসলাম বলতে বুঝায়—ধর্মীয় বিশ্বাস, ইবাদত আর সচ্চরিত্র। এমন এক সময় ছিল, যখন এই মূল নীতিগুলো ছিল সুস্পষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী। এগুলো সকলের পক্ষেই ছিল সমভাবে গ্রহণীয়। যাঁরা রসূল করীম (সঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর বাণীও শুনতে পান, তাঁরা ভাবতেন, তাঁর বাণীকে কার্যে পরিণত করাই হলো প্রকৃত ঈমান। তাঁদের মনে কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। যতদিন রসূল করীম ও তাঁর সাহাবিগণ দুনিয়াতে ছিলেন, ততদিন কোন দর্শন মুসলমানদের ঈমান ও ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারেনি। 'খেলাফতে রাশেদা'র পর খলীফাদের মাথায় দেশ বিজয়ের খেয়াল চাপে। ফলে, মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এদিক থেকে আব্বাসী খলীফাদের যুগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ইসলামের চিরন্তন সারল্য ও সাম্য ত্যাগ করে একনায়কত্ব, বিলাস-ব্যসন ও স্বেচ্ছাচারিতার বেসাতি আরম্ভ করেন। তাঁরা একদিকে ইরানী ও গ্রীকদের দর্শনকে আরবীতে রূপান্তরিত করেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগতের সাথে সাংস্কৃতিক ও তমদ্দুনিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই টানা-পোড়েনের ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অক্ষত রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী আকায়েদে শত শত প্রশ্নের উদ্ভব হয়। আত্মা, নুবুওয়াত এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাস আর সন্দেহের ঝড় উঠে পাশ্চাত্য জগতের 'হাঁ বোধক' বা 'না বোধক' চিন্তাধারার ছড়াছড়ি বড় বড় মুসলিম ধর্ম প্রচারক ও তফসীরকারদের পথভ্রষ্ট করে দেয়। তাঁদের ইসলামবিরোধী সমালোচনা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে আরম্ভ করে। মুসলিম চিন্তানায়কগণ এ সময়ই 'ইলমে কালাম' (ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিদ্যা)-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এর উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। খোলা মাঠে নেমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ছিল না। তারা জানতো যে, তলোয়ার দিয়ে যদি মুসলমানদের পদানত করার চেষ্টা করা হয়, তবে তাদের পরিণতি

হবে এমনি, রসুল করীমের দুশমনদের যেমন হয়েছিল কোন এক সময়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা দর্শনের আড়ালে আশ্রয় নেয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাতিয়ার নিয়ে ইসলাম ধর্মের উপর হামলা চালাতে শুরু করে। মুসলিম চিন্তানায়কগণ ভাবলেন, দর্শনের ঢাল দিয়ে দর্শনের রদ করাই হলো প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা। এঁদের যুক্তিবাদ ও ঐশী জ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা কেবল নাস্তিকতাকেই রুখে দাঁড়ায়নি, সমালোচকদের সামনেও তাঁরা এটা প্রমাণ করে দিলেন যে, অভ্যন্তরীণ শক্তি হোক বা বহিঃশক্তিই হোক, বিরোধী শিবিরের মোকাবিলায় তাঁরা যথেষ্ট শক্তির অধিকারী। মুসলিম চিন্তাবিদদের এ চিন্তাধারাই আবু মুসলিম, আবু বকর, আবুল কাসেম বলখী এবং আরো অন্যান্য ওলামাকে অগ্রগতির পথে ধাবিত করে। তাঁরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা রদ করার জন্য কুরআনের তফসীর করেই ক্ষান্ত হননি, ইলমে কালাম বিষয়ে কতক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেন। এঁরাই পৃথিবীকে সর্বপ্রথম এক বিশেষ 'আধুনিক ইলমে কালাম' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী, ইবনে রুশদ বা কাজী আযুদের ভাবধারা ও মতবাদ যাই হোক না কেন, এঁদের সবারই লক্ষ্য ছিল নিছক যুক্তিবাদের ধারাকে রোধ করা। মুসলমানদের মধ্যে তখন প্রতিরোধের এ মনোভাব দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

এই মহান ব্যক্তিদের পদক্ষেপ ও দূরদর্শিতার ফলে মিসর, সিরিয়া তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম দেশে ইলমে কালামের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এসব দেশের মুসলিম চিন্তাবিদরা এ শাস্ত্রকে এত উন্নত, দৃঢ় ও বিস্তৃত করে তোলেন যে, এর সামান্য ধাক্কায় গ্রীক ও ইরানী দর্শনের লৌহ দুর্গ ধ্বসে পড়ে। তা সত্ত্বেও গ্রীক ও ইরানী দর্শনের ছিটে ফোঁটা ও বিচ্ছিন্ন ভগ্নাবশেষের প্রভাবে মুসলিম ভারতের চিন্তাধারা প্রভাবিত না হয়ে পারেনি। স্যার সৈয়দ আহমদ গোড়াতেই এ আসন্ন বিপদ আঁচ করতে সক্ষম হন। মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস বিকৃত হোক, তারা কালের প্রবাহে ভেস্তে যাক ও পথভ্রষ্ট হোক—এটা তাঁর মোটেও সহ্য হতো না। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'তফসীরুল্ কুরআনে'র প্রণয়ন এই অনুভূতিরই ফলশ্রুতি।

স্যার সৈয়দের পর শিবলী নু'মানীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি একনিষ্ঠভাবে নাস্তিক্যের ক্রমবর্ধমান ধারাকে রোধ করার জন্য চেষ্টা করেন।

তিনি 'নাদওয়াতুল ওলামা'র এক সভায় আলেম সমাজকে সতর্ক করে বলেন, "দর্শনের আড়ালে কুফর ও নাস্তিক্যের যে ধারা ভারতের দিকে বয়ে আসছে, তা রোধ করা আলেম সমাজের কর্তব্য।" খুব কম লোকই শিবলীর কথায় সায় দেয়। কেউ কেউ তাঁকে 'জড়বাদী', আবার কেউ কেউ 'ধর্মহীন' বলে অভিহিত করে। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন মুসলিম দরদী। তিনি হাসিমুখে বিরুদ্ধ শিবিরের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তিনি চেষ্টা করতেন যে, জনসাধারণ যেন ভাবাবেগে প্রবাহিত না হয় এবং তাঁর মর্মবাণী উপলব্ধি করে।

শিবলী ছিলেন হানাফী পন্থী। এ বিষয়ে লোকের মনে যেন সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সেজন্য তিনি কেবল 'সীরাতুন্ নু'মান'ই রচনা করেন নি, নিজ নামের সাথে স্থায়ীভাবে 'নু'মানী' শব্দটিও সংযোজিত করেন।

'আল-কালাম' ও 'ইলমুল-কালাম' নামক গ্রন্থ দু'টি শিবলীর সবচাইতে বড় অবদান। প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল গ্রন্থদ্বয়কে চার খণ্ডে সমাপ্ত করা। কিন্তু দুই খণ্ড প্রকাশিত হবার পর দেখলেন যে, তাঁর মূল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়েছে। তাই আর অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

গাযালী এবং রাযীর ভাবধারায় শিবলী অনেকটা উপকৃত হন। তিনি এ রচনাদ্বয়ের মাধ্যমে এক বিশেষ ইলমে কালামের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতে এমন সব প্রশ্নের আলোচনা স্থানলাভ করে, ভারতের বুকে সময় সময় যার উদ্ভব হয়ে থাকে। মিশনারীদের খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতীয় মুসলমান-দের মন-মেজাজকে অতিষ্ঠ ও পরাভূত করে রেখেছিল। তারা যুগের একজন গাযালী বা রাযী বা ইবনে রুশদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা নাস্তিকদের অভিযোগ রদ করে আপন ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তির খোঁজে উন্মুখ হয়ে রয়েছিল।

শিবলী মুসলমানদের বিপদগামী হতে দেননি। তিনি সুষ্ঠু বুদ্ধি-ভিত্তিক প্রমাণ দিয়ে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন। যাঁরা দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার চর্চা করেন, তাঁরা ভাল করে জানেন যে, ভারতে আজ পর্যন্ত শিবলীর সমকক্ষ কোন 'কালামবিদ' জন্মগ্রহণ করেনি। তাঁর এ রচনাদ্বয়ের জ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলোকে ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহ উপলব্ধি করা যায়। যারা এতদিন নিজেদের

ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেবল হাওয়ার উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিল এবং মনের টানেই আপন ধর্মীয় বিশ্বাসে অটল ছিল, তাদের জন্য এই গ্রন্থদ্বয় ছিল মহার্ঘ্য। এর ফলে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস খুবই দৃঢ়তা লাভ করে। শিবলী রচিত গ্রন্থদ্বয়ের উপকারিতা এখানেই শেষ নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের দিক থেকে ইসলামী আকায়েদের বিরুদ্ধে যে সব প্রশ্নের অবতারণা করা হয়, সেগুলোর দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দেবার জন্যও মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ রচনাদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।

শিবলী যখন 'ইলমুল-কালাম' ও 'আল-কালাম' রচনায় রত ছিলেন, তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলমানরা ছিল পর্যুদস্ত। এছাড়া পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থাও তখন ইসলামী আকায়েদকে বিনষ্ট করার জন্য ছিল যথেষ্ট। আজ বাংলাদেশে খ্রীস্টান মিশনারিগণ নব নব কৌশলে ইসলামের মৌলিক আকায়েদ বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় শিবলীর 'আল-কালাম' ও 'ইলমুল-কালাম'-এর উপকারিতা আরো বেড়ে যেতে বাধ্য।

# বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

[ আল্-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন্ অস্সলাতু আলা রসূলিহী মুহাম্মাদেঁও-অ-আলিহী-অ-আস্হাবিহী আজমাঈন ]

দুনিয়ার প্রায় সকল জাতির কাছেই ধর্ম সবচাইতে প্রিয় বস্তু। মুসলমানদের কাছে এ-তো ছিল প্রাণাধিক প্রিয় এবং এর বিশেষ কারণও ছিল। তা'হলো – 'মুসলমান' বলতে কোন বংশ, পরিবার, দেশ, লোকালয় বা ব্যক্তি বিশেষকে বুঝায় না; এ হলো একটি ভাবধারার নাম। মুসলিম জাতীয়তাবাদের মৌল উপাদান বা উৎস হলো—ধর্ম। তাই এ দিকটা বাদ দিলে জাতীয়তাবাদের অস্তিত্বই থাকে না। এ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই মুসলমানরা যুগে যুগে তাদের ধর্মকে সর্ববিধ সঙ্কট থেকে রক্ষা করার জন্য দুর্বার চেষ্টা চালায়।

আব্বাসী খলীফাদের শাসনামলে গ্রীস ও পারস্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। প্রত্যেক জাতিকে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আলোচনা করা এবং বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার পুরোপুরি অধিকার দেয়া হয়। ফলে, ইসলাম এক বড় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। পার্সী, খৃীস্টান, ইহুদী ও নাস্তিকরা দিকে দিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মুসলিম জয় যাত্রার প্রথম অঙ্কে এদের গায়ে ইসলামী অসির যে যখম লেগেছিল, এখন তারা মসীরূপ অসি দিয়ে সেই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলো। তারা স্বাধীন ও বেপরোয়া সমালোচনার তীরে ইসলামী আকায়েদকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো। ফলে দুর্বলমনা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠলো।

সে সময় শাসন ক্ষমতা বলে খুব সহজেই এসব বিরূপ সমালোচনার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া যেতো। কিন্তু মহানুভবতার বশবর্তী হয়ে মুসলমানরা কলমের জওয়াব তলোয়ারে দেয়া পছন্দ করেনি। ওলামা সমাজ ঐকান্তিক আগ্রহ ও পরিশ্রম সহকারে দর্শন শিক্ষা করেন এবং বিরোধিগণ ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে সব হাতিয়ার

অবলম্বন করে, তা দিয়েই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। সেসব প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলশ্রুতিই আজ 'ইলমে কালাম' নামে পরিচিত।

আব্বাসীদের আমলে ইসলাম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। আজ তার চাইতেও বড় সঙ্কটের আশঙ্কা বিদ্যমান। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ঘরে ঘরে স্থান লাভ করেছে। স্বেচ্ছাচারিতা আজ এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, পূর্বে ন্যায্য কথা বলাও এত সহজ ছিল না, আজ অন্যায় কথা বলা যতটুকু সহজ। ধর্মীয় ভাবধারায় ভূমিকম্পের ন্যায় আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা আজ আগাগোড়া পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত। প্রবীণ ওলামা সমাজ যদি কখনো নির্জনতার বাতায়ন থেকে মুখ বের করেন, তাঁরা দেখতে পান যে, ধর্মের দিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন।

চারদিক থেকে রব উঠছে—একটি আধুনিক ইলমে কালাম প্রণীত হোক! এ প্রয়োজন তো সবাই সমর্থন করে। কিন্তু মতভেদ হলো এর মূলনীতি নিয়ে। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতে, 'আধুনিক ইলমে কালাম' আগাগোড়া নব্য নীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হবে। কারণ, অতীতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনীত হয়, তা ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। আজ অভিযোগের আকৃতি-প্রকৃতি পুরোপুরি পরিবর্তিত। অতীতে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল গ্রীক দর্শনের সাথে। গ্রীক দর্শন আদ্যোপান্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল অনুমান ও কল্পনার উপর। কিন্তু আজ ইসলামকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেবল অনুমান বা কল্পনা দিয়ে কোন লাভ হবে না।

কিন্তু আমার মতে, এ ধারণা ঠিক নয়। প্রাচীন ইলমে কালামের যে অংশকে আজ নিরর্থক বলে মনে করা হয়, তা পূর্বেও ছিল অপর্যাপ্ত। আর যে অংশটুকু তখন ফলপ্রসূ ছিল, তা আজও তদ্রূপ এবং বরাবরই তদ্রূপ থাকবে। কাল-প্রবাহ বা বিপ্লবের ফলে কোন বস্তুর বিশুদ্ধতা বা বাস্তবতা বিনষ্ট হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি দীর্ঘদিন ধরে আশা করে আসছিলাম যে, প্রাচীন নীতির অনুসরণে এমন এক বিশেষ ইলমে কালাম প্রণয়ন করবো, যা হবে বর্তমান যুগের রুচি মোতাবেক। কিন্তু পরে ভাবলাম, এ বিষয়ে হাত দেবার পূর্বেই ইলমে কালামের বিস্তারিত ইতিহাস লেখা আবশ্যক এবং এর দুটি কারণও ছিল ঃ

১। যে ইলমে কালাম প্রণয়ন করা আমার উদ্দেশ্য, তার রচনা-ভঙ্গি যা-ই হোক না কেন, তাতে একটা বস্তুর প্রতি আমাকে লক্ষ্য রাখতেই হবে। তা হলোঃ পূর্ব-পুরুষদের নির্ধারিত নীতি যেন কোথাও লংঘিত না হয়। এ রচনায় আমাকে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হবে। তা হলোঃ যুগে যুগে মুসলিম ইমামগণ ইলমে কালাম রচনায় কি নীতি অবলম্বন করেছিলেন? তাতে যে সব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়, তাই বা কোন প্রকার বা কি প্রকৃতির ছিল? এতে একটি ফয়দাও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রগতিশীলতা, স্বাধীন চিন্তাধারা, সাহসিকতা, উদারতা—এমন কতগুলো গুণ প্রতিভাত হয়ে উঠবে, যার জন্য এ যাবত কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি এবং যা অন্যভাবেও প্রকাশ লাভ করেনি।

২। ইতিহাস বিষয়ে ইউরোপের লোকেরা যে সব নব নব উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত ও জাতীয় ইতিহাস রচনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। এখন তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় নিয়োজিত। তাঁরা এখন যে সব বিষয়ের পেছনে লেগে রয়েছেন, তা হলো---অমুক শাস্ত্রের উৎপত্তি হলো কখন? কি কারণে ও কিভাবে এর ক্রমোন্নতি হলো? এতে এ যাবত কি কি উন্নতি এবং কি কি পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হলো? এ ধরনের কোন ইতিহাস গ্রন্থ উর্দুতে কেন, আরবী-ফার্সীতেও দৃষ্ট হয় না। আমি আমার গ্রন্থ রচনার সূচনা থেকেই ইতিহাসকে আপন বিষয়রূপে বেছে নিয়েছি। তাই এ যাবত যা লিখেছি এবং যা প্রকাশিত হয়েছে, তা ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে ইলমে কালাম ছিল আমার আওতার বাইরে। তাই আমি ভাবলাম, যদি ইলমে কালামের ইতিহাস লিখি, তবে একদিকে ইসলামী সাহিত্যের একটি বড় অভাব ঘুচবে, অন্যদিকে ইলমে কালামের এ রচনাটিও আমার আওতাভুক্ত হয়ে পড়বে এবং এমনি করে ইতিহাসের গণ্ডি অতিক্রম করে গুনাহগার হওয়া থেকেও আমি রেহাই পাবো।

## প্রাচীন ওলামা রচিত ইলমে কালামের ইতিহাস গ্রন্থ

ইলমে কালাম এবং কালামবিদগণের জীবনচরিত সম্পর্কে আরবী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। সবার আগে হিজরী চতুর্থ

শতকে মহান ঐতিহাসিক আল্লামা মরয্বাণী ‘আখ্বারুল-মুতা-কাল্লিমীন’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে নাদীম খুব শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁর নাম উল্লেখ করেন। এরপর আরো অনেক গ্রন্থ প্রণীত হয়। নিম্নে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে ঃ

| গ্রন্থ | গ্রন্থকার |
|---|---|
| মাকালাতুল্ ইসলামীন | ইমাম আবুল হাসান আশ্য়ারী |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | আবুল মুযাফ্ফর তাহির বিন মোহাম্মদ ইসফারায়েনী |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | কাজী আবু বকর মোহাম্মদ বিন আত্তাইয়েব বাকেল্লানী মৃঃ ৪০৩ হিঃ |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | আবুল মনসুর আব্দুল কাহির বিন তাহির বাগদাদী। মৃঃ ৪২৯ হিঃ। |
| আল্-ফুস্সাল-ফিল মিলাল্ অন্ নিহাল্ | আল্লামা আলী বিন্-আহমদ-বিন হাযম যাহিরী। মৃঃ ৪৫৬ হিঃ। |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | ইমাম মোহাম্মদ বিন আব্দুল করীম শহরিস্তানী। মৃঃ ৫৪৮ হিঃ। |
| মিলাল্ ও নিহাল্ | আহমদ বিন ইয়াহইয়া মুরতযা যাইদী। |

এঁদের মধ্যে ইবনে হায্ম শহরিস্তানী এবং মুরতাযা যাইদীর গ্রন্থদ্বয় আমার সামনেই অধ্যয়নভুক্ত রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসে সর্বপ্রথম কিভাবে মতভেদের সৃষ্টি হলো, কিভাবে তা প্রসার লাভ করলো এবং কিভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হলো, ইবনে হায্ম ও মুরতাযা যাইদী তাঁদের গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ দেন। তাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসেরও আলোচনা করেন। ইবনে হায্ম তাঁর গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদেরও খণ্ডন করেন। মুরতাযা যাইদীর গ্রন্থটি ‘মুতাযিলা’ ও ‘যাইদিয়া’ মতবাদের উপর লিখিত।

এ গ্রন্থমালার সব কয়টি মুস্লিম সম্প্রদায়সমূহের অভ্যন্তরীণ মতভেদ বর্ণনায় সীমিত। নাস্তিক ও দার্শনিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ‘মুতা-

কাল্লিম' (কালাম শাস্ত্রবিদ)-গণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, তার উল্লেখ এসব গ্রন্থে নেই। এজন্য আমাকে আরো অনেক গ্রন্থ আলোচনা করতে হয়। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম ঃ

| গ্রন্থ | গ্রন্থকার |
|---|---|
| তাহাফাতুল-ফালাসিফাহ | ইমাম গাযালী |
| আত্‌তাফ্‌রিকাতো-বাইনাল-ইসলামে ও য্‌যানাদিকাহ্‌ | ,, ,, |
| মিশ্‌কাতুল-আনওয়ার | ,, ,, |
| তাবিলাতুল্‌-কোরআন | ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদী |
| আল্‌-মাকসাদুল-আকসা | ইমাম গাযালী |
| আল্‌ মায্‌নুনু-আলা-গাইরে আহ্‌লিহী | ,, ,, |
| আল্‌ মায্‌নুনু আলা আহ্‌লিহী | ,, ,, |
| আল্‌ কিস্‌তাসুল মুসতাকীম | ,, ,, |
| আল্‌-ইকতিসাদু ফিল্‌ ইতিকাদ্‌ | ,, ,, |
| মায়ারিজুল্‌-কুদ্‌স্‌ | ,, ,, |
| জওয়াহিরুল-কোরআন | ,, ,, |
| ইল্‌জামুল আওয়াম | ,, ,, |
| মুনকিয্‌ মিনাদ্‌-দালাল | ,, ,, |
| আন্‌-নাফখু-অত্‌তস্‌বিয়াহ্‌ | ,, ,, |
| মাতালিবে আলিয়াহ্‌ | ইমাম রাযী। এটি ইমাম রাযীর সর্বশেষ রচনা। |
| নিহাইয়াতুল উকুল | ,, ,, |
| আরবাইন্‌-ফী-উসুলিদ্‌-দীন | ,, ,, |
| মাবাহিসে-মাশরিকিয়াহ্‌ | ,, ,, |
| হিকমাতুল ইশরাক্‌ | শেখ শিহাবুদ্দীন মাক্‌তুল্‌ |
| হায়াকিলুন নূর | ,, ,, ,, |
| আল্‌ কালামু আলাল মুহাস্‌সাল | ইবনে তাইমিয়াহ্‌ |
| রদ্দে মানতিক্‌ | ,, ,, |
| শরহি মাকাসিদ | আল্লামা তাফতাযানী |
| শরহি মাওয়াকিফ্‌ | কাজী আয্‌দুদ্দীন ও সৈয়দ শরীফ |
| সাহাইফ্‌ | ,, ,, ,, ,, ,, |
| কিতাবুর রুহ্‌ | ইবনে কাইয়েম |

অধুনা ইলমে কালাম বিষয়ে মিসর, সিরিয়া ও ভারতে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এতে নতুন ইলমে কালামের অঢেল মাল-মসলাও সৃষ্টি হয়েছে। এই নতুন ইলমে কালামকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ এক ধরনের ইলমে কালাম দেখা যায়, যাতে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা আর প্রমাণ বই কিছুই নেই। এটা মূলত আশায়েরাপন্থী শেষ যুগীয় ওলামারই সৃষ্টি। আরেক ধরনের ইলমে কালাম রয়েছে, যাতে ইউরোপের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তাদের ভাবধারাকে সত্যের মাপকাঠি-রূপে ধরে নেয়া হয়েছে, তৎপর কুরআন-হাদীসকে জোর জবরদস্তি করে টেনে এনে তার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া হয়েছে। প্রথমোক্তটি অন্ধ অনুকরণ এবং শেষোক্তটি অনুকরণধর্মী ইজতেহাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমি এসব গ্রন্থাবলীকে মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করিনি।

## ইলমে কালামের ইতিহাস

### ইলমে কালামের দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগ ঃ

বেশ কিছু কাল থেকে ইলমে কালাম একটি মিশ্র বিষয়রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। মূলত তা ছিল দুটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত এবং উভয়ের উদ্দেশ্যও ছিল পৃথক পৃথক। এক প্রকারের ইলমে কালাম কেবল মুসলিম সম্প্রদায়সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে জন্মলাভ করে। এই ইলমে কালাম দীর্ঘকাল ধরে প্রসার লাভ করতে থাকে। এরই ফলে বড় বড় হাঙ্গামা এবং বিতর্কের লড়াই দানা বেঁধে উঠে। এতে কেবল কলমেরই আশ্রয় নেয়া হয়নি, তলোয়ারও ব্যবহৃত হয়। এ লড়াই মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মারাত্মক আঘাত হানে।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলমে কালাম দর্শনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে জন্মলাভ করে। ইমাম গাযালীর আবির্ভাবের পূর্বে ইলমে কালামের উভয় শাখা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তিনিই এ দু'টিকে মিশিয়ে ফেলার সূত্র আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ইমাম রাযী এই মিশ্রিত ইলমে কালামের উন্নতি বিধান করেন। শেষ যুগীয় ওলামাগণ বিষয়টিকে এত এলেমেলো করে দিলেন যে, দর্শন, কালাম, আকাইদ-নীতি সব কিছু মিলে একটি জগাখিচুড়ি সৃষ্টি হয়।

মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথম প্রকারের ইলমে কালাম নিয়ে চর্চা বা তার ইতিহাস রচনা করা মোটেই সমীচীন নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় প্রকারের ইলমে কালামের ইতিহাস লেখা এবং তদনুসারে একটি আধুনিক ইলমে কালাম প্রণয়ন করা। কিন্তু এর অনেকটা নির্ভর করে প্রথমোক্ত ইলমে কালামের ইতিহাস জানার উপর। তাই তারও একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া অপরিহার্য।

ইসলাম যতদিন আরবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন আকাইদ নিয়ে কোন প্রকার পরিশ্রম, আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়নি, তর্কবিতর্কও সৃষ্টি হয়নি। তার কারণ হলো, আরবদের স্বভাব ছিল কেবল কাজ করে যাওয়া, কল্পনায় ডুবে থাকা নয়। তাই ইসলামের সূচনা থেকেই তারা নামায, রোযা, যাকাত ধর্মের সকল ব্যবহারিক দিকগুলো নিয়ে ভাবনা এবং গবেষণা শুরু করে। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঈমান সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি, পর্যালোচনাও করেনি। মোটামুটি আকীদাকে ঠিক রাখাই তাদের কাছে ছিল যথেষ্ট।

## ধর্মীয় বিশ্বাসে মতভেদের সূত্রপাত

### ধর্মীয় বিশ্বাসে মতভেদ সৃষ্টির প্রথম কারণ :

ইসলামের গণ্ডি যখন আরব ছেড়ে অনেকদূর প্রসারিত হলো, ইরানী, গ্রীক, কিব্‌তী এবং আরো অন্যান্য জাতি যখন মুসলিম দেশের সীমারেখায় প্রবেশ করলো, তখন থেকেই আকাইদ নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনা শুরু হয়। কারণ টীকা-টিপ্পনী কাটা এবং তিলকে তাল করাই ছিল অনারবদের স্বভাব।

### দ্বিতীয় কারণ :

দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, যে সব জাতি ইসলামে দীক্ষিত হয়, তারা পূর্ববর্তী ধর্মে আল্লাহ্‌র গুণাবলী, বিধি-বিধান, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতো। একাধিক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আল্লাহ্‌র অংশীদারত্ব, মূর্তিপূজা এরূপ তাদের অনেক ধ্যান-ধারণা ছিল, যা স্পষ্টত ইসলাম বিরোধী। তারা যখন ইসলাম গ্রহণ

করলো, তখন তাদের এসব ভাবধারা মন থেকে সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু ইসলামের যে সব আকাইদে বিভিন্ন দিক রয়েছে, অর্থাৎ যাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা যায় এবং তন্মধ্যে যেগুলোর সাথে তাদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় বিশ্বাসের কিছুটা সাদৃশ্যও রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে পুরনো ধ্যান-ধারণার দিকে ধাবিত হওয়াটা ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। বিভিন্ন ধর্মের লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাদের সাবেক ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল পরস্পর বিরোধী। তাই ইসলামের উপর তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারেনি। ধরুন, ইহুদী ধর্মে আল্লাহ্‌কে 'শরীরী মানুষ' রূপে জ্ঞান করা হয়। আল্লাহ্‌র চোখে উঠে,চোখে যন্ত্রণাও হয়; ফেরেশতা তার সেবা করে; সে কখনো কখনো পয়গম্বরের সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দৈবক্রমে আঘাতও প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরূপ ভাবধারার ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। তাদের নজর কুরআনের সেসব আয়াতের উপর না পড়ে পারেনি, যাতে আল্লাহ্‌র হাত, মুখ এবং অন্যান্য কায়াবোধক বিভিন্ন শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। এসব শব্দ দিয়ে তারা স্বভাবতই এ অর্থ করেছে যে, বস্তুত আল্লাহ্‌র হাত, পা ইত্যাদি রয়েছে।

### তৃতীয় কারণ ঃ

এ ছাড়া কতগুলো বিষয় রয়েছে বিতর্কমূলক, যাদের পরস্পর-বিরোধী অর্থ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি না হয়ে পারে না। যেমন 'জবর ও কদর' (মানুষের ক্ষমতা ও অক্ষমতা)-র বিষয়টি। এতে একদিকে ভাবলে মনে হয় যে, আমরা আপন কর্মের স্রষ্টা, পক্ষান্তরে এর অন্যদিকটা গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, কর্মতো দূরে থাক, আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছারও কোন অধিকার নেই। মনুষ্য প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। এ বিভিন্নতাও ছিল মতদ্বৈততার একটি প্রধান কারণ।

### চতুর্থ কারণ ঃ

একজন সরলপ্রাণ, সরল স্বভাব ও পূতমনা ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হলে তার মনে আল্লাহ্‌র যে ছবি অংকিত হয়, তা এই ঃ তিনি সারা বিশ্বের মালিক এবং রাজাধিরাজ; তাঁকে কেউ আদেশ দিতে পারে না;

কোন কাজ তাঁর জন্য অবশ্য করণীয় নয়; কেউ তাঁর আদেশ লংঘন করতে পারে না। পাপীকে ক্ষমা করা আর পুণ্যবানকে শাস্তি দেবার অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। এ মর্ম কথা ব্যক্ত করে কোন কবি বলেন ঃ

তিনি যখন দয়ার ভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে আসেন, তখন
আযাযিলও বলে—এতে আমারো অংশ রয়েছে। আবার
তিনি যখন রুষ্ট হন, আদেশের তরবারি উঠান,
'কাতিবীন কেরাম'ও হতবাক হয়ে পড়েন।

তিনি তাঁর অসীম শক্তির লীলা দেখালে পাথর কণাও পাহাড়ে পরিণত হয়; রাত দিনের আকার ধারণ করে; আগুনের উত্তাপ শীতল হয়ে যায়; পানির স্রোত থমকে দাঁড়ায়।

সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন তিনি। যে সব বস্তুকে আমরা বাহ্যত সৃষ্টির হেতু বলে মনে করি, বস্তুত তা ঠিক নয়। মানুষ কোন কাজই স্বেচ্ছায় করতে সক্ষম নয়। সে কেবল তাই করতে সক্ষম, যা আল্লাহ্ করাতে চান।

এই ধ্যান-ধারণাগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের রূপ ধারণ করে এবং 'আশায়েরা' মতবাদে পরিণত হয়। এই বিষয়গুলো ইলমে কালামে নিম্ন পরিভাষায় বর্ণিত হয় ঃ

* আল্লাহ্র প্রত্যেকটি হুকুমকে মঙ্গলসূচক হতে হবে-তাঁর জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।
* পৃথিবীতে কোন বস্তুই কোন বস্তুর সৃষ্টির হেতু হতে পারে না।
* বস্তুর সত্তায় কোন বৈশিষ্ট্য বা প্রভাব নেই।
* আল্লাহ্ যদি সৎকে বিনা দোষেও শাস্তি দেন, তবুও তা অন্যায় কিছু নয়।
* মানুষ স্বেচ্ছায় কোন কাজ করতে সক্ষম নয়।
* মানুষ ভাল-মন্দ যা-ই করে, তা আল্লাহ্ই করান।

**পক্ষান্তরে একজন দার্শনিক আল্লাহ্ সম্পর্কে নিম্নরূপ ধারণা পোষণ করে ঃ**

* আল্লাহ্র প্রত্যেকটি কাজই মঙ্গলসূচক; তাঁর ক্ষুদ্রতম কাজও অমঙ্গলকর নয়।

* তিনি বিশ্ব শৃংখলা বজায় রাখার জন্য কতগুলো বাঁধাধরা নিয়ম রেখেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম নেই।
* তিনি বস্তু সত্তায় এমন বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রেখেছেন, যা অবিচ্ছেদ্য।
* তিনি মানুষকে ইচ্ছাধীন কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। সেজন্য প্রত্যেকেই স্ব স্ব কাজের জন্য দায়ী।
* ন্যায় বিচার করাই তাঁর স্বভাব। তিনি কখনো অবিচার করতে পারেন না।

এই ভাবধারা মুতাযিলার ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়।

ইমাম রাযী তাঁর 'তফসীরে কবীর' এর 'আন্আম' নামক সূরায় আবুল কাছেম আনসারীর মুখ দিয়ে এ গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আহলে সুন্নাত-অল-জামায়াত' (আশ্য়ারিয়া) এর লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্ তায়ালার শক্তির অসীমত্ব প্রকাশ করা। আর মুতাযিলার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র মহিমা ও মহত্ত্ব তুলে ধরা এবং তাঁকে দোষমুক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব এবং পবিত্রতার সমর্থক। কেবল তফাৎ হলো একের মতবাদ ভ্রান্ত, আর অন্যের যথার্থ।

**পঞ্চম কারণ :**

ঐশী বাণীর সাথে যুক্তিবাদের কতটুকু সামঞ্জস্য আছে বা নেই, এ প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেও আকাইদে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। কতক মানুষ আছে, যারা প্রত্যেক ব্যাপারেই যুক্তি প্রয়োগ করতে চায়। তারা কোন কথাই বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ না তা যুক্তিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো, যারা আলোচনা বা সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে ধর্মপ্রাণ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোক থেকে যা শোনে, তাই বিচার-বিশ্লেষণ না করে মেনে নেয়।

মানুষের এ দু'ধরনের প্রকৃতি স্বভাবেরই সৃষ্টি। তাই যুগে যুগে প্রকৃতি ও মনোবৃত্তির এ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মহামান্য সাহাবাদের জীবনী পাঠ করলে দেখতে পাবেন এরূপ অনেক ধর্মীয় মতভেদ। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) রসূলে করীমের হাদীস বর্ণনা

করে বলেন, "জীবিতদের বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হয়।" হযরত আইশা (রাঃ) এই হাদীস শুনে বললেন, "এটা হতেই পারে না। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন, "এক ব্যক্তির পাপের দায়ে অপর ব্যক্তির শাস্তি হতে পারে না।" কোন এক সাহাবী রসূলে করীমের হাদীস বর্ণনা করে বললেন, "মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায়।" হযরত আইশা এ হাদীস শুনে বললেন, "মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায় না। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং রসূল করীমকে সম্বোধন করে বলেনঃ "আপনি মৃতদের কিছুই শোনাতে পারবেন না।" হযরত আবু হুরাইরা রসূল করীমের অপর একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, "আগুনে পাকানো খাদ্য খেলে অযু ভেঙ্গে যায়।" হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসুদ এই হাদীস শুনে বলেন, "যদি তাই হয়, তবে গরম পানি খেলেও অযুর প্রয়োজন হয়ে পড়বে।" হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস বলেন, "রসূল করীম মেরাজের সময় আল্লাহ্‌কে দেখতে পান।" হযরত আইশা প্রত্যুত্তরে বলেন, "কখনো দেখতে পাননি।"

সাহাবাদের সম্পর্কে (আল্লাহ্ মাফ করুন) এটা ধারণাও করা যায় না যে, তাঁরা রসূল করীমের বাণী অস্বীকার করতে পারেন। তাই বলতে হয়, যাঁরা উপরোক্ত হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁরা হয়তো ভেবেছেন যে, যা যুক্তিযুক্ত নয়, তা রসূল করীমের বাণীই নয়। তাঁদের মতে, বর্ণনাকারিগণ হয়তো তাঁদের বর্ণনায় ভুল করেছেন।

হযরত আইশা হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত অনেক হাদীসের দোষত্রুটি তুলে ধরেন। হাফেয জালালদ্দীন সুয়ুতী এ হাদীসগুলোর একটি সংকলন প্রস্তুত করেন।

### ষষ্ঠ কারণঃ

ধর্মীয় বিশ্বাসে মতভেদের আরো একটি বড় কারণ ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে ওলামা সমাজের ভেদনীতি। মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌দের নীতি ছিল, তাঁরা স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কারুর সাথে মেলামেশা করতেন না। অন্যের সাথে উঠাবসা তাঁরা ভাল মনে করতেন না। দ্বিতীয় কারণ ছিল, তাঁরা হাদীসের অনুসন্ধান, আলোচনা ও পর্যালোচনায় এত ব্যস্ত থাকতেন যে, অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করার মত অবকাশ তাঁদের ছিল না। ফলে বিধর্মীদের আওয়াজ তাঁদের কানে এসে পৌঁছতো না। তাঁরা মোটেও জানতেন না যে, ইসলামের বিরুদ্ধে

কি কি অভিযোগ আনীত হচ্ছে। তাঁদের আহ্বান ছিল কেবল আপন ভক্তদের প্রতি। ভক্তগণও তাঁদের কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতো।

মুহাদ্দিসদের নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করতোঃ আল্লাহ্ যদি শরীরী না হন, তবে কি করে আর্‌শে আসীন হতে পারেন? উত্তরে তাঁরা বলতেনঃ এটা কিভাবে সম্ভব, তা আমাদের জানা নেই। তবে ব্যাপারটি নিয়ে প্রশ্ন করাও বেদা'ত। ভক্তগণ নীরবে এ জওয়াব মেনে নিতো। তাই মুহাদ্দিসদের এই গোলক ধাঁধাঁ দূর করার প্রয়োজন হতো না।

পক্ষান্তরে, মুতাকাল্লিমীন (ইলমে কালামবিদগণ) বিশেষতঃ মুতাযিলাবাদী ইমামগণ প্রত্যেক ধর্মের এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকের সাথে মেলামেশা করতেন এবং তাদের সাথে বিতর্কও করতেন। শিক্ষিত লোকদের উপর তাঁরা জোর জবরদস্তি অযৌক্তিক কিছু চাপিয়ে দিতেন না এবং দিলেও তা কার্যকর হতো না। তাই তাঁরা আলোচ্য বিষয়ের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হতেন এবং প্রশ্নকারীদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করতেন।

এভাবে মুসলিম আকাইদের বিভিন্ন স্তরে যে সব পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়, সেগুলো আমি বিভিন্ন মতবাদের আকারে পেশ করছি।

## 'যাহিরিয়া' ও 'মুশাব্বিহা'-দের মতেঃ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে ইসলামী আকাইদে কয়েকটি পর্যায় দেখা যায়। প্রথম স্তরে রয়েছে 'যাহিরিয়া' ও 'মুশাব্বিহা' সম্প্রদায়। এঁদের মতে, আল্লাহ্ শরীরী, আপন আসনে আসীন। তাঁর হাত মুখ আছে। তিনি রসূল করীমের পবিত্র স্কন্ধে হাত রাখেন এবং রসূল করীমও তাঁর হাতের স্নিগ্ধতা অনুভব করেন।

## সাধারণ বর্ণনাকারী (আরবাবে রিওয়াইয়াত) এর মতেঃ

দ্বিতীয় পর্যায় হলো আল্লাহ্ শরীরী। তাঁর হাত, পা, মুখ ইত্যাদি আছে। তবে এসব আমাদের মত নয়। এটা হলো সাধারণ বর্ণনাকারীদের অভিমত।

তৃতীয় পর্যায় হলো আল্লাহ্ শরীরী নন। তাঁর হাত মুখ নেই। কুরআনে এ সম্পর্কে যে সব শব্দ রয়েছে, তাতে শাব্দিক ও

আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়নি। তাতে ভাবার্থ ও রূপকার্থ বুঝানোই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ শ্রবণকারী, চক্ষুষ্মান, জ্ঞাত-এসব গুণাবলী তাঁর সত্তাবহির্ভূত।

**সূক্ষ্মদর্শী আশায়েরার মতে :**

চতুর্থ পর্যায় হলো আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সত্তাভুক্ত নয়; বহির্ভূতও নয়।

**মুতাযিলার মতে :**

পঞ্চম পর্যায়—আল্লাহ্‌র সত্তা একক। তিনি দ্বৈততার ঊর্ধ্বে। তাঁর সত্তাই সমস্ত গুণাবলীর আধার। তাঁর সত্তাই চক্ষুষ্মান, শ্রবণকারী এবং ক্ষমতাবান।

**মুসলিম দার্শনিক এবং সাধারণ সূফীদের মতে :**

ষষ্ঠ পর্যায় : অস্তিত্বের অপর নাম আল্লাহ্। অর্থাৎ অস্তিত্বই তাঁর সত্তা। এই মতবাদই পরিভাষায় 'ওহ্‌দাতুল ওজুদ' (সর্ব-আল্লাহ্‌বাদ) এর নাম ধারণ করে। এখানেই দর্শন এবং সূফীবাদ একই সীমারেখায় প্রবেশ করে।

জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ভাবধারার ক্রমোন্নতির ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসেও পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়। ইসলাম এর ব্যতিক্রম নয়। বনু উমাইয়ার ক্রান্তি যুগে ইসলামী আকাইদ প্রথম পর্যায় অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে। আব্বাসী খলীফাদের দরবারে দার্শনিকদের ভীড় থাকতো। রাতদিন দর্শনের চর্চা হতো। ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ বহুকাল পর্যন্ত হাদীস-কুরআনের বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থের উপর অনড় থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোকের চিন্তাধারা অনেকটা এগিয়ে যায়। তারা নব পর্যায়ে উপনীত হয়। 'আল্লাহ্‌র হাত মুখ আছে। অথচ আমাদের মত নয়।' এরূপ ধারণায় তাদের বিশ্বাস করানো মুশকিল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসদের মধ্য থেকেই অন্য একটি সম্প্রদায়ের (আশ্‌য়ারিয়া) উদ্ভব হয়। এঁরা আল্লাহ্‌র শরীর এবং হাতমুখ অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা সেখানেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। কারণ আল্লাহ্‌র গুণাবলী (সিফাত্) নিয়েই ছিল তাদের প্রধান সমস্যা। আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে যদি তাঁর সত্তাভুক্ত বলা হয়, তবে প্রতীয়মান হয় যে,

তাঁর গুণাবলী বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। পক্ষান্তরে, যদি সত্তা বহির্ভূত বলা হয়, তবে তাঁর সত্তা একাধিক্যের শিকারে পরিণত হয়। এই উভয় সংকট এড়ানোর জন্য তাঁরা বলতে বাধ্য হলেন যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সত্তাভুক্তও নয়, বহির্ভূতও নয়। কিন্তু এ সূক্ষ্ম সীমারেখায় দাঁড়িয়ে থাকবেন কি করে? শেষ পর্যন্ত তাঁদের মানতেই হলো যে, আল্লাহ্ এক অযৌগিক অস্তিত্ব এবং তা সমস্ত গুণাবলীর আধার।

এই আলোচনায় আমার এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, আকাইদের এই বিভিন্ন মতভেদ এখন সম্পূর্ণ মুছে গেছে। বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী লোক যুগে যুগে ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। এখানে আমি এটাই বুঝাতে চাই যে, যত নতুন সম্প্রদায় ক্রমাগত জন্মলাভ করেছে, তাদের সবটিই প্রাচীন সম্প্রদায় সম্ভূত।

## রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলেই আকাইদে মতদ্বৈধতার সূত্রপাত হয়

আকাইদে মতদ্বৈধতার আরো কারণ থাকলেও মূলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এর সূত্রপাত হয়। বনূ উমাইয়ার আমলে দেশে বিরাজমান ছিল কাটাকাটি আর হানাহানি। ফলে লোকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কিন্তু যখনই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটতো এবং কারুর অভিযোগ শোনা যেতো, সরকারের খয়েরখা লোকেরা তাকে এই বলে স্তব্ধ করে দিতো—যা কিছু ঘটে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই ঘটে; আমাদের অভিযোগ করার কিছুই নেই ; আমাদের বলা উচিত —আমান্না-বিল-কাদ্‌রে খাইরিহী-ও-শার্‌রিহী— তকদীরে ভালমন্দ যা আছে, তা বিশ্বাস করলাম।

'জোর জুলুমের দেবতা' হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় মা'বাদ জুহানী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। সাহাবাদের সাথেও তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি ছিলেন একজন সাহসী এবং ন্যায়পরায়ণ লোক। তিনি ইমাম হাসান বসরীর শিক্ষার আসরে যোগদান করতেন। একদিন তিনি ইমাম সাহেবের নিকট আরয করলেন, বনূ উমাইয়াদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র বিধিবিধান নির্ধারিত—এ বলে যে ছুতানাতা পেশ করা হয়, তা কতটুকু ঠিক? ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, "আল্লাহর এই শত্রুগণ মিথ্যাবাদী।" মা'বাদ জুহানী প্রথম থেকেই বনূ

উমাইয়াদের অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তদবধি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রাণে মারা যান।

মা'বাদের পর গায়লান দামিশকী কর্তৃক এ ভাবধারা আরো প্রসার লাভ করে। তিনি ছিলেন হযরত ওসমানের দাস। তিনি পরোক্ষভাবে মোহাম্মদ বিন হানীফার নিকট শিক্ষালাভ করেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয খলিফা হলে তিনি অবাধে তাঁর কাছে একটি পত্র লেখেন এবং তাতে বনু উমাইয়াদের অবিচার-অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁকে ডেকে পাঠান এবং রাজকীয় তোষাখানার নিলাম কার্যে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রকাশ্যে পূর্ববর্তী শাসকদের সামগ্রীসমূহ নিলামে বিক্রি করতেন এবং ডেকে ডেকে বলতেন, "এই সব মালপত্র জোরজুলুমে অর্জিত হয়েছে।"

তখনো ইসলামের প্রাচীন সরলতা অনেকটা বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও বিলাসিতার সামগ্রী এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সেই রাজকীয় তোষাখানায় পশমের ত্রিশ হাজার মোজা বিদ্যমান ছিল। গায়লান লোকদের কাছে প্রকাশ্যে বলতেন, "ভাইসব! জুলুমের সীমা আঁচ করুন। জনসাধারণ উপবাস করতো, আর আমাদের শাসকগণ তাঁদের তোষাখানায় ত্রিশ হাজার জোড়া মোজা মজুদ রাখতেন।" ওমর ইবনে আবদুল আযীয ১০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অতঃপর হিশাম ইবনে আবদুল মালেক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি গায়লানের কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই তিনি গায়লানকে ডেকে পাঠান এবং বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁর হাত পা কেটে ফেলেন। তথাপি তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই অজুহাতেই প্রাণে বধ করা হয়।

এ সময় জাহাম ইবনে সাফ্‌ওয়ান্‌ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দায়ে নিহত হন। কিন্তু এ রক্ত বৃথা যায়নি। ন্যায়বিচার এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রসারিত এবং শক্তিশালী হয়ে উঠলো। একটি বিরাট দল সত্য এবং ন্যায়বিচারকে ইসলামের মৌলিক নীতিরূপে বরণ করে অগ্রসর হলেন। এই দলই শেষ পর্যন্ত 'মুতাযিলা' নামে অভিহিত হয়। মুতাযিলা সম্প্রদায় তাঁদের পাঁচটি মৌলনীতির মধ্যে দুটি নিয়েই যাত্রা শুরু করেন। সে দুটি হলো ন্যায় বিচার ও সত্যাদেশ।

এই সম্প্রদায় ক্রমাগত প্রসার লাভ করতে থাকে। ১২৫ হিজরীতে ওলীদ সিংহাসনে আরোহণ করলে এ সম্প্রদায়ের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে লক্ষের কোঠায় পৌঁছে। এমনকি বনু উমাইয়া বংশীয় এযীদ ইবনে ওলীদও এ মতবাদ গ্রহণ করেন। ওলীদ সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই বিলাসিতায় লিপ্ত হন এবং প্রকাশ্যে মদ্যগান ও আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ করেন। এই পরিস্থিতি দেখে এযীদ সত্যাদেশের নীতি নিয়ে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেন। হাজার হাজার মুতাযিলা তাঁকে অনুসরণ করে। ওলীদ বন্দী হয়ে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর এযীদ খলীফা হন। এ দিনই সর্ব প্রথম মুতাযিলা-মতবাদ রাজকীয় সমর্থন লাভ করে। প্রসঙ্গত একথা স্মর্তব্য যে, ওলীদের বিরুদ্ধে এযীদ যখন বিদ্রোহ করেছিলেন, সেই সময় তাঁর সমর্থকদের মধ্যে আমর ইবনে ওবাইদ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে মতাযিলা-মতবাদের একজন বিশিষ্ট ইমামরূপে পরিগণিত হন।

## বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

অঙ্কুরে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই 'জবর ও কদর' (মানুষের অক্ষমতা ও সক্ষমতা)-এর প্রশ্নটি সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু যখন একবার কোন কারণে চিন্তাধারায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা আপনা আপনিই বেড়ে চলে। বনু উমাইয়াদের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই 'খালক-ই কুরআন' অর্থাৎ কুরআনকে চিরন্তন না বলে অভিনব এবং নশ্বর বলা, 'তানযীহ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে মানবিক রূপের উর্ধ্বে মনে করা, 'তাশবীহ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে মানবিক রূপের সাথে তুলনা করা, আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে তাঁর সত্তার অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত মনে করা ইত্যাদি বিতর্কমূলক বিষয়াদি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যার মুখ থেকে যে কথা বের হতো, সেটাই একটা মতবাদে পরিণত হতো। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। 'মিলাল ও নিহাল' এবং আকাইদের অন্যান্য গ্রন্থে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক বিবরণ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস লিখিত রয়েছে। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

এ সম্পর্কে যে কথাগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে ঃ

১। মৌলিক পার্থক্যের দিক থেকে এসব সম্প্রদায়ের সংখ্যা কত ?

২। এই পার্থক্যসমূহে কতটুকু বৈপরীত্য রয়েছে এবং এসব বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে আসল ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু ?

## মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা মূলতঃ অল্প

'মুহাক্কিকীন' (গবেষকগণ) সমর্থন করেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক বেশী বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। মূলতঃ এসব সম্প্রদায়ের সংখ্যা খুবই অল্প। প্রত্যেকটি দল থেকেই কয়েকটি উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। 'শরহে মাওয়াকিফ' গ্রন্থানুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা মুলত ৮টি—শিয়া, সুন্নী, খারিজী, মুরজিয়া, নাজারিয়া, মুতাযিলা, জব্রিয়া ও মুশাব্বিহা।

আল্লামা মাক্রিযী 'তারীখে মিস্র' নামক গ্রন্থে বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরো কম। তাঁর মতে, এর সংখ্যা হলো মাত্র পাঁচটি ঃ শিয়া, সুন্নী, মুতাযিলা, খারিজী এবং মুরজিয়া।

## বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির চারটি মৌলিক কারণ

আল্লামা শহরিস্তানী খুব সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ৪টি মৌলিক কারণ নির্ধারণ করেন ঃ

১। আল্লাহ্র গুণাবলী আছে কি না? যদি থাকে, তবে সত্তার সাথে তার সম্পর্ক কি ?
২। জব্র ও কদ্র অর্থাৎ মানুষ অক্ষম, না সক্ষম?
৩। বিশ্বাস ও কর্মের সম্পর্ক।
৪। যুক্তি এবং ঐশী বাণীর সম্পর্ক।

### প্রথম কারণ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির প্রথম মৌলিক কারণ হলো—কুরআন মজীদে আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব শব্দ রয়েছে, যাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি প্রতীয়মান হয়। যেমন আরশের উপর তাঁর অবস্থান করা, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের সম্মুখে তাঁর উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি—এসব ক্ষেত্রে মৌলিক অর্থ গ্রহণ করা হবে, না ভাবার্থ—এ প্রশ্নটি দুটি দলের সৃষ্টি করে। 'মুহাদ্দিসীন' এবং 'আশয়ারিয়া' মৌলিক অর্থ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্য থেকেই আবার ক্রমাগত 'মুজাস্সিমা' ও 'মুশাব্বিহা' নামক দুটি দল জন্ম লাভ করে।

এঁরা আল্লাহ্‌র হাত পা ইত্যাদি আছে বলে বিশ্বাস করেন। ভাবার্থ গ্রহণ করেন মুতাযিলা সম্প্রদায়। এঁদের দ্বিতীয় নাম—আল্লাহ্‌র স্বতন্ত্র গুণাবলী অস্বীকারকারী।

বিষয়টির আরো একটি বিশ্লেষণ আছে। তা হলো—আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে যদি চিরন্তন বলে মেনে নেয়া হয়, তবে তাঁর একাধিক চিরন্তন অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। আর সেগুলোকে যদি নশ্বর এবং অভিনব বলে পরিগণিত করা হয়, তবে আল্লাহ্‌র অস্থায়িত্ব প্রমাণিত হয়।

প্রথম সমস্যাটি এড়ানোর জন্য মুতাযিলা এ মত গ্রহণ করেন যে, আল্লার স্বতন্ত্র গুণাবলী নেই। আমাদের মুতানুসারে, আল্লাহ্‌র গুণাবলী দিয়ে যে সব কাজ সম্পন্ন হয়, তাঁদের নিকট তাঁর সত্তাই সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করে। 'মুহাদ্দিসীন' মনে করেন, এটা আল্লাহ্‌র গুণাবলী অস্বীকার করারই শামিল। তাই তাঁরা আল্লাহ্‌র স্বতন্ত্র গুণাবলী স্বীকার করতে প্রস্তুত।

## দ্বিতীয় কারণ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির দ্বিতীয় কারণ হলো—মানুষের কর্মের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, কোন বস্তুই তার ক্ষমতাধীন নয়। এমনকি আমাদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়ও আমাদের আওতাধীন নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা যদি আপন ক্রিয়াকর্মে অক্ষম হই, তবে শাস্তি ও প্রতিদান, যা হচ্ছে ধর্মের প্রাণ, তার বুনিয়াদই উৎপাটিত হয়।

কুরআন মজীদে উভয় প্রকারের অর্থবোধক আয়াত রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মানুষ যা কিছু করে, তা আল্লাহ্‌ই করান। যেমন, রসূলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেন, "আপনি বলুন, সব কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।" (আল কুরআন)। আবার কোন কোন আয়াতে বোঝা যায় যে, মানুষ স্বয়ং আপন কর্মের জন্য দায়ী। যেমন' "যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয়, তা তোমারই কর্মফল" (আল কুরআন)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে দু'টি মতবাদের সৃষ্টি হয়। যাঁরা প্রত্যক্ষ পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁরা সোজাসুজি মানুষের অক্ষমতা

মেনে নেন এবং 'জাব্রিয়া নামে অভিহিত হন। আর যাঁরা মানুষের ক্ষমতা বোধক আয়াত নিয়ে ইতস্তত করতেন, তারা অর্জন এবং ইচ্ছার ওযর রাখলেন। অর্থাৎ মানুষ অর্জন করে এবং আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন। এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন আবুল হাসান আশয়ারী। এর পূর্বে কেউ এই মধ্য পন্থার কথা উচ্চারণ করেনি। পক্ষান্তরে, মুতাযিলা মত প্রকাশ করেন যে, মানুষ আপন ক্রিয়া কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে এই ক্ষমতাটুকু আল্লাহ্রই দেয়া। তাই এ মতবাদ আল্লাহ্র ক্ষমতায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

## তৃতীয় কারণ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির তৃতীয় কারণ হলো, মানুষের 'আমল' অর্থাৎ কর্ম তার ঈমানের অন্তর্ভুক্ত কি-না—এ প্রশ্নটি। অনেক হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূল করীম শালীনতা এবং আরো অন্যান্য বিষয়কে ঈমানের অঙ্গরূপে গণ্য করেছেন। এজন্য 'মুহাদ্দিসীন' মনে করেছেন যে, 'আমল' ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু 'আহলে নযর' অর্থাৎ অন্তর্বাদিগণ এ মতবাদ সমর্থন করেন নি। তাঁরা আকীদা এবং আমলের মধ্যে পার্থক্য করেন। মুহাদ্দিসীন 'আহলে নযর'দের 'মুরজিয়া'রূপে অভিহিত করেন। ইমাম আবু হানীফা ছিলেন 'আহলে নযর'দের পথিকৃৎ। তাই অনেক মুহাদ্দিস তাঁকে মুরজিয়া-রূপেই আখ্যায়িত করেন।

## চতুর্থ কারণ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির চতুর্থ কারণকেই মৌলিক কারণ বলা যায়। এখানেই 'আহলে যাহির' (বহির্বাদী) এবং 'আহলে নযর' (অন্তর্বাদী) এই দুই সম্প্রদায়ের ভাবধারার পরিসীমা পৃথক পৃথক হয়ে পড়ে। এই মতদ্বৈধতার প্রধান কারণ হলো ঐশী বাণী ও যুক্তির মধ্যে প্রাধান্য কার এবং ঐশীবাণী ও যুক্তি প্রয়োগের সীমারেখা কতটুকু এ বিতর্কমূলক বিষয়টি। আশয়ারিয়া ঐশী বাণীর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে, মুতাযিলা এবং আরো অনেকে গুরুত্ব আরোপ করেন যুক্তিবাদের উপর।

এই কারণের ভিত্তিতে যেসব ধর্মীয় মতবাদ গড়ে উঠেছে, তার কয়েকটি অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো ঃ

**আশায়েরার মতে :**

১। কোন বস্তু মূলত ভাল বা মন্দ কিছুই নয়। শরীয়ত-বিধাতা (আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল) যে বস্তুকে ভাল বলেন, সেটাই ভাল বলে অভিহিত। আর যে বস্তুকে তাঁরা মন্দ বলে অভিহিত করেন, সেটাই মন্দ বলে পরিগণিত।

২। আল্লাহ্ অবাস্তব বস্তুর প্রতি আদেশ দিতে পারেন এবং দিয়েও থাকেন।

৩। ন্যায় বিচার করা আল্লাহ্র জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়।

৪। আল্লাহ্ ইবাদতের প্রতিদানে শাস্তি এবং গুনাহের প্রত্যর্পণে পুরস্কারও দিতে পারেন এবং এটা তাঁর পক্ষে অন্যায় কিছুই নয়।

**মুতাযিলার মতে :**

১। প্রত্যেক বস্তু মূলেই ভাল বা মন্দ হয়ে থাকে। শরীয়ত-বিধাতা সে বস্তুকেই ভাল বলেন, যা মূলত ভাল। আবার সে বস্তুকেই মন্দ বলে অভিহিত করেন, যা বস্তুত মন্দ।

২। আল্লাহ্ কোন অবাস্তব বস্তুর প্রতি আদেশ দিতে পারেন না।

৩। অবশ্য কর্তব্য।

৪। আল্লাহ্ এরূপ কখনো করতে পারেন না। এরূপ করলে তা হবে জুলুম এবং অবিচার।

## আকাইদের মত বিরোধিতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি

এসব মতবিরোধ বিস্ময়কর কিছুই নয়। কেননা, এসব বিষয়ের পেছনে যে কারণসমূহ বিদ্যমান ছিল, তাতে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসব মত-বিরোধিতায় একদল অপর দলকে কাফেররূপে আখ্যায়িত করতেও ইতঃস্তত করেনি। যেমন, আল্লার বাণী চিরন্তন, না দৈবঘটিত— এটা ছিল অন্যতম বিতর্কমূলক বিষয়। মুতাযিলা বলেন, আল্লার বাণী তাঁর চিরন্তন গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর বাণীও চিরন্তন। কিন্তু কুরআনের যে শব্দগুলো রসুল করীমের উপর অবতীর্ণ হয়, তা ছিল নৈমিত্তিক এবং অভিনব। পক্ষান্তরে, মুহাদ্দিসীনের অভিমত ছিল, আল্লাহ্র বাণী যে কোন অবস্থায়ই চিরন্তন। সূক্ষ্মভাবে দেখতে

গেলে উভয়ের সারমর্ম ছিল এক এবং অভিন্ন। কিন্তু উভয় দল বিষয়টিকে ঈমান এবং কুফ্‌রের মাপকাঠিরূপে দাঁড় করিয়েছেন।

ইমাম বায়হাকী তাঁর 'কিতাবুল আস্‌মা-অস্‌-সিফাত' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি একটি ভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা করেন। আমরা সে গ্রন্থ থেকে কয়েকজন মুহাদ্দিসের অভিমত নিম্নে পেশ করছি ঃ

অকী বিন-আল-জার্‌রাহ ঃ

যে ব্যক্তি কুরআনকে অশাশ্বত এবং নশ্বর বলে ধারণা করে, সে কাফের।

এযীদ বিন হারাওয়ান ঃ

যে ব্যক্তি বলে, আল্লার বাণী অশাশ্বত এবং অভিনব, আল্লার কসম, সে নাস্তিক। ইমাম শাফেয়ীর জনৈক শিষ্য বলেন ঃ

যে ব্যক্তি বলে, কুরআন অনিত্য এবং নৈমিত্তিক, সে কাফের। ইমাম বোখারী ঃ

আমি ইহুদী, খ্রীস্টান, অগ্নিপূজক সকলের ধর্মীয় গ্রন্থ দেখেছি, কিন্তু জাহ্‌মিয়ার মত এত অধিক অজ্ঞ কাফের আমি আর কখনও দেখিনি। আমি সেই ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলে মনে করি, যে জাহমিয়াকে কাফের মনে করে না।

আবদুর রহমান বিন মাহ্‌দী ঃ

যদি আমার হাতে তলোয়ার থাকে, আর প্রকাশ্যে সেতুর উপর কাউকে বলতে শুনি—কুরআন অশাশ্বত ও অভিনব, তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেবো।

কোন কোন মুহাদ্দিস, এঁদের মধ্যে ইমাম বোখারীও রয়েছেন, এ বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য করেন। তাঁরা বলেন, কুরআন মজীদের শব্দাবলীর যে উচ্চারণ করা হয়, তা নৈমিত্তিক এবং অভিনব। কিন্তু জমহুর মুহাদ্দিসীন তাঁদেরও ভীষণ বিরোধিতা করেন। যুহ্‌লী ছিলেন ইমাম বোখারীর শিক্ষক। সহীহ্‌ বোখারীর অনেক হাদীস তাঁর নিকট থেকে গৃহীত হয়। ইমাম বোখারীকে এ মত প্রকাশ করতে শুনে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কুরআনের উচ্চারণকে অভিনব মনে করে, সে যেন আমার আসরে না আসে। হাফেয ইবনে হাজার এ ঘটনাটি 'শরহে বোখারী'তে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ইবনে শাদ্‌দাদ একস্থানে লিখেছেন ঃ আমি যে কুরআন উচ্চারণ করি, তা অভিনব'—

এ লেখাটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সামনে পাঠ করা হলে তিনি তা কেটে দেন এবং বলেন ঃ যে কোন অবস্থায়ই কুরআন চিরন্তন এবং অবিনশ্বর। আবু তালিব একবার বলেছিলেন ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কুরআনের উচ্চারণকে অভিনব এবং নৈমিত্তিক বলে মনে করেন। একথা ইমাম আহমদ ইবনে হামবলের কর্ণগোচর হলে তিনি রাগে কম্পিত হয়ে উঠেন এবং আবু তালিবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এতো ছিল একদিকের হালহকিকত। অন্যদিকে ছিলেন মুতাযিলা সম্প্রদায়। তাঁরা মনে করতেন, কুরআনের শব্দ ও উচ্চারণকে চিরন্তন মনে করা 'কুফরী' কাজ। মামুনুর রশীদের মত ন্যায়বান বাদশাও কুরআনকে চিরন্তন বলার দায়ে সে সময়কার বড় বড় মুহাদ্দিসদের ভীষণ শাস্তি দেন এবং আদেশ দেন যে, এরূপ মতবাদের লোকেরা যদি তওবা না করে, তবে তাদের হত্যা করা হবে।

কেবল এ বিষয়টি নয়। এরূপ শত শত বিতর্কমূলক ব্যাপার ছিল। সব ক্ষেত্রেই উভয় দল ভীষণ বাড়াবাড়ি করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন ইমাম আবু হানীফার শিষ্য। কাযী শরীক তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কারণ তিনি নামাযকে ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করতেন না। ইমাম আবু হানীফা 'আমল' অর্থাৎ কর্মকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন না। তাই অনেক মুহাদ্দিস তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

অনেকদিন পর্যন্ত এসব ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যদিও পুরনো ধ্যান ধারণা সমূলে যায়নি, তথাপি আজ পাঁচ ছয় শ' বছর পর্যন্ত এটা সর্ব সমর্থিত মতে পরিণত হয়েছে যে, আকাইদের (ধর্মীয় বিশ্বাস) ব্যাপারে এক কেবলা অবলম্বীদের (যাতে বহু সম্প্রদায় রয়েছে) মধ্যে কেউ কাউকে কাফের-রূপে আখ্যায়িত করবে না। এমন এক সময়ও ছিল, যখন ইবনে হিব্বানের ন্যায় হাদীসের বড় ইমামকেও আকাইদের ব্যাপারে দ্বীপান্তরিত হতে হয়েছিল। একমাত্র ওজুহাত ছিল, তিনি বলেছিলেন যে, আল্লাহ সীমাবদ্ধ নন বরং সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু আজ বিভিন্ন বিষয়ের বড় বড় ইমামগণ সেই শব্দ দিয়েই আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করছেন। প্রাচীন মুহাদ্দিসগণের সময় কেউ যদি বলতো—আল্লাহ সব জায়গায়

বিরাজমান, তবে তাঁকে জাহমিয়া মতাবলম্বী এবং কাফের সম মনে করা হতো। ইবনুল কাইয়েম 'ইজতিমায়ুল জুয়ুশিল ইসলামিয়া' নামক গ্রন্থে এসব মুহাদ্দিসের মতামত তাঁদের গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃত করেন। কিন্তু আজ আর সে ধারণা নেই। এখন বহুদিন থেকেই প্রায় সকল মুসলমানই আল্লাহ্‌র বিশ্বজনীন অবস্থানের মত্ পোষণ করেন।

মুহাদ্দিসীনের নিকট মুরজিয়াপন্থীরা ছিলেন একটি পথ ভ্রষ্ট সম্প্রদায়। তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু কালক্রমে আল্লামা যাহ্‌বীর ন্যায় লোককেও তাঁর মীযানুল ই'তেদাল' নামক গ্রন্থে নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করতে হয়ঃ

আমার মতে, মুরজিয়া মতবাদ বড় বড় উলামারই মতবাদ। এ মতাবলম্বীদের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

মুহাদ্দিস খাত্‌তাবী একজন প্রখ্যাত লোক। তাঁর 'মায়ালিমুস্‌সুনান' হাদীস শাস্ত্রের এক অপূর্ব গ্রন্থ। ইমাম বায়হাকী 'কিতাবুল আসমা ওস্‌সিফাত' নামক গ্রন্থে তাঁর অনেক মতামতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ

যে সব বেদাতপন্থী ঐশীবাণীর ভাবার্থ করেন এবং ভুলের শিকারে পরিণত হন, তাঁরা কাফের নন। তাঁদের স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ না তাঁদের মধ্যে থেকে খারিজী এবং রাফিযীরা সাহাবাদের কাফের বলেন বা কাদ্‌রিয়াগণ আপন দলের লোক ছাড়া সকল মুসলমানকে কাফের বলেন।

ইমাম গাযালী 'ইম্‌লা-ফি-মুশ্‌কিলাতিল ইহ্‌ইয়া' নামক গ্রন্থে এবং ইমাম রাযী সূরা-এ-বাকারার প্রথম রুকুস্থ আয়াত—"ইন্নাল্লাযীনা কাফারু" এর ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, এসব পরস্পর বিরোধী মতবাদের উপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বা কাফের বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা তাকিউদ্দীন লিখেছেনঃ

**আশয়ারিয়া এবং মুতাযিলা উভয়ই সমগোত্রীয়। এঁরাই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ইসলামী দর্শনবেত্তা। তবে এঁদের মধ্যে আশয়ারিয়া অধিকতর ন্যায়ের পথে রয়েছেন।**

অধিকাংশ মুতাযিলাপন্থী ছিলেন হানাফী মতাবলম্বী। এজন্যই 'তাবাকাতুল হানাফিয়া' নামক গ্রন্থে তাঁদের বিবরণ স্থান লাভ করেছে। তাতে যেভাবে মর্যাদা সহকারে হানাফী উলামার আলোচনা করা হয়, ঠিক তেমনি মুতাযিলাপন্থীদেরও সশ্রদ্ধ বিবরণ পেশ করা হয়। যেমন মুতাযিলা মতাবলম্বী হোসাইন ইবনে আলী সম্পর্কে এ মন্তব্য করা হয় যে, ফিকাহ এবং কালামে তাঁর মত দ্বিতীয় আর নেই। যমখশরী সম্পর্কে এমত প্রকাশ করা হয় যে, তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান হানাফী।

ইমাম রাযী 'সূরা-এ-আন্য়াম' এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা শেখ আল-কাসিম আনসারীর মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আহলে-সুন্নাত ও জামা'ত'-এর লক্ষ্য হলো আল্লাহ্র শক্তির আধিক্য প্রকাশ করা, আর মুতাযিলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা এবং তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করা। তাই খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, তাঁরা উভয়ই আল্লাহর মহত্ত্ব এবং পবিত্রতার সমর্থক। তবে কথা হলো এই যে, এঁদের মধ্যে কেউ হয়তো ভুল করেছেন, আর কেউ হয়তো ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

পরবর্তী মুহাদ্দিসীন পর্যন্ত যেতে হবে না। ভালরূপে অনুসন্ধান করলে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনের মধ্যেও এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যাবে, যাঁরা ছিলেন স্বাধীনমতাবলম্বী। অথচ তাদের অনেককেই কাদ্রিয়া বা মুতাযিলারূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সওর ইবনে যাইদ, সওর ইবনে ইয়াযীদ, হাস্সান ইবনে আতিয়াহ, হাসান ইবনে যাক্ওয়ান, দাউদ ইবনে হাসীন, যাকারিয়া ইবনে ইসহাক, সালীম ইবনে উজ্লান, সালাম ইবনে মিসকীন, সাইফ ইবনে সুলাইমান মক্কী, শিব্ল ইবনে ইবাদ মক্কী, শরীক ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর, আবদুল্লা ইবনে আবী লবীদ, আবদুল আলা ইবনে আবদুল আলা, আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ তন্নুরী, আত্তার ইবনে আবি মাইমুন, ওমর ইবনে আবি যাইদা, ইমরান ইবনে মুসলিম কাইসর, ওমাইর ইবনে হানী আদ্দামিশকী, আওফ্ আল আরাবী বসরী, মুহম্মদ ইবনে সওয়ার আল বসরী, হারাওয়ান ইবনে মুসা আল আওয়ার, হিশাম ইবনে আবদুল্লাহ্ দাস্তওয়ানী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে হামযা আলহায্রামী—এঁদের সবাইকে

হাফেয ইবনে হাজার 'ফাতহুলবারী' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় কাদরিদা-রূপে অভিহিত করেন।

আল্লামা যাহ্বী 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায্' নামক চারখণ্ড বিশিষ্ট একটি হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন। এটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি সে সব হাফেয-এ-হাদীসের (হাদীস কণ্ঠস্থকারী) বিবরণ লিখেছেন, যাঁরা হাদীস শাস্ত্রের স্তম্ভরূপে পরিগণিত এবং যাঁদের উপর নির্ভর করে এ শাস্ত্রের আলোচনা এবং পর্যালোচনা। এ গ্রন্থে তিনি অনেক মুতাযিলাপন্থী উলামার নাম পেশ করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম হচ্ছেঃ আতা ইবনে ইয়াসার, সাইদ ইবনে আবি আরুবাহ, কাতাদাহ ইবনে ওসামা, হিশাম দাস্তওয়াই, সাইদ ইবনে ইবরাহীম, মুহম্মদ ইসহাক, ইমামুল মাগাযী এবং সামান। এঁদের মধ্যে আতা ইবনে ইয়াসার, কাতাদাহ, হিশাম এবং সাইদ সম্পর্কে ইমাম আহমদ হামবল এবং হাদীস শাস্ত্রের অন্যান্য ইমামগণ পরিষ্কার ভাষায় এই মন্তব্য করেছেনঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাঁরা ছিলেন তখনকার ইমাম অর্থাৎ পথ প্রদর্শক।

# প্রথম যুগ
# বুদ্ধিভিত্তিক ইলমে কালাম

এই ইলমে কালাম দর্শন শাস্ত্রের বিকল্পস্বরূপ জন্ম লাভ করে। এর ইতিহাস লেখাই আমার উদ্দেশ্য।

আকাইদে (ধর্মীয় বিশ্বাসে) কিভাবে মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হলো, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বনু উমাইয়াদের সময় নাগাত ধর্মীয় বিতর্ক মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আব্বাসীদের সময় এ সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ সময় শিক্ষা খুবই প্রসার লাভ করে। অগ্নিপূজক, ইহুদী, খ্রীস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আরবী জ্ঞানবিজ্ঞান শেখার এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবধারা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি হাসিলের সুযোগ লাভ করে। বনু উমাইয়ার সময় ধর্মীয় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু আব্বাসিগণ সেই অনুমতি প্রদান করেন। যে কেউ ইচ্ছামত মতামত প্রকাশ করতে পারতো। তাই অন্যান্য জাতিও ইসলামী আকাইদ সম্পর্কে পর্যালোচনা ও সমালোচনা করার সুযোগ পায়।

তদুপরি খলিফা মনসুর দুনিয়ার যে কোন ভাষায় রচিত জ্ঞান-গর্ভ ও ধর্মীয় গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনূদিত করেন। সেগুলো পাঠ করে শত শত মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক মাসউদী কাহির বিল্লার বিবরণে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আল মুকাফ্‌ফা এবং অন্যান্য লোকেরা ফার্সী ও পহলবী ভাষা থেকে অগ্নিপূজকদের অধিনায়ক—মানী, ইবনে দাইসান, মরকিউন রচিত গ্রন্থাবলীর যে সব অনুবাদ করেন এবং সেগুলোর সমর্থনে মুসলমানদের মধ্য থেকে ইবনে আবিল আরজা, হাম্মাদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে যিয়াদ, মুতি ইবনে ইয়াস যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাতে লোকদের মধ্যে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা বিস্তার লাভ করে।

## ইলমে কালাম সৃষ্টির কারণ

প্রয়োজনের তাগিদে মুসলিম ওলামাই 'নাহ্‌ব' (বাক্য বিন্যাস) ব্যাকরণ, 'লুগাত' (অভিধান), তফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা), 'বালাগত' (বাক্যালংকার বিদ্যা) এবং আরো অন্যান্য বিষয় প্রণয়ন এবং উদ্ভাবন করেন। ঠিক তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁরা ইলমে কালামও একদিন আবিষ্কার করতেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করার পূর্বেই প্রশাসনিক মহল থেকে এ শাস্ত্র প্রণয়ন করার দাবী উত্থাপিত হয়। এটা ছিল ইলমে কালামের পক্ষে একটি সৌভাগ্যের বিষয়।

### খলিফা মাহদীর আদেশে ইলমে কালাম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা

হারুনুর রশিদের পিতা খলিফা মাহদী ১৫৮ হিজরীতে খেলাফতের কর্মভার গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম আলিমদের আদেশ দিলেন ঃ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনীত হচ্ছে, তদুত্তরে গ্রন্থাবলী রচনা করা হোক। এ সত্ত্বেও তাঁর সময়ে বিষয়টি 'ইলমে কালাম' নামে অভিহিত হয়নি। মামুনুর রশিদের আমলে মুতাযিলি-গণ দর্শন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন এবং দার্শনিক মনোবৃত্তি নিয়ে এ বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। তাঁরাই বিষয়টিকে 'ইলমে কালাম' নামে অভিহিত করেন।

## ইলমে কালামরূপে নামকরণ

ইলমে কালামের নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান মোহাম্মদ আবুল হোসাইন মুতাযিলীর আলোচনায় সামআনীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আকাইদ বিষয়ক মতভেদ সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় আল্লার 'কালাম' (বাণী) নিয়ে। তাই ইলমে আকাইদ (ধর্মীয় বিশ্বাস তত্ত্ব)-কে ইলমে কালামরূপে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এটা যথার্থ নয়। প্রকৃত পক্ষে, আল্লার কালাম নিয়ে প্রথমতঃ মতভেদের উদ্ভব হয়নি। বনু উমাইয়ার সময়েও এ বিষয়টি 'কালাম' রূপে অভিহিত হয়নি।

আল্লামা শহ্‌রিস্তানী 'মিলাল ও নিহাল' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ "এ নামকরণের দু'টি কারণ হতে পারে। আকাইদ বিষয়ক যত মতানৈক্যের

সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে আল্লার কালাম নিয়ে যে মতানৈক্য হয়, তা ছিল সবচাইতে বেশী তীব্র এবং যুদ্ধংদেহী। হয়তো এ কারণেই ইলমে আকাইদের নামকরণ করা হয় ইলমে কালাম রূপে। দ্বিতীয়তঃ ইলমে কালাম রচিত হয় দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। দর্শনের একটি শাখার নাম ছিল 'মানতিক' (যুক্তি বিজ্ঞান)। 'মানতিক' এবং 'কালাম' একই অর্থবোধক। হয়তো এ কারণেই ইলমে আকাইদকে ইলমে কালামরূপে অভিহিত করা হয়।" এ নামকরণের এটাই যথার্থ কারণ।

## ইলমে কালামের বিরোধিতা

ইলমে কালাম সৃষ্টির প্রারম্ভেই মুহাদ্দিসীন (হাদীস পন্থী) এবং আরবাবে যাহির (বহির্বাদী) এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ হাম্বল, সুফিয়ান সওরী এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন বিষয়টিকে 'হারাম' বলে বর্ণনা করেন। ইমাম গাযালী 'ইহ্ইয়াউল উলুম' নামক গ্রন্থে আকাইদের আলোচনায় বলেন ঃ

শাফেঈ, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান এবং পূর্ববর্তী সমস্ত হাদীসবেত্তাগণ এ বিষয়টিকে (ইলমে কালাম) হারাম বলে বর্ণনা করেন।

ইমাম শাফেঈ বলতেন, কালাম পন্থীদের কশাঘাত করা উচিত। ইমাম আহমদ হাম্বল বলতেন, কালামপন্থিগণ ধর্মহীন। কথিত আছে, অধিকাংশ মুসলিম ইমাম এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করেন। পরবর্তী যুগে এ সব মতামতকে বিস্ময়ের চোখে দেখা হয়। অনেক সময় এসবকে অবিশ্বাস্য বলেও মন্তব্য করা হয়। এই মনোভাব থেকেই ইমাম রাযীকে তাঁর 'তফসিরে কবির' এবং 'মানাকিবুশ শাফেয়ী' নামক গ্রন্থে এসব পরম্পরাগত মতবাদের নতুন ব্যাখ্যা দিতে হয়, এমনকি অস্বীকারও করতে হয়।

বস্তুতঃ এই বিরোধিতা ছিল যুগের সৃষ্টি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে অধিকাংশ ওলামা যে কোন একটি বিষয়ে অভিজ্ঞ হতেন। 'নাহ্ব' বিদ ফিক্হ্ জানতেন না। হাদীসের সাথে ফক্হ্দের (ফিক্হ্ বিদ)। বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। মুহাদ্দিসীন ছিলেন যুক্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনবগত। ইলমে কালাম প্রণীত হলে তাতে দর্শনের অনেক পরিভাষা প্রবেশ করে। এসব পরিভাষা দেখে মুহাদ্দিসীন

মনে করতেন যে, ইলমে কালাম এবং দর্শন উভয়ই এক এবং অভিন্ন। তাঁরা পূর্ব থেকেই গ্রীক দর্শনকে খারাপ চোখে দেখতেন। তাই ইলমে কালামকেও সেই শ্রেণীতে পরিগণিত করেন। কথিত আছে যে, মুহাদ্দিসগণ বলতেন: তোমরা যদি কাউকে দ্রব্য, গুণ, জড় পদার্থ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতে দেখ, তবে মনে করবে যে, সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। মুহাদ্দিস ইবনুস্ সাব্কীর নিম্নলিখিত ভাষ্য তাঁদের এমনোভাবের সাক্ষ্য বহন করছে:

ইলমে কালাম এবং দর্শন একই বস্তু—এ ধারণা নিয়েই পূর্ববর্তী ইমামগণ তাঁদের গ্রন্থাবলীতে অনেক দর্শন জানা লোকের সমালোচনা করেন। আহমদ ইবনে সালিহ্‌কে দার্শনিক ভাবাপন্ন বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ তিনি বলতেন: আমি দর্শন মোটেই জানি না। আবু হাতিম রাযী সম্পর্কেও এ ধরনের মন্তব্য করা হয়। অথচ তিনি ছিলেন একজন মুতাকাল্লিম। ইমাম যাহাবীও এমনিভাবে মিযযী সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, তিনি 'মা'কুল' অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা জানেন। প্রকৃতপক্ষে, যাহাবী এবং মিয্যীর মধ্যে কেউ যুক্তিবিদ্যার একটি অক্ষরও জানতেন না।

সবচাইতে বড় কথা হলো—ইলমে কালামের জন্য দর্শন এবং পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের প্রয়োজন ছিল। অথচ মুহাদ্দিসীন ছিলেন দর্শন পাঠের ঘোর বিরোধী।

## বিরোধিতার কারণ

মুহাদ্দিসগণের দর্শনের প্রতি বিরোধিতার সবচাইতে বড় কারণ ছিল এই যে, কালাম পন্থিগণ তাঁদের রচনায় ইসলাম বিরোধীদের মতামত উল্লেখ করে প্রত্যুত্তর দিতেন। মুহাদ্দিসীন ইসলাম বিরোধীদের এই নাস্তিকতামূলক মতামতের উদ্ধৃতিকেও অবৈধ বলে মনে করতেন। ইমাম আহমদ হাম্বলের সময় জারাস্ মোহাসিবী একজন বিখ্যাত আল্লাহ্‌ভক্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। মুহাদ্দিসীনও ছিলেন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হযরত জুনাইদ বাগদাদী তাঁরই মুরিদ ছিলেন। তিনি শিয়া এবং মুতাযিলীদের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলেই ইমাম আহমদ হাম্বল তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর সাথে মেলামেশা ত্যাগ করেন।

বিরোধিতার আরও একটি বড় কারণ ছিল এই যে, যাঁরা ইলমে কালাম চর্চা করতেন, তাঁদের আকীদা মুহাদ্দিসীন-এর আকীদা থেকে

কিছু না কিছু স্বতন্ত্র হওয়া ছিল স্বাভাবিক। নীচে যে হাদীসগুলো দেয়া হলো, কালাম পন্থিগণ সে ধরনের হাদীসগুলোকে হয়তো অশুদ্ধ মনে করতেন, নয়তো সেগুলোর সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করতেন ঃ

(১) হযরত আদম এবং মুসা (আঃ) এর মধ্যে বিতর্ক হয়। (২) আকাশ ফেরেশতাদের ভারে কম্পিত হয়ে উঠে। (৩) আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন আপন উরু যখন দোজখের মধ্যে রাখবেন, তখনই তার সান্ত্বনা হবে।

মুহাদ্দিসীন উপরোক্ত হাদীসগুলোকে পূর্ব থেকেই শুদ্ধ বলে বিশ্বাস করতেন। সুতরাং সেগুলোকে অস্বীকার করা বা ভাবার্থে গ্রহণ করাকে তাঁরা রসুলের বাণীর অবমাননা বলে আখ্যায়িত করেন। একদিন হারুনুর রশিদের দরবারে একজন মুহাদ্দিস আদম (আঃ) এবং মূসা (আঃ)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলেন ঃ হযরত আদম এবং মুসা কি করে একত্রিত হলেন? হারুনুর রশিদ ছিলেন মুহাদ্দিসীনদের মতাবলম্বী। তিনি এ প্রশ্নে ক্ষিপ্ত হয়ে সে ব্যক্তির হত্যার আদেশ দেন। আল্লামা সুয়ূতী 'তারিখুল খোলাফা' নামক গ্রন্থে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইলমে কালামের প্রতি 'মুহাদ্দিসীন' এবং 'আরবারে যাহির' যে ভাবে বিরোধিতা করেন, তাতে এ শাস্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে মুছে যেতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। কারণ দু'একজন ছাড়া সমস্ত আব্বাসী খলিফা এবং তাঁদের সভাসদেরা এর প্রতি সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এ রাজকীয় সহায়তার ফলে তা বরাবর উন্নতি লাভ করতে থাকে। কেবল আব্বাসীরাই নয়, দায়লমীরাও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এতদসত্ত্বেও বিষয়টি জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়নি।

## ইলমে কালামের প্রতিষ্ঠাতা

শেষ পর্যন্ত ইমাম গাযালী এবং রাযী যখন ইলমে কালামের উন্নতি বিধানের দায়িত্ব আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন, তখনই তা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। মোট কথা, খলিফা মাহদীর সময় ইলমে কালামের সৃষ্টি হয় এবং যতটুকু জানি, আবুল হোযাইল আল্লাফই এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পুরো নাম—মোহাম্মদ ইবনে হোযাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাক্হুল। তিনি ১৩১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ

করেন এবং ২৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইবনে খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি ছিলেন বাগ্মী ও সুতার্কিক। তিনি পাল্টা জওয়াব প্রদানে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি কালাম বিষয়ক ছোট বড় ৬০টি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে তিনি অনেক সুক্ষ্ম বিষয়েও আলোচনা করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী বহুদিন থেকে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু অগ্নি-পূজক ও নাস্তিকদের সাথে তিনি যে সব বিতর্ক করেন এবং যে সব বক্তৃতা প্রদান করেন, সেগুলোর কিছু কিছুটা 'শরহে মিলাল-ও-নিহাল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

## আবুল হোযাইল আল্লাফ

আবু হোযাইলের বিতর্ক আজকালকার ন্যায় শুধ্‌মাত্র বাকপটুতা বা বাগ্মিতা ছিল না। তাঁর বিতর্কের ফলে অনেক নাস্তিক এবং ধর্মবিরোধী আপন ধর্মীয় বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

ইবনে খাল্লিকান লিখেছেন ঃ

একবার অনেক অগ্নিপূজক আবুল হোযাইলের সাথে বিতর্ক করতে আসেন। তিনি সবাইকে স্তব্ধ করে দেন। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল মাইলাস। তিনি সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম অনুসারেই আবুল হোযাইল তাঁর এক গ্রন্থকে 'মাইলাস' নামে অভিহিত করেন। 'শরহে মিলাল-ও-নিহাল নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিন হাজার ব্যক্তি তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

মামুনুর রশিদের সভায় যত ইলমে কালামবিদ ছিলেন, তন্মধ্যে আবুল হোযাইল এবং নায্‌যাম ছিলেন সর্বাধিনায়ক। সরকারের পক্ষ থেকে আবুল হোযাইল বার্ষিক ৬০ হাজার দিরহাম পেতেন। কিন্তু তিনি সমস্ত অর্থ বিদ্যোৎসাহীদের জন্য খরচ করে ফেলতেন। তিনি কেবল যুক্তিবিদ্যায়ই নয়, আরবী সাহিত্যেও সুদক্ষ ছিলেন। সুমামা ইবনে আশরাস ছিলেন মামুনুর রশিদের সভাসদদের মধ্যে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি একবার মামুনের দরবারে আবুল হোযাইলের প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

কথোপকথনের সময় আবুল হোযাইল যখন সুমামার প্রতি সম্বোধন করতেন; তখন শুধু নাম ধরেই তাঁকে ডাকতেন। অথচ

তিনি ছিলেন একজন মর্যাদাসম্পন্ন লোক। স্বয়ং মামুনও নামের স্থলে পদবী ধরেই তাঁকে সম্বোধন করতেন। এভাবে নাম ধরে ডাকায় সুমামা অবশ্য সাময়িকভাবে দুঃখিত হন। কিন্তু তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, আবুল হোযাইল কোন একটি বিষয় প্রমাণ করতে গিয়ে যখন আরবদের সাত শ' শ্লোক কণ্ঠস্থ শোনালেন, তখন আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম, "আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকুন বা পদবী ধরেই ডাকুন—সবই আপনাকে সাজে।" আবুল হোযাইলের কোন কোন বিতর্কের বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য।

একদিন কোন এক ব্যক্তি আবুল হোযাইলের নিকট এসে বললেন, কুরআন মজিদ সম্পর্কে আমার অন্তরে কতগুলো সন্দেহ রয়েছে, যা কিছুতেই দূরীভূত হচ্ছে না। সেগুলো হলো—কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। আবার কোন কোন আয়াতে ব্যাকরণের দিক থেকে ভুলত্রুটি দেখা যায়।" আবুল হোযাইল বললেন, প্রত্যেক আয়াতের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করবো, নাকি মোটামুটিভাবে এমন উত্তর দেবো, যাতে আপনার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়। অভিযোগকারী শেষোক্ত পন্থা গ্রহণ করলেন। আবুল হোযাইল বললেন, এটাতো সকলেই সমর্থন করছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ছিলেন আরবের একজন সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাঁর বাকপটুতা এবং ভাষাশৈলীর উপর কারুর কোন আপত্তি ছিল না। এতেও সন্দেহ নেই যে, আরবগণ রসূল করীমকে মিথ্যাবাদীরূপে আখ্যায়িত করেছিল এবং তাঁর সমালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। এমতাবস্থায় আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আরবগণ রসূল করীমকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু কেউ তো একথা বলেনি যে, তাঁর ভাষাশৈলী ছিল অশুদ্ধ বা তাঁর কথা ছিল পরস্পর বিরোধী। সেসময় যখন লোকেরা এরূপ অভিযোগ করেনি, তাহলে আজ সে অভিযোগ করার অধিকার কার আছে ?

'শরহে মওয়াকিফ' এবং অন্যান্য গ্রন্থেও কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। তবে তাতে এটাও বলা হয়েছে যে, আবুল হোযাইলের দেয়া জওয়াবগুলো যথেষ্ট নয়। শাহ ওলী উল্লাহ্ সাহেব 'ফওযুল কবির' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

"কুরআন মজীদ কাসাই বা ফার্‌রার (দুজন আরবী ব্যাকরণবিদ) নির্ধারিত নিয়মাবলীর অধীন নয়।" আবুল হোযাইলের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি এ উক্তি করেন।

সে সময় সালিহ্ ইবনে কুদ্দুস নামে একজন বিখ্যাত অগ্নি-পূজক ছিলেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, আলো এবং অন্ধকার পরস্পর বিরোধী উপাদান। এ দুটির সংমিশ্রণেই বিশ্বের সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে আবুল হোযাইল এবং সালিহ ইবনে কুদ্দুসের মধ্যে বিতর্ক হয়। আবুল হোযাইল জিজ্ঞেস করলেন, এই সংমিশ্রণে সৃষ্ট বস্তুটি সেই উপাদান দুটি থেকে স্বতন্ত্র একটা কিছু, না তাদেরই যৌগিক। সালিহ্ দ্বিতীয় দিক নিলেন। আবুল হোযাইল জিজ্ঞেস করলেন, পরস্পর বিরোধী দুটি বস্তু কি করে মিলিত হতে পারে? এর জন্য প্রয়োজন তৃতীয় সত্তার অর্থাৎ সংমিশ্রণকারীর এবং সেই অপরিহার্য সত্তাই আল্লাহ্।

একবার সালিহ্ বিতর্কে পরাস্ত হন। আবুল হোযাইল জিজ্ঞেস করলেন, এখন ইচ্ছা কি? সালিহ্ বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে 'ইস্‌তেখারা' করে অর্থাৎ স্বপ্নযোগে তাঁকে জিজ্ঞেস করে আমার অভিপ্রেত কর্মপন্থা নিরূপণ করে নিয়েছি এবং আমি এ বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, আল্লাহ্ দু'জন। আবুল হোযাইল বললেন, ইস্‌তেখারা তো করলেন, তবে বলুন, তা কোন আল্লাহ্‌র নিকট? যে আল্লাহ্‌র নিকট করলেন, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কিভাবে মতামত জ্ঞাপন করলেন? আবুল হোযাইল এবং সালিহ সম্পর্কে ইবনে খাল্লিকান আরো একটি মজার গল্প উল্লেখ করেছেন। সেটার উদ্ধৃতি এখানে দিলাম না।

## হিশাম ইবনুল হাকাম

এ সময় হিশাম ইবনুল হাকাম কুফী নামক একজন প্রখ্যাত 'মুতাকাল্লিম' (কালামপন্থী) ছিলেন। তিনি ছিলেন ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকীর জ্ঞানচর্চা বিভাগের শিরোমনি। বুদ্ধিজাত জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। বিতর্কে আবুল হোযাইল যদি কখনো কারুর নিকট নতি স্বীকার করতেন, তবে তাঁর নিকটেই করতেন। মাস্‌উদী তাঁর গ্রন্থে সে সব বিতর্কেরও বিবরণ পেশ করেন, যাতে ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকী আবুল হোযাইলের উপর জয়লাভ করেন। ইবনে

নাদিম কিতাবুল 'ফিহ্‌রিস্ত' নামক গ্রন্থ তাঁর অনেক রচনার কথা উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে 'আররদ্দু আলয্‌যানাদিকা,' 'আররদ্দু আলা আস্‌হাবিল ইস্‌নাইন,' 'আররদ্দু আলা আসহাবিত্‌ তাবায়ে (বস্তু বাদী-দের রদ),' 'কিতাবুল্‌ আ'লা আরাসতুতাসালিস্‌ ফিত্‌তাওহীদ' অন্যতম। এখন গ্রন্থগুলো দুষ্প্রাপ্য। তবে নামগুলো দেখেই অনুমিত হয় যে, এসব কত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে লিখিত।

## ইলমে কালামের প্রতি ইয়াহ্‌ইয়া বারমাকীর অনুরাগ

কেবল খলিফা মাহদীই নন, শাহী দরবারের অন্যান্য প্রধানেরাও ইলমে কালামের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে খালেদ বারমাকী ছিলেন আব্বাসী শাসনের প্রাণধন, খলিফা মাহদীর প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর শাসনতরীর কাণ্ডারী। তিনি ইলমে কালাম আলোচনার জন্য শাহী দরবারে একটি সমিতি গঠন করেন। ঐতিহাসিক মাস্‌উদী সে সম্পর্কে বলেন ঃ

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে খালেদ ছিলেন একজন তার্কিক এবং চিন্তাবিদ। তিনি একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির সভায় প্রত্যেক ধর্মের যুক্তিবাদিগণ যোগদান করতেন।

এই সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন হিশাম ইবনুল হাকাম। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞ লোক। সভায় প্রত্যেক ধর্মের লোক যোগদান করতেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর আলোচনা করা হতো। ঐতিহাসিক মাস্‌উদী এ সমিতির-আয়োজিত একটি সভার বিবরণ পেশ করেন। তাতে ইলমে কালামের বিখ্যাত ১৩ জন বিদ্বান উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি আলী ইবনে হাসিম, আবু মালিক হায্‌রামী, আবুল হোযাইল এবং নায্‌যামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। মাস্‌উদীর ভাষ্য অনুসারে এ সভার বিষয়বস্তুর মধ্যে সৃষ্টি ও অভি-ব্যক্তি, চিরন্তনতা ও নশ্বরতা, প্রমাণিতকরণ ও অস্বীকারকরণ গতি ও গতিহীনতা, সংমিশ্রণ ও পৃথকীকরণ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, কোন বস্তুর টানা বা উত্তোলন করা, মৌলিকত্ব ও অমৌলিকত্ব, বৈধকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ, পরিসংখ্যান ও মূল্যায়ন, যুদ্ধ, ইমামত ছিল অন্যতম।

## ইবনে খালদুনের ভ্রম

আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় ইলমে কালামের বর্ণনায় লিখেছেন, "ইমাম গাযালীর পূর্বে ইলমে কালামে দর্শনের কোন আমেজ ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম দার্শনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ইলমে কালাম পুনর্গঠন করেন।" এটা ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মারাত্মক ভ্রম। পরবর্তী অনেক আলোচনায় তাঁর এ ভ্রম প্রতিপন্ন হবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে খালেদ কর্তৃক আহূত ইলমে কালামের সভায় যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে বলে মাস্উদী উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর চাইতে অধিকতর দার্শনিক বিষয় আর কি হতে পারে ?

খলিফা মাহদীর পর হিজরী ১৬৯ সালে হাদী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং মাত্র এক বছর তিন মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এরপর মহামতি খলিফা হারুনুর রশিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর যুগকে সমৃদ্ধি ও উন্নতির যুগ বলে পরিগণিত করা হয়। যে দরবারে জা'ফর বারমাকী, কাযী আবু ইউসুফ, ইমাম মুহম্মদ, আবু নওয়াস, ইসহাক মুসিলী এবং কাসাঈর ন্যায় মহৎ লোক আসীন থাকতেন, তার অধিনায়ক কতবড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাঁর যুগে ইলমে কালামের কোন উন্নতি হয়নি। সে সময় কালামপন্থী আলিমদের কয়েদখানায় বন্দী করা হয় এবং আদেশ জারি করা হয় যে, কেউ যেন ইলমে কালাম সম্পর্কে কিছু লিখতে না পায়। কিন্তু তখন এমন কতগুলো কারণ দাঁড়ায়, যাতে বাধ্য হয়ে হারুনুর রশিদকে ইলমে কালামের কদর করতেই হয়। লোকদের ইলমে কালাম থেকে যখন প্রতিহত করা হলো এবং এ খবর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লো, তখন সিন্ধুর রাজা সুযোগ বুঝে হারুনুর রশিদের নিকট এ মর্মে এক পত্র দিলেন, "মুসলমানেরা তলোয়ারের বলেই ইসলাম প্রচার করেছে। যদি যুক্তিবলে ইসলামকে সত্য বলে প্রমাণিত করা চলে, তবে আপনি কোন একজন আলিমকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারলে আমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবো।"

হারুনুর রশীদ একজন ফকিহ (ফিক্হবিদ)-কে পাঠালেন। রাজার সভাসদদের মধ্যে একজনকে বিতর্কের জন্যে স্থির করা হলো।

তিনি ফকিহকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আল্লাহ্ ক্ষমতাশীল, না অক্ষম? ফকিহ উত্তরে বললেন, ক্ষমতাশীল। রাজার পক্ষের লোকটি বললেন, আপনার আল্লাহ্ তাঁর মত অন্য একজন সৃষ্টি করতে পারেন কি? যদি না পারেন, তবে তাঁর শক্তিই বা রইল কোথায়? ফকিহ তদুত্তরে বললেন, এ ধরনের প্রশ্ন ইলমে কালামের সাথে সম্পৃক্ত। আর আমরা ইলমে কালামকে খারাপ বলে মনে করি। সিন্ধুর রাজা হারুনুর রশিদের নিকট লিখলেন, "আমি প্রথমে সন্দিহান হয়ে লিখেছিলাম। এখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে, যুক্তি দিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।"

হারুনুর রশিদ আদেশ দিলেন, মুতাকাল্লিমদের (কালামপন্থী) ডাকানো হোক এবং তাঁদের সামনে ব্যাপারটা পেশ করা হোক। মুতাকাল্লিমগণ দরবারে এলে তন্মধ্যে একজন বালক সেই সন্দেহ নিরসন করে বললো, এটা এমন ধরনের একটি প্রশ্ন, যেমন কেউ বললোঃ আল্লাহ্ কি এমন শক্তিমান যে তিনি স্বয়ং অজ্ঞ বা অক্ষম হতে পারেন? আল্লাহ্ এমন সব বস্তুই সৃষ্টি করতে পারেন, যা নশ্বর এবং অচিরন্তন। হারুনুর রশিদ আদেশ দিলেন, এই বালককেই বিতর্কের জন্য রাজার কাছে পাঠানো হোক। সভাসদগণ বললেন, এর চাইতেও অধিকতর জটিল বিষয় উপস্থিত হতে পারে এবং এ বালক সেগুলোর উত্তর দানে সক্ষম নাও হতে পারে। শেষ পর্যন্ত প্রখ্যাত মুতাকাল্লিম মুযাম্মার ইবনে ইবাদকে এ কাজে নিযুক্ত করা হলো।

## মামুনুর রশিদের যুগ

হারুনের পর মামুনের যুগ এলো। তাঁর জ্ঞান-সেবার বিবরণ দিতে হলে একটি বড় গ্রন্থের প্রয়োজন। আবার ইলমে কালামের সমৃদ্ধির জন্য তিনি যে সব কাজ করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার জন্য আরো একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। ঐতিহাসিক মাস্উদী, কাহের বিল্লার জীবনীতে একজন ইতিহাসবিদ সভাসদের ভাষ্য উদ্ধৃত করে মামুন সম্পর্কে বলেন ঃ

মামুনুর রশিদ মুতাকাল্লিমদের সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং আবুল হোযাইল, আবু ইসহাক এবং নায্যামের ন্যায় তার্কিকদের

সভাসদরূপে গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন তাঁর মতাবলম্বী, আবার কেউ কেউ ছিলেন তাঁর মত বিরোধী। মামুনুর রশিদ দূর দূর থেকে ফকিহ্ এবং সাহিত্যিকদের ডেকে এনে তাঁর সভায় স্থান দেন এবং তাঁদেরকে বৃত্তিও প্রদান করেন। এতে লোকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের অনুরাগ জন্মে এবং যুক্তিবিজ্ঞানও প্রসার লাভ করে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদের সমর্থনে গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানমূলক বিতর্কের জন্য মামুন সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারিত করেন। সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক মাস্‌উদী বলেন ঃ

মঙ্গলবার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক খলিফার দরবারে এসে সমবেত হতেন। তাঁদের জন্য একটি কক্ষ ফরশ দিয়ে বিশেষভাবে সাজানো হতো। প্রথমে খাওয়া দাওয়ার জন্য দস্তরখান বিছানো হতো। আহার শেষে প্রত্যেকেই ওযু করতেন। অতঃপর নানা ধরনের খোশবু এসে উপস্থিত হতো। সকলেই পোশাক-পরিচ্ছদ সুগন্ধময় করে নিতেন এবং সুরভি নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করতেন। বিতর্ক কক্ষে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকতো না। সকলেই স্বাধীনচিত্তে আলাপ আলোচনা করতেন। দ্বিপ্রহরের পর সভা ভেঙ্গে যেতো।

## একটি ধর্মীয় সম্মিলন

ইলমে কালামের প্রতি হারুনুর রশিদের হস্তক্ষেপের ফলে ইসলাম-বিরোধিগণ প্রচার করেছিল যে, ইসলাম যুক্তিতে নয়, বরং তলোয়ারের জোরেই প্রসার লাভ করতে পারে। এ সন্দেহ নিরসন করার জন্য মামুনুর রশিদ একটি মহৎ বিতর্ক সভার আয়োজন করেন এবং তাতে প্রত্যেক অঞ্চল, দেশ এবং ধর্মের লোককে আমন্ত্রিত করেন। অগ্নিপূজকদের অধিনায়ক ইয়াযদাঁ বখ্‌ত মারব থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আসলেন। মামুন তাঁকে খেলাফত-ভবনের নিকট বিশেষ একটি কক্ষে স্থান দেন।

আবুল হোযাইল মুসলমানদের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি বিতর্কে জয়লাভ করেন। ইয়াযদাঁ বখ্‌ত বিতর্কে পরাজিত হলে মামুন জোশে উদ্দীপিত হয়ে বলে উঠলেন, ইয়াযদা বখ্‌ত! আপনি

মুসলমান হোন! উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা তো কাউকেও জোর পূর্বক মসলমান করেন না এবং আমিও মুসলমান হতে চাই না। মামুন বললেন ঃ হাঁ, এটা ঠিক কথা।

## নাযযাম

আবুল হোযাইলের পর তাঁর শিষ্য ইব্রাহিম ইবনে সাইয়ার নাযযাম ইলমে কালামের বিশেষ উন্নতি বিধান করেন। তিনি ছিলেন মামুনুর রশিদের শিক্ষক এবং বিশিষ্ট সভাসদ। শহরিস্তানী 'মিলাল-ও-নিহাল' নামক গ্রন্হে তাঁর দর্শনজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, "তিনি অনেক দর্শন গ্রন্হ পাঠ করেন এবং মুতাযিলা পন্হী ইলমে কালামকে দর্শনের সাথে গুলিয়ে ফেলেন।"

ইউরোপের প্রখ্যাত গবেষকদের ধারণা হলো-যে সব পদার্থকে লোকেরা দ্রব্য বলে মনে করে, সেগুলো দ্রব্য নয়, বরং কতগুলো গুণের যৌগিক। আবার যেগুলোকে লোকেরা গুণ বলে ধারণা করে, সেগুলো মূলতঃ দ্রব্য। যেমন, সুগন্ধ বা আলোকে সাধারণতঃ গুণ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এসবও দ্রব্য। সুগন্ধ হলো —ফুল থেকে নির্গত কতগুলো বিশেষ পরিমাণের পরমাণুর যৌগিক। বস্তুত নাযযামই উভয় ধারণার স্রষ্টা। তিনিই সর্বপ্রথম ধারণা[১] দুটি পেশ করেন। শহরিস্তানী 'মিলাল-ও-নিহাল' নামক গ্রন্হে নাযযামের বিশেষ বিশেষ নীতি এবং বিষয়বস্তুর উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে তাঁর সপ্তম নীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে শহ্‌রিস্তানী বলেন ঃ

জড় পদার্থ কতগুলো গুণের যৌগিক। হিশাম ইবুল হাকামের ন্যায় তিনিও এমত পোষণ করেন যে রং, স্বাদ, সুগন্ধ—এ সবই পদার্থ।

---

১. ধারণা দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লামা তাফ্‌তাযানী 'শরহে মাকাসিদ' নামক গন্হের ২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, নাযযামের মতে, পদার্থমাত্রই রং, গন্ধ ইত্যাদির যৌগিক। এ হিসেবে নাযযামের অভিমত হলো, "পদার্থ কতগুলো গুণের যৌগিক"। এর মানে হলো—পদার্থ সে সব বস্তু নিয়েই গঠিত, যেগুলোকে লোকেরা গুণ বলে মনে করে থাকে। বস্তুত তা গুণ নয়।

নাযযাম অবিভাজ্য পরমাণুরও অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি তর্ক দর্শনের প্রত্যেকটি গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

## একটি বিস্ময়কর ব্যাপার

এখানে একটি বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ না করে পারছি না। তাহলো এই যে, নায্যামকে তাঁর সূক্ষ্মবুদ্ধির পুরস্কার স্বরূপ 'কাফের' খেতাবেই আখ্যায়িত করা হয়। আল্লামা সাম্য়ানী 'কিতাবুল আন্সাব' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "কাদরিয়া (মুতাযিলা) সম্প্রদায়ের মধ্যে নায্যামের ন্যায় বিভিন্ন দিক থেকে এত বড় কাফের অতীতে আর দেখা যায়নি। তিনি অগ্নিপূজক, প্রকৃতিবাদী এবং দার্শনিকদের সাহচর্যে যৌবন অতিবাহিত করেন। তিনি অবিভাজ্য পরমাণুর বিষয়টি ধর্মহীন দার্শনিকদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেন। আর ন্যায়পরায়ণ সত্তা জুলুম করতে সক্ষম নয়—এ বিষয়টি শিক্ষা করেন অগ্নিপূজকদের নিকট। এছাড়া রং, স্বাদ, গন্ধ, আওয়াজ—এসবও পদার্থ—এ শিক্ষাটি প্রাপ্ত হন হিশামিয়া সম্প্রদায়ের নিকট। এমনিভাবে তিনি ইসলামকে অগ্নিপূজক এবং দার্শনিকদের ধর্মের সাথে গুলিয়ে জগা-খিচুড়ি করে ফেলেছেন।" এটা শুধু সাম্যানীর ধারণা নয়। হাদীস বর্ণনাকারীদের নিয়ে যে সব জীবনচরিত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এবং তাতে সাধারণত যেখানেই নায্যামের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই তাঁকে এ ধরনের অজুহাতে ধর্মহীন বা নাস্তিকরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দর্শনে নায্যাম কত বেশী দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা একটি ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। একদিন তিনি জা'ফর বারমাকীর নিকট বলেছিলেন, আমি অ্যারিস্টটলের একটি গ্রন্থের কোন কোন বিষয় ভুল প্রতিপন্ন করেছি। এর উত্তরে জা'ফর বলেছিলেন, আপনি কী লিখবেন? আপনি তো এ গ্রন্থ পড়তেও পারেন না। প্রত্যুত্তরে নায্যাম বললেন, আপনি কি চান যে, আমি অ্যারিস্টটলের গ্রন্থটি আগাগোড়া মুখস্থ শুনিয়ে দেই? এ কথা বলেই তিনি অ্যারিস্টটলের রচনা পড়ে শুনাতে আরম্ভ করলেন এবং সাথে সাথে তাঁর ভুলের প্রতিও অংগুলি নির্দেশ করতে থাকেন।

**জাহিয বলতেন:** "লোকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, প্রতি হাজার বছরে এমন একজন লোক জন্মগ্রহণ করে, যার সঙ্গে পৃথিবীর কারুর

তুলনা হয় না। এটা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হয় যে, নায্‌যামও ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি।"

ধর্মীয় বিষয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে নায্‌যাম অন্যান্য ধর্মের ঐশী গ্রন্থ সমূহেও বিরাট দক্ষতা অর্জন করেন। তওরিত, ইনজিল, যবুর ছিল তাঁর নখাগ্রে। এগুলোর ব্যাখ্যাও তিনি ভাল করে জানতেন।

নায্‌যাম জাহিযের ন্যায় একজন অতুলনীয় জ্ঞানী এবং একান্ত অনুগত শিষ্যের সৃষ্টি করেন। এতেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চ মর্যাদা খুব সহজে অনুমিত হয়।

## ওয়াসিক বিল্লাহ্

মামুনের পর মুসতা'সিম শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অশিক্ষিত। তাঁর মন মেজাজ ছিল একজন সৈনিকের ন্যায়। কিন্তু এরপর হিজরী ২২৭ সালে তাঁর পুত্র ওয়াসিক বিল্লাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করলে মামুনের জ্ঞানচর্চা আবার সজীব হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক মাসঊদী তাঁর জীবনচরিত বর্ণনায় বলেন ঃ

খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ্ চিন্তাভাবনা করতে ভালবাসতেন। তিনি অনুকরণ মোটেই পছন্দ করতেন না। আধুনিক ও প্রাচীন দার্শনিক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ভাবধারা জানবার তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর সভায় পদার্থ বিজ্ঞান এবং অধিবিদ্যার বিশেষ চর্চা হতো।

মুতাকাল্লিম এবং ফকিহ্দের বিতর্কের জন্য ওয়াসিক বিল্লাহ একটি সমিতি গঠন করেন। তাতে প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে সূক্ষ্ম আলোচনা করা হতো। ঐতিহাসিক মাসউদী এসব সম্মিলনের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সারাংশ 'আখবারুয্ যামান' এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিধৃত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল সে সব গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। উপরোক্ত ইতিহাসবিদ তাঁর 'মুরুজুয্ যাহাব' নামক গ্রন্থে শুধু এতটুকু লিখেছেন ঃ

তাঁর দরবারে মুতাকাল্লিম ও ফকিহ্দের অনুধ্যানের জন্য যে সব সভা আহূত হতো, তাতে যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং প্রচলিত মতবাদের মৌলিক ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আলোচিত হতো। আমি আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

মাহদী, মামুন এবং ওয়াসিকের রাজকীয় উৎসাহ উদ্দীপনায়, তদুপরি বারমাকীদের এবং অন্যান্য ওজির-আমিরদের সক্রিয় স্বীকৃতির

ফলে ইলমে কালাম এত দৃঢ়তা লাভ করে যে, এর উপর থেকে সরকারের ছত্রছায়া উঠে যাবার পরেও তা বহুদিন পর্যন্ত উন্নতি করতে থাকে এবং তদবিষয়ক গ্রন্থাবলী ও রচনাবলী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। মাহদী থেকে আরম্ভ করে ওয়াসিক পর্যন্ত যত কালাম-পন্থী ওলামা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের ইতিহাস লিখতে হলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। তন্মধ্যে জাহিয, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইসকাফী (মৃঃ ২২৩ হিঃ), জা'ফর ইবনে আল-বাশার, আলী ইবনে রুম্মানী, জা'ফর ইবনে হারব সায়রাফী (মৃঃ ২৩৬ হিঃ), হাসান ইবনে আবদুল্লাহ্‌, আবু মূসা আল-ফার্‌রার (মৃঃ ২২৬ হিঃ) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## নওবখ্‌ত ও তাঁর বংশ পরিচয়

ইলমে কালামের ক্রমবিকাশের আলোচনায় নওবঘতের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফযল ইবনে নওবঘত ছিলেন হারুনুর রশিদ প্রতিষ্ঠিত 'খাযানাতুল হুকামা'-এর প্রধান। তিনি ফার্সী গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করতেন। 'খাযানাতুল হুকামা' নামক প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ করা হতো। নওবঘতের পৌত্র ইসমাইল একজন বড় আলিম এবং ইলমে-কালামবিদ ছিলেন। তাঁর অধিনায়কত্বে বিশেষ ধরনের সভা আহূত হতো। তাতে মুতাকাল্লিমগণ সমবেত হয়ে ইলমে কালাম বিষয়ে পর্যালোচনা করতেন। ইলমে কালাম বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে নাদিম তাঁর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করেনঃ

কিতাবু ইবতালিল্‌ কিয়াস, নাকযু কিতাবে আবাসিল্‌ হিকমাতে আলার রাবিন্দী, নাকযুত তাজ, কিতাবু তাসবিতির রিসালাহ্‌।

ইসমাঈলের ভাগ্নে হাসান ইবনে মূসা এ বংশের সবচাইতে প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেম। ইবনে নাদিম তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি মুতাকাল্লিমও ছিলেন, দার্শনিকও ছিলেন। তাঁর আদেশে এবং তত্ত্বাবধানে গ্রীক দর্শনের অনেক গ্রন্থ অনূদিত হয়। বিখ্যাত অনুবাদক আবু ওসমান দামিশ্‌কী, ইসহাক, সাবিত ইবনে কুর্‌রাহ তাঁর নিত্য সহচর ছিলেন। তাঁর একটি গ্রন্থের আলোচনা পরে করা হবে।

ইলমে কালাম ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে চতুর্থ শতকে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

## চতুর্থ শতকের মুতাকাল্লিমীন

এ যাবত অবশ্য ইলমে কালাম নিয়ে বহু গ্রন্থই রচনা করা হয়। কিন্তু কুরআন মজীদে যা কিছু বর্ণিত আছে, তা যে যুক্তি-সম্মত এবং বুদ্ধিভিত্তিক—এ মর্মে ইলমে কালামের নীতির আলোকে কোন তফসির রচিত হয়নি। এই প্রয়োজন এ শতকের কয়েকজন বিখ্যাত আলিম পূর্ণ করেন। তাঁরা হচ্ছেনঃ আবু মুসলিম ইসফাহানী, আবু বকর আসুম, আবুল কাসিম বলখী এবং কাফ্ফাল্ কবির।

আবু মুসলিমের আসল নাম মোহাম্মদ ইবনে বাহার ইসফাহানী। আল্লামা যাহাবী তাঁর নাম মোহাম্মদ ইবনে আলী ইব্নে মাহরিযদ লিখেছেন। ইবনে নাদিম তাঁকে বিখ্যাত বলিগদের (বাক্ বিশেষজ্ঞ) নামের তালিকায় শামিল করেন এবং বলেনঃ তিনি ছিলেন একজন লেখক, বাক্ বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক মুতাকাল্লিম। তাঁর রচিত তফসিরের নাম 'জামিউত্ তাবিল্ লে-মোহকামিত্ তানযিল।' 'কাশ্ফুয্যুনুন' রচয়িতার মতে, তফসিরটি ১৩ খণ্ডে বিভক্ত। আবু মুসলিম হিজরী ৩২২ সালে ওফাত প্রাপ্ত হন। এ তফসিরের রচয়িতা একজন মুতাযিলী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম রাযী তাঁর প্রশংসা করে বলেনঃ আবু মুসলিম তাঁর তফসিরে যে যুক্তি প্রয়োগ করেন, তা খুবই সুন্দর। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোও তাঁর নজর এড়াতে পারেনি।

অনেক বিষয়ে আবু মুসলিম ছিলেন অদ্বিতীয়। কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াত 'নাসিখ' (বিলোপ-সাধক) ও কোন কোন আয়াত মনসুখ (রহিত)—এ মতবাদ তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। যে সব আয়াত সাধারণ ওলামার নিকট মনসুখ বলে গণ্য, সেগুলোর তফসির বর্ণনায় ইমাম রাযী আবু মুসলিমের মত্ অনুসরণ করেন এবং তাঁর দেয়া রহিত হওয়ার কারণও উদ্ধৃত করেন। রাযীর বর্ণনাপদ্ধতি দেখে মনে হয় যে, তিনি আবু মুসলিমের সাথে পুরোপুরি একমত ছিলেন।

আবুল কাসিম বলখীর পুরো নাম—আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ কা'বী। ইবনুল খাল্লিকান তাঁর নাম 'প্রখ্যাত আলেম' বলে উল্লেখ করেন এবং তাঁর কৃতিত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেনঃ

"তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুতাকাল্লিম।" ইমাম রাযী তাঁর তফসিরে বলখীর অনেক অভিমত উদ্ধৃত করেন।

'কাশ্‌ফুয্‌যুনুন্‌' নামক গ্রন্থে লিখিত আছেঃ বলখীর তফসির ১২ খণ্ডবিশিষ্ট। এর পূর্বে এত বড় তফসির আর কখনো লিখিত হয়নি। তিনি হিজরী ৩০৯ সালে ওফাত প্রাপ্ত হন।

এ তফসিরটি ছাড়াও তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ আছে। যেমন, উয়ুনুল্‌ মাসাইল, মাকালাতু আহলে কিতাব। দার্শনিকদের সাথে তিনি প্রায়ই বিতর্কে লিপ্ত হতেন এবং তাঁদের পরাস্ত করতেন। খোরাসানের বহুলোক তাঁর যুক্তিবলে প্রভাবিত হন এবং সঠিক পথ অবলম্বন করেন।

আবু বকর আসুমের প্রকৃত নাম আবদুর রহমান ইবনে কাইসান। তাঁর বেশী বিবরণ জানা নেই। 'কাশ্‌ফুয্‌যুনুন' নামক গ্রন্থে তাঁর তফসিরের উল্লেখ আছে। ইমাম রাযী তাঁর তফসির থেকে অনেক কিছু উদ্ধৃত করেন।

কাফ্‌ফাল ছিলেন একজন বড় এবং বিখ্যাত আলেম। তাঁর পুরো নাম মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ইসমাঈল। তিনি তফসির, হাদীস, ফিক্‌হ্‌ এবং সাহিত্যের 'ইমাম' (পথপ্রদর্শক) বলে গণ্য ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। আল্লামা ইবনুস্‌ সাবকী 'তাবাকাত-এ-কুব্‌রা' নামক গ্রন্থে লিখেন, "মৌলিক নীতি বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন তফসির, হাদীস ও ইলমে কালামের একজন ইমাম।" আল্লামা ইবনুস্‌ সাব্‌কী তাঁর প্রশংসায় অনেক মুহাদ্দিসের ভাষ্য উদ্ধৃত করেন। কাফ্‌ফাল ছিলেন ইমাম আবুল হাসান আশয়ারীর সমসাময়িক। তাঁর নিকট আবুল হাসান আশ্‌য়ারী ফিক্‌হ্‌ অধ্যয়ন করেন। হিজরী ৩৬৫ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

একটি মজার ব্যাপার হলো এই যে, কাফ্‌ফাল বুদ্ধিভিত্তিক নীতি অবলম্বনে তফসির রচনা করেন। এজন্য লোকেরা তাঁকে মুতাযিলী বলে ধারণা করতেন। অথচ সমস্ত শাফেঈপন্থী তাঁকে সেযুগের ইমাম বলে গণ্য করতেন। এজন্য ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, তিনি প্রথমে ছিলেন মুতাযিলী। অতঃপর আশায়েরাবাদ অবলম্বন করেন। এ মর্মে ইবনে আসাকিরেরও একটি অভিমত আছে বলে কথিত আছে।

আবু সাহাল সা'লুকীর নিকট এক ব্যক্তি কাফ্‌ফালের তফসির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেনঃ তা পবিত্রও বটে, অপবিত্রও বটে। অপবিত্রতার কারণ হলো—তাতে মুতাযিল্লাবাদের প্রতি সমর্থন রয়েছে।

## পঞ্চম শতকে ইলমে কালাম

পঞ্চম শতকে বিভিন্ন কারণ বশতঃ ইল্‌মে কালামের পতন শুরু হয়। তা সত্ত্বেও এ সময় কতক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুতাকাল্লিমের আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে আবুল হোসাইন মোহাম্মদ ইবনে আলী আল-বস্‌রী, আবু ইসহাক ইস্‌ফারাইনী, কাযী আবদুল জাব্বার মুতাযিলী ছিলেন বিশেষ প্রখ্যাত। ইবনে খাল্লিকান বলেন, ইমাম রাযীর 'আল মাহসুল' নামক গ্রন্থটি আবুল হোসাইন বস্‌রী রচিত 'মু'তামাদ' নামক গ্রন্থেরই সারমর্ম। এতে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি কত বড় মর্যাদার লোক ছিলেন। ইবনে খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

"তাঁর যুক্তি খুবই সুন্দর। তিনি ছিলেন সে সময়ের ইমাম। লোকেরা তাঁর রচনায় খুবই উপকৃত হয়।" তাঁর আরো গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'তাসাফ্‌ফুহুল আদিল্লাহ্‌' দুখণ্ড বিশিষ্ট। 'গুরুরুল আদিল্লাহ্‌' একটি বৃহদাকার গ্রন্থ। আবুল হোসাইন হিজরী ৪২৬ সালে পরলোক-গমন করেন। হানাফী মতাবলম্বী প্রখ্যাত ফকিহ্‌ কাযী যমিরী তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

আবু ইসহাক ইসফারাইনীর মূল নাম—ইব্রাহিম ইবনে মোহাম্মদ। শাফেঈ মতাবলম্বীদের মধ্যে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। মুহাদ্দিসগণও তাঁকে তদানীন্তন ইমাম বলে গণ্য করতেন। হিজরী ৪১৮ সালে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। তিনি নিছক ইলমে কালাম বিষয়ে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা' পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট। এর নাম 'জামিউল হুলা ফি উসূলুদ্‌দীন অর-রদ্দু আলাল মুলহিদীন।'

ইলমে কালামের ইতিহাস এ শতকে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এ যাবত ফকিহ্‌ এবং মুহাদ্দিসগণ ছিলেন ইলমে কালামের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ। অনেকেই এ বিষয়কে পথ ভ্রান্তির কারণ বলে মনে করতেন। যাঁরা ততটা চরমপন্থী ছিলেন না, তাঁরা অন্ততঃ এত-

টুকু মনে করতেন যে, এ বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। এ সময়ে প্রাচ্যদেশসমূহে ইলমে কালাম সম্পর্কে এই একই মনোভাব ছিল। কিন্তু স্পেন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। সেখানে হাদীস এবং কালাম একই সভায় পাশাপাশি স্থান লাভ করে।

আল্লামা ইবনে হায্‌ম যাহিরী হিজরী ৩৮৪ সালে কর্ডোভায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি সুলতান মুনসুর মোহাম্মদ ইবনে আবি আমরের দরবারে ওজির পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন ফিক্‌হ্‌ এবং হাদীসের ইমাম। সাধারণ মুহাদ্দিসীন তাঁর মর্যাদা ও মহত্বের স্বীকৃতি দেন। মুহাদ্দিস যাহাবী 'তাবাকাতুল্‌ হোফ্‌ফায্‌' নামক গ্রন্থে তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তাঁকে হাদীসের ইমাম বলে অভিহিত করেন। মুসলিম জাহানে যাঁরা অসাধারণ প্রতিভাশালী বলে পরিগণিত, আল্লামা ইবনে হায্‌ম্‌ তন্মধ্যে একজন। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা চারশতের কাছাকাছি। এগুলো আশি হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে। তাঁর একটি বৃহদাকার গ্রন্থের নাম— 'ইসাল'। এতে তিনি ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রের সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ও হাদীসের ইমামদের মতামত উদ্ধৃত করেন এবং প্রত্যেকের যুক্তিও বর্ণনা করেন। আবার মত-বিরোধমূলক বিষয়ে নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করেন। 'মুহাল্লা' এ ধরনের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এতে তিনি মুজতাহিদের ভূমিকা পালন করেন। তিনি কারুর অনুকরণ করতেন না। তাঁর রচনাবলীতে এ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।

## স্পেনে ইলমে কালাম

স্পেনে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন অধ্যয়ন করা ছিল একটি অপরাধ। তাঁরা 'দর্শন' শব্দটিকেও অন্য শব্দে প্রকাশ করতেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে হায্‌ম জনমতের মোটেই পরোয়া করেন নি। তিনি মোহাম্মদ ইবনে হাসান কিনানীর নিকট এসব বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং দক্ষতাও অর্জন করেন। তিনি মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) বিষয়ে 'তাকরিব' নামক একটি গ্রন্থ লিখে পূর্ববর্তী পরিভাষাগুলো বদলে দেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের উদাহরণ ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু থেকে উদ্ধৃত করেন।

ইবনে হায্‌ম ইলমে কালাম বিষয়ে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। একটিতে তিনি তওরিত এবং ইনজিলের ভাষাকে কিভাবে বিকৃত

করা হয়, তা' তুলে ধরেন। ইবনে খাল্লিকান দাবী করেন, এ বিষয়ে এটাই সর্বপ্রথম গ্রন্থ। দ্বিতীয় রচনার নাম—'আলফসলু ফিল মিলালে-ওল-আহ্ওয়ায়ে-অন-নিহাল'। এতে প্রকৃতিবাদী, দার্শনিক, অগ্নিপূজক, খ্রীস্টান এবং ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস বর্ণনা করেন এবং তাদের মতামত খণ্ডনও করেন। এ গ্রন্থে সমস্ত মুসলিম সম্প্র-দায়ের আকাইদ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় এবং সেগুলোর সমালোচনাও করা হয়। এ গ্রন্থটির প্রথম ভাগ মিসরে প্রকাশিত হয়েছে এরং বাকিটুকু এখন মুদ্রিত হচ্ছে।

আল্লামা ইবনে হায্ম কারুর অনুসারী ছিলেন না। তিনি নির্ভীক এবং স্বাধীনভাবে মুজতাহিদদের সমালোচনা করতেন। তাই ফকিহ্গণ তাঁর শত্রুতে পরিণত হন। তাঁরা আওয়াজ তুললেন যে, কেউ যেন তাঁর সাথে মেলামেশা না করে। এতেও তাঁরা সন্তুষ্ট হননি। তাঁরা তাঁকে দ্বীপান্তরিত করিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। এই হতভাগ্য লোকটি 'লায়লা' নামক মরুভূমিতে ভবঘুরে হয়ে হিজরী ৪৫৬ সালের ৮ই শাবান প্রাণত্যাগ করেন। এটা ইবনে খাল্লিকানের অভিমত। আমাদের মতে, মানতিক এবং কালামের প্রতি ঝুঁকে পড়াই ছিল ইবনে হায্মের সবচাইতে বড় অপরাধ।

স্পেনে ইবনে রুশ্দের পূর্বে ইবনে হায্ম ছাড়া আর কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ইলমে কালামের প্রতি লক্ষ্য করেননি। এর কারণ ইবনে হায্ম তাঁর এক পুস্তিকায় বর্ণনা করেন। এ পুস্তিকাটি স্পেনের গৌরব বর্ণনায় লিখিত। এতে তিনি বলেন : আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় নেই। আকাইদ বিষয়েও আলাপ-আলোচনা হয় না। তাই এখানে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ইলমে কালামের কোন উন্নতি হয় নি। তা সত্ত্বেও খলিল ইবনে ইসহাক, ইয়াহ্ইয়া ইবনুস সামানিয়া, মুসা ইবনে হাদির, আহমদ ইবনে হাদিরের ন্যায় মুতাযিলীরা এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। আমি নিজেও অভিনব ধারণা নিয়ে সে সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি।

## ইলমে কালামের পতন

ইলমে কালামের প্রথম পর্বের ভাটা এখানেই আরম্ভ হয়। ক্রমাগত এর সম্পূর্ণ পতন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ শতকের শেষভাগে অর্থাৎ

আব্বাসীদের শাসন ক্ষমতায় ভাঙ্গন ধরার সাথে সাথেই ইল্‌মে কালামের পতন শুরু হয়। হুকুমতের ছত্র ছায়ায় বিষয়টি জন্ম লাভ করে এবং তারই সহায়তায় উন্নতির ধাপগুলো অতিক্রম করে। জনসাধারণ প্রথম থেকেই বিষয়টিকে খারাপ চোখে দেখতো। কিন্তু সরকারের সহায়তা ছিল বলে তারা কোন ব্যাঘাত জন্মাতে পারেনি। আব্বাসী শাসকরা একদিকে ছিলেন বাদশা, অন্যদিকে ছিলেন খলিফা। অর্থাৎ তাঁরা ধর্মপ্রধানও ছিলেন। জুমায় তাঁরাই ছিলেন খতিব এবং তাঁরাই ছিলেন ইমাম। দু'ঈদে তাঁরাই নামায পড়াতেন। ফিক্‌হ্‌ (শরীয়তের আইন) বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই ইজতেহাদ (মত প্রয়োগ) করতেন। এজন্য তাঁদেরকে ফকিহ্‌দের (ফিক্‌হ্‌বিদ) সামনে কখনো নতি স্বীকার করতে হয়নি।

চতুর্থ শতকে আব্বাসী খলিফাদের শাসন ক্ষমতায় ফাটল ধরে। হুকুমতের চাবিকাঠি দায়লমী ও তুর্কীদের হাতে চলে যেতে আরম্ভ করে। তুর্কীরা আপন ক্ষমতা বলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রবল থাকলেও অন্যদিকে দুর্বল ছিল তাঁদের মন মস্তিষ্ক। ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁরা ছিলেন শূন্য পর্যায়ে। এ জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁদের যে ধর্মীয় অধিকার ও কর্তৃত্ব ছিল, তা তাঁদের হস্তচ্যুত হয়। তাঁরা ইমামতও করতে পারতেন না, খোতবা পাঠেও সক্ষম ছিলেন না। ধর্মীয় বিষয়ে কোন অভিমত বা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন না। তাই ধর্মীয় প্রশাসনের ভার ফকিহদের হাতে চলে যায়। এই বাদশাদের অজ্ঞতার সীমা দেখুন: কুরআন সৃষ্ট, না চিরন্তন—এ বিষয়টি নিয়ে যখন বিতর্কের উদ্ভব হলো, তখন মামুনুর রশিদকে সমস্ত আলিমদের বিতর্কে আমন্ত্রিত করতে হয় এবং এতটুকু বলতে হয় যে, কেউ যদি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তবে তিনি তাঁর ধারণা প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত। মাহমুদ গজনবী যখন সত্য নিরুপণের জন্য হানাফী এবং শাফেঈ ওলামার মধ্যে বিতর্কের আয়োজন করলেন, তখন তাঁদের মধ্যস্থতা করার একজন আরবী জানা খ্রীস্টানকেই ডেকে আনতে হয়।

মোটকথা, তুর্কীদের ক্ষমতা বিস্তারের সাথে সাথে ইলমে কালাম দুর্বল হয়ে পড়ে। চিন্তার স্বাধীনতা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় এবং বুদ্ধিমত্তার আলো সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

# দ্বিতীয় যুগ

## আশায়েরা

প্রথম স্তরের ইলমে কালাম ছিল ঐশী বাণী এবং পরস্পরাগত ধর্মমত্‌ভিত্তিক। কিন্তু ইমাম গাযালীর সময় তা বুদ্ধিভিত্তিক হয়ে দাঁড়ায়। আমার উদ্দেশ্য ছিল ইমাম গাযালীর যুগ থেকে বুদ্ধিভিত্তিক ইলমে কালাম প্রণয়ন করা। কিন্তু দেখলাম, ইমাম গাযালী ইলমে কালামে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তার বুনিয়াদ রচিত হয়েছে ইমাম আবুল হাসান আশয়ারীর হাতে। তাই আমি আশয়ারীর যুগ থেকেই আরম্ভ করছি।

ইমাম আশয়ারীর নাম আলী ইবনে ইসমাঈল। হিজরী ২৭০ সালে তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৩০ সালে বাগদাদে পরলোকগমন করেন। তিনি প্রথমে মুতাযিলাপন্থী আবদুল ওহাব জুব্বাইর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। একদিন স্বপ্নযোগে তিনি একটি আদেশ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে তিনি বসরার জামে মসজিদে ঘোষণা করলেনঃ আজ থেকে আমি মুতাযিলা মতবাদ বর্জন করলাম। অতঃপর তিনি বাগদাদে শিক্ষা লাভ করে হাদীস ও ফিকায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং মুতাযিলাবাদের বিরুদ্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শাফেঈপন্থিগণ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। শত শত নয়, হাজার হাজার ওলামা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন শিষ্যের নাম হলো আবু সাহাল সালয়ূকী, আবু বকর কাফ্‌ফাল, আবু যাইদ মারওয়াযী, যাহির ইবনে আহমদ, হাফিজ আবু বকর জুরজানী, শেখ আবু মোহাম্মদ তাবারী, আবু আবদুল্লাহ তায়ী, আবুল হাসান বাহিলী। এঁদের খ্যাতি অবশ্য কম ছিল না। কিন্তু এঁদের শিষ্য আবু বকর বাকিল্লানী, আবু ইসহাক ইসফারায়েনী, আবু বকর ইবনে ফুরাক এবং শিষ্যের শিষ্য ইমামুল

হারামাইন প্রমুখ আরো বেশী খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রভাবের দরুন ইমাম আশয়ারীর রচনাবলী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের প্রণীত ইলমে কালাম বিশ্বজনীন ইলমে কালামে পরিণত হয়।

ইমাম আশয়ারী-পূর্ব যুগে ইলমে কালামে দর্শনের আমেজ ছিল না। আল্লামা বাকিল্লানী এতে কয়েকটি নতুন দার্শনিক বিষয় প্রবর্তন করেন। যেমন, অবিভাজ্য পরমাণুর মতবাদ বাস্তব সত্য, শূন্যাকাশের অস্তিত্ব অসম্ভব কিছু নয়; একটি পরমূর্ত পদার্থ অপর একটি পরমূর্ত পদার্থের সাহায্যে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না; পরমূর্ত পদার্থ দু'বার অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। বাকিল্লানীর পর ইমামুল হারামাইন (ইমাম গাযালীর শিক্ষক) ইলমে কালাম বিষয়ে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সারমর্ম নিয়ে 'ইরশাদ' নামে অপর একটি সারগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ইমামুল হারামাইন ছিলেন সে সময়কার 'শাইখুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ। ইরাক থেকে আরব পর্যন্ত সব জায়গায় তাঁর ফতোয়া সমর্থন লাভ করে। তাঁর রচনাবলী ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

এ যাবত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌দের মধ্যে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের মোটেই রেওয়াজ ছিল না। এজন্য ইলমে কালাম শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বেদাতপন্থীদের (মুবতাদে) মতবাদ খণ্ডনেই ব্যবহৃত হতো। বিধর্মীদের চিন্তাধারা খণ্ডনে যা কিছু লেখা হতো, তা প্রমাণসম্মত করার জন্য কেবল ঐশীবাণীভিত্তিক পরম্পরাগত যুক্তি প্রয়োগ করা হতো। ইমাম গাযালী 'আল মুনকিয্‌-মিনাদ্‌-দালাল্‌' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

অতঃপর আমি ইলমে কালাম দেখতে আরম্ভ করলাম; তা শিখলাম এবং বুঝলাম। গবেষকদের (মুহাক্‌কিকীন) গ্রন্থাবলীও পাঠ করলাম এবং নিজেও যা রচনা করার ছিল, করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, এই ইলমে কালাম আমার উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এই ইলমে কালামের একমাত্র লক্ষ্য হলো 'আহলে সুন্নাত্‌ জামাতের' আকিদাকে বেদাতপন্থীদের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা। এই ইলমে কালাম সে সব লোকের সাথে লড়ার

জন্য যথেষ্ট নয়, যারা স্বতঃসিদ্ধ সত্য (বাদহিয়াত) ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে বিশ্বাসী নয়।

যাক, ইলমে কালামের বিরাট গ্রন্থ-সম্পদ প্রস্তুত হলো। ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী এর প্রতিষ্ঠাতারূপে আখ্যায়িত হন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'মাকালাতুলইসলামীইন' আমি নিজেই দেখেছি। ইবনুল-কাইয়েম 'ইজ্‌তিমাউল্‌-জুয়ুশিল-ইসলামিয়া' নামক গ্রন্থে কিতাবুল ইবানাহ্‌ ইত্যাদি গ্রন্থের ভাষা হুবহু উদ্ধৃত করেন। এসব গ্রন্থে আহলে সুন্নাত জমাতের' যে আকিদা ফুটে উঠে, ইমাম গাযালী তাঁর 'ইহ্‌ইয়াউল উলুম' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তা 'কাওয়াইদুল আকাইদ' (ধর্মীয় বিশ্বাস নীতি) শিরোনামায় সন্নিবিষ্ট করেন। ইমাম গাযালীর পর ইমাম রাযী এসব বিষয়ের উপর পরিষ্কাররূপে আলোকপাত করেন। এর পর সকলেই তাঁর অনুসরণ করেন।

ইলমে কালামের বড় বড় বিষয় এবং আশয়ারীদের মতে, যে সব নীতি আহলে সুন্নাত এবং মুতাযিলীদের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, সেগুলো ইমাম গাযালী, রাযী ও আবুল হাসান আশয়ারীর ভাষায় বর্ণনা করছি ঃ

১. আল্লাহ মানুষকে তার শক্তি বহির্ভূত কাজের প্রতিও আদেশ দিতে পারেন। এটা তাঁর জন্য বৈধ। মুতাযিলিগণ এ মতের বিরোধী।

২. কোন গুণাহ্‌ ছাড়াই আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন বা পুণ্য ছাড়াই প্রতিদান দিতে পারেন—এ অধিকার তাঁর রয়েছে। মুতাযিলাপন্থী এ মতের বিরোধী।

৩. আল্লাহ আপন বান্দাদের প্রতি যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন। যা করা মানুষের জন্য অভিপ্রেত, তা করা আল্লাহর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়।

৪. শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে চেনা অবশ্য কর্তব্য ; বুদ্ধির মাধ্যমে নয়। মুতাযিলী এ মতের বিরোধী।

৫. মিযান অর্থাৎ দাড়ি পাল্লা সত্য। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের আমলনামায় লিখিত পাপ পুণ্যের ওজন করবেন।

এ সব আকাইদ ইমাম গাযালী তাঁর 'ইহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং উল্লেখিত ভাষাতেই বর্ণনা করেন।

'নবুওয়াতে সন্দেহ'—এ শিরোনামায় ইমাম রাযী তাঁর 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

৬. আমাদের সহযোগিগণ (আশায়েরা) বলেন, কুরআনের আয়াতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম এবং দুনিয়ার সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়।

৭. জীবন সঞ্চারের জন্য শরীরের প্রয়োজন নেই। যেমন, আগুনকেও আল্লাহ বুদ্ধি, জীবন এবং বাক শক্তি প্রদান করতে পারেন। মুতাযিলী এ মতের বিরোধী।

৮. এমনও সম্ভব হতে পারে, আমাদের সামনে উঁচু পাহাড় রয়েছে এবং প্রকট আওয়াজও সেদিক থেকে আসছে, অথচ আমরা কেউ দেখছি না এবং শুনছিও না। আবার এমনও সম্ভব যে, একজন অন্ধ প্রাচ্যে উপবিষ্ট রয়েছে এবং পশ্চিমা দেশে সে একটি মশা দেখতে পাচ্ছে। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, ইমাম আশ্য়ারী প্রকৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের ধরাবাঁধা নিয়ম ও ক্ষমতা মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

### তফসীর-এ কবীর-এর হারুত-মারুতের কিস্সায় আছে ঃ

৯. আহলে সুন্নাতের মতে, একজন যাদুকর বাতাসে উড়তে পারে। সে মানুষকে গাধায় এবং গাধাকে মানুষে পরিণত করতে পারে।

১০. মানুষের কর্মে তার নিজস্ব ক্ষমতার কোন ভূমিকা নেই।

১১. কাফেরের 'কুফর' এবং গুণাহগারের 'গুনাহ' আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই সংঘটিত হয়।

যে কোন আকাইদ গ্রন্থে এই আকিদাগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

এ আকিদাগুলো আশায়েরার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া তাদের আরো অনেক বিশেষ বিশেষ আকিদা রয়েছে। ইমাম গাযালী 'ইহইয়াউল উলুম' গ্রন্থের প্রারম্ভে একবার সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন। পরে বিস্তারিত বিবরণ দেন।

আমি এখানে 'ইহইয়াউল উলুম' থেকে সেগুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

## প্রথম স্তম্ভ

### আল্লাহর সত্তা

আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধীয় দশটি মৌলিক নীতি ঃ (১) আল্লাহ বিদ্যমান (২) একক (৩) চিরন্তন (৪) মূর্ত নন (৫) শরীরী নন (৬) পরমূর্ত নন (৭) সর্বদিকের উর্ধ্বে (৮) পাত্রের উর্ধ্বে (৯) দর্শনীয় (১০) চিরস্থায়ী।

## দ্বিতীয় স্তম্ভ

### আল্লাহ্‌র গুণাবলী

গুণাবলী সম্পর্কীয় দশটি মৌলিক নীতি ঃ (১) আল্লাহ জীবিত (২) জ্ঞাত (৩) ক্ষমতাশীল (৪) ইচ্ছার অধিকারী (৫) শ্রবণকারী (৬) চক্ষুষ্মান (৭) বাক্‌শীল (৮) অবিনশ্বর (৯) তাঁর বাণী চিরন্তন (১০) জ্ঞানী ও ইচ্ছাময়।

## তৃতীয় স্তম্ভ

### আল্লাহ্‌র কর্ম

এ সম্পর্কীয় দশটি মৌলিক নীতি ঃ

(১) আল্লাহ মানুষের সমস্ত কর্মের স্রষ্টা। (২) মানুষের কর্ম-ফল নিজেদেরই অর্জিত। (৩) আল্লাহর ইচ্ছানুসারে মানুষ সব কর্ম সম্পন্ন করে। (৪) যে কোন সৃষ্টি আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীল। (৫) মানুষকে তার শক্তি বহির্ভূত কর্মের প্রতি আদেশ করা আল্লাহর পক্ষে বৈধ। (৬) নিষ্পাপকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর পক্ষে বৈধ। (৭) সৃষ্টিকুলের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য জরুরী নয় (৮) কেবল সে আদেশই অবশ্য করণীয়, যা শরীয়তের পক্ষ থেকে তদরূপ বলে সাব্যস্ত। (৯) নবীদের প্রেরণ আল্লাহর জন্য অসম্ভব কিছু নয়। (১০) মোহাম্মদ রসূলুল্লার নুবুওয়াত মুজিযা প্রতিষ্ঠিত।

## চতুর্থ স্তম্ভ
## ওহীভিত্তিক প্রমাণে বিশ্বাস্য বিষয়

এ সম্পর্কীয় দশটি মৌলিক নীতি ঃ

(১) কিয়ামত (২) মুন্‌কির নকীর (৩) কবরের শাস্তি (৪) রোজকিয়ামতের দাড়িপাল্লা (৫) পুলসিরাত (৬) বেহেশ্‌ত্‌-দোযখের অস্তিত্ব (৭) ইমামত সম্বন্ধীয় নির্দেশ (৮) খেলাফতের ক্রমানুসারে সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব (৯) ইমামতের শর্তাবলী (১০) নির্ধরিত ইমামের অনুপস্থিতিতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুলতানের নির্দেশ।

ইমাম আশয়ারী এমন কতগুলো বিশেষ আকিদা প্রবর্তন করেন, যা 'সুন্নাতবাদ'কে মুতাযিলাবাদ থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়। এ আকিদা-গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এসবকে নিয়েই ইলমে কালামের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। ইমাম আশয়ারীর পূর্বে মুতাকাল্লিমদের দুটি সম্প্রদায় ছিল ঃ ওহীবাদী (আরবাব-ই-নক্‌ল) এবং বুদ্ধিবাদী (আরবাব–ই-আক্‌ল)। ইমাম আশয়ারী মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি যে সব আকিদা অবলম্বন করেন, তা ছিল বুদ্ধি এবং ওহীভিত্তিক মতবাদের এক সুসমঞ্জস রূপ। তিনি ওহীভিত্তিক চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে তাঁর বিশেষ মতবাদে কি ভাবে উত্তীর্ণ হলেন, তা দু'একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করছি।

১. ওহীবাদিগণ আল্লাহ্‌র সাক্ষাতলাভে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক ও মুতাযিলিগণ তা অস্বীকার করেন। ওহীবাদিগণ কেবল আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভেই বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরা এটাও মনে করতেন যে, আল্লাহ তাঁর আরশে আসীন রয়েছেন। তিনি কোন একটি দিক জুড়ে রয়েছেন। তাঁর প্রতি ইঙ্গিতও করা যায়। ইমাম আশয়ারী দার্শনিক এবং মুতাযিলীদের মতবাদ সমর্থন না করে ওহীবাদীদের আকিদাই অবলম্বন করেন। কিন্তু আল্লাহ কোন একটি স্থান জুড়ে রয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ইঙ্গিতও করা যায়—এসবের প্রতি তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। কারণ, বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার ফলে তিনি এতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত নন এবং তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করাও সম্ভব নয়। কেননা, এসব হলো নশ্বরতার বৈশিষ্ট্য। অথচ আল্লাহ নশ্বর নন।

এ মতবাদ অবলম্বনের ফলে ইমাম আশয়ারীর জন্য অন্য একটি সমস্যার উদ্ভব হয়। তা হলো, আল্লাহ্ যদি কোন বিশেষ স্থান জুড়ে না থাকেন, তবে তিনি দর্শনযোগ্যও হতে পারেন না। কারণ, যা স্থান অধিকার করে না, তা দেখাও যায় না। বাধ্য হয়ে ইমাম আশয়ারীকে মানতে হলো যে, কোন বস্তুর দৃষ্টিগোচর হবার জন্য তার কোন স্থানে অবস্থান করা বা ইঙ্গিতযোগ্য হবার প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে ইমাম আশয়ারীকে বিতর্ক বিদ্যার সমস্ত নীতি বিসর্জন করতে হলো।

'শরহে মাওয়াকিফ্' গ্রন্থে আছে ঃ

আশায়েরার মতে, কোন বস্তু সমক্ষে না থাকলেও তা গোচরীভূত হতে পারে।

তৃতীয় সমস্যা এই দাঁড়ালো যে, আল্লাহ যদি দর্শনীয় হন, তবে সর্বক্ষণ তাঁর গোচরীভূত হওয়া উচিত। কারণ, তাঁর বিদ্যমানতাই যদি দর্শনের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত কেনইবা এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে? তাই বাধ্য হয়ে ইমাম আশয়ারীকে এটাও বলতে হলো যে, কোন বস্তুর গোচরীভূত হবার সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলেও তার অদৃশ্য হবার সম্ভাবনা থাকে।

'শরহে মাওয়াকিফ' গ্রন্থে আছে ঃ

আটটি শর্ত পুরোপুরি পাওয়া গেলেও আমরা এটা বলতে পারি না যে, সে বস্তু গোচরীভূত হবেই।

(২) ওহীবাদিগণ সাধারণ্যে মুজিযার সমর্থক ছিলেন। তাঁরা হেতুবাদ তো অস্বীকার করতেন না, তবে বলতেন, মুজিযার বেলায় আল্লাহ 'কার্য-কারণ, সম্বন্ধ শিথিল করে দেন। ইমাম আশয়ারী এতটুকু নিশ্চয়ই জানতেন যে, কারণ যা হয়, কার্য তার বিপরীত হতে পারেনা। তাই তিনি 'কার্যকারণ, সম্বন্ধকেই অস্বীকার করলেন। মোট কথা, এভাবে ধীরে ধীরে উপরোক্ত সমস্ত আকাইদের সৃষ্টি হয়। ইমাম গাযালীর পূর্বেই ইলমে কালামের কাঠামো পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়।

এ ছিল আশায়েরাবাদী ইলমে কালামের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় ইমাম গাযালীর পরশ লেগে। তিনি ইলমে কালামের রূপরেখাই বদলে দেন।

## ইমাম গাযালীর বৈশিষ্ট্য :

আমি ইমাম গাযালীর স্বতন্ত্র জীবনচরিত রচনা করেছি। তাতে তাঁর প্রণীত ইলমে কালাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় সংক্ষেপে বলছি :

১. ইমাম সাহেবই সর্বপ্রথম দর্শনের ভ্রম সংশোধনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

২. এ যাবত ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। এজন্য প্রথম থেকেই এ বিষয়টি পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল না। ইমাম সাহেব ঘোষণা করলেন, যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করা 'ফরযে কেফায়া'। দর্শন সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, গুটি কতক বিষয় ব্যতীত এতে ধর্মবিরোধী কিছুই নেই।

৩. ইমাম সাহেবের বদৌলতেই দর্শন জনপ্রিয়তা লাভ করে। দর্শন এবং ধর্মশিক্ষা পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করে। এ শিক্ষা-পদ্ধতিই ইমাম রাযী, শাইখুল ইশরাক, আল্লামা আমুদী, আবদুল করীম শহরিস্তানীর মত লোক সৃষ্টি করে। এঁরা ছিলেন বুদ্ধিভিত্তিক এবং ওহীভিত্তিক এই দ্বিমুখী জ্ঞানের শিরোমণি।

৪. ইমাম সাহেব প্রথমত আশায়েরাবাদের সহায়তা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ পন্থা অবশ্য সর্বসাধারণের জন্য ভাল। কিন্তু তা গূঢ়তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এতে সত্যিকার সান্ত্বনাও লাভ করা যায় না।

৫. এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ইমাম সাহেব আশ্‌য়ারীপন্থা ডিঙ্গিয়ে আকাইদ বিষয়ে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি এই : জাওয়াহিরুল্ কুরআন, মুনকিয্ মিনাদ্-দালাল্, মাযনূন—ই-সগির ও কবির, মায়ারিজুল কুদ্‌স্, মিশকাতুল আনওয়ার।

৬. ইমাম সাহেবের মতে, শরীয়তের গূঢ় তত্ত্ব সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এজন্য তিনি তাঁর সে সব গ্রন্থই সর্ব সাধারণ্যে প্রচার করেন, যা আশায়েরার ধর্মীয় বিশ্বাস মোতাবেক ছিল। কিন্তু যে সব গ্রন্থ তিনি আপন রুচি মাফিক রচনা করেন, সে সম্পর্কে তিনি তাগিদ করেন যে, সেগুলো যেন সাধারণ্যে প্রচার করা না হয়।

৭. ফলে ইমাম সাহেবকে সাধারণত আশায়েরাবাদী বলেই পরিগণিত করা হয়। তাঁর স্বাতন্ত্র্য ধর্মী রচনাবলী ভাল করে প্রচারিত হয়নি বলেই প্রাচীন ইলমে কালাম বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। একমাত্র পরিবর্তন হলো এই যে, তাঁর প্রভাবে ইলমে কালামে দর্শন স্থান লাভ করে।

৮. ইমাম গাযালীর পর আল্লামা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম এই পন্থা অবলম্বন করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাই জাতি তাঁকে 'আফযল' (বড় জ্ঞানী) খেতাবে ভূষিত করেন।

## শহ্‌রিস্তানী

আল্লামা মোহাম্মদ শহ্‌রিস্তানী হিজরী ৪৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আহমদ ইবনে খাওয়ানীর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ফিক্‌হ্ নীতি (উসুল-এ-ফিকাহ্) শিক্ষা করেন বিখ্যাত সূফী আবুল কাসিম কুশায়রীর নিকট। ইলমে কালামে দক্ষতা অর্জন করেন আবুল কাসিম আনসারীর শিষ্যত্বে। হিজরী ৫১০ সালে তিনি বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানে তিন বছর কাল অবস্থান করেন। সেখানে তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তাঁর ওয়ায-নসিহতে কেবল বিশিষ্ট লোকেরাই নয়, জনসাধারণও প্রভাবাণ্বিত হয়।

আল্লামা মোহাম্মদ শহরিস্তানী হাদীস বিদ্যায়ও দক্ষতা অর্জন করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস সাময়ানী তাঁরই শিষ্য। ইলমে কালাম বিষয়ে শহ্‌রিস্তানীর কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। যেমন, 'নিহাইয়াতুল্ ইকদাম-ফি-ইলমিল্-কালাম,' 'আলমানা হিজু-অল-বায়ান,' কিতাবুল-মুযারায়াহ্,' 'তালখিসুল-আকসাম-লি-মাযাহিবিল্-আনাম। কিন্তু যে গ্রন্থটি সবচাইতে বেশী খ্যাতি অর্জন করে, তা হলো—'মিলাল-ও-নিহাল'। গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণ এবং তাদের ক্রমোন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়। এর সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় ভাগে অন্যান্য সকল ধর্মের ইতিহাস লিখেন এবং বিশেষ করে গ্রীক দার্শনিকদের ইতিবৃত্ত বিশদ-ভাবে তুলে ধরেন। তিনি এ গ্রন্থে গ্রীক দার্শনিকদের বিবরণ বিস্তারিত-ভাবে পেশ করেন। তিনি প্রত্যেক গ্রীক দার্শনিকের দর্শন এত সুচারু-

রূপে এবং নিখুঁতভাবে আলোচনা করেন যে, সে সম্পর্কে ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ইউরোপবাসী গ্রন্থটিকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে। গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয় এবং মূল আরবী ভাষ্য সহকারে মুদ্রিত হয়।

আল্লামা মোহাম্মদ শহরিস্তানী যদিও একজন ধর্মপ্রচারক, মুহাদ্দিস এবং ফকীহ্ ছিলেন, কিন্তু দর্শনে তাঁর খ্যাতি ছিল সমধিক। তাই তিনিও অভিযোগের হামলা থেকে রেহাই পাননি। আল্লামা সাময়ানী 'তাবাকাতুশ্ শাফিইয়াহ্' নামক গ্রন্থে বলেন, তাঁকে নাস্তিক বলেও ধারণা করা হতো।

কাফী নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, যদি তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে গড়বড় না থাকতো এবং তিনি ধর্মহীনতার দিকে ঝুকে না পড়তেন, তবে ইসলামের ইমাম বলে পরিবিদিত হতেন।

মুহাদ্দিস ইবনে সাব্কী শহরিস্তানী সম্পর্কে লোকদের এই ধারণাকে বিস্ময়ের চোখে দেখেন। কেননা তাঁর রচনাবলীতে এ ধারণার সমর্থন মেলে না। ইবনে সাবকীর মতে, কেউ হয়তো আল্লামা সাময়ানীর গ্রন্থে এ কথাগুলো পরে সংযুক্ত করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তাই।

## ইমাম রাযী

শহরিস্তানীর পর ইলমে কালামের মুকুট ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর শিরে বিরাজ করে। ইমাম সাহেবের নাম মোহাম্মদ ইবনে ওমর। হিজরী ৫৪৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলায় পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। কামাল সাম্য়ানীর নিকট ফিক্হ্ অধ্যয়ন করেন। ফিক্হ্ হাসিলের পর যুক্তিবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সে যুগে মাজদুদ্দীন জীলি যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইমাম রাযীর জন্মভূমি রায় নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। ইমাম রাযী তাঁর নিকট যুক্তিবিদ্যা পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর মাজদুদ্দীনকে শিক্ষকতা করার জন্য মারাগায় আমন্ত্রণ করা হয়। ইমাম সাহেবও তাঁর সাথে গমন করেন এবং বেশ কিছুকাল তাঁর নিকট দর্শন এবং ইলমে কালাম শিক্ষা করেন। রায় শহরে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি খাওয়ারাযম গমন করেন। আকাইদ বিষয়ে

সেখানকার ওলামার সাথে তাঁর বিতর্ক হয়। ফলে, লোকেরা তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। তিনি খাওয়ারাযম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। খাওয়ারাযম ত্যাগ করে তিনি মা-ওরাউন্নাহার নামক স্থানে উপনীত হন। সেখানেও তাঁর এই দশা ঘটে। বাধ্য হয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। এখানে একজন অর্থশালী ব্যবসায়ীর সাথে ইমাম সাহেবের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। তিনি ইমাম সাহেবের ছেলেদের সাথে আপন মেয়েদের বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিছুদিন পর সেই ব্যবসায়ী মারা যান। তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না বলে সমস্ত ধন সম্পদ ইমাম রাযীর করায়ত্ত হয়।

ইমাম সাহেব ছিলেন রিক্ত হস্ত। কিন্তু হঠাৎ তিনি এত সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন যে, ভারত বিজয়ী শিহাবুদ্দীন গোরীও তাঁর নিকট থেকে ধারস্বরূপ মোটা অংক গ্রহণ করেন। ঋণ পরিশোধের সময় গোরী অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে ইমাম রাযীকে প্রসন্ন করেন। আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে ইমাম রাযীর জ্ঞান গৌরবও বৃদ্ধি পায়। সে সময়কার বাদশাগণ তাঁর সকাশে গমন করা গৌরবের বস্তু বলে মনে করতেন। মোহাম্মদ ইবনে তাকাশ্ খাওয়ারাযম শাহ ছিলেন সে সময়কার সবচাইতে বড় শাসনকর্তা। তিনি খোরাসান, মা-ওরাউননাহার, কাশগড় এবং ইরাকের অধিকাংশ জয় করেন। তিনি প্রায় সময় ইমাম রাযীর দরবারে হাযির হতেন।

একবার তিনি হেরাত গমন করেন। সেখানকার শাসনকর্তা হোসাইন খুর্‌রামিন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য বেরিয়ে আসেন এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান। অতঃপর এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। তাতে সমস্ত ওলামা, ওমারা এবং অন্যান্য লোকজন উপস্থিত ছিলেন। ইমাম সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁর ডানে-বামে দাঁড়ানো ছিল তলোয়ার উচানো সারি সারি তুর্কী তরুণ। তারা ইমাম সাহেবের খরিদা গোলাম ছিল। তারা সব সময় ইমাম সাহেবের পাশেই থাকতো।

আসর যখন পুরোদমে জমলো, তখন হেরাতের শাসনকর্তা হোসাইন শাহ আবির্ভূত হন এবং ইমাম সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ইমাম সাহেব তাঁকে আপন পাশে বসালেন। একটু পর শিহাবুদ্দীন গোরীর ভাগনে সুলতান মাহমুদও এসে উপস্থিত হন। ইমাম

সাহেব তাঁকে অপর পাশে স্থান দিলেন। লোকজন জমায়েত হলে ইমাম সাহেব আত্মার মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। দৈবক্রমে তাঁর ভাষণদানকালে একটি কবুতর ঠিক ইমাম সাহেবের সামনে এসে পতিত হয়। কবুতরটির উপর একটি বাজ হামলা করেছিল। বাজপাখিটি লোকের ভিড় দেখে অন্য দিকে পালিয়ে গেল এবং কবুতরটি প্রাণে রক্ষা পেল। সভায় শরফুদ্দীন নামক একজন কবিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের প্রতি লক্ষ্য করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্নের চরণ দু'টি আবৃত্তি করলেন। চরণ দু'টি ছিল সময়োপযোগীঃ

কবুতরকে কে শেখালো যে এটা আপনার আস্তানা নয় বরং হরম শরীফ্! আপনি হলেন ভীত সন্ত্রস্তের আশ্রয়!

ইমাম সাহেব স্বতঃস্ফূর্ত চরণ দু'টি শুনে খুবই আনন্দিত হন। তিনি কবিকে পাশে এনে বসালেন এবং সভাশেষে গোশাক পরিচ্ছদ এবং অনেক অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

ইমাম সাহেব প্রায়ই হেরাতের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করতেন। রাজপ্রাসাদের ইমারতটি হরেক রকম সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত থাকতো। খাওয়ারযম শাহ্ তাঁকে এ ভবনটি দান করেন।

এ ছিল তাঁর সামাজিক মান মর্যাদা। একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরূপেও তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধার অধিকারী। দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের বহু লোক তাঁর কাছে আসতো এবং জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক বহু সমস্যা সমাধান করে নিতো। তিনি যখন সোয়ার হতেন, তখন দুই শতাধিক আলিম ও ভক্ত তাঁর সোয়ারীর আশেপাশে থাকতেন।

ইমাম সাহেবের শারীরিক গঠনঃ মাঝারি গড়ন, দোহারা শরীর, প্রশস্ত বক্ষ, ঘন দাঁড়ি, কণ্ঠস্বর উচ্চ ও হৃদয়গ্রাহী এবং প্রতাপ-মণ্ডিত চেহারা।

৬০৬ সালের শওয়াল মাসে রোজ রবিবার তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি কেবল তফসীর, উসূল, ও ফিক্হ শাস্ত্রেরই নয়, দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যারও ইমাম ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর এ যাবত কেউ তাঁর সমকক্ষ পয়দা হয়নি। তিনি দর্শনের জটিল বিষয়াদিকে এত সহজভাবে তুলে ধরেছেন যে, তা প্ল্যাটো এবং অ্যারিস্টটলকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীন কোন আলিমও তাঁর সমকক্ষ হওয়ার দাবী করতে পারেন না।

আমার পক্ষে তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতার পূর্ণ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। শুধু তাঁর ইলমে কালাম সম্বন্ধীয় কৃতিত্ব বর্ণনা করেই আমি ক্ষান্ত করছি।

## ইলমে কালামে ইমাম রাযীর কৃতিত্ব

১. ইলমে কালামে তাঁর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হলো দর্শনের ভ্রম খণ্ডন। তিনি দর্শনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তীক্ষ্ণ মেধার চোখা তীরে দর্শন-দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করেন। প্রবল ভাবাবেগ এবং বিরোধিতার উচ্ছ্বাসে তিনি এটাও পার্থক্য করতে পারেন নি যে, দর্শনে কোন্ বিষয়টি প্রয়োজনীয়, আর কোন্‌টি অপ্রয়োজনীয়। দর্শনে এমন শত শত বিষয় রয়েছে, যা বাস্তব সত্য এবং যা ধর্ম বিরোধীও নয়। এমন সব বিষয়ও ইমাম রাযীর হাত থেকে রেহাই পায়নি। দর্শনে এমন কতগুলো ব্যাপার আছে, যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণ করা—এ সবের প্রতি অভিযোগ আনাই সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও ইমাম রাযী হস্তক্ষেপ না করে ছাড়লেন না। তিনি বললেন, বিষয়গুলো বাস্তব সত্য হলেও এ সম্পর্কে দার্শনিকদের যে সব প্রমাণ রয়েছে, তা শুদ্ধ নয়। এসব ক্ষেত্রে মুহাক্কিক্ তুসী, বাকের দামাদ প্রমুখ দর্শনের পক্ষই সমর্থন করেন। ইমাম সাহেব সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিভাবে সফলকাম হতে পারেন? তথাপি বলতে হয় যে, তিনি দর্শনের উপর অভিযোগের যে পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তা এর ভিতরকে নড়বড়ে করে দেয়। ইমাম সাহেব এবং মুহাক্কিক তুসীর মধ্যকার বিরোধ নিরসনের জন্য আল্লামা কুতবুদ্দীন রাযী একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি ইমাম রাযী উত্থাপিত বহু অভিযোগের উত্তর দিতে পারেন নি।

২. ইমাম সাহেব সর্বপ্রথম দর্শন পদ্ধতি অবলম্বন করে ইলমে কালাম রচনা করেন। তিনি দর্শনের শত শত বিষয়কে ইলমে কালামে

সন্নিবিষ্ট করেন। পরবর্তী যুগের লোকেরা ইলমে কালামকে ক্রমাগত পূর্ণাঙ্গ দর্শনে পরিণত করে।

৩. ইমাম সাহেব ইলমে কালাম সম্পর্কে যে সব গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো এই: মাতালিবে আলিয়া, নিহাইয়াতুল্-উকুল্, আরবাঈন-ফি-উসুলিদ্দীন, মুহাস্সাল, আল বায়ান-অল-বুরহান, মাবাহিসু ইমাদিয়াহ্, তাহ্যিবুদ্ দালাইল, তাসিসুত্ তাকদিস, ইরশাদুর নায্যার-ইলা-লাতাইফিল আস্সার, আজওয়াবাতুল মাসাইলিল্ বুখারিয়াহ্, তাহসিলুল হক, যুবদাহ্, লাওয়ামিউল-বাইয়েনাত-ফি-শরহে আসমাইল্লাহে অস্ সিফাত্, কিতাবুল কাযা অল-কদর, তা'জিযুল ফালাসিফাহ্, ইসমাতুল্ আম্বিয়া, কিতাবুল খালকে-অল-বায়াস্, খামসিনা-ফি-উসুলিদ্দীন।

এগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি আমি পড়েছি। তিনি যে সব গ্রন্থে দর্শনের ভ্রম প্রতিপাদন করেন, যেমন শর্হে-ইশারাত, মাবাহিসে মাশ্রিকিয়াহ—সেগুলোকে এক হিসেবে ইলমে কালামের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৪. ইমাম সাহেবের ইলমে কালাম কায়েম ছিল আশায়েরা আকাইদের উপর ভিত্তি করে। তিনি এত জোরেশোরে ইলমে কালাম সমর্থন করেন যে, আশয়ারীদের যে সব বিষয় ব্যাখ্যার (তাবীল) অপেক্ষা রাখতো, সেগুলোতেও তিনি ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন নি। বরং প্রচুর যুক্তি দিয়ে সেগুলোর যথার্থতা প্রমাণ করেন। যেমন, আশায়েরা এ মত্ পোষণ করেন যে, মানুষ আপন কর্মে সক্রিয় ক্ষমতার অধিকারী নয়। তথাপি তাঁরা অদৃষ্টবাদ ও অক্ষমতাবাদ থেকে রেহাই পাবার জন্য মানুষের অর্জন ক্ষমতার অধিকার স্বীকার করে নেন। কিন্তু ইমাম রাযী এই অর্জন অধিকারও বর্জন করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় মানুষের অক্ষমতার অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি 'তফসীর-এ-কবীর' এর বিভিন্ন স্থানে যুক্তি দিয়ে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে আরো প্রমাণ করতে চান যে, আল্লাহ্র প্রত্যেকটি কাজ মঙ্গলময় ও কল্যাণকর হওয়া জরুরী নয়; ভাল-মন্দ বুদ্ধিনির্ভর নয়; জীবনের জন্য দেহ শর্ত নয়; কোন বস্তুর দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য রং, দেহ এবং পাত্রের প্রয়োজন নেই; কোন বস্তুই মূলত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়; কার্যকারণের

মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকা জরুরী নয় ইত্যাদি। তিনি এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন এবং এ-গুলোকে মুতাযিলা-বাদ ও সুন্নীবাদের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করেন। কালামের উপর লিখিত তাঁর সমস্ত গ্রন্থ এবং তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' এ ধরনের আলোচনায় পরিপূর্ণ।

প্রকৃত কথা হলো, এ ধারণাগুলো এত প্রচলন লাভ করেছিল যে, সেগুলো অস্বীকার করে কারুর পক্ষে জীবনে বেঁচে থাকাও মুশকিল ছিল। এ বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেই ইমাম গাযালী 'ইল্জামুল আওয়াম' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"কেবল সে সমস্ত বিষয় লোকের ধর্মীয় বিশ্বাসে (ই'তেকাদ) পরিণত হয়, যেগুলো ইলমে কালামের যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অথবা বড় বড় ওলামার মতবাদ বলে প্রচলিত ছিল, অথবা যে সব ভাবধারাকে অস্বীকার করা সমাজে গর্হিত কাজ বলে মনে করা হতো, অথবা যে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলে জনগণ অবজ্ঞার চোখে দেখতো।"

৫. ইমাম সাহেব সত্য বর্ণনার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন।

যারা শরীয়তের গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করতো, যুক্তিবাদ এবং ওহী-বাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতো, ইমাম রাযী তাদের 'হুকামা-এ-ইসলাম' নামে অভিহিত করেন। যেমন তিনি তফসীরের একস্থানে বলেন ঃ

'হুকামা-এ-ইসলাম এই আয়াতে প্রমাণ করেন।

অন্য এক স্থানে বলেন ঃ

এটা দ্বিতীয় বিষয় এবং তা হলো 'হুকামা-এ-ইসলাম' এর অভিমত।

অপর এক স্থানে লিখেন ঃ

এবং সেটা হলো 'হুকামা-এ-ইসলামের' একটি দল।

ইমাম রাযী এই সম্প্রদায়ের নাম শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চারণ করেন। তিনি তাঁদের মতামতের সমালোচনা করেন নি বরং প্রায় জায়গায় ইঙ্গিতে এবং কোন কোন জায়গায় পরিষ্কার ভাষায় তাঁদের প্রশংসা করেন।

'হুকামা-এ-ইসলামের' উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যে সকল বিষয় বর্ণনা করেন, তা হচ্ছে বস্তুত ইমাম সাহেবের প্রকৃত অভিমত এবং সেগুলোই ইলমে কালামের প্রাণ। যেমন, কুরআন মজীদের আয়াত—"লাহু-মুয়াক্কিবাতুমমিন্-বাইনে-ইয়াদাইহি" (তার পাশেই রয়েছে আমলনামা লেখক ফেরেশতা ) এর ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী স্বয়ং প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, 'আমলনামায়' রেকর্ড রাখার এবং তা পরিমাপ করার অর্থ কি? এবং এতে লাভই বা কি? এর উত্তরে তিনি লিখেন:

এ বিষয়ে দুটি ভিন্ন মত্ রয়েছে: মুতাকাল্লিমদের অভিমত হলো—সত্যি সত্যি আমলনামা ওজন করা হবে। এতে কিয়ামতের দিন সবাই বুঝতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তির আমল (কর্ম) ভাল, আর অমুকের খারাপ।

হুকামা-এ-ইসলামের মতে, মানুষ ভালমন্দ যাই করে, তা তার অন্তরে এক বিশেষ প্রতিফলন সৃষ্টি করে। যতই সে কাজের পুনরা-বৃত্তি করা হয়, ততই প্রতিফলনের ছাপ আরো গভীর হয়ে দাঁড়ায়। এমনি করে তার অন্তরে ভাল বা মন্দ করার এক সুষ্ঠু ক্ষমতা গজায়। এটাকেই বলা হয় আমলের পরিলিখন। প্রত্যেকটি কাজই কিছু না কিছু ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেকটি কাজ যেন এক একটি ছাপ বা পরিলিখন। ( তাফসীর-এ-কবীর: সূরা-এ-রাআদ )

### দ্বিতীয় উদাহরণ:

'রসূলগণ তাদের বলেছিলেন, আমরা তোমাদের মত মানুষ বই কিছুই নই" ( সূরা-এ-ইব্রাহিম )। কুরআন মজীদের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী বলেন, আহলে সুন্নাত ও জামাতের মত্ হলো নুবুওয়াত একটি পদ, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই তা দিয়ে থাকেন। পয়গাম্বর হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয় যে, তাকে বিশেষ ঐশী ক্ষমতার অধিকারী এবং অন্য সকল মানুষ থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে।

পক্ষান্তরে, হুকামা-এ-ইসলামের অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম রাযী বলেন, মানুষ বিশেষ আধ্যাত্মিক ও ঐশীগুণের অধিকারী না হলে সে পয়গাম্বর হতে পারে না। তিনি যে শব্দগুলো দিয়ে হুকামা-এ-ইসলামের অভিমত বর্ণনা আরম্ভ করেন, তা হলো: "আমাদের মনে রাখা উচিত, এখানে একটি সুক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট বিষয় আলোচিত হচ্ছে। সেটা হলো হুকামা-এ-ইসলাম... ...।"

**তৃতীয় উদাহরণ ঃ**

"তাঁর (আল্লাহর) নিকট রয়েছে সমস্ত অদৃশ্যমান বস্তুর চাবি কাঠি। তিনি ছাড়া সে সম্পর্কে আর কেউ জানে না" (সূরা ; আন্‌য়াম) এ আয়াতে সাধারণ ব্যাখ্যাকারদের অভিমত বর্ণনা করার পর ইমাম রাযী বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'হুকামা' অদ্ভুত সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

**চতুর্থ উদাহরণ ঃ**

"হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার রসূলদের কাছে যে ওয়াদা করেছ, তা আমাদের পূর্ণ করে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদের অপদস্থ করো না" (সূরা ঃ আল ইমরান)—এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাযী বলেন ঃ

কিয়ামতের দিন পথভ্রান্তি এবং কুকর্মের দরুন মানুষ যে লজ্জা বরণ করবে, মুসলিম হুকামা তাকেই আধ্যাত্মিক শাস্তিরূপে অভিহিত করেন এবং বলেন, আধ্যাত্মিক শাস্তি শারীরিক শাস্তি থেকে অধিকতর কঠিন।

কোন কোন স্থানে ইমাম রাযী 'মুসলিম হুকামা'দের চিন্তাবাদী (আরবীতে নযর) এবং বুদ্ধিবাদী (আরবীতে মা'কুলাত) নামে অভিহিত করেন। যেমন, "যখন আপনার প্রভু বনু আদমের পিঠ থেকে সন্তানাদি নির্গত করেন" (সূরা ঃ আ'রাফ)—এই আয়াতের তফসীরে ইমাম রাযী বলেন ঃ

তফসীরবিদদের মধ্যে এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। রিওয়াইয়াতপন্থীরা বলেন, "আল্লাহ্ যখন আদম সৃষ্টি করে তার পিঠে হাত বুলালেন, তখন পিপড়ার মত লক্ষ লক্ষ প্রাণ বেরিয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাদের নিকট থেকে আপন খোদায়িত্বের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন। অতঃপর আবার তাদের হযরত আদমের পিঠে অনু-প্রবেশ করান।" ইমাম রাযী এই ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, প্রাচীন তফসীরবিদ, যেমন সাঈদ ইবনুল্ মুসাইয়াব, সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রমুখও এ মত্ পোষণ করেন।

অতঃপর ইমাম রাযী বলেন, "চিন্তাবাদী ও বুদ্ধিবাদীদের মতে, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এই যে, মানুষের প্রকৃতিকে আল্লাহ্

এমনভাবে সৃষ্টি করেন, তা যেন আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তবে এ সাক্ষ্য মৌখিক নয়, ভাবভঙ্গিতে।" ইমাম রাযী এ ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ অভিমতের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

মোটকথা, তিনি এ পদ্ধতিতে আকাইদের অধিকাংশ বিষয়ে এমন সব ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা দর্শন এবং বুদ্ধিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬. ইলমে কালাম বিষয়ে তাঁর সবচাইতে বড় অবদান হলো কুরআন মজীদের তফসীর প্রণয়ন। ইমাম সাহেবের পূর্বে যত তফসীর রচিত হয়, সেগুলো যুক্তিসম্মত উপায়ে লিখিত হয়নি। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের যে সব বিষয় নিয়ে বিরোধিগণ বরাবর প্রশ্ন তুলতো, সেগুলোর যুক্তিসঙ্গত উত্তর এ যাবত কেউ দেয়নি। কেবল ওহীবাদ ও পরম্পরাগত মতবাদ-ভিত্তিক জওয়াব দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়। মুতাযিলিগণ অবশ্য পূর্বেই এ ধরনের বিভিন্ন তফসীর লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা লোকের কাছে এত অপ্রিয় ছিলেন যে, কেউ তাঁদের যুক্তিসঙ্গত কথায় কর্ণপাত করেনি। আশায়েরাবাদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম রাযীই এ পদ্ধতি অবলম্বনে তফসীর রচনা করেন এবং এমন এক উচ্চমানসম্পন্ন তফসীর রচনা করেন, যার চাইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আজও রচিত হয়নি। যদিও তিনি গভীর জ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ লেখনী ধারার আবর্তে সর্বত্র খাঁটি ও মেকীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি এবং কোথাও কোথাও এমন সব ভাসা ভাসা ও অগভীর কথাও লিখেছেন, যা তাঁর পক্ষে সমীচীন ছিল না। তথাপি এটা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি এসব নিষ্প্রয়োজন বিষয়াদির পাশাপাশি এমন শত শত সূক্ষ্ম এবং বিতর্কমূলক সমস্যার সমাধান করেন, যার নাম-নিশানাও অন্য কোন গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইমাম রাযী তাঁর এই তফসীরে ইলমে কালাম বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করেন। তিনি এর বিভিন্ন স্থানে হুকামা-এ ইসলামের মতামত বর্ণনা করেন। হুকামার অনেক চিন্তাধারা আশায়েরা বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেন। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, তিনি তাঁর ঘোর বিরোধী মুতাযিলীদের তফসীরসমূহ থেকেও সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি

অনেক স্থানে কোন প্রকার সমালোচনা না করেই তাঁদের মতামতের উদ্ধৃতি দেন এবং কোন কোন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের প্রশংসাও করেন।

তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! আমাকে এর একটি নিদর্শন দেখতে দিন!" সূরায়ে আল ইমরানের এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাযী আবু মুসলিম ইস্পাহানীর ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দেন এবং তাঁর প্রশংসায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিম্ন কথাগুলো উচ্চারণ করেন, যদিও তাঁর এ ব্যাখ্যা ছিল সাধারণ তফসীরকারদের মতবিরোধী।

তফসীর রচনায় আবু মুসলিমের আলোচনা খুবই সুন্দর। তিনি পাতালে প্রবেশ করে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেন।

অথচ আবু মুসলিম ছিলেন একজন বিখ্যাত মুতাযিলী এবং তাঁর তফসীরটি ছিল সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদের ভিত্তিতে লিখিত। এ তফসীরে ইমাম রাযীর যে কাজটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসার যোগ্য, তা হলো কুরআন মজীদের কিস্সা সম্পর্কিত অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন। কুরআন শরীফে বনি ইস্রাঈল এবং পূর্ববর্তী অনেক জাতির নবীদের সংক্ষিপ্ত কিস্সা রয়েছে। এসব কিস্সাকে কেন্দ্র করে ইহুদীদের মধ্যে অনেক কল্পনাপ্রসূত এবং বিবেকবর্জিত গল্প গুজব প্রচলিত ছিল। তারা যখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো, তখন এসব ভিত্তিহীন গল্প গুজবকেও কুরআনের তফসীরে জুড়ে দিলো। এ গল্পগুলো ছিল চিত্তহরা ও মনমুগ্ধকর। এগুলো ধর্ম প্রচারক এবং ধর্মোপদেশকদের সভায় লোকের মনে যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করতো। তাই এগুলো খুব শিগ্গির জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে তফসীরসমূহ এসব গল্প গুজবে ভরে যায়। হাদীসবিদ ও তফসীর বিশারদ আবুজাফ'র মোহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারীর তফসীর সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহ এক বাক্যে এ মন্তব্য করেছিলেন যে, ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে উত্তম তফসীর আর লিখিত হয়নি। অথচ এ তফসীরটিও এ ধরনের কিস্সা কাহিনী থেকে মুক্ত নয়। বাবেলে যোহরা নাম্নী একজন ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক ছিল। 'ইসমে আযম' (আল্লাহর প্রধান নাম) এর বলে তার আকাশে গমন করা এবং সেখানে গিয়ে নক্ষত্রে পরিণত

হওয়া—এ ভিত্তিহীন গল্পটিও তাঁর তফসীরে স্থান লাভ করেছে এবং সনদ সহকারেই করেছে।

এরূপ আরো অনেক প্রচলিত ভিত্তিহীন ধারণা তফসীরসমূহে সন্নিবিষ্ট করা হয়। যেমন হযরত ইউসুফের পাপকার্যে উদ্যত হওয়া, শয়তান কর্তৃক হযরত আইউবকে পরাভূত করা এবং তাঁর ধনসম্পদ ও বংশকে ধ্বংস করা; শয়তানের প্ররোচনায় হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক তাঁর পুত্রের নাম আব্দুল হারেস (হারেস শয়তানের নাম) রাখা, হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) তিনবার মিথ্যা কথা বলা, সিকান্দর বাদশার সেই স্থানে উপনীত হওয়া, যেখানে সূর্য পানির ঝরনায় অস্তমিত হয়; হযরত দাউদের উইরিয়ার স্ত্রীর উপর আসক্ত হওয়া—এরূপ ভিত্তিহীন ধারণাগুলো তফসীরে প্রবেশ করে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গরূপে পরিণত হয়। এগুলোই ইসলাম বিরোধীদেরকে ইসলামের উপর হামলা করার সবচাইতে বেশী সুযোগ দেয়।

সর্বপ্রথম মুতাযিলীরাই এসব পরম্পরাগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে অস্বীকার করেন। কিন্তু মুতাযিলার এসব ধারণাকে অবিশ্বাস করার মানে ছিল লোকদেরকে সেগুলো গ্রহণ করতে আরো উৎসাহিত করা। কারণ তাদের প্রতি মানুষের ধারণা ভাল ছিল না। ইমাম রাযীর যুগ পর্যন্ত এসব অলীক গল্প গুজব সর্বসম্মতরূপে চলে আসছিল। তিনিই সাহসিকতার সাথে এসব নিরর্থক কিস্‌সা কাহিনী অস্বীকার করেন এবং বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, এসব কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হযরত ইব্রাহীম সংক্রান্ত কিস্‌সা সম্পর্কে তিনি তাঁর তফসীরে লিখেন : "এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত ইব্রাহীমের তিনবার মিথ্যা কথা বলার ঘটনাতো হাদীসেই রয়েছে। তা কি করে অস্বীকার করা যায়?" আমি উত্তরে বললাম, হাদীস বর্ণনাকারীকে যদি সত্যবাদী বলে গণ্য করেন, তবে হযরত ইব্রাহীম মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন। আর যদি হযরত ইব্রাহীমকে সত্যবাদী বলে মনে করেন, তবে বর্ণনাকারিগণ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন। এখন আপনার এখতিয়ার, এঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা, সত্যবাদী বলুন, আর যাঁকে ইচ্ছা, মিথ্যাবাদী মনে করুন।"

ইমাম সাহেব এ তফসীরে যুক্তিবাদের আলোকে আকাইদের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করেন। এ গ্রন্থের অন্যান্য অংশে সমুচিত জায়গায় এগুলো নিয়ে আরো কিছু আলোচনা করবো।

ইমাম সাহেব যুক্তিবাদের তুলনায় ওহীভিত্তিক মতবাদের উপরই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মুতাযিলী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাবধারা খণ্ডনে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলীও রচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ তাঁর সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেনঃ

আল্লামা যাহাবী 'মিযান' নামক গ্রন্থে বলেনঃ

ফখরুদ্দীন ইবনে খতীব বহু গ্রন্থ-রচয়িতা। তেজস্বিতা ও যুক্তি-বিদ্যায় তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় লোক। কিন্তু হাদীসে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে সমস্ত বিষয় ধর্মের স্তম্ভ, তাতে তিনি এমন সব সন্দেহের অবতারণা করেন, যা বিস্ময়কর। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি আমাদের অন্তরে ঈমান কায়েম রাখুন!

হাফিয ইবনে হাজার 'লিসানুল মীযান' নামক গ্রন্থে ইবনুর রবীবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ

তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি গুরুতর সন্দেহের সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেগুলো নিরসন করতে সক্ষম নন। এজন্যই কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী বলেছেন, তাঁর প্রশ্নগুলো নগদ, কিন্তু উত্তরগুলো বাকী।

আবার 'একসীর-ফি-উসূলিত্ তাফসীর' এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেনঃ

সিরাজুদ্দীন মাগরিবী 'মাখায' নামক একটি দ্বিখণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি ইমাম রাযীর তফসীরের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেন। ইমাম রাযীর প্রতি ঘোরতর অভিযোগ করে তিনি বলেনঃ

ইমাম রাযী বিরোধীদের অভিযোগ জোরেশোরে বর্ণনা করেন, কিন্তু আহলে সুন্নাতের তরফ থেকে যে উত্তর দেন, তা খুবই দুর্বল। এজন্য কোন কোন লোক তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করে।

হাফিয ইবনে হাজার সিরাজুদ্দীন মাগরিবীর উপরোক্ত মন্তব্য পেশ করার পর তুফীর নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেনঃ

"ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর প্রতি যে কুধারণা পোষণ করা হয়, তা ঠিক নয়। কারণ তার উদ্দেশ্য যদি অন্য কিছু হতো, তবে কার ভয়ে তিনি তা প্রকাশ করলেন না?'

কিন্তু তুফী জানতেন না যে, ইমাম সাহেব সত্যিই এ বিপদের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। হাফিয ইবনে হাজার এই গ্রন্থেই লিখেছেন: লোকেরা তাঁর ধরপাকড়ের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি উধাও হয়ে যান।

ইমাম সাহেবের প্রতি কুধর্মিতার অভিযোগ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মতবাদ তুলে ধরা হয়, সেগুলো হাফিয ইবনে হাজার এই গ্রন্থে তাঁর যে সব ইবনে খলীলের উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন:

ইমাম রাযীর মতে, জাব্‌রিয়া মতবাদই যথার্থ। পরমূর্ত পদার্থের অস্তিত্ব বজায় থাকে। দার্শনিকদের ন্যায় তিনিও বলেন, কেবল সম্বন্ধ ও সম্পর্কের নামই আল্লাহ্‌র গুণাবলী। স্বতন্ত্র গুণাবলী বলে কোন কিছুই নেই। ইমাম রাযী আরো বলতেন, পৃথিবীকে যে ব্যক্তি নশ্বর বলে দাবী করে, তার বিরুদ্ধে আমার শত প্রশ্ন রয়েছে।

ইমাম রাযীর পর, বরং তাঁর যুগেই ইসলামের অবনতির বহু কারণ দেখা দেয়। তাতারীদের অভিযান ছিল প্রধানতম কারণ। এরূপ সময় ইমাম রাযীর বিরাট প্রতিভার সামনে আর কোন মনীষীর নাম ফুটে উঠা ছিল মুশকিল। তথাপি বলতে হয়, ইসলামের জ্ঞানদেহে তখনো জীবনের কিছুটা স্পন্দন বাকি ছিল। তাই ইমাম রাযী ছাড়াও এ যুগে এমন কতক লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের নাম ইলমে কালামের ইতিহাস থেকে বাদ দেয়া যায় না। তন্মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত হলেন—আল্লামা সাইফুদ্দীন আমুদী।

## আল্লামা আমুদী

তাঁর পুরো নাম—আবুল হাসান আলী সাইফুদ্দীন আমুদী। তিনি ৫৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩১ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। ফিক্‌হ্‌, উসূল-এ-ফিক্‌হ্‌ ইত্যাদি বাগদাদে অধ্যয়ন করেন। দর্শনে দক্ষতা অর্জন করেন সিরিয়ায়। সেখান থেকে তিনি মিসর গমন করেন এবং কাররাফা মাদ্রাসায় সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। দিন দিনই তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই খ্যাতিই তাঁর জন্য মারাত্মক বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। ইবনে খাল্লিকান বর্ণনা করেন,

তাঁর এই জনপ্রিয়তা ফকীহ্‌দের দুশমনে পরিণত করে। তাঁরা একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা ও দর্শন-পূজার অভিযোগ আনয়ন করেন। এ বিজ্ঞাপনে সমস্ত ফকীহ্ দস্তখত করেন। মজার ব্যাপার হলো, এটি স্বয়ং আল্লামা আমুদীর সামনে পাঠানো হয় এবং তাঁকেও এতে সই করতে বলা হয়। তিনি এতে নীচের চরণ দুটি লিখে দিলেন ঃ

তারা এ জোয়ানের (স্বয়ং) মর্যাদা লাভে সক্ষম নয় বলে ঈর্ষান্বিত।
জাতি আজ তার শত্রু, মারমুখী।

আল্লামা আমুদী মিসর থেকে সিরিয়ায় পালিয়ে গেলেন এবং হামাতে বসবাস আরম্ভ করেন। অতঃপর দামেশকে এসে মাদ্রাসায়ে আযিযিয়ায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু সময়টি তার পক্ষে অনুকূল ছিল না। কিছুদিন পর তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত ঘরেই বসে রইলেন এবং সে অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁর রচনা অনেক। দর্শন বিষয়ক রচনায় অনেক স্থানেই তিনি অ্যারিস্টটলের মতবাদ রদ করেন। কিন্তু ইমাম রাযীর ন্যায় তিনি এলোপাতাড়ি সমালোচনা করেন নি, বরং যে বিষয়গুলো সত্যি আপত্তিকর, সেগুলোরই প্রতিবাদ করেন। ইলমে কালামে তিনি ছিলেন আশায়েরাবাদী। তথাপি কোন কোন স্থানে তিনি স্বাধীনভাবে তাঁদের সমালোচনা করেন।

ইলমে কালাম বিষয়ক বিখ্যাত রচনাবলী ঃ দাকাইকুল-হকাইক্, রুমুযুল-কুনুয, আব্কারুল্-আফকার।

আল্লামা আমুদীর পর তাঁর সমকক্ষ উল্লেখযোগ্য লোক আর জন্ম-গ্রহণ করেনি। কাযী আযুদ, আল্লামা তাফ্তাযানী প্রমুখ অবশ্য বড় বড় গ্রন্থ লিখেছেন। সেগুলোর কিছু অংশ নিযামিয়ায় পাঠ্যতালিকাভুক্তও রয়েছে এবং সেগুলোকে আমাদের ওলামার গৌরব চিহ্ন বলেও পরিগণিত করা হয়। তা সত্ত্বেও এটা না বলে পারা যায় না যে, এ গ্রন্থগুলো ইমাম রাযী এবং আল্লামা আমুদীর অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়। এছাড়া সে সব গ্রন্থে নিছক দার্শনিক বিষয় এত বেশী পরিমাণে স্থান লাভ করেছে যে, দর্শন গ্রন্থ ও কালাম গ্রন্থের মধ্যে

কোন পার্থক্য আছে বলেই মনে হয় না। আল্লামা ইবনুল খালদুন তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় সত্যিই লিখেছেন:

শেষ যুগীয় ওলামা একই ক্ষেত্রে দর্শন ও কালাম উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করে জগাখিচুড়ি করে ফেলেছেন। এখন দর্শন এবং কালাম এত সংমিশ্রিত হয়ে পড়েছে যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করাই মুশকিল। বিদ্যার্থিগণ এসব গ্রন্থে ইলমে কালাম শিখতে পারে না।

## আশায়েরাবাদের প্রসার এবং তার স্থায়িত্বের কারণ

আশায়েরাপন্থী ইলমে কালাম যে দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যে, এর গোড়ার দিকের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো শুধরে যাবে এবং তা পূর্ণতার চরম সীমায় উপনীত হবে। কিন্তু তাতারী লুটেরাদের অগ্রাভিযান সমস্ত আশা আকাংক্ষাকে নস্যাৎ করে দেয়। এই আকস্মিক বিঘ্নের ফলে আশায়েরাবাদী ইলমে কালামের মৌলিক জ্ঞান সাধনার কাজ কিছুটা থমকে দাঁড়ালেও এর প্রচার কার্য মোটেও ব্যাহত হয়নি। বিভিন্ন কারণে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো, যার ফলে ধীরে ধীরে সারা মুসলিম দুনিয়ায় আশায়েরা মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। মাকরিযী 'তারিখে মিসির' নামক গ্রন্থে এই বিস্তৃতি ও উন্নতির কারণ বর্ণনা করেন। আমি হুবহু তা পেশ করলাম। তবে মাঝে মাঝে সমার্থবোধক এবং অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু শব্দ বাদ দেয়া হলো:

সুলতান সালাহদ্দীন যখন বাদশাহ হলেন, তখন তিনি এবং তাঁর দরবারের কাযী আবদুল মালিক ছিলেন এই (আশয়ারী) মতাবলম্বী। সালাহদ্দীন ছোট বেলায় সেই আকাইদ সঙ্কলনটি আয়ত্ত করেন, যা কুতুবুদ্দীন তাঁর জন্য প্রণয়ন করেছিলেন। সালাহদ্দীনের ছেলেরাও এ সঙ্কলনটি মুখস্থ করে নেয়। এ কারণেই সালাহদ্দীন এবং তাঁর বংশধরেরা আশায়েরাবাদ প্রচারে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ হন এবং সকলকে তা গ্রহণে বাধ্য করেন। বনি আইউব এবং তাঁর তুর্কী দাসদের শাসনামলেও আশায়েরাবাদের প্রতি রাজকীয় সহায়তা বিদ্যমান ছিল। দৈবক্রমে মোহাম্মদ ইবনে তুমরাতও আশায়েরাবাদ গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম গাযালী থেকে এ মতবাদ শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন 'মুওয়াহিদ্দীন' শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আশয়ারী

মতবাদ জোরেশোরে প্রচার করেন। তাঁর শাসনামলে সেই সব লোকদের হত্যা বৈধ বলে মনে করা হতো, যারা তাঁর আকীদার বিরোধিতা করতো। এ অজুহাতে তিনি এত লোক হত্যা করেছেন যে, নিহতদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। এসব কারণেই আশায়েরা মতবাদ সারা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে।

অন্য এক স্থানে ঐতিহাসিক মাক্রিযী ইমাম আশ্য়ারীর আকাইদ উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

এগুলো হলো আশ্য়ারী আকাইদের কয়েকটি নীতি। আজ সারা মুসলিম বিশ্বে এ আকাইদ প্রচলিত। যে ব্যক্তি এ মতবাদের বিরোধী, তাকে হত্যা করা হয়।

## আশয়ারিয়া ইলমে কালামে তিন ধরনের বিষয় রয়েছেঃ

১. খাঁটি দার্শনিক বিষয়,
২. মুতাকাল্লিমদের নিরূপিত ধর্মবিরোধী দার্শনিক বিষয়,
৩. খাঁটি ইসলামী বিষয়।

প্রথম প্রকারের বিষয়াদির সাথে ইলমে কালামের কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় প্রকার বিষয়গুলোও বস্তুত ইলমে কালাম থেকে স্বতন্ত্র। কারণ যে সব দার্শনিক বিষয় ধর্মবিরোধী, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এখন বাকী থাকে শুধু ইসলামী বিষয়াদি।

এ বিষয়াদির মধ্যে যেগুলো কেবল আশায়েরা মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত এবং যেগুলোর কথা পূর্বেও বলেছি, তা প্রমাণিত করার জন্য ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষয়গুলো ছিল এমনি ধরনের, যত চেষ্টাই তাদের প্রতিষ্ঠায় করা হতো, সবই বৃথা যেতো। আপনারা নিজেরাই বিচার করুন! এ ধরনের কথা যেমন—আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজের জন্যেও দায়ী করতে পারেন; হায়াতের জন্য দেহ শর্ত নয়; যাদুবলে মানুষ গাধা হতে পারে—এসব বিষয় কিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব?

এ ছাড়া বাকী বিষয়ে মোটামুটি সব সম্প্রদায়ই একমত। যেমন আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তওহীদ, নুবুওয়াত, কুরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম, পরকাল—এসব বিষয়কে আশায়েরা বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত করেছেন। তন্মধ্যে বড় বড় কয়েকটি যুক্তি সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

## আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ হলো—বিশ্ব নশ্বর এবং নশ্বর পদার্থের অস্তিত্ব হেতু সাপেক্ষ। তাই বিশ্বও হেতু সাপেক্ষ। এই হেতুকেই আমরা আল্লাহ্ বলে থাকি। এ যুক্তির দ্বিতীয়াংশ প্রণিধানের জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। প্রথমাংশ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন প্রমাণ প্রযোজ্য।

তন্মধ্যে একটি হলো, বিশ্বে যা কিছু বিদ্যমান, তা হয়তো স্বমূর্ত (জওহর), নয়তো পরমূর্ত (আরয)। পরমূর্ত পদার্থ যে নশ্বর, এতে কারুর সন্দেহ নেই। স্বমূর্ত পদার্থ মূলতঃ নশ্বর। কারণ, কোন স্বমূর্ত পদার্থ পরমূর্ত পদার্থ ছাড়া স্বরূপ লাভ করতে পারে না। আমরা জানি, পরমূর্ত পদার্থ নশ্বর। তাই স্বমূর্ত পদার্থও নশ্বর। কিন্তু স্বমূর্ত বস্তুকে যদি অবিনশ্বর ধরে নেয়া হয়, তবে পরমূর্ত বস্তুও অবিনশ্বর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, পরমূর্ত বস্তু ছাড়া স্বমূর্ত বস্তু মূর্তি লাভ করতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সকল জড়বস্তু হয় গতিসম্পন্ন হবে, নয় তো গতিহীন। গতি এবং গতিহীনতা উভয়ই নশ্বর। তাই সকল জড়-বস্তুও নশ্বর। গতির মানে হলো এক অবস্থা বা এক স্থান থেকে অন্য অবস্থা বা অন্য স্থানে পরিবর্তিত বা অপসারিত হওয়া; এটাই নশ্বরতা বা নৈমিত্তিকতা। গতিহীনতা এইজন্য নশ্বর যে, যা নশ্বর নয়, তা অবশ্যই চিরন্তন। আর যে বস্তু চিরন্তন, তা কখনও বিলুপ্ত হয় না। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, গতিহীন বস্তু কখনও বিলুপ্ত হতে পারে না। অথচ এটা বাস্তব সত্যের বিপরীত।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের তৃতীয় প্রমাণ হলো—প্রত্যেক জড় বস্তুর স্বরূপ এক। এ সত্ত্বেও তাদের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্তা নিশ্চয়ই একজন রয়েছেন। তিনিই আল্লাহ্। যেমন আগুন আর পানি মৌলিক স্বরূপের দিক থেকে উভয়ই এক। এ হিসেবে আগুনের ন্যায় পানিও জ্বালাতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, বরং উভয়ের গুণও পৃথক পৃথক এবং কাজও স্বতন্ত্র। তাই বলতে হয় এসব গুণের নির্ধারক একজন অবশ্যই রয়েছেন এবং তিনিই আল্লাহ্।

বিভিন্ন গ্রন্থে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আরো অনেক যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিগুলোই প্রধান।

## আল্লাহ্‌র একত্ববাদ

আল্লাহ্ একক। কারণ, যদি দু'জন হয় এবং খোদাইত্বের গুণাবলী উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান থাকে, তবে এটাই প্রতিপন্ন হবে যে সৃষ্টবস্তু বলে কিছুই নেই। কারণ স্বভাবতই সকল সৃষ্ট-বস্তুর সাথে উভয় আল্লাহ্‌র সম্পর্ক থাকবে সমভাবে। এ অবস্থায় যদি উভয় মিলে কোন বস্তু সৃষ্টি করে থাকে, তবে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, একটি সৃষ্ট বস্তুর জন্য দুটি পূর্ণাঙ্গ কারণ রয়েছে। অথচ কোন বস্তুর জন্যই দুটি পূর্ণাঙ্গ কারণ থাকতে পারে না। আর যদি একজনে সৃষ্টি করে থাকে, তবে একের উপর অপরের প্রাধান্য প্রতিপন্ন হয়।

## নবুওয়াত

আশায়েরার মতে, নবুওয়াতের মানে হলো—আল্লাহ্ আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তাকে আপন বিধি-বিধান প্রচারের জন্য আদিষ্ট করে থাকেন। এর জন্য তার মধ্যে পূর্ব থেকেই বিশেষ কোন যোগ্যতা বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের প্রয়োজন নেই।

নবুওয়াতের সত্যতা মুজিযার উপর নির্ভরশীল। মুজিযার সংজ্ঞা হলো—তা হবে অলৌকিক, ঐশী এবং অপরের পক্ষে অসম্ভব; মুজিযাধারী নিজেকে নবীরূপে ঘোষণা করবেন, তাঁর কাজকর্ম হবে নবুওয়াতের দাবী মাফিক এবং তা নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কখনো প্রকাশিত হবে না। এ শর্তাবলীর সাথে যে ব্যক্তি মুজিযার অধিকারী হবেন, তিনিই নবী। মুজিযা নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ যে ব্যক্তির নিকট থেকে মুজিযার উদ্ভব হয়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নিকট উপস্থিত সকলের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, তিনিই সত্য নবী।

## রসূল করীমের নবুওয়াতের প্রমাণ

এটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে যে, রসূল করীমের সময় আরবগণ বাক্-কৌশল ও রচনাশৈলীতে চরম উন্নতি লাভ করে। তারা মনে করতো যে, এ বিষয়ে সারা দুনিয়া একত্রে মিলেও তাদের

মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তাদের এ ধারণা ছিল যথার্থ। এ সময়ই কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয় এবং এ দাবী নিয়ে অবতীর্ণ হয় যে, সারা পৃথিবীর মানুষ এবং জিন একত্র হয়েও কুরআনের মত একটি ক্ষুদ্রতম সূরাও পেশ করতে সক্ষম নয়। সমস্ত আরব এ দাবীর মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্রতম সূরার চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করতে পারেনি। সুতরাং এটা অবশ্যই সমর্থন করতে হবে যে, কুরআন ঐশীবাণী এবং তা একটি মুজিযা। তা না হলে সমস্ত আরবেরা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন নতি স্বীকার করলো ?

## পরকাল ও তার স্বরূপ

সমস্ত মানুষের সাবেক শরীর নিয়ে হাশরে সমবেত হওয়া, তুলাদণ্ডে আমল পরিমিত হওয়া, পুলসিরাত পার হওয়া, বেহেশত-দোজখে প্রবেশ করা—এসব পরলৌকিক ব্যাপার। এ বিষয়গুলো সম্ভাব্য। তদুপরি রসূল করীম এগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। তাই এগুলো সুনিশ্চিত।

আশয়ারী পন্থী ইলমে কালামের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু গ্রীক দর্শনের প্রতিবাদে নিবেদিত। এতে সন্দেহ নেই যে, দর্শনের যেসব বিষয় ইসলাম বিরোধী, তা রদ করাই ইলমে কালামের সর্বাধিক কর্তব্য। কিন্তু মুতাকাল্লিমীন এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকারে পরিণত হন। যে বিষয়গুলো তাঁরা গ্রীক দর্শনের অংগ বলে মনে করেন, সেগুলো মূলত তাঁদের প্রতিপাদ্যই নয়। আর যেগুলো প্রকৃত পক্ষে গ্রীক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলো মোটামটি ইসলাম বিরোধী ছিল না।

## মাতুরিদিয়া

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইসলামী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে হানাফীরাই সংখ্যায় সবচাইতে বেশী এবং ভাবধারার দিক থেকে তাঁরা হলেন মাতুরিদিয়া মতাবলম্বী। তা সত্ত্বেও ইলমে কালামে আশয়ারীদের তুলনায় মাতুরিদিয়ার খ্যাতি নিতান্ত কম। মাতুরিদিয়া মতবাদের খ্যাতি না থাকায় আজ অধিকাংশ হানাফী ওলামাই আশয়ারী মতাবলম্বী। অথচ পূর্বকালে কোন হানাফীর পক্ষে আশয়ারিয়া হওয়াটা ছিল বিস্ময়কর। আল্লামা ইবনুল আসির 'তারিখে কামিল'

নামক গ্রন্থে ৪৬৬ হিজরীর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কোন হানাফী আশয়ারী-মতাবলম্বী হবে – এটা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

মাতুরিদিয়া মতবাদের বিলুপ্তির কারণ হলো এই যে, হানাফী ওলামা ইলমে কালাম-বিষয়ে খুব কমই গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে যত বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আছে, সে সব শাফী মতাবলম্বীদেরই রচিত। তাঁরা সাধারণত ছিলেন আশয়ারিয়া।

ইলমে কালামে মাতুরিদিয়া শাখার উদ্ভাবক হলেন আবুল মনসুর মাতুরিদী। তাঁর পুরো নাম মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ। তিনি ছিলেন সমরখন্দ অঞ্চলস্থ মাতুরিদ নামক গ্রামের অধিবাসী। তিনি ইমাম আবু নসর আওয়াযী, আবু বকর আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে সালিহ জোরজানী, নাসির ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলখী এবং মোহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রাখীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরোক্ষভাবে কাযী আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের শিষ্য ছিলেন। তিনি ৩৩৩ হিজরী সালে ওফাত প্রাপ্ত হন।

## তাঁর রচনাবলী

কিতাবুত তওহীদ, কিতাবুল মাকালাত, রদ্দু আওয়াইলিল্ আদিল্লা-তিল্কাবী, বায়ানু-ওহামিল মুতাযিলাহ্, তাবিলাতুল্ কোরআন। 'তাবিলাতুল্ কোরআন' অসমাপ্ত। এটি আমি অধ্যয়ন করেছি।

যে সমস্ত বিষয়কে আমি আশয়ারির বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছি, ইমাম মাতুরিদী সে সব বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেন। এ জন্যই তাঁর রচিত ইলমে কালামকে আশয়ারীর ইলমে কালাম থেকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে পরিগণিত করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ দুই ইমামের মতবিরোধ-মূলক বিষয়গুলোকে পৃথক করে দেখিয়েছেন। কারো কারো মতে, এ ধরনের বিষয়ের সংখ্যা—৩, কারো কারো মতে ১৩, আবার কারো কারো মতে ৪০ বলেও বর্ণনা করা হয়। আল্লামা ইবনুল বাইয়াযী এ বিষয়গুলো ভালরূপে খতিয়ে দেখেছেন। তাঁর মতে, বিতর্কমূলক বিষয়ের সংখ্যা হলো ৫০। আমি প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বর্ণনা করছি।

নিম্নে ইমাম মাতুরিদীর চিন্তাধারা থেকে কয়েকটি বিষয়ের রূপরেখা দেয়া হলো। ইমাম আশয়ারী এসব বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেন।

১. প্রত্যেক বস্তুর ভালমন্দ নির্ধারণের মানদণ্ড হলো বুদ্ধি।

২. আল্লা কাউকেও শক্তি-বহির্ভূত কার্যের জন্য শাস্তি দিতে পারেন না।

৩. আল্লাহ্ উৎপীড়ন করেন না। তাঁর উৎপীড়ক হওয়া অকল্পনীয়।

৪. আল্লাহ্র সকল কাজকর্ম মঙ্গলজনক।

৫. মানুষের কর্মক্ষমতা আছে এবং তাঁর ইচ্ছারও স্বাধীনতা রয়েছে। এ ক্ষমতা কর্ম সম্পাদনের সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৬. ইমান বৃদ্ধিও পায় না, হ্রাসও পায় না।

৭. জীবনের আশা ত্যাগের মুহূর্তেও তওবা কবুল হয়।

৮. পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বস্তু অনুভব করার নাম জ্ঞান নয়, বরং তা হলো জ্ঞান লাভের উপায় মাত্র।

৯. পরমূর্ত বস্তুর পুনঃ রূপায়ণ সম্ভব নয়।

## তৃতীয় যুগ

## ইবনে রুশ্‌দ

অন্ত যুগের আলিম সমাজ যদিও ইলমে কালামকে কল্পনাপুরীতে পরিণত করেন, তথাপি তাঁদের অবদান অস্বীকার করার জো নেই। কেননা, তাঁদের বদৌলতেই যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে যে সব ধর্মবিদগণ এ যাবত যুক্তিবাদভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে সরে থাকতেন, তাঁরাও এ দিকে অনুরক্ত হয়ে উঠেন। ক্রমে মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটলো। আশায়েরা মতবাদ যদিও সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তথাপি কোথাও কোথাও এর বিশ্বব্যাপী খ্যাতির মধ্য থেকে বিরোধিতার আওয়াজ উঠতে লাগলো। স্পেনে যখন ইমাম গাযালীর ইঙ্গিতে তাঁর শিষ্য মেহ্‌দী মিল্‌স্‌ম্যান-এর শাসনকে নস্যাৎ করে দিলেন এবং আবদুল মুমিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন, তখন আশায়েরা মতবাদ রাজকীয় মতবাদে পরিণত হয়। এ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সেখানে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন প্রসার লাভ করতে থাকে এবং অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ে ইবনে মাজা, ইবনে তুফাইল এবং ইবনে রুশ্‌দের ন্যায় বড় বড় বিজ্ঞানী (হুকামা) ও দার্শনিক পয়দা হন। প্রাচ্যদেশে একমাত্র ফারাবী ছাড়া এঁদের সমকক্ষ কোন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক জন্মলাভ করে নি। আবু আলী সিনা গ্রীক দর্শনের ব্যাখ্যায় অনেক ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হন এবং ফলে শত শত ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এই দার্শনিকগণ সে সব ভ্রম উদ্‌ঘাটন করে প্রকৃত বিষয়টি তুলে ধরেন। এঁদের মধ্যে ইবনে রুশ্‌দ ইলমে কালামের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন। এজন্যই আমি তাঁর বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিখ্‌ছি।

ইবনে রুশ্‌দের পুরো নাম—আবুল ওলীদ মোহাম্মদ ইবনে রুশ্‌দ। ৫১৪ হিঃ মোতাবেক ১১২০ খ্রীস্টাব্দে কর্ডোবায় এক

শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর দাদা (মৃঃ ৫২০ হিঃ) স্পেনের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইবনে রুশ্দ কর্ডোবায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। প্রথমে ফিক্হ্, সাহিত্য এবং চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করেন। অতঃপর দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হন এবং ইবনে বাজ্জার নিকট এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। স্পেনের শাসনকর্তা আবদুল মুমিন জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইবনে রুশ্দকে আপন দরবারে ডেকে আনেন এবং বিচারকরূপে নিযুক্ত করেন। শুধু বিচারকরূপেই নয়, বিশেষ সহচররূপেও তাঁকে বরণ করেন। দিন দিনই তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

আবদুল মুমিনের পর তাঁর পুত্র ইউসুফ মসনদে আরোহণ করেন। তিনিও ইবনে রুশ্দের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। গ্রীক দর্শনের প্রতি ইউসুফের বিশেষ ঝোঁক ছিল। গ্রীক দর্শনের যে সব গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়, সেগুলো ছিল কঠিন, অসমাপ্ত এবং ভ্রান্তিবহুল। তিনি ইবনে রুশ্দকে আদেশ দিলেন, ইবনে তুফাইলের পরামর্শ এবং সহযোগিতায় যেন অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যাপুস্তক (শরাহ) রচিত হয়। তদানুসারে ইবনে রুশ্দ বিশেষ পরিশ্রম এবং গুরুত্ব সহকারে এ কাজে হাত দেন।

৬৬৫ হিজরীতে ইউসুফ তাঁকে উশ্বিলিয়ার কাজীরূপে নিযুক্ত করেন। তিনি দু'বছর এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময় তিনি বিচার কার্যের সাথে সাথে গ্রন্থ রচনার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ই তিনি অ্যারিস্টটলের 'আল-হায়ওয়ান' নামক গ্রন্থটির ব্যাখ্যা-পুস্তক (শরাহ) রচনা করেন। বিচারকরূপে তিনি মাঝে মাঝে কর্ডোবা, মরক্কো এবং উশ্বিলিয়া সফর করতেন। ৫৭৫ হিজরীতে ইবনে তুফাইলের মৃত্যু হলে ইউসুফ তাঁকে ব্যক্তিগত চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করেন। ৫৮০ হিজরীতে ইউসুফ ওফাতপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর পুত্র মনসুর মসনদে সমাসীন হন। মনসুরও ইবনে রুশ্দের যথেষ্ট কদর করেন। এ সময় তিনি বার্ধক্যে উপনীত হন। তাই তিনি চাকুরী ত্যাগ করে কর্ডোবায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।

ইবনে রুশ্‌দ তাঁর সমসাময়িকদের মতামতের ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দেন। ইমাম গাযালী গ্রীক দর্শনের প্রতিবাদে যেসব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তিনি সেগুলোরও ভুল প্রতিপাদন করেন। তিনি আপন রচনায় আশ্‌য়ারীদের ভীষণভাবে আক্রমণ করেন। ফলত ফকীহ্‌গণ তার দুশমন হয়ে উঠেন। এ ছাড়া তাঁর প্রতিকূলে আরো অনেক কারণ এসে দাঁড়ায়। ফলে মনসুর তাঁকে দ্বীপান্তরিত করেন।

দর্শনের প্রসার দেখে ফকীহ্‌গণ এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যে, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ার উপক্রম হয়। বাধ্য হয়ে মনসুর আদেশ দিলেন—দর্শনের যাবতীয় গ্রন্থ পুড়ে ফেলা হোক। তদনুসারে শত শত গ্রন্থ পুড়ে ফেলা হয়। ইবনে রুশ্‌দকে তাঁর বাসভূমি থেকে দূরে লুসিনা নামক দ্বীপে বন্ধ করে রাখা হয়। তাঁর সাথে অন্যান্য দার্শনিক—আবু জাফর যাহাবী, আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে ইব্‌রাহীম, আবুর রাবী কাফিফ, আবু আব্বাসকেও সাজা দেয়া হয়। মনসুর মূলত ইবনে রুশ্‌দের প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন না। তাই কোন এক ছুতো ধরে তাঁকে তওবা করানো হয় এবং দোষত্রুটি মার্জনা করে পুনরায় দরবারে ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি হিজরী ৫৯৫ সালে পরলোকগমন করেন।

ইবনে রুশ্‌দ গ্রীক দর্শনের ব্যাখ্যায় এবং তার সহজীকরণে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তা ইউরোপে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য থেকে অনুমিত হয়। প্রবাদ বাক্যটি ছিল এইঃ

"মানুষ প্রকৃতির নিয়মাবলী অনুধাবনে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সে অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলী অনুধাবনে সক্ষম হয়। আবার সে অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলী অনুধাবনে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সে ইবনে রুশ্‌দের গ্রন্থাবলী অনুধাবনে সক্ষম হয়।"

বিখ্যাত ফরাসী জ্ঞানী অধ্যাপক রিনান ইবনে রুশ্‌দের জীবন চরিত, গ্রন্থাবলী এবং তাঁর দর্শন বিষয়ে পাঁচশত পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানা বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন যে, জার্মানী, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের দার্শনিকগণ দীর্ঘকাল ধরে ইবনে রুশ্‌দের অনুসরণ করেন এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারীরূপে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করেন।

এগ্রন্থে ইবনে রুশ্‌দের দর্শন আমার প্রতিপাদ্য নয়। এজন্য ইল্‌মে কালামে তিনি যে সংস্কার করেন বা যে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেন, শুধু তাই আমি লিখছি।

ইবনে রুশ্‌দের আবির্ভাবের পেছনে প্রকৃতির একটি উদ্দেশ্য ছিল। গ্রীকরা অ্যারিস্টটলের দর্শন বুঝতে যে সব ভুলের অবতারণা করেন এবং তদুপরি আবু আলী সীনা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তার যে বিকৃতি সাধন করেন, তা সংশোধন করা এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা নির্ণয় করাই ছিল ইবনে রুশ্‌দের আবির্ভাবের পেছনে প্রকৃতির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি একচেটিয়া দর্শনের সেবা করতে পারেন নি। তাঁকে ইলমে কালামের দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। সে সময় দর্শনের এত বেশী প্রসার ঘটেছিল যে, বহুলোক ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণ যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শন শিক্ষাকে হারাম বলে ঘোষণা করেন।

ইবনে রুশ্‌দ দর্শনের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ ধারণাও প্রবল ছিল যে, দর্শন এবং শরীয়ত একই সৌধের দুটি স্তম্ভ। তাই ধর্ম দুর্বল হতে পারে, এমন কোন কাজই তিনি সহ্য করতেন না। অপর দিকে যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শনকেও তিনি হারাম বলে মনে করতেন না। এ প্রয়োজনই তাঁকে যুক্তিভিত্তিক মতবাদ এবং ওহীভিত্তিক পরম্পরাগত মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে উৎসাহী করে।

তাঁর মনে এ ধারণা উদিত হবার আরো একটি কারণ ছিল। তা হলো এই যে, তিনি ছিলেন পরোক্ষভাবে ইমাম গাযালীর শিষ্য। ইলমে কালাম বিষয়ে তাঁর সামনে থাকতো ইমাম গাযালীর রচনাবলী। এ বিষয়ে তিনি দুটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন ঃ (১) ফস্‌লুল মাকাল্ ও তাক্‌রিরু মা বাইনাশ্ শরীয়তে অল হিকমাতে-মিনাল্-ইত্তেসাল (২) আলকাশ্‌ফু-আন-মানাহিজিল্-আদিল্লাতে-ফি-আকাই-দিল্-মিল্লাহ্। গ্রন্থ দুটো অনেক আগেই ইউরোপে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে মিসরে সেগুলোর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ কি না? তিনি স্বয়ং উত্তরে বলেন, তা শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব); অন্তত পছন্দনীয় (মুস্তাহাব)। এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি বলেন, স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিশ্বের লীলাখেলা মানুষের সমক্ষে তুলে ধরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং এমনি করে মানুষকেও এরূপ প্রমাণ-পদ্ধতি অবলম্বনে উৎসাহিত করেন। কুরআনের এমনি আয়াতসমূহের আলোকেই ফকীহ্‌গণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রজ্ঞার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রে যখন এ ধরনের আয়াতের উপর ভিত্তি করে প্রজ্ঞা প্রয়োগের বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে, তা হলে মৌলিক যুক্তির প্রমাণে তা অবৈধ হবে কেন?

অতঃপর ইবনে রুশ্‌দ এ আলোচনা করেন যে, কুরআনের পরোক্ষ ব্যাখ্যা দেয়া বৈধ কি না? পরোক্ষ ব্যাখ্যা (তাবিল) সম্পর্কে মতভেদ ছিল। এক সম্প্রদায় মনে করতো, তা সম্পূর্ণ অবৈধ। অপর সম্প্রদায় ছিল এর পক্ষপাতী। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের নিকট এর বৈধতা বা অবৈধতা ছিল কুরআনের যে মূল বচন আছে, তার আকৃতি-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করে। অথচ তাদের উচিত ছিল, যাদের সম্পর্কে কুরআনের আদেশ নিষেধ অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের জ্ঞানের পরিসর বিবেচনা করেই পরোক্ষ অর্থের বৈধতা—অবৈধতা নিরূপণ করা। ইবনে রুশ্‌দ এক্ষেত্রে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করেন। তা হলো এই যে, একমাত্র চিন্তাশীল এবং বিশেষজ্ঞেরই পরোক্ষ ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার আছে। সাধারণ লোককে কেবল কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ শেখানো উচিত। কোথাও যদি তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এসব আয়াত রহস্যমূলক। এগুলোর উপর মোটামুটি ঈমান গ্রহণ করাই যথেষ্ট।

ইবনে রুশ্‌দের মতে, এসব ক্ষেত্রে আয়াতের গূঢ় তত্ত্ব সাধারণ লোকের ধারণায় আসতেই পারে না। সুতরাং সাধারণ্যে তা শিক্ষা দেয়ার মানে—কুরআনের প্রতি তাদের অবিশ্বাস ডেকে আনা। যেমন সাধারণ লোকদের যদি বলা হয়, আল্লাহ্‌ আছেন, কিন্তু তাঁর কোন আসন, স্থান বা দিক নেই, তা হলে এ ধরনের অস্তিত্ব তাদের ধারণায় আসতে পারে না। সুতরাং এমন কথা বলার মানে হলো আল্লাহ্‌ মূলেই নেই।

যে সমস্ত ঐশীবাণী পরোক্ষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে, তাতে শুধু মুজতাহিদদের জন্যই চিন্তা ভাবনা করার অনুমতি রয়েছে। এঁরা

যদি ইজতেহাদে ভুলও করেন, তবুও অপরাধ কিছু নয়। কিন্তু যারা ইজতেহাদের উপযুক্ত নয়, তারা যদি ভুল করে, তবে মার্জনীয় নয়। এর উদাহরণ হলো, যদি কোন দক্ষ চিকিৎসক চিকিৎসায় ভুল করে, তবে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু যদি কোন হাতুড়ে চিকিৎসক ভুল করে, তবে তাকে সেই ভুলের জন্য মাশুল দিতে হয়।

এ গ্রন্থে ইবনে রুশ্‌দ আশায়েরাবাদী ইলমে কালামের তীব্র সমালোচনা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, তাঁদের প্রমাণ-পদ্ধতি যুক্তিভিত্তিক নয়, আবার ওহীভিত্তিকও নয়। ওহীভিত্তিক এজন্য নয় যে, তাঁরা কুরআনী ভাষার পরোক্ষ অর্থ করেন। তাঁরা মুহাদ্দিসীনদের ন্যায় তার বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থ মোটেও গ্রহণ করেন না। যুক্তিভিত্তিক এজন্য নয় যে, তাদের গ্রন্থে যে সকল যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ রয়েছে, সেগুলো যুক্তি প্রদর্শনের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না।

দ্বিতীয় গ্রন্থে ইবনে রুশ্‌দ প্রথমতঃ আশায়েরা, মুতাযিলা এবং বাতিনিয়া-ভাবধারা এবং তাদের প্রমাণ পদ্ধতির গলদ প্রমাণিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ, গুণাবলী, বিশ্বের নশ্বরতা, নবী প্রেরণ, ঐশী বিধিবিধান, যুলুম ও ইনসাফ, হাশর ও নশর ইত্যাদির হকিকত বর্ণনা করেন এবং সেগুলোর বুদ্ধিভিত্তিক ও ওহীভিত্তিক প্রমাণ পেশ করেন।

এ পুস্তকটি যদিও বৃহদাকার নয়, তথাপি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখিত বলে এটি পূর্বকার সমস্ত গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এদিক থেকে আল্লামা ইবনে রুশ্‌দকে একটি বিশেষ প্রমাণ পদ্ধতির প্রবর্তক বলা যায়।

ইলমে কালামের সাধারণ নিয়ম অনুসারে আকাইদ বিষয়ে যে সব মৌলিক প্রমাণ পেশ করা হতো, সেগুলো ছিল প্রত্যেকের নিজস্ব আবিষ্কার। কিন্তু আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ উপরোক্ত বিষয়াদিতে কুরআন থেকেই সমস্ত প্রমাণ পেশ করেন। তিনি দাবী করেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেও দেখান যে, কুরআন মজীদের প্রমাণাদি একদিকে যেমন সম্বোধন ধর্মী এবং সর্বসাধারণের জন্য সান্ত্বনাদায়ক, অন্যদিকে তেমনি যুক্তিসম্মতও বটে। এর মানে পুরোপুরি যুক্তি শাস্ত্রের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। এই প্রমাণগুলো আমি গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে বর্ণনা করার ইচ্ছা রাখি।

যে সব বিষয়ে ইবনে রুশ্‌দ সাধারণ আশায়েরার বিরোধিতা করেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, মুজিযার যুক্তি দিয়ে নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা। আশায়েরার মতে, নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হলো মুজিযা। ইবনে রুশ্‌দ মূলত মুজিযা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু মুজিযা দিয়ে নবুওয়াত প্রমাণিত হয়, এটা তিনি সমর্থন করেন, নি। তিনি বলেন, অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে এমনি ধরনের প্রমাণ দুটি ভূমিকা সংযোগে সম্পন্ন হয়ঃ

গৌণ ভূমিকা—ওমুক ব্যক্তি থেকে মুজিযা জাহির হয়েছে।

মুখ্য ভূমিকা—যে ব্যক্তি থেকে মুজিযা জাহির হয়, তিনি অবশ্যই নবী।

উভয় ভূমিকায় প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ এটা কি করে প্রমাণ করা যাবে যে, অলৌকিক যা কিছু ঘটে, তা কোন প্রক্রিয়া বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ সম্ভূত নয়। দ্বিতীয় ভূমিকার যথার্থতা নির্ভর করে অপর একটি বিষয়ের উপর। তা হলো—নবুওয়াত বা রিসালতের (রসূল-পদ প্রাপ্তি) সত্যতা প্রমাণ করা। কেননা, যে ব্যক্তি নবুওয়াতে বিশ্বাসী নয়, সে কি করে এ ভূমিকা সমর্থন করতে পারে? নবুওয়াত স্বীকার করে নিলেও এটা কি করে প্রমাণ করা যাবে যে, মুজিযা কেবল নবী থেকেই জাহির হয়। হয়তো এর উত্তর এই দেয়া হবে যে, কে নবী, আর কে নবী নন, তা পর্যবেক্ষণ এবং চিরাচরিত নিয়মই বাতলে দেবে। অন্য কথায়, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যত মুজিযার উদ্ভব হয়েছে, তা নবী থেকেই হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি কেবল পরবর্তী নবীদের বেলায়ই প্রযোজ্য। সর্বপ্রথম যে নবী পৃথিবীতে আগমন করেন, এ যুক্তিতে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা কি করে প্রমাণিত হবে? এর পূর্বে তো কোন নবীও আগমন করেন নি এবং কোন মুজিযাও সংঘটিত হয় নি। তা হলে মানুষ কি করে বুঝতে পারবে যে, কেবল তাঁরাই নবী, যাঁদের নিকট থেকে মুজিযা জাহির হয়।

এর চাইতে বড় কথা হলো—আশায়েরাবাদীদের মতে, নবী ছাড়া অন্যান্য লোকের হাতেও সকল প্রকার অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে পারে। যদি তাই হয়, তবে নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যই বা কি থাকে? আশায়েরাপন্থীরা বলেন, মুজিযা এবং অলৌকিকত্বের মধ্যে পার্থক্য

রয়েছে। মুজিযা শুধু সে ব্যক্তি থেকেই জাহির হয়, যিনি নবুওয়াতের দাবিদার এবং সত্যিকার নবী। কোন অসত্য নবী নবুওয়াতের দাবি করলেও তার নিকট থেকে মুজিযা জাহির হতে পারে না। ইবনে রুশ্‌দ বলেন, এটা অদ্ভুত ধরনের পার্থক্য। যখন এটা মেনেই নেয়া হলো যে, অলৌকিকত্ব কেবল নবী নয়, যে কোন লোক থেকেই জাহির হতে পারে, তা হলে এ পার্থক্য কে সমর্থন করবে যে, অলৌকিকত্ব সকল ব্যক্তির হাতেই সংঘটিত হতে পারে, কেবল মাত্র কৃত্রিম নবুওয়াতের দাবিদারের হাতে নয়।

এই হলো ইবনে রুশ্‌দের ভাষ্যের সারমর্ম। কিন্তু আমার মতে, ইবনে রুশ্‌দের এ অভিযোগ ঠিক নয়। আশায়েরা পরিষ্কার বলেছেন, মুজিযার অসাধারণত্ব যুক্তিনির্ভর নয়, বরং চিরাচরিত নিয়মই এর নিরূপক। 'শরহে মাওয়াকিফ' এবং অন্যান্য গ্রন্থে বিশেষ শিরোনামায় বিষয়টি আলোচিত হয়। ইবনে রুশ্‌দ যদি কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের উপর এ অভিযোগ করে থাকেন, তবে তা আশায়েরার উপর বর্তায় না। কেননা, আশায়েরার বক্তব্য হলো, মুজিযা জাহির হওয়ার পর চিরাচরিত নিয়মানুসারেই অধিকাংশ লোকের মনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নবুওয়াতের দাবিদারের প্রতি বিশ্বাস জমে উঠে; তখন কারো পক্ষে তা অবিশ্বাস করার জো থাকে না।

আশায়েরা মতবাদের ডংকা সারা দুনিয়ায় বেজে উঠা সত্ত্বেও হাম্বলীপন্থিগণ সব সময় তাঁদের বিরোধিতা করেন। তাঁরা ছিলেন ঐশী বাণীর আক্ষরিক অর্থের সমর্থক। তাঁদের এবং 'মুজাস্‌সিমা'দের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। কুরআনের যে সমস্ত আয়াতে আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহ্‌কে দিকবিশিষ্ট এবং সাকার বলে মনে হয়, সেখানে আশায়েরাবাদীরা পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু হাম্বলিগণ তা মোটেই পছন্দ করেন নি। তাঁদের এ অপছন্দনীয়তা এতদূর অগ্রসর হয় যে, উভয় দলের মধ্যে কাটাকাটি হানাহানি পর্যন্ত সংঘটিত হয়। ইবনুল আসীর তাঁর ইতিহাসে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেন।

## ইবনে তাইমিয়্যাহ্‌

এ বিষয়টিতে আশায়েরাবাদীরা ন্যায়পথেই ছিলেন। তবুও হাম্বলীরা তাঁদের বিরোধিতা করতে থাকেন। এ বিরোধিতার ফল

ভালই হলো। আশায়েরাপন্থীদের শক্তি খুব বেড়ে গেল। তাঁদের বিরোধিতার সাহস করতে পারে, এমন কেউ তখন সারা দুনিয়ায় ছিল না।

মুতাযিলাবাদীরা সম্পূর্ণরূপে দমে গেলেন। হাদীসপন্থিগণ দীর্ঘকাল ধরে আশায়েরা থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁরাও আশায়েরা মতাবলম্বী হয়ে উঠে অন্ততঃ তাঁদের প্রকাশ্য বিরোধিতা ত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত কেবল হাম্বলীরাই তাঁদের মতবাদ অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং আশয়ারীদের বিরোধিতায় অবিচল থাকেন। কিন্তু তাঁরা আশায়েরার যে সব মতবাদ ও আকাইদ মোটেই স্পর্শ করেন নি, যেগুলো ছিল সত্যিই আপত্তিকর এবং ত্রুটিপূর্ণ। এখন সে সব ত্রুটি শোধরাবার সুযোগ ঘনিয়ে এলো। ইমাম গাযালীর বদৌলতে দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যা মুহাদ্দিস এবং ফকীহদের আস্তানায় স্থান লাভ করে। ফলে; এ পূত পবিত্র সম্প্রদায়েও বড় বড় চিন্তাবিদ এবং জ্ঞানীর আবির্ভাব হলো। হিজরী সপ্তম শতকে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব হয়। তিনি ছিলেন একাধারে বড় মুহাদ্দিস, যুক্তিবিদ এবং ইলমে কালামে পারদর্শী। সে সময় ইলমে কালামে যত মতবাদ প্রচলিত ছিল, সবগুলোর উপর তিনি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন। আশয়ারী ইলমে কালামের সে সব বিষয়ের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে, যেগুলো ছিল সত্যিই সমালোচনার যোগ্য। অথচ এ যাবত কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। তিনি স্বাধীন এবং নির্ভীক চিত্তে সে সব বিষয়ের ভ্রম প্রতিপন্ন করেন।

ইবনে তাইমিয়ার নাম—আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে তাইমিয়াতুল-হাররানী। হিজরী ৬৬১ সালের ১০ই রবিউল আউয়াল তারিখে তিনি সিরিয়ার হাররান নামক এক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দশ-এগার বছর বয়সে তিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সতর বছর বয়সে তিনি এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেন যে, লোকেরা তাঁর নিকট ফতোয়া গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। এ সময় অবধি তিনি গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। তাঁর উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থাবলী তদানীন্তন আলীমদের মুগ্ধ করে। একুশ বছর বয়সে তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন।

ইবনে তাইমিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণত্ব সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারা এবং চরম ভাবাপন্নতার দরুন

একদল বড় ওলামা তাঁর বিরুদ্ধে খড়গ হস্ত হয়ে উঠেন। তাঁরা বাদশার দরবারে ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনয়ন করেন, এবং তাঁর হত্যার ফতোয়াও জারি করেন। বাদশা তাঁকে দরবারে হাযির করলেন। তিনি বাদশার প্রভাব প্রতিপত্তির মোটেই পরওয়া করলেন না। তিনি স্বাধীন এবং নির্ভীক চিত্তে প্রশ্নোত্তর করলেন এবং আপন মতবাদে অবিচলিত রইলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সিরিয়া থেকে দ্বীপান্তরিত করে মিসরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হলো।

কিছুদিন পর তিনি রেহাই পেলেন। ৬৯৯ হিঃ সালে তাতারীরা সিরিয়ার উপর আক্রমণ চালায়। সে সময় ইবনে তাইমিয়াহ্ জিহাদের প্রচারক এবং মুজাহিদরূপে আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর উৎসাহ্ উদ্দীপনা, নির্ভীকতা ও অবিচলতার ফলেই মুসলিম সুলতান এবং আমীরদের মনে সাহসের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা তাতারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মিসর গমন করেন এবং কয়েক বছর এ চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করেন। হিজরী ৭০৪ সালে তিনি কসর্ ওয়ানিন থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বিজয় গৌরব অর্জন করেন।

যদিও ইসলামের প্রতি ইবনে তাইমিয়ার দরদ, অনুরাগ ও দৃঢ় সংকল্প লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু কোন কোন প্রচলিত মতবাদের প্রতি তাঁর বিরোধিতার ফলে ওলামা সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং বাদশার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি বড় বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাদশার প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। ইবনে তাইমিয়াহ্ বিতর্কে জয়লাভ করলেও জনসাধারণের অসন্তুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হয়। কিন্তু তিনি স্বাধীন মতামত প্রকাশে অবিচলিত থাকেন এবং সেজন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়। এমনিভাবে তাঁকে বারবার কারারুদ্ধ করা হয় এবং মুক্তিও দেয়া হয়। কারার অন্তরালেই তাঁকে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। কয়েদখানায়ও তিনি গ্রন্থ রচনার কাজ ছাড়েন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে কলম, দোয়াত ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়া হয়। বাধ্য হয়ে তিনি রাত দিন ইবাদতে সময় অতিবাহিত করতেন। পড়াশুনা ত্যাগের

ফলে তাঁর অন্তরে কঠোর আঘাত লাগে। অচিরেই তিনি পীড়িত হয়ে পড়েন এবং বিশ দিন অসুখে ভুগে ৭২৮ সালের (হিঃ) জিলকা'দা মাসে ওফাত প্রাপ্ত হন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে চারদিক থেকে জনতা এসে ভীড় করে। যে দুর্গে তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, সেখানে তিলধারণেরও জায়গা ছিল না। আনুমানিক দুই লক্ষ লোক তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিল। শহরের সমস্ত দোকান পাট বন্ধ থাকে। তাঁর প্রতি লোকের এত ভক্তি ছিল যে, তারা আপন রুমাল বা চাদর তাঁর মরদেহে ছুঁইয়ে চুম্বন করে এবং নিজদের পবিত্র বলে মনে করে।

ইবনে তাইমিয়ার জীবনচরিত খুবই হৃদয়গ্রাহী। এ ধরনের বিস্ময়কর স্বাধীনচিত্ততা, সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আন্তরিকতার উদাহরণ পৃথিবীতে খুব কমই মেলে। এখানে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। ইবনে রজব দু'খণ্ডবিশিষ্ট একখানি গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করেন। 'তাবাকাতুল্ হুফ্ফায্,' 'যাইল ইবনুল খাল্লিকান' ইত্যাদি গ্রন্থেও তাঁর জীবনী কিছুটা বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। পাঠকগণ সেগুলো পাঠ করতে পারেন। এখানে তাঁর জ্ঞানবিষয়ক কৃতিত্ব বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

ইবনে তাইমিয়ার ছিল অসাধারণ মেধাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, সাগরসম জ্ঞান এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর দৈনিক রচনার গড় ছিল কমপক্ষে চল্লিশ পৃষ্ঠা এবং সবগুলোই ছিল মৌলিক ও মুজতাহিদধর্মী। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা অনুমানিক পাঁচ শ'। প্রায়গুলোই বৃহদাকার এবং কয়েক খণ্ডবিশিষ্ট। আল্লামা যাহাবী ছিলেন একজন বড় মুহাদ্দিস এবং ইবনে তাইমিয়ার সমসাময়িক। তিনি যেখানেই তাঁর রচনার উল্লেখ করেন, খুব শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর নাম উচ্চারণ করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, একজন বিজ্ঞ লোকরূপে তাঁর উপর ইবনে তাইমিয়ার কত বেশী প্রভাব ছিল!

## ইবনে তাইমিয়ার রচনাবলী

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ ইলমে কালাম বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম পেশ করা হচ্ছে এবং নামগুলোই

বিষয়বস্তুর পরিচয় বহন করছেঃ আল-ইতেরাযাতুল্ মিস্রিয়াহ্ (চার খণ্ডবিশিষ্ট), আর্-রদ্দু-আলা-তাসিসিদ-তাক্দিসে-লির্রাযী, শরহে মুহাস্সাল, শরহে আরবাঈনে ইমাম রাযী, রদ্দু-ত্বায়ারুযিল্-আক্ল্ (চার খণ্ডবিশিষ্ট), রদ্দু নাসারা (চার খণ্ডবিশিষ্ট), রদ্দে-ফালসাফাহ্ (চার খণ্ডবিশিষ্ট), ইসবাতুল-মায়াদ, সুবুতুন নুবুওয়াতে-অল-মুজিয়াতে-অল-কারামাতে আক্লান-অ-নক্লান, আর্রদ্দে-আলাল্ মান্তিক।

আমি অল্প কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলাম। 'ফওয়াতুল ওফাইয়াত' নামক গ্রন্থে তাঁর ইলমে কালামের গ্রন্থাবলীর একটি সূচীপত্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আর্রদ্দু-আলাল্-মানতিক' (অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার সমালোচনা) এবং 'রদ্দে-ফাল্সাফাহ্' বড় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আর্রদ্দু-আলাল্-মান্তিক' আমার নিকট আছে। আমি সময় মত এর গবেষণাধর্মী বিষয়গুলোর সদ্ব্যবহার করবো।

## ইলমে কালামের ভুল আবিষ্কার

ইলমে কালামে বহুদিন থেকে অনেক ভুল ধারণা চলে আসছিল এবং সেগুলো এত প্রচলিত ছিল যে, কেউ সেগুলোর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দও করতে সাহস পেতো না। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ খুব সাহসিকতা ও স্বাধীনচিত্ততা সহকারে সেগুলোর প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন এবং বলেন, 'মুতাকাল্লিম'গণ যে সব বিষয়কে ধর্মের পরিপোষক বলে মনে করেন, বস্তুত সেগুলো হলো ধর্মের পরিপন্থী। 'আর্রদ্দু-আলাল্-মান্তিক' নামক গ্রন্থে তিনি বলেনঃ

"আল্লাহ্কে দেখা সম্ভব—এটা অবশ্য বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়; তবে সেই প্রমাণ আবুল হাসান আশয়ারী এবং অন্যান্যদের দেয়া প্রমাণ নয়। তাঁরা বলেন, যা কিছু বিদ্যমান, তাই দর্শনীয়। তাঁরা আরো বলেন, সকল বিদ্যমান বস্তুই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায়। অথচ এ দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এটা এমনি ধরনের ভুল যেমন মুতাকাল্লিমীন অমূলকভাবে দাবি করেন যে, (১) পরমূর্ত পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নয়; (২) সমস্ত পদার্থ এক ধরনের এবং (৩) প্রত্যেক বস্তু অবিভাজ্য পরমাণুর যৌগিক; (৪) আল্লাহ্ কোন বস্তুকে কারণবশতঃ বা হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতে

সৃষ্টি করেন নি ; এবং (৫) এসব বস্তুর মধ্যে তিনি কোন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ শক্তিও নিহিত রাখেন নি ; (৬) সর্বনিয়ন্তা (আল্লাহ্) যে বস্তুই সৃষ্টি করেন, তা কোন বৈশিষ্ট্য ছাড়াই সৃষ্টি করেন ; (৭) আল্লাহ্ যে সব বস্তু সৃষ্টি করেন, বা শরীয়তে যে সব প্রত্যাদেশ রয়েছে, সেগুলোর সৃষ্টিমূলে বা আদেশের অন্তরালে কোন মঙ্গলা-মঙ্গলের উদ্দেশ্য নেই। মুতাকাল্লিমদের এসব ভুল-ভ্রান্তি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। লোকেরা মনে করলো, তাঁরা যা বলেন, সেটাই মুসলমানদের ধর্ম এবং সেটাই রসূলুল্লাহ্ এবং সাহাবাদের নির্দেশ।

## মুতাকাল্লিমীন ও দার্শনিকদের ভাবধারা বিচারে স্বাধীন মতামত প্রকাশ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ ছিলেন পাষাণ, অত্যন্ত কঠোর জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং দর্শনবিরোধী। তিনি অনুকরণ মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি ন্যায়-অন্যায় খতিয়ে দেখতেন। মুতাকাল্লিম ও দার্শনিকদের ভাবধারা বিচারে তিনি সব সময় নিরপেক্ষ মতামত এবং ন্যায়ানুগ-তার পরিচয় দেন। এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

"গ্রীক দার্শনিকগণ পদার্থ বিদ্যা এবং অংকশাস্ত্রে যেসব অভিমত ব্যক্ত করেন, তা মুতাকাল্লিমদের মতামতের চাইতে অনেকটা প্রকৃষ্ট বলে মনে হয়। কেননা, এসব বিষয়ে মুতাকাল্লিমগণ যে মতামত পোষণ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা জ্ঞানসম্মত নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়, আবার শরীয়ত মাফিকও নয়।"

## পূর্ববর্তী ধর্মবেত্তাগণের মতে ভাল-মন্দ ছিল বুদ্ধিভিত্তিক

অনেক লোক পূর্বেও মনে করতো, আর এখনো মনে করে যে, আশায়েরাবাদীদের আকাইদ বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এ সত্ত্বেও পূর্ববর্তী যুগের প্রধান ধর্মবেত্তাগণ সেগুলোর যথার্থতা স্বীকার করেন এবং সেগুলোকে আপন আকাইদরূপে গ্রহণ করেন। সাধারণ লোকের ধারণা—ইসলামের প্রাথমিক যুগে বুদ্ধিবাদ 'ভাল-মন্দের' তুলাদণ্ড ছিল না। তাই সে যুগের লোকেরা এ ধারণাও পোষণ করতো না যে, শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধানকে অবশ্যই বুদ্ধিবাদের দিক থেকে প্রকৃষ্ট হতে হবে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্

সাধারণ লোকের এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলে গণ্য করেন। তিনি এ ভ্রম প্রতিপাদন করে বলেন, আগেকার সমস্ত ধর্মবেত্তাই বুদ্ধিভিত্তিক ভাল-মন্দের সমর্থক ছিলেন। সর্বপ্রথম এ মতবাদ অস্বীকার করেন ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী। তিনি হলেন এক নতুন মতবাদের প্রবর্তক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেন ঃ

"বুদ্ধিভিত্তিক মঙ্গলামঙ্গলের মতবাদ অস্বীকার করা অন্যতম 'বিদাত' যা ইমাম আবুল হাসান আশয়ারীর সময় ইসলাম ধর্মে সৃষ্টি হয়। মু'তাযিলীদের সাথে অদৃষ্টবাদ নিয়ে বিতর্ক করতে গিয়ে এ মতবাদের প্রবর্তন করেন।"

## বুদ্ধিভিত্তিক ভাল-মন্দের মতবাদ সর্বপ্রথম অস্বীকার করেন ইমাম আবুল হাসান আশ্'য়ারী

মাক্রিযী 'তারিখে মিসির' নামক গ্রন্থে লেখেছেন যে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়াই সর্বপ্রথম ইসলামী আকাইদকে কলুষমুক্ত করে প্রাথমিক যুগের ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ফকীহ্দের বিদ্বেষ এবং ঈর্ষার ফলে এবং কতকটা তাঁর কঠোর উক্তিতেও লোকেরা তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। ফলে তাঁকে বহুকাল কারাগারে অতিবাহিত করতে হয়। লোকসমাজে তাঁর প্রভাবও হ্রাস পায়। তা সত্ত্বেও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ইবনুল কাইয়েম এবং আরো অনেকে তাঁর পথ অনুসরণ করেন। তাঁরা ইলমে কালামে তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম না হলেও তাঁদের জোরালো লেখনীধারা বহু দীর্ঘস্থায়ী বেদাতের ভিত নড়বড়ে করে দেয়।

## শাহ্ ওলী উল্লাহ

ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে রুশদের পর বরং তাঁদের যুগেই মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির চরম অবনতি দেখা দেয়। মনে হচ্ছিল যে, এরপর বোধ হয় আর কোন বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান লোকের আবির্ভাব হবে না। কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাহানে নব দ্যুতি বিকিরণ করা। তাই ইসলামের পতনোন্মুখ মুহূর্তে জন্ম নিলেন শাহ্ ওলী উল্লার ন্যায় এমন একজন মহান ব্যক্তি, যাঁর সুক্ষ্মদর্শিতার সমক্ষে গাযালী, রাযী ও ইবনে রুশদের কৃতিত্বও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

শাহ্ ওলী উল্লাহ হিজরী ১১১৪ সালের ৪ঠা শাওয়াল রোজ বুধবার দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ নির্ণায়ক নাম 'আযিমুদ্দিন'। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মক্তবে ভর্তি হন। সাত বছর বয়সে নামায আরম্ভ করেন। এ বছরই তাঁর সুন্নাত রসম সমাধা করা হয় এবং এ বছরের শেষ ভাগেই তিনি কুরআন শরীফ শেষ করে ফার্সী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। দশ বছরের সময় তিনি 'শরহে মুল্লা' পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। যদিও চলিত প্রথা অনুসারে সেটা বিয়ের উপযুক্ত সময় ছিল না, তথাপি বিশেষ মঙ্গলের নিরিখে তাঁর পিতা এ কাজ সম্পন্ন করতে বাধ্য হন। পনর বছর বয়সে তিনি পিতার হাতে নকশ্‌বন্দিয়া তরীকায় বয়াত করেন। এ বছর তিনি আনুষ্ঠানিক অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এ সময় তাঁর পিতা আবদুর রহীম তাঁকে শিক্ষকতা করার অনুমতি দেন। এ উপলক্ষে বহু লোককে আমন্ত্রণ করা হয় এবং ধুমধামের সাথে খাওয়া দাওয়া করা হয়।

শাহ্ সাহেব পাঠ্যসূচীভুক্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন ঃ
ফিক্‌হ ঃ শরহে ভিকাইয়াহ্, হিদায়াহ্।
ফিক্‌হের মূলনীতি ঃ হুস্‌সামী ও তওযীহ্, তল্‌বীহ।
যুক্তিবিজ্ঞান ঃ কুত্‌বী, শরহে মাতালে।
কালাম ঃ শরহে আকাইদ, শরহে মাওয়াকিফ্।
অধ্যাত্মবাদ ঃ আওয়ারিফ, রাসাইলে নক্‌শ্‌বন্দিয়া, শরহে রুবাইয়াতে মুল্লাজামী, লাওয়াইহ, নক্‌দুন্ নুসুস্।
চিকিৎসা শাস্ত্র ঃ মুয়াজ্‌জায
দর্শন ঃ মাইবুযী ইত্যাদি

বাক্য বিন্যাস ব্যাকরণ ঃ কাফিয়া, শরহে জামী
বাক্যালঙ্কার বিদ্যা ঃ মুতাওওয়াল, মুখ্‌তাসারুল মায়ানী।
জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র ঃ প্রাথমিক গ্রন্থাবলী।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বার বছর জ্ঞানার্জন ও শিক্ষকতায় ব্যাপৃত থাকেন। অতঃপর তিনি মক্কা মদিনায় গমন করেন এবং হিজরী ১১৪৩ সালে হজক্রিয়া সমাপন করেন। তিনি প্রায় দু'বছর তথায় অবস্থান করেন এবং সেখানে শেখ আবু তাহির এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

সেখানকার অন্যান্য ওলামার নিকটও তিনি অনেক কিছু শিক্ষা করেন এবং ১১৪৫ সালের (হিঃ) রজব মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হিজরী ১১৭৬ সালে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

শাহ্ সাহেব প্রত্যক্ষভাবে ইলমে কালাম সম্পর্কে কোন বই পুস্তক রচনা করেন নি। এ জন্যই তাঁকে মুতাকাল্লিমীনের দলে শামিল করা আপাত দৃষ্টিতে সমীচীন বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা' শীর্ষক গ্রন্থটি হলো ইলমে কালামের প্রাণধন স্বরূপ। এতে তিনি শরিয়তের গূঢ় তত্ত্ব এবং রহস্য উদ্ঘাটন করেন।

## ইলমে কালামে শাহ সাহেবের সংযোজন

ইলমে কালামের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম যে ঐশীধর্ম, তা প্রতিষ্ঠিত করা। ধর্ম দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিতঃ আকাইদ (বিশ্বাস) ও আহ্কাম (নির্দেশাবলী)। শাহ সাহেবের যুগ পর্যন্ত কেবল প্রথম বিষয়টি নিয়েই বই পুস্তক রচিত হয়। দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি। সর্বপ্রথম শাহ্ সাহেবই এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগার' ভূমিকায় বলেনঃ "রসূল করীমের উপর কুরআনরূপে যে মুজিযা অবতীর্ণ হয়, তার প্রত্যুত্তর আরব-অনারবদের মধ্যে কেউ দিতে পারেনি; সেইরূপ তিনি যে শরীয়ত (ধর্মীয় বিধি বিধান) প্রাপ্ত হন, তাও ছিল তাঁর জন্য অপর একটি মুজিযা। কারণ এমনি ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত রচনা করা ছিল লোকের সাধ্যাতীত। কুরআন মজীদকে মুজিযারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেভাবে গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে, তেমনি শরীয়তরূপ মুজিযা সম্পর্কেও স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী রচিত হওয়া প্রয়োজন।"

অতঃপর তিনি বলেন :

"বেদাতপন্থীরা ইসলামের অনেক বিধান সম্পর্কে এ অভিযোগ এনেছেন যে, সেগুলো নাকি বুদ্ধিসম্মত নয়। যেমন তাঁরা প্রশ্ন করে থাকেন, যে কবরের শাস্তি, হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত, তুলাদণ্ড ইত্যাদির সাথে বিবেক-বুদ্ধির কি সম্পর্ক রয়েছে? রমযানের শেষদিন রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য, অথচ শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে রোযা

রাখা হারাম—এর কারণ কি? বেহেশ্তের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দোযখের ভীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে শরীয়তে যা বলা হয়েছে, তা হাস্যাস্পদ। মোটকথা, অস্বীকারকারিগণ এ ধরনের অনেক প্রশ্নই খাড়া করে থাকে। সেগুলোর জওয়াব দিতে হলে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, শরীয়তের প্রত্যেকটি বিষয়ই বুদ্ধিসম্মত।"

শাহ্ সাহেব যে দুটি প্রয়োজন তুলে ধরেন, তাই ইলমে কালামের মৌলিক উদ্দেশ্য। এদিক থেকে আমি তাঁর গ্রন্থটিকে ইলমে কালাম বিষয়ক গ্রন্থ বলে মনে করি।

শাহ্ সাহেব 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা'য় ইলমে কালাম সম্পর্কীয় যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

১. মানুষের প্রতি আদেশ-নিষেধের নির্দেশ কেন দেয়া হলো?
২. আল্লাহ্র স্বভাব অপরিবর্তনীয়।
৩. আত্মার গূঢ়তত্ত্ব।
৪. প্রতিদান ও শাস্তির গূঢ়তত্ত্ব।
৫. কিয়ামত সংক্রান্ত ঘটনাবলীর গূঢ়তত্ত্ব।
৬. সদৃশ (ইন্দ্রিয়াতীত) জগৎ (আলমে মিসাল)।
৭. নবুওয়াতের গূঢ়তত্ত্ব।
৮. প্রত্যেক ধর্মের হকিকত এক।
৯. বিভিন্ন শরীয়ত সৃষ্টির কারণ।
১০. এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন ছিল, যা সকল পুরনো ধর্মকে রহিত করে।

**ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ ঃ** এটা শাহ্ সাহেব-দর্শনের অন্যতম প্রাণ-কোষ। তাই তিনি এ বিষয়টি নিয়েই তাঁর আলোচনা আরম্ভ করেন 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগায়'। তিনি বলেন, "অনেক হাদীসে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অস্তিত্ব-জগতের মাঝে এমন একটি জগৎও রয়েছে, যা ভৌতিক নয়। যেসব বস্তু এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অনুভূত হয়, সেগুলো প্রথমে প্রকাশ লাভ করে আলমে-মিসাল অর্থাৎ সদৃশ যে সব বস্তু এ (ইন্দ্রিয়াতীত) জগতে। জগতে কায়া ধারণ করে না, সেগুলোও সেখানে গতিধারণ, উত্তরণ ও অবতরণ করে থাকে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তা দেখতে পায় না।

যেমনঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'সূরায়ে বাকারা' ও 'সূরায়ে আলি ইমরান' কিয়ামতের দিন বৃষ্টির আকারে উপস্থিত হবে।" অন্য একটি হাদীসে আছে, "কিয়ামতের দিন মানুষের কৃতকর্ম রূপ ধারণ করে উপস্থিত হবে। সর্বপ্রথম উপস্থিত হবে নামায, অতঃপর সদকাহ্, অতঃপর রোযা।"

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "কিয়ামতের দিন সব বারগুলো সাধারণরূপে উপস্থিত হবে। কিন্তু শুক্রবার উপস্থিত হবে একটি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে।" অন্য একটি হাদীসে আছেঃ "কিয়ামতের দিন দুনিয়া একজন কুশ্রী বৃদ্ধার রূপ ধারণ করে উপস্থিত হবে।" অন্যত্র রসূল করীম (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদের ঘরের চারদিকে বিপদসমূহকে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতে দেখছি।"

মে'রাজের হাদীসে আছেঃ আমি চারটি নদী দেখছিঃ দুটি প্রকাশ্য, আর দুটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য দুটি ছিলো—নীল ও ফোরাত।

শাহ্ সাহেব এ ধরনের আরো অনেক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং এসব বিষয়কে আলমে-মিসাল অর্থাৎ সদৃশ (ইন্দ্রিয়াতীত) জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এই জগৎকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। হযরত মরিয়ম জিব্রিল (আঃ)-কে দেখেছেন; হযরত জিব্রিল রসূল করীমের নিকট আবির্ভূত হতেন; ফেরেশ্তাগণ কবরে উপস্থিত হন; মৃত্যুকালেও তাঁরা হাযির থাকেন; কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বান্দাদের সাথে কথা বলবেন—এসব বিষয়কে শাহ্ সাহেব সদৃশ (ইন্দ্রিয়াতীত) জগতের অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ এ ধরনের যত বিষয় হাদীসে হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনটি মতামত থাকতে পারেঃ

১. হয়ত বলতে হবে যে, সেগুলো প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত হবে।

এক্ষেত্রে সদৃশ জগতকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, যেমন আমরা মেনে নিয়েছি। মুহাদ্দিসগণ যে নীতি অবলম্বন করেন, তার সারমর্ম এটাই। সুয়ূতি এ অভিমতই পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

২. যদি সদৃশ জগতকে না মানা হয়, তবে বলতে হবে যে, এ বিষয়গুলো লোকের কাছে এভাবেই অনুভূত হয়ে থাকে, যদিও বাস্তবে তা ঘটছে না। কুরআনে একটি আয়াত রয়েছে—"যেদিন

আকাশ প্রকাশ্য ধুয়া নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।" এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বলেন, এক সময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ক্ষুধার দরুন লোকদের কাছে মনে হতো, আকাশ যেন ধূম্রময়। বস্তুত আকাশে কোন ধুঁয়াই ছিল না। ইবনুল মাজিশুনের মতে, কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে আল্লাহ্র উপস্থিতি সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। এর মানে হলো—লোকেরা আল্লাহ্কে এমনিভাবে দেখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ও উপস্থিত হবেন না এবং তাঁর সত্তাতেও কোন পরিবর্তন সূচিত হবে না।

৩. তৃতীয় অভিমত হলো—এ ধরনের হাদীস এবং ঘটনাগুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করা হোক।

এ সব সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদানের পর শাহ্ সাহেব বলেন "যে ব্যক্তি তৃতীয় ব্যাখ্যা সমর্থন করেন, আমি তাঁকে ন্যায়পন্থী বলে মনে করি না।"

শাহ্ সাহেবের মতে, প্রথম ব্যাখ্যাটি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতি মাফিক। প্রথম ব্যাখ্যা দুটি যদি অন্যান্য আলিমদের নিকটও গ্রহণযোগ্য হয়, তবে দর্শন এবং ধর্মের মধ্যে কোন মতভেদই থাকে না।

শাহ্ সাহেবের সময় শেষ যুগীয় আশয়ারীদের লেখা ছাড়া ইলমে কালামের আর কোন রচনাই বিদ্যমান ছিল না। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা আশয়ারী পদ্ধতিতে হয়ে থাকলেও তা তাঁর মৌলিক চিন্তাধর্মী মন-মেযাজের উপর মোটেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিনি নতুন পদ্ধতি অনুসারে ইলমে কালামের বিষয়বস্তুর পুনঃবিন্যাস করেন। তিনি আশয়ারীদের প্রায় সকল প্রধান বিষয়ের বিরুদ্ধে মত পোষণ করতেন। ইলমে কালামে তাঁর যে সব গুরুত্বপূর্ণ ইজতেহাদ এবং মৌলিক চিন্তাধারা রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটা এখানে পেশ করা হচ্ছে ঃ

ইলমে কালামের সবচাইতে বড় ত্রুটি ছিল এই যে, কুরআন মজীদ সম্পর্কে বিরোধীদের যে সব সন্দেহ ছিল, সেগুলো নিরসন করার চেষ্টা খুব কমই করা হতো। 'শরহে মাওয়াকিফ' ও অন্যান্য গ্রন্থে কুরআন মজীদের রচনাশৈলী সম্বন্ধীয় অভিযোগসমূহের প্রত্যুত্তর দেয়া হলেও তাতে তেমন ফায়দা হয়নি। কারণ রচনাশৈলীর চাইতে ভাবের দিক থেকেই বিরোধীদের অভিযোগ ছিল বেশী।

তফসির-গ্রন্থসমূহে অবশ্য বেশীর ভাগ অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে এবং সেগুলোর উত্তরও দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সন্তোষজনক নয়। শাহ্ সাহেব সুচারুরূপে বিরোধীদের এসব অভিযোগ খণ্ডন করেন। তন্মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল এই যে, কুরআনেএক একটি কথা দশবার বিশবার করে বর্ণনা করা হয়েছে।

## কুরআন মজীদে কোন কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তির গূঢ়তত্ত্ব

কুরআনে কোন কোন বিষয়কে কেন পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হলো—এ প্রশ্নের উত্তরে তফসির বেত্তাগণ বলেন, এতে কুরআনের বলিষ্ঠ রচনাশৈলী দেখানোই ছিল আল্লাহ্র উদ্দেশ্য। কারণ, একটি ভাবকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বারবার বর্ণনা করা—এটা হলো কুরআনের রচনা-কৌশলের সর্বোৎকৃষ্টতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এসব উত্তর ছিল সম্পূর্ণ বৃথা। কেননা, একটি বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পুনঃপুনঃ প্রকাশ করা আবুল ফযল বা যুহুরীর ন্যায় কোন কোন মানুষের জন্য কৃতিত্ব হতে পারে, কিন্ত তা মহামহিম আল্লাহ্র মহত্ত্ব মোটেই বৃদ্ধি করতে পারে না।

শাহ্ সাহেব কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তির কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, কুরআন মজীদে বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি কেন করা হলো? প্রত্যেক বিষয়কে একবার উল্লেখ করে ক্ষান্ত করা হলো না কেন? উত্তরে বলবো, এতে শ্রোতৃবর্গের জন্য দু'টি ফায়দা রয়েছে। প্রথমত এতে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয় এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বিষয়টি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত এতে বিষয়টির প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য ব্যক্তির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং সে তার পূর্ণ স্বাদ আস্বাদনে সমর্থ হয়। একটি উৎকৃষ্ট কবিতার পুনরাবৃত্তি করে যেমন স্বাদ গ্রহণ করা যায়, তেমনি কুরআনের বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তিতেও নব নব আস্বাদন মেলে।

## কুরআন মজীদের বিষয়বস্তুর এলোমেলো হবার কারণ

কুরআন সম্পর্কে এ যুগের একটি বড় অভিযোগ হলো এই যে, এর বিষয়বস্তুসমূহকে কালের ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি।

একটি বিষয় শেষ হতে না হতেই অপর একটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়। উত্তরাধিকারের বর্ণনা সমাপ্ত না হতেই আসরের নামাযের আলোচনা আরম্ভ হয়। কুরআনের একটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে তার শত স্থান বিচরণ করতে হয়।

পূর্ববর্তী ইমামদের কেউ এ অভিযোগের উত্তর দেন নি। তাঁরা এমন একটি প্রশ্ন এড়িয়ে যান, যাকে আজকাল একটি জটিল বিষয় বলে অভিহিত করা হয়। কারলায়েল রসূল করীম সম্পর্কে খুবই ভাল ধারণা পোষণ করতেন। তিনি ইসলামের প্রত্যেকটি বস্তুকে ভাল চক্ষে দেখতেন। তিনিও কুরআনের এলোপাতাড়ি বিষয় দেখে নিরুত্তর হয়ে পড়েন। তিনি এর কোন কারণ দর্শাতে পারেন নি।

শাহ্ সাহেব খুব সুন্দরভাবে এ অভিযোগটি খণ্ডন করেন। তিনি বলেনঃ যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, কুরআনের বিভিন্ন সূরায় তার বিষয়বস্তুসমূহকে কালক্রমানুসারে না সাজিয়ে এলেমেলো-ভাবে বর্ণনা করা হলো কেন? উত্তরে বলবো, অবশ্য সবকিছুই করা আল্লাহ্‌র পক্ষে সম্ভব। তবে এ কাজের মধ্যে তাঁর একটি হেকমত এবং কৌশল নিশ্চয়ই নিহিত রয়েছে। তা হলো এই যে, যাদের উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের ভাষা এবং বর্ণনা পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআনের বিষয়াদিকে সাজানো হয়েছে।

কালের ক্রমানুসারে সাজাবার যে পদ্ধতি বর্তমানকালের গ্রন্থকারগণ আবিষ্কার করেছেন, তা আরবদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। যদি এটা বিশ্বাস না করেন, তবে প্রাক-ইসলাম যুগে জন্ম নেওয়া মুসলিম কবিদের কসীদা আলোচনা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত কুরআনে যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে লক্ষ্য-ব্যক্তির সামনে বিষয় বস্তুর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরাই হলো মূল উদ্দেশ্য।

শাহ্ সাহেবের এ বর্ণনার সারমর্ম হলো এই যে, কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে আরবদের ভাষায়। তাঁরাই ছিলেন এর প্রাথমিক লক্ষ্য ব্যক্তি। এজন্য কুরআন শরীফে তাঁদের রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজনও ছিল। প্রাচীন আরবদের যত গদ্য ও পদ্য রচনা রয়েছে, তাতে এ পদ্ধতির পুরোপুরি স্বাক্ষর মেলে। সেগুলোতে একাধারে বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেখা যায় না। বরং একটি

বিষয় আরম্ভ করা হয় এবং তা শেষ না হতেই অন্য একটি বস্তুর অবতারণা করা হয়। আবার প্রথম বিষয়টি টেনে আনা হয়। কিন্তু তাতেও স্থিরতা বজায় থাকে না। আচমকা অন্য একটি বিষয়ের দিকে কলম চালনা করা হয়। কুরআনেও এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত কুরআন মজীদের সবচাইতে বড় উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আল্লার প্রতি ধাবিত করা, তার আনুগত্য ও ইবাদতের বিষয়-বস্তুকে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করে লক্ষ্য-ব্যক্তির মনে একটি বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করা। কুরআনের বিষয়বস্তুসমূহকে ক্রমানুসারে সাজানো হলে এরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না।

## কুরআন মজীদের বাক্য-বিন্যাস পদ্ধতি ব্যাকরণ বিরোধী হবার কারণঃ

কুরআন মজীদ সম্পর্কে একটি বড় অভিযোগ ছিল এই যে, এর অনেক জায়গাই আপাতদৃষ্টিতে বাক্য বিন্যাস-ব্যাকরণ বিরোধী। এসব স্থলে তফসির বেত্তাগণ অদ্ভূত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, কুরআন মজীদকে প্রচলিত ব্যাকরণ মোতাবেক করে দেখানো। শাহ্ সাহেব এ সমস্যার সমাধান করে বলেনঃ

বিনীতের কাছে এ বিষয়ের সুরাহা হলো এই যে, কুরআনের অনেক জায়গা চলতি ব্যাকরণের পরিপন্থী, আবার অনেক জায়গা ভাব মোতাবেক। প্রাচীন আরবদের ভাষা এবং পরিভাষায় অনেক কিছুই ছিল চলতি ব্যাকরণের পরিপন্থী। কুরআন অবতীর্ণ হয় আরবদের ভাষায়। তাই যদি কোথাও কোথাও 'ওয়াও' বর্ণের স্থলে 'ইয়া' ব্যবহৃত হয়, অথবা দ্বিবচনের স্থলে এক বচন প্রয়োগ করা হয়, অথবা পুংলিঙ্গের স্থলে স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তবে বিচিত্র কিছুই নয়।

প্রাচীন ধর্মবেত্তাগণ কুরআন মজীদের সবচাইতে বড় যে মাহাত্ম্যটি এড়িয়ে গেছেন, শাহ্ সাহেব তা তুলে ধরেন। বিষয়টি হলো এই যে, সকলেই কুরআনকে শব্দালঙ্কার ও বাক্যালঙ্কারের দিক থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে প্রচার করেন। কিন্তু কেউ এ কথা ভাবেন নি যে, কুরআনের সব চাইতে বড় মোজেযা হলো—তাতে আত্মশুদ্ধি, তওহীদ, রিসালত এবং পরকালের যে গূঢ়তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, তা সমস্ত মানবিক শক্তির উর্ধ্বে।

# মুসলিম দার্শনিক

## ( হুকামা-এ-ইসলাম )

আপাতদৃষ্টিতে মুতাকাল্লিমদের আলোচনায় মুসলিম হুকামাতে (মুসলিম দার্শনিককে) অন্তর্ভুক্ত করা অযাচিত বলেই মনে হয়। কেননা, সাধারণত 'মুতাকাল্লিমীন' এবং 'হুকামা' বলতে দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়কেই বুঝায়। মূলত ব্যাপারটি তা নয়। দেখা যায়, একই ব্যক্তি দার্শনিকও বটে, আবার মুতাকাল্লিমও বটে। তবুও 'হুকামা' নামে আখ্যায়িত দলকে 'মুতাকাল্লিমীন' সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অপর একটি স্বতন্ত্র দলরূপে অভিহিত করা যায়। কিন্তু 'হুকামা' শব্দটির সাথে যদি 'ইসলাম' শব্দটি জুড়ে দেয়া যায়, তবে এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপরীত্য থাকে না। ইমাম গাযালী এবং ইবনে রুশদ 'হুকামায়ে ইসলাম' অর্থাৎ মুসলিম দার্শনিকরূপে আখ্যায়িত। কিন্তু এঁরাই আবার ইলমে কালামের শিরোমণিরূপে পরিগণিত।

## মুসলিম দার্শনিক

দুঃখের বিষয়, আমাদের ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ 'মুসলিম দার্শনিক' শীর্ষক কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন নি, যাতে তাঁদের নামধাম এ সংক্রান্ত এবং তথ্য কেন্দ্রীভূতভাবে পাওয়া যেতে পারে। এতে সন্দেহ নেই যে, ইসলামী বিশ্বে মুসলিম দার্শনিক নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' নামক গ্রন্থে অনেক স্থানে 'হুকামা-এ-ইসলাম' নামক সম্প্রদায়ের অনেক মতামতের উদ্ধৃতি দেন। যেমন, এক স্থানে তিনি বলেন, 'হুকামা-এ-ইসলাম' অমুক আয়াত দিয়ে প্রমাণ করেন। অন্য স্থানে তিনি বলেন, দ্বিতীয় অভিমতটি হলো 'হুকামা-এ-ইসলামের'। তিনি প্রায় স্থানে 'হুকামা' শব্দটি ব্যবহার করেন, আর এতে অর্থ করেন 'হুকামা-এ-ইসলাম'। কেননা, তিনি যেসব অভিমতের কথা উল্লেখ

করেন, সেগুলো কুরআন মজীদ সম্পর্কীয়। বলা বাহুল্য, কুরআম সম্পর্কীয় মতামত গ্রীক হুকামার ভাষ্য মোটেই হতে পারে না।

ইমান রাযী 'তফসীর-এ-কবীর' নামক গ্রন্থে মুসলিম দার্শনিকদের যে সব মতামত উদ্ধৃত করেন, সেগুলো খতিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, এ সম্প্রদায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দর্শন এবং শরীয়তের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। সূরায়ে আনয়ামের ব্যাখ্যায় যেখানে তিনি কিয়ামতের হিসাব কিতাবের গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, সেখানে মুসলিম দার্শনিকদের অভিমত উদ্ধৃত করে সর্বশেষে বলেন, "এ মতামতগুলোর উদ্দেশ্য হলো নবুওয়াতের বিধান এবং দর্শনের বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা।" এ ধরনের কথা তিনি আরো অনেক স্থানে পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন।

## ইয়াকুব কিন্দী

ইয়াকুব কিন্দী ছিলেন মুসলিম দার্শনিকদের পুরোধা। খুব সম্ভব তিনিই সর্বপ্রথম দর্শন বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন। তিনি ছিলেন মামুনুর রশিদের সমসাময়িক। তাঁর রচনাবলী বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এজন্য তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা সম্ভব নয়। এরপর আবুনসর ফারাবী (মৃত্যু ঃ ৩৩৯ হিঃ) জোরালো প্রবন্ধসমূহ লিখে শরীয়ত এবং দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেন। সেগুলোর সারমর্ম হলো এই ঃ

## ফারাবী

১. মানুষ দুটি বস্তুর সমষ্টি ঃ আত্মা এবং শরীর। আত্মার কোন রং-রূপ নেই, দিকও নেই এবং তা ইঙ্গিতযোগ্যও নয়। অবশ্য, শরীর এসব গুণে গুণান্বিত হতে পারে। শরীয়তের পরিভাষায় আধ্যাত্মিক এবং জড়-জাগতিক বিষয় যথাক্রমে 'আদেশ' (আম্‌র) এবং 'সৃষ্টি' (খাল্‌ক্‌) রূপে অভিহিত। কুরআন মজীদের আয়াত এ মর্মেই সাক্ষ্য বহন করছে। আল্লাহ্‌ বললেন, "মনে রেখো! সৃষ্টি এবং আদেশ তাঁরই (আল্লাহর) কর্তৃত্বাধীন।" ইমাম গাযালীও 'সৃষ্টি' এবং 'আদেশের' এই ব্যাখ্যা দেন।

## ইসলামী আকাইদের ব্যাখ্যায় ফারাবী

২. যে ব্যক্তির আত্মা পরিশোধিত ও পরিমার্জিত, তিনিই নবুওয়াত-প্রাপ্ত হন। সাধারণ আত্মা যেমন পার্থিব জগতের

উপর কর্তৃত্ব করে, তেমনি পরিশোধিত আত্মা কর্তৃত্ব করে স্বর্গীয় জগতের উপর।

## নবুওয়্যাত

এ কারণেই নবীদের হাতে অতি-প্রাকৃতিক মুজিযার উদ্ভব হয়। 'লওহে মাহফূয' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্ঞানরাজ্যে যা কিছু আছে, তা প্রতিবিম্বিত হয় পরিশোধিত আত্মায়।

৩. মামূলী আত্মার ব্যাপার হলো এই যে, যখন তা বাতিনের (অভ্যন্তরীণ দিকের) প্রতি লক্ষ্য করে, তখন যাহিরের (বাহ্যিক) দিকটা তার সামনে থেকে দূরে সরে যায়। আবার যখন তা যাহিরের দিকটির প্রতি লক্ষ্য করে, তখন বাতিনের দিকটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ঐশী ক্ষমতাপ্রাপ্ত আত্মার বেলায় তা হয় না। তাকে কোন বস্তুই কোন বস্তু থেকে বিরত রাখতে পারে না।

## ফেরেশতা

৪. ফেরেশতা একটি আকৃতি, যা সবর্তমান এবং যা উপলব্ধি করা যায়। এর প্রকৃত অস্তিত্ব অনুভব করা আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কেবল ঐশিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকেরাই এই অনুভূতি লাভ করে থাকে। এ সত্যটি উপলব্ধি করার সময় পরিশোধিত ও উন্নত আত্মার অধিকারী লোকের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞান স্বর্গীয় ক্ষমতার পানে ঝুঁকে পড়ে। তখন সে ফেরেশতাদের সশরীরে দেখতে পায় এবং তাঁদের আওয়াজও শুনতে পায়। এ আওয়াজই হলো ওহী।

## ওহী

প্রকৃত ওহী বলতে বুঝায় আত্মার সাথে ফেরেশতার একাত্মতা। ফেরেশতার মনের ভাব আত্মার উপর এমনিভাবে ছায়াপাত করে, যেমন পানির ভেতর প্রতিবিম্বিত হয় সূর্যের কিরণ। এই একাত্মতার অবস্থায় পরিশোধিত আত্মার অধিকারী লোক ফেরেশতার প্রতিচ্ছবি এবং আওয়াজ অনুভব করে। এমতাবস্থায় তার যাহির ও বাতিন (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) উভয় দিকের উপর চাপ পড়ে। ফলে তার মধ্যে অচৈতন্যের ভাব দেখা দেয়।

## লওহ্‌-ও-কলম

লওহ্‌–ও-কলম বলতে দেহধারী বিশেষ কোন হাতিয়ারকে বুঝায় না ; এতে বুঝায় আধ্যাত্মিক জগতের ফেরেশতারাজি। 'লিখন' বলতে বুঝায় বাস্তবে যা ঘটে, তার ছবি অঙ্কন। কলম, 'আদেশ-জগত' (আলম-এ-আমরা) থেকে ভাব গ্রহণ করে এবং সেভাব আধ্যাত্মিক লিখনের সাহায্যে লওহের উপর অঙ্কিত হয়। লওহ এবং কলমের যুগ্ম ক্রিয়ায় যে অভিব্যক্তি ঘটে, তাকেই বলা হয় আল্লাহ্‌র বিধিবিধান বা তকদীর।

আল্লাহর সত্তা উপলব্ধি করার মানে হলো—অনুগত ও তুষ্ট আত্মার পূর্ণতা লাভ। এটাই আত্মার চরম তৃপ্তি ('নুসূসে ফারাবী' থেকে গৃহীত)।

ফারাবীর পর বু-আলী সীনা বিষয়টিকে আরো ফলাও করে বর্ণনা করেন। তিনি দার্শনিক মনোবৃত্তি নিয়ে কুরআনের কোন কোন সূরার তফসীর রচনা করেন। 'শিফা' এবং 'ইশারাত' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তিনি নবুওয়াত, পরকাল, মন্দের সৃষ্টি, দোয়ার প্রতিফলন, ইবাদতের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে উৎকৃষ্ট অধ্যায়সমূহ সংযোজিত করেন এবং সেগুলো যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।

## বু-আলী সীনা

এখানে এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম গাযালীর ধারণায়, বু-আলী সীনা পরকালীন দৈহিক পুনরুত্থান অস্বীকার করেন। তাই তিনি বু-আলীকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। বস্তুত ব্যাপারটি তা নয়। তিনি পরিষ্কার ভাষায় দৈহিক পুনরুত্থান স্বীকার করেন। তিনি 'শিফা' নামক গ্রন্থে দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তত্ত্বের অধ্যায়ে বলেন :

"আমাদের নবী আমাদের শিরোমণি, আমাদের অধিনায়ক যে সত্য শরীয়ত নিয়ে আবির্ভূত হন, তা দৈহিক শাস্তি ও প্রতিদানের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে।"

## অলৌকিক ঘটনা

মুজিযা এবং অলৌকিক ঘটনাবলী ছিল শরীয়তের এক বিরাট সমস্যা। বু-আলী সীনা এ সমস্যাটি সমাধান করেন। মুজিযা সম্পর্কে

গ্রীক দার্শনিকগণ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নি। তাঁরা এটা স্বীকারও করেন নি, আবার অস্বীকারও করেন নি। আল্লামা ইবনে রুশদ 'তাহাফাতুত্ তাহাফা' নামক গ্রন্থে বলেন, পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ মুজিযা সম্পর্কে কোন অভিমত ব্যক্ত করেন নি। প্রাচীন পদার্থবিদেরা, যাঁরা আজকাল জড়বাদী বা প্রকৃতিবাদী বলে অভিহিত, তাঁরা অলৌকিক ঘটনাবলীতে মোটেই বিশ্বাস করতেন না। ধর্মাবলম্বীরা অলৌকিক ঘটনাবলীতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এর সমর্থনে কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিতে সক্ষম ছিলেন না। এজন্য তাঁদের বিশ্বাস অন্ধ অনুকরণ বলে বিবেচিত হয়। বু-আলী সীনাই সর্বপ্রথম দর্শন-নীতির আলোকে অলৌকিক ঘটনাবলীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লামা ইবনে রুশদ 'তাহাফা' নামক গ্রন্থে বলেন, "আমি যতটুকু জানি, ইমাম গাযালী অলৌকিক ঘটনাবলী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দার্শনিকদের যে চিন্তাধারার উদ্ধৃতি দেন, তা ইবনে সীনা ছাড়া অন্য কোন দার্শনিকের মতবাদ নয়।"

বু-আলী সীনা 'ইশারাত' নামক গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তিনি যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দিয়ে বলেন, একজন 'কামিল' অর্থাৎ শরীয়তের দিক থেকে নিষ্কলঙ্ক আদর্শবান ব্যক্তির পক্ষে এটা সম্ভব যে, তিনি ইচ্ছা করলে খাওয়া দাওয়া না করেও বেশ কিছুকাল জীবিত থাকতে পারেন; গায়েবী খবর দিতে পারেন; দোয়ার সাহায্যে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারেন; অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পারেন; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুও দেখতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বু-আলী সীনা এসব কি করে প্রমাণ করলেন, তা গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে বর্ণনা করা হবে।

## ইবনে মিসকাওয়াইহ

আহমদ ইবনে মিস্‌কাওয়াইহ্ এ যুগেই পয়দা হন। ৪২১ হিজরী সালে তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। তিনি দর্শন এবং শরীয়তের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দর্শনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক দর্শনে ফারাবী এবং ইবনে রুশ্‌দ ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁর

রচনাবলীর মধ্যে 'তাহ্যীবুল আখলাক' মিসর ও ভারতে প্রকাশিত হয় এবং 'তাজারিবুল উমাম' মুদ্রিত হয় ইউরোপে। শেষোক্ত গ্রন্থটি একটি যুগ সৃষ্টিকারী রচনা।

## ইবনে মিস্কাওয়াইহ্-এর রচনাবলী

দর্শন এবং শরীয়তের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি 'আল্-ফওযুল আসগর' এবং 'আলফওযুল্ আকবর' নামক দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথমটি বৈরুতে প্রকাশিত হয়। আমি তা পাঠ করেছি। এতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে (১) আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং তাঁর গুণাবলী। (২) আত্মার গূঢ় তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য। (৩) নবুওয়াত। ইবনে সীনার বর্ণনা পদ্ধতি তত মার্জিত নয়, কিন্তু ইবনে মিসকাওয়াইহের বর্ণনা পদ্ধতি খুব পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

## ইবনে মিসকাওয়াইহ্ রচিত 'আল-ফওযুল-আসগর

এ গ্রন্থটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে খুবই ব্যাপক। কিন্তু বর্ণনার পদ্ধতির দিক থেকে সংক্ষিপ্ত। এতে আলোচ্য বিষয়বহির্ভূত কিছুই নেই। এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করছি ঃ

## আল্লাহ্র অস্তিত্বের উপলব্ধি মুশকিল কেন ?

আল্লাহ্র অস্তিত্ব—এ বিষয়টি সহজ থেকেও সহজ ; আবার কঠিন থেকেও কঠিন। এর উদাহরণ হলো—সূর্য খুবই উজ্জ্বল। কিন্তু এই ঔজ্জ্বল্যের দরুনই তাতে কোন চোখ তিষ্ঠিতে পারে না এবং বাদুড়ও তাকে দেখতে পায় না। আল্লাহ্র হকিকতের সাথে মনুষ্য-জ্ঞানের অনুরূপ সম্পর্ক।

মানুষের উপলব্ধি আরম্ভ হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে। সে কোন বস্তু অনুভব করে ত্বক, নাক, কান, জিহ্বা ও চোখ দিয়ে। যতক্ষণ কোন জড় বস্তু তার সামনে থাকে, ততক্ষণ সে ইন্দ্রিয়জ্ঞান দিয়ে তা উপলব্ধি করে। কিন্তু তার এ উপলব্ধি ক্রমান্বয়ে এত উন্নতি লাভ করে যে, সেই বস্তুর আকৃতি তার কল্পজগতেও অংকিত হয়। এটা হলো জড় জগত থেকে চিন্তা জগতে প্রবেশ করার প্রথম

মঞ্জিল। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ যে খণ্ড জ্ঞান হাসিল করে, তার মধ্য দিয়েই সে অখণ্ড জ্ঞান অর্জন করে। অখণ্ড জ্ঞানের সাথে অবশ্য জড় পদার্থের কোন সংযোগ নেই, কিন্তু তা ইন্দ্রিয়অর্জিত খণ্ডজ্ঞান থেকে উদ্ভূত বলে তাকেও জড় প্রভাব মুক্ত বলা চলে না।

'মানুষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করে—এটা আজন্ম ব্যাপার। সুতরাং যে বস্তু জড় নয় এবং যার সাথে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই, তা উপলব্ধি করা স্বভাবতই কঠিন। এ কারণেই মানুষের পক্ষে আল্লাহকে উপলব্ধি করা মুশকিল। আল্লাহ্ অজড়। তাঁর সাথে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। চিন্তাবাদীরা (আরবাব-এ-নযর) ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করছেন এবং এমন সব বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করার প্রয়াস পাচ্ছেন, যেগুলো অজড়। যেমন অখণ্ড জ্ঞান, বিবেক ও আত্মা—এ ধরনের চিন্তামূলক বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হলে দীর্ঘ সাধনার পর একটি অজড় বস্তুকেও উপলব্ধি করা সম্ভব হয়ে উঠে এবং তা উন্নতি লাভ করে প্রত্যয়ের আকার ধারণ করে।

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, ব্যষ্টিতে সব সময় পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই ব্যষ্টিগত জ্ঞানেরও পরিবর্তন না হয়ে পারে না। ধরুন, এক ব্যক্তি আমাদের সামনেই উপবিষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটছে, তা আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না। কিন্তু সর্বক্ষণই তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষয় সাধিত সাধিত হচ্ছে এবং তদস্থলে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। এটাকেই বলা হয় স্থলাভিষিক্তকরণ। এইজন্যই ব্যষ্টিগত জ্ঞান পূর্ণ ও স্থায়ী হয় না। কারণ, তা ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। পক্ষান্তরে, অখণ্ড ও বিশ্বজনীন জ্ঞান অপরিবর্তনীয়। বিশেষ বিশেষ মানুষ যেমন যায়েদ, বকর বা হামিদের অবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় মানব জাতির হকিকতে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। এমনিভাবে জ্ঞান যতই জড়—প্রভাবমুক্ত হয়, ততই তা পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে চলে যায় এবং সেই জ্ঞান অপরিবর্তনীয় হয়। এইজন্যই সামগ্রিক জ্ঞান, আঙ্গিক জ্ঞান থেকে অনেক বেশী স্থায়ী ও উত্তম।

উপরিউক্ত ভূমিকা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করা মানুষের ক্ষমতাধীন হলেও তা সাধারণ

মানুষের জন্য সম্ভব নয়। কেবলমাত্র সেসব লোকেরাই আল্লাহ্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম, যারা ইন্দ্রিয় জগতের ঊর্ধ্বে উঠে কল্পনার পাখায় ভর করে অজড় বস্তু সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে। এদের ঐশিক বস্তু উপলব্ধি করার জন্য জড় উপাদান বা ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নেই।

## আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ

এটা সবারই জানা কথা, বস্তু মাত্রই গতিশীল। গতি বলতে আমি কেবল স্থানের পরিবর্তন বুঝি না; যে কোন পরিবর্তনকেই গতিরূপে অভিহিত করি। যেমন শরীর—এটা বাড়ে, কমে, আবার একই অবস্থায়ও থাকে। প্রথমোক্ত দুই অবস্থায় স্পষ্টতই পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। তৃতীয় অবস্থাটিও মূলত পরিবর্তনশূন্য নয়। কারণ সর্বদাই শরীরের পুরনো অঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তদস্থলে নতুন অঙ্গ স্থানলাভ করে। এটা হলো আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের প্রথম ভূমিকা।

দ্বিতীয় ভূমিকা হলো—গতিশীল বস্তুর মধ্যে যে গতি আছে, তার একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই রয়েছে। যদি না থাকে, তবে এটা প্রমাণিত হবে যে, বস্তু নিজেই আপন গতির স্রষ্টা। কিন্তু এটা সত্য নয়; কেননা, আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ গতিশীল এবং এ গতি তার স্বেচ্ছাধীনও বটে। কিন্তু এ গতিকে যদি তার সত্তাগত সৃষ্টি বলা হয়, তবে এটাই প্রমাণিত হবে যে, মানুষের হাত-পা কেটে ফেলা হলেও তার মূল অঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন অঙ্গ—উভয়ের মধ্যেই গতি বিদ্যমান থাকবে। অথচ মূল অঙ্গ বা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ—কোনটাতেই গতি বহাল থাকে না।—

'গতিশীল বস্তুর মধ্যে যে গতি আছে, তার একজন স্রষ্টা অবশ্যই রয়েছে'—এ নীতির উপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা এমন একটি সত্তা, যা গতিবিহীন। কেননা, তা-ও যদি গতিশীল হয়, তবে তার গতির জন্য অপর একজন স্রষ্টার প্রয়োজন হবে। আবার সেই স্রষ্টার জন্য আরো এক-জন স্রষ্টার আবশ্যক হবে। এমনিভাবে এমন এক পর্যায়ের দিকে ব্যাপারটি গড়িয়ে যাবে, যার অন্ত নেই। এরূপ অন্তহীনতা অবান্তর।

সুতরাং যে সত্তা স্বয়ং গতিশীল নয়, কিন্তু সমস্ত গতির সৃষ্টি করে এবং যা অনন্ত গতিশীল বস্তুর উৎসমূল, সে-ই-আল্লাহ্।

ইবনে মিস্‌কাওয়াইহের এ যুক্তি মূলত অ্যারিস্টটল থেকে গৃহীত। বরং সত্যিকার বলতে গেলে অ্যারিস্টটল হুবহু এ যুক্তিই পেশ করেছিলেন। তিনি বলতেন—'বিশ্ব চিরন্তন। কিন্তু এর গতি সৃষ্ট ও নশ্বর। আল্লাহ্ই এ গতির স্রষ্টা।' তাঁর এই অভিমত হুবহু ওঁদেরই ন্যায়, যাঁরা বলেন, মৌল উপাদান চিরন্তন। কিন্তু তার বিভিন্ন আকারে যে রূপান্তর ঘটে, তা হলো নশ্বর। এ রূপান্তর সাধন করা আল্লাহ্রই কাজ।

## ইবনে মিসকাওয়াইহের যুক্তির প্রতিবাদ

ইবনে মিসকাওয়াইহের এ যুক্তি যথাযথ নয়। কেননা, বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, বস্তুর মধ্যে যে গতি রয়েছে, তা হলো আঙ্গিক এবং বস্তুর বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজনেরই ফল। ইবনে মিসকাওয়াইহের এ দাবী—'গতিশীলতা যদি বস্তুর প্রকৃতিগত ব্যাপার হতো, তবে তার বিভিন্ন অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার পরেও সেই গতি অক্ষুণ্ণ থাকতো'—নিরর্থক। কারণ, বস্তুর প্রকৃতি হলো তার বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজনেরই নামান্তর। তাই তার কোন একটি অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করা হলে সাবেক সংযোজনই বিদ্যমান থাকে না। তাই সেই গতিও অব্যাহত থাকতে পারে না। বস্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করলে তার গতিও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই মুতাকাল্লিমগণ আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণে অন্য যুক্তি পেশ করেন। সেগুলো দুর্বল হলেও অন্তত অ্যারিস্টটলের যুক্তির চাইতে অনেকটা দৃঢ়।

এই যুক্তি প্রদর্শনের পর ইবনে মিসকাওয়াইহ্ আল্লাহ্র গুণাবলী প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ একক, চিরন্তন ও অজড়। ইবনে মিস্‌কাওয়াইহ্ আল্লাহ্র গতিহীনতার উপর ভিত্তি করেই এসব গুণাবলী প্রমাণ করেন। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে ঃ

## আল্লাহ্র এককত্ব

আল্লাহ্ যদি একাধিক হয়, তবে তাদের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে, যার উপর ভিত্তি করে সবাইকে আল্লাহ্র রূপে

আখ্যায়িত করা যায়। পক্ষান্তরে, তাদের মধ্যে এমন একটি অসামঞ্জস্যমূলক অঙ্গও থাকতে হবে, যাতে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। এমতাবস্থায় আঙ্গিক সংযোজনের প্রশ্ন দাঁড়ায়। আবার সংযোজনের ফলে সৃষ্টি হয় গতি। অথচ এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সত্তার কোন গতি নেই।

## চিরন্তনতা

যে বস্তু চিরন্তন নয়, তা গতিশীল। কারণ, অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে উত্তীর্ণ হওয়াও এক প্রকার গতি। অথচ এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন গতি নেই।

## অশরীরিত্ব

আল্লাহ্ যদি শরীরী হতেন, তবে নিশ্চয়ই গতিশীল হতেন। শরীরী বস্তুর গতিশীলতা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। আর এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ গতিশীল নন।

## বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে বিশ্বজগতের সৃষ্টি

আল্লাহ অবশ্য সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি তার প্রত্যক্ষ স্রষ্টা নন। কারণ প্রত্যক্ষভাবে এক বস্তু থেকে একাধিক বস্তু সৃষ্টি হতে পারে না। কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেই তা সম্ভব ঃ

১. যে বস্তু বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন, মানুষ বিভিন্ন উপাদান এবং বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। তাই তার বিভিন্ন শক্তিতে বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২. হাতিয়ার বিভিন্ন ধরনের হবে। যেমন একজন মিস্ত্রী, বিভিন্ন হাতিয়ার দিয়ে বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

৩. উপাদানের বিভিন্নতার ফলে ফলাফলও বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন আগুনের কাজ হলো পুড়িয়ে ফেলা। লোহা এতে গলে যায়, কিন্তু মাটি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আগুনের ক্রিয়া উভয়স্থানে একই থাকে। কিন্তু রূপ পরিগ্রহকারী উপাদান অর্থাৎ লোহা এবং মাটির প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় তাদের মধ্যে আগুনের প্রতি ক্রিয়াও বিভিন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহ্‌র সত্তায় উপরিউক্ত তিনটি কারণের কোনটাই দৃষ্ট হয় না। আল্লাহ্ বিভিন্ন উপাদান ও শক্তির যৌগিক হতে পারেন না—

এটা একটা সুস্পষ্ট কথা। দ্বিতীয় বিকল্পটিও বাতিল। কারণ পরম সত্তার যদি বিভিন্ন হাতিয়ার থাকে, তবে তাদের স্রষ্টাই বা কে? যদি অন্য কেউ সেগুলো সৃষ্টি করে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র একাধিক্য প্রমাণিত হয়। যদি আল্লাহ্ নিজেই তাদের সৃষ্টিকর্তা হন, তবে সেগুলো সৃষ্টি করতে অপরাপর হাতিয়ারের প্রয়োজন হবে। আবার সেই অপরাপর হাতিয়ার সৃষ্টির জন্য কতগুলো হাতিয়ারের প্রয়োজন দেখা দেবে। এমতাবস্থায় অন্তহীন হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে হবে। অথচ কোন বস্তুর অন্তহীনতা অবান্তর।

এখন বাকী থাকে তৃতীয় বিকল্প। এতেও এ প্রশ্ন জাগে যে, এসব মৌল উপাদান সৃষ্টি করলো কে? আল্লাহ্ স্বয়ং তো বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করতেই পারেন না। যদি অন্য কেউ সৃষ্টি করে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র একাধিক্য প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু উপরিউক্ত কোন বিকল্পই আল্লাহ্‌র সত্তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই একমাত্র পন্থা হলো—আল্লাহ্ স্বয়ং একটিমাত্র বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা সৃষ্টি করেছে অপর একটি বস্তু এবং এমনিভাবে একটি থেকে অপরটি উৎপন্ন হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র বিশ্ব। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো এই যে, আল্লাহ্ সর্বাগ্রে আদি জ্ঞান (আক্‌ল-এ-আওয়াল) সৃষ্টি করেছেন এবং তা সৃষ্টি করেছে আত্মা। আবার আত্মা সৃষ্টি করেছে আকাশ এবং আকাশ সৃষ্টি করেছে সমগ্র জগত।

আল্লামা ইবনে মিস্‌কাওয়াইহ্ এ বর্ণনার পর বলেন, অ্যারিস্টটলই সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেনঃ আমি এসব বিবরণ ফারফুরিউস থেকে উদ্ধৃত করছি।

## আল্লাহ্ অনস্তিত্ব থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি করেন

জড়বাদীদের মতে, অনস্তিত্ব থেকে কোন বস্তুই সৃষ্টি হতে পারে না। বিশ্বে যা কিছু অস্তিত্ব লাভ করে, তার মৌল উপাদান পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। তাই বলতে হয়, এই মৌল চিরন্তন। আল্লাহ্ মৌল উপাদান সৃষ্টি করেন নি। বরং মৌল উপাদান যে আকার পরিগ্রহ করে, তাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। জালিনুসও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। তিনি তাঁর অভিমত প্রমাণের জন্য একটি গ্রন্থও রচনা করেন। ইসকান্দর আফ্রুসী নামক একজন গ্রীক দার্শনিক এ

গ্রন্থের বিষয়বস্তু খণ্ডন করেন। আল্লামা ইবনে মিস্‌কাওয়াইহ্, ইস্‌কান্দর আফরুসীর অভিমত সমর্থন করেন এবং তাঁর বিবরণকে ফলাও করে বিবৃত করেন। সে বিবরণের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

এতটুকু সবার জানা আছে যে, জড় পদার্থ এক আকার থেকে যখন অন্য আকারে রূপান্তরিত হয়, তখন সাবেক আকার সম্পূর্ণ-রূপে বিলুপ্ত হয়। যদি তা না হয়, তবে আকারটি হয়তো অন্য বস্তুতে অনুপ্রবেশ করবে, নয়তো পূর্ববৎ পূর্বস্থানেই অবিচলিত থাকবে। প্রথমোক্ত বিকল্পটি যে স্পষ্টত গলদ, তা আমরা স্বচক্ষেই দেখছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আমরা যখন মোমের একটি গোলাকার বলকে সমতল আকৃতিতে রূপান্তরিত করি, তখন এর গোলাকৃতি অপর কোন বস্তুতে অনুপ্রবেশ করে না। দ্বিতীয় বিকল্পটিও অবাস্তব। কেননা বস্তুটির দ্বিতীয় আকার ধারণ করার পর প্রথম আকারটিও যদি বিদ্যমান থাকে, তবে পরস্পর বিরোধী আকারের মিলন ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অর্থাৎ একই সময়ে একই বস্তু, উদাহরণস্বরূপ বলতে গেলে, গোলাকারও হয়, আবার সমতলও হয়।

এজন্য এটাই মেনে নিতে হবে যে, যখন কোন বস্তু নতুন আকার পরিগ্রহ করে, তখন তার সাবেক আকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। তাই অবশ্যই বলতে হবে যে, নতুন আকার অনস্তিত্ব থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, পরমূর্ত-পদার্থ যেমন, আকার, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ—এসব অনস্তিত্ব বা শূন্য থেকেই সৃষ্টি হয়। এখন শুধু এ প্রমাণ বাকী রয়েছে যে, পদার্থ কিভাবে শূন্য থেকে অস্তিত্ব লাভ করে। এর জন্য নিম্ন-লিখিত ভূমিকাগুলো মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

১. যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ করা হলে তা শেষ পর্যন্ত এক অমিশ্র মৌল উপাদানে গিয়ে ঠেকে।

২. এটা সকলের জানা আছে যে, মৌল উপাদান কোন অবস্থায়ই নিরাকার হতে পারে না। অজস্র পরিবর্তন সাধিত হলেও তাতে কোন না কোন আকার অবশ্যই বিরাজ করবে। কেননা মৌল উপাদান এবং আকার—এ দুটি বস্তু অবিচ্ছেদ্য।

৩. পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আকার চিরন্তন নয়, বরং তা অনস্তিত্ব থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে। এর সাথে যখন এটাও প্রমাণিত হলো যে, মৌল উপাদান কোন অবস্থায়ই আকার শূন্য হতে পারে না, তখন এটাও প্রতিপন্ন না হয়ে পারে না যে, মৌল উপাদান অবশ্যই অনিত্য এবং নশ্বর। তা না হয়, আকারকেও চিরন্তন বলতে হবে। সর্বশেষে এটাই প্রতিষ্ঠিত হলো যে, মৌল উপাদান নশ্বর ও পরিবর্তনশীল। এই নিরিখে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, সমস্ত মৌল উপাদান শূন্য থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটা একটা অবিমিশ্র বস্তু। এর পূর্বে এমন কোন বস্তুই বিদ্যমান ছিল না, যা থেকে মৌলিক উপাদান সৃষ্টি হতে পারতো। এটাই হলো ইবনে মিসকাওয়াইহের বিবরণের সারাংশ।

এখানে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, অধিকাংশ গ্রীক দার্শনিকের মতে, বিশ্ব চিরন্তন। অ্যারিস্টটলও অনুরূপ মত পোষণ করেন। ইসলামী আকাইদ অনুসারে বিশ্ব চিরন্তন নয়। এজন্য ইবনে মিসকাওয়াইহ্ গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে কেবল সেই সম্প্রদায়ের মত ও যুক্তি গ্রহণ করেন, যারা বিশ্বকে নশ্বর ও পরিবর্তনশীল বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এই সম্প্রদায় যেসব প্রমাণ পেশ করেন, তা থেকেই ইবনে মিসকাওয়াইহ্ উপকৃত হন।

## রূহ বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা

আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহ এ আলোচনাটি নিম্নের ভূমিকা-সহকারে আরম্ভ করেন ঃ

রূহের গূঢ় তত্ত্ব; এর অস্তিত্ব; শরীরের বিলুপ্তির পর রূহের স্থায়িত্ব—এ বিষয়গুলো খুবই সূক্ষ্ম এবং জটিল। অথচ এসব বিষয়ের উপরই পরকালের অস্তিত্বের প্রমাণ নির্ভরশীল। তাই এ বিষয়গুলো নিয়ে প্রথমেই আলোচনা করা প্রয়োজন।

অ্যারিস্টটল প্রমুখ রূহ সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা ছিল খুবই এলোমেলো এবং অস্পষ্ট। আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহ্ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু এ বর্ণনায়ও ধারাবাহিকতার অনেক অভাব দৃষ্ট হয়। এজন্য আমি তাঁর পূর্ণ বিবরণের সারাংশ ঝরঝরে করে পেশ করছি।

## রূহের অস্তিত্ব ও অজড়ত্ব

জড় বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো তা কোন না কোন আকার ধারণ করবেই। যতক্ষণ একটি আকার বিলুপ্ত না হয়, ততক্ষণ তা অন্য আকার পরিগ্রহ করতে পারে না। যেমন কোন রৌপ্য পেয়ালাকে যদি সোরাইতে রূপান্তরিত করতে হয়, তবে পেয়ালার আকার বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তা সোরাইর আকার ধারণ করতে পারে না। সকল জড় বস্তুতেই এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। যে বস্তুতে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, তা জড় বস্তু নয়।

কিন্তু মানুষ যখন কোন বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করতে শুরু করে, তখন সে বস্তুর আকার তার আত্মায় অঙ্কিত হয়। আবার ঠিক সেই মুহূর্তেই সে অন্য একটি বস্তুর হকিকতও উপলব্ধি করতে সক্ষম। মানুষের আত্মা একই সময় একাধিক বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং একাধিক আকারও তার আত্মায় ছায়াপাত করে। সে যতই হকিকত উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, ততই তার বোধশক্তি বৃদ্ধি পায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের উপলব্ধি-ক্ষমতা জড়বস্তু নয়। যে বস্তু একই সময় বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করতে পারে এবং বিভিন্ন বস্তু উপলব্ধি করতে পারে, তাকেই রূহ বা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা বলা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, দেহের যে অংশে কোন বস্তু অনুভূত হয়, তাই অন্তর এবং তাই রূহ।

কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না যে, মানুষের মধ্যে বোধ-শক্তি রয়েছে, যদ্দ্বারা সে সকল বস্তু হৃদয়ঙ্গম করে। যারা আত্মা অস্বীকার করে, তাদের মতে, এ বোধশক্তি হয়তো একটি জড়বস্তু, নয়তো তার একটি বৈশিষ্ট্য। মতভেদের মূল কারণ হলো—এ বোধশক্তি জড়, না-কি অজড়?—এ প্রশ্নটা। এর অজড়ত্বের সমর্থনে ইবনে মিসকায়াইহ্ বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন। এগুলোর বেশীর ভাগ অ্যারিস্টটল থেকে গৃহীত।

## আত্মার অজড়ত্বের প্রথম প্রমাণ

জড় ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য হলো, যখন তা কোন শক্তিশালী বস্তুকে অনুভব করে, তখন তার শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। যেমন কোন ব্যক্তি যখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন তার দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত

হয় এবং তা কর্ম সম্পাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, চিন্তামূলক বিষয়ের অনুধাবনে আত্মার ক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ শক্তি জড় নয়।

কিন্তু আত্মার অজড়ত্বের এ প্রমাণ দুর্বল। কারণ, আত্মাও কোন কোন ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহকে উপলব্ধি করা। এ ক্ষেত্রে আত্মার সেই অবস্থা হয়, যা সূর্যের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের হয়ে থাকে।

## দ্বিতীয় প্রমাণ

ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য হলো—তা কোন শক্তিধর বস্তুকে অনুভব করার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুর্বল বস্তুকেও অনুভব করতে পারে না। এটা এমনি ধরনের ব্যাপার, যেমন সূর্যের দিকে তাকানোর ফলে যখন চোখের জ্যোতিতে ধাঁধা লাগে, তখন বেশ কিছুক্ষণ তা মামুলি বস্তুকেও দেখতে পায় না। কিন্তু আত্মার অবস্থা তদ্রূপ নয়। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, উপলব্ধি-ক্ষমতা জড়বস্তু নয়।

কিন্তু এ প্রমাণও ধোপে টেকে না। আত্মিক শক্তিরও সেই একই দশা। যখন তা কোন সূক্ষ্ম এবং জটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে তার সমাধানে নিমগ্ন হয়, তখন কিছু সময় পর্যন্ত তার পক্ষে সহজ থেকে সহজ বিষয়ে মনোনিবেশ করাও কষ্টকর বলে মনে হয়।

## তৃতীয় প্রমাণ

মানুষ যখন কোন সূক্ষ্ম এবং চিন্তামূলক বিষয় নিয়ে ধ্যান করে, তখন সে জড়বস্তুসমূহ থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয় এবং নির্জনতা অবলম্বন করে। তখন সে কোন বস্তুর দেখা-শোনা, ঘ্রাণ নেয়া বা স্পর্শ করা—এসব কিছুই পছন্দ করে না। কেননা, এসব বস্তু তার চিন্তাধারায় অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বোধশক্তি জড়পদার্থ নয়। যদি এমন কিছু হতো, তবে তা পারিপার্শ্বিক জড়বস্তু এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় থেকে মুক্ত হওয়া মোটেই পছন্দ করতো না এবং মুক্ত হতেও পারতো না।

এ প্রমাণও যথার্থ নয়। এটা অবশ্য ঠিক যে, মানুষ চিন্তাভাবনা করার সময় প্রত্যেক জড়বস্তুর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু

এ বিচ্ছিন্নতা হলো আপাতদৃষ্টিতে। মূলত চিন্তাভাবনার সময়ও মানুষ সে সব ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞানকে কাজে লাগায়, যা পূর্ব থেকেই তাঁর মস্তিষ্কে সন্নিবিষ্ট থাকে। কল্পনার সময়ও মানুষ জড় জ্ঞান থেকে সাহায্য না নিয়ে পারে না। তবে পার্থক্য হলো এতটুকু—চিন্তাভাবনার সময় সে উপস্থিত এবং সম্মুখস্থ ইন্দ্রিয় জ্ঞান থেকে সাহায্য না নিয়ে পুরনো ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান থেকেই সাহায্য গ্রহণ করে। কারণ উপস্থিত জ্ঞানের সাথে তার উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্ক নেই।

## চতুর্থ প্রমাণ

মানুষ এমন অনেক বিষয়ের ধ্যান করে, যার সাথে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন পরস্পর বিরোধী দুটি বস্তুর সমন্বয় অবাস্তব; আল্লাহ্ বিদ্যমান; সর্বোচ্চ আকাশের উপর শূন্য বলতে কিছু নেই, আবার তা অন্য কিছুতে ভরাও নয় - এসব চিন্তাগর্ভ বিষয়। এগুলোর সাথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

এ প্রমাণও যথার্থ নয়। উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হলে বুঝা যাবে যে, এগুলোর সাথেও জড়বস্তু এবং ইন্দ্রিয়ের যোগ-সূত্র রয়েছে। যেমন আমরা অজস্র ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, দুইটি পরস্পর বিরোধী বস্তুর মিলন হয় না। তাই আমরা সার্বিকভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, পরস্পর বিরোধী দুটি বস্তুর সমন্বয় অবাস্তব। কিন্তু এটাও আমাদের ভাবতে হবে যে, এই ব্যাপক জ্ঞানটি সেই সব অজস্র আংশিক এবং খণ্ড জ্ঞান থেকে অর্জিত, যার সাথে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

## পঞ্চম প্রমাণ

উপলব্ধি-ক্ষমতা বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধি পায় এবং সজীবতা লাভ করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এর সাথে জড়বস্তুর সম্পর্ক নেই। তা না হয় শারীরিক দুর্বলতা উপলব্ধি-ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতো।

এ প্রমাণগুলো অ্যারিস্টটল থেকে গৃহীত। ইবনে মিসকাওয়াইহ্ প্লেটোর প্রমাণাদিরও উদ্ধৃতি দেন। কিন্তু এগুলো কেবল সাধারণ লোকের জন্যই উপযোগী। এর মধ্যে কেবল একটি প্রমাণই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহ্ তা খুব

সংক্ষেপে এবং অপূর্ণভাবে বর্ণনা করেন। যদি এর সাথে আরো কিছু ভূমিকা সংযোজিত করা যায়, তবে তা নিশ্চয়ই একটি জোরালো প্রমাণ হবার যোগ্যতা রাখে। তাই আমি সে প্রমাণটি পেশ করছি ঃ

## আত্মা ও তার অজড়ত্বের একটি দৃঢ় প্রমাণ

এটা সকলেই দেখতে পায় যে, মানব দেহে বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে এবং এদের ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন। মুখ বাক্-ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কান শ্রবণ করে; নাক ঘ্রাণ নেয়—এসব ক্রিয়া বাহ্য কোন বস্তুর প্রভাবে সম্পন্ন হয় না। এ সবের উৎস রয়েছে মানুষের অভ্যন্তরে। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে যে সংবেদন বা ভাবাবেগ রয়েছে যেমন, ক্রোধ, দয়া, প্রেরণা, ভালবাসা, স্মৃতিশক্তি, কল্পনা—এগুলোর উৎপত্তিস্থল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশেই রয়েছে।

এটাও স্পষ্টত বুঝা যায় যে, মানুষের বিভিন্ন ভাবাবেগ সাহায্যকারী বস্তুরূপেই কাজ করছে এবং সেগুলো নিজের জন্যে নয়, অপর একটি ক্ষমতার জন্যই আপন আপন ক্রিয়া সম্পন্ন করে চলেছে। এদের নির্দেশক এবং পরিচালকের উপর এমন একটি শক্তি রয়েছে, যা এদেরকে আপন উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত ও পরিচালিত করে। হাত যা স্পর্শ করে, চোখ যা দেখে, কান যা শোনে—এসব ক্রিয়া স্বয়ং হাত, চোখ বা কানের কোন কাজে আসে না, বরং আরো একটি সুপ্ত ক্ষমতা রয়েছে, যা এদের কর্মফলে উপকৃত হয়। ইন্দ্রিয়শক্তি বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞান সরবরাহ করে, কিন্তু এসব অভিজ্ঞান দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন অন্য একটি শক্তির।

এ শক্তিটি সেখানেই স্পষ্টত বুঝা যায়, যেখানে ইন্দ্রিয় অনুভূতি ভুলের শিকারে পরিণত হয়। যেমন দূরবশত একটি বড় বস্তুকে ছোট বলে মনে হয় এবং বাহ্য চক্ষু তাকে ছোট বলেই মনে করে। কিন্তু অন্তর চক্ষু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাহ্য চক্ষু ভুল করেছে। এখানে ইন্দ্রিয় চক্ষুর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে এ প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সেটা কোন বস্তু, যা এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে পরিচালিত করে? জড়-

বাদীরা বলেন, তা হলো মস্তিষ্ক। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি অংশ স্বতন্ত্র শক্তির উৎস। কিন্তু তাতে এমন কোন চালক ক্ষমতার প্রমাণ মেলে না, যা বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলোকে পরিচালিত করতে পারে। তাতে এমন কেন্দ্রীয় শক্তিরও সন্ধান মেলে না, যার কাজে আঙ্গিক শক্তিগুলো হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যে বস্তু জড়াত্মক এবং যা দেহের অংশ বিশেষ, তা সাহায্যকারী হওয়ার চাইতে বেশী কিছু হতে পারে না। সুতরাং যে বস্তু এসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে পরিচালিত করবে, তাকে অবশ্যই এসবের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং অজড় হতে হবে। কেননা, যদি জড় বস্তু হয়, তবে তাও হবে হাতিয়ারস্বরূপ এবং তার ক্রিয়া হবে বিশিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। এই সামগ্রিক পরিচালক শক্তিই হলো—রূহ বা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা।

এখন একমাত্র সন্দেহ রইলো এই যে, এ রূহ হয়তো স্বমূর্ত না হয়ে পরমূর্ত হতে পারে। যেমন বর্তমান জড়বাদীরা বলেন যে, এই আত্মা হলো দেহের গঠন বা তার অঙ্গ সংযোজনের একটি অবস্থা মাত্র। ইবনে মিসকাওয়াইহ্ নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়ে এ সম্ভাবনা নাকচ করে দেন ঃ

১. যে বস্তুটি স্বয়ং বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন অবস্থা পরিগ্রহ করে, তা সে সব আকার বা অবস্থার সহগোত্রীয় হতে পারে না। জড়বস্তু সাদা, কালো, লাল—বিভিন্ন রং ধারণ করে। তাই তার সত্তা হবে বর্ণহীন। তা না হলে তা কি করে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করতে পারে ?

আত্মা প্রত্যেক বস্তুর কল্পনা করতে পারে। তাতে যে কোন আকার পরিগ্রহ এবং অনুধাবন করার যোগতা রয়েছে। তাই বলতে হয়, আত্মা পরমূর্ত বা গুণবাচক পদার্থ নয় এবং পরমূর্ত বস্তুর যে নয়টি বৈশিষ্ট্য যেমন অবস্থা, সংখ্যা, কাল, পাত্র ইত্যাদি রয়েছে, তাদের কোনটির আওতায় পড়ে না।

২. জড় পদার্থের দোষ গুণ, ইত্যাদি পরমূর্ত বা গুণবাচক বস্তু বলে অভিহিত। পদার্থ সৃষ্টির সাথে সাথেই তার সাথে এই পরমূর্ত বস্তুগুলোর সংযোগ ঘটে। গুণ অস্থায়ী। তাই এর মানও নগণ্য।

সুতরাং যে বস্তু সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈহিক শক্তি এবং বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব করে, তা পরমূর্ত (গুণবাচক) হতে পারে না।

এ যুক্তিকে আমরা অন্য শব্দে আরো ফলাও করে এবং আরো সাবলীল উপায়ে বর্ণনা করতে পারি। এটা সর্বজনবিদিত যে, মানুষের দেহ এবং দৈহিক অবস্থা পরিবর্তনশীল। আধুনিক জড়বাদীরা বলেন, ত্রিশ বছর পর মানবদেহের মৌল উপাদানের একটি অণুও বিদ্যমান থাকে না। পূর্বের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বদলে যায় এবং সাবেক দেহের ন্যায় সম্পূর্ণ নতুন অন্য একটি দেহ গঠিত হয়। এ সত্ত্বেও মানবদেহে এমন একটি বস্তু রয়েছে, যা সব সময় অপরিবর্তিত থাকে। এই নিরিখে বলা হয় যে, "এই হামিদ হলো সেই ত্রিশ বছর আগেকার হামিদ।" এ বস্তুকেই আমরা রূহ বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মারূপে অভিহিত করি।

বলা বাহুল্য, এ বস্তু পরমূর্ত অর্থাৎ গুণবাচক হতে পারে না। কেননা, পর বিদ্যমান এবং গুণবাচক বস্তু সব সময় পরিবর্তিত হয়। অথচ রূহ বা আত্মা এমন একটি বস্তু, যা সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও অক্ষত থাকে।

## আত্মার চিরন্তনতা

পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মা স্ববিদ্যমান এবং অজড় বস্তু। তাই এটাও প্রতিপন্ন হলো যে, তা ধ্বংসনীয়ও নয়। কারণ ধ্বংসশীলতা জড় পদার্থেরই বৈশিষ্ট্য। যে বস্তুর সাথে জড়ত্বের কোন সম্পর্ক নেই, তা কি করে ধ্বংস হতে পারে?

আধুনিক গবেষণার আলোকে এ মতবাদটি খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আধুনিক ধ্যানধারণা নিশ্চিতভাবে এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কোন বস্তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। কেবল তার রূপ বদলে যায়। তার অঙ্গগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে অন্য একটি আকার ধারণ করে। সারা পৃথিবী জুড়েও যদি একটি অণুকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে, তবুও তা সম্ভব হবে না।

পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মা যৌগিক পদার্থ নয়, বরং তা অবিমিশ্র বস্তু। তাই এর আঙ্গিক বিশ্লেষণও সম্ভব নয়, এর অঙ্গের পরিবর্তনও সম্ভব নয়। সুতরাং এর বিনাশও সম্ভব নয়।

## নবুওয়াত

নুবুওয়াতের গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে সৃষ্টি জগতের ক্রমবিকাশ ও তার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে গবেষণা করা প্রয়োজন।

## সৃষ্টি জগতের ক্রমোন্নতি

সৃষ্টির প্রথম স্তরে ছিল কতগুলো একক ও অবিমিশ্র মৌল উপাদান। সেগুলোর সংমিশ্রণের ফলে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয় জড় জগত। এটা হলো যৌগিক সৃষ্টির নিম্নতম স্তর। অতঃপর তা উন্নতি লাভ করে উদ্ভিদ জগতে উন্নীত হয়। উদ্ভিদ জগত উন্নতির বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করতে থাকে। এ জগতে প্রথমে সৃষ্টি হলো তৃণ। কিন্তু এ তৃণ বীজ থেকে নয়, তা জন্ম লাভ করে স্বাভাবিকভাবেই। অতঃপর সৃষ্টি হলো বৃক্ষ। বৃক্ষরাজিও উন্নতির অনেক ধাপ অতিক্রম করে। ফলে, সৃষ্টি হলো এমন এমন বৃক্ষ, যার কাণ্ড, শাখা, ফল, ফুল ইত্যাদি রয়েছে এবং যার জন্য প্রয়োজন হয় উৎকৃষ্ট ভূমি, পানি ও বায়ুর। ক্রমোন্নতির ফলে এদের মধ্যে সৃষ্ট হলো জৈব বৈশিষ্ট্য। ফলে, তাদের সীমারেখা প্রাণী জগতের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। যেমন খেজুর বৃক্ষ। এ শ্রেণীর বৃক্ষের মধ্যে প্রাণী জগতের ন্যায় পুরুষ ও স্ত্রী জাত হয়ে থাকে এবং যেভাবে নর-মাদার সঙ্গমের ফলে সন্তানের সৃষ্টি হয়, তেমনি এ বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যেও সহ-মিলনের দরুন ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ বৃক্ষে যতক্ষণ সহ-মিলন না হয়, ততক্ষণ সেগুলো ফলবতীও হয় না। রসূল করীম বলেন ঃ

তোমাদের ফুফু খেজুর বৃক্ষের সম্মান কর। কেননা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর যে মাটি উদ্বৃত্ত ছিল, তা দিয়েই এ বৃক্ষ সৃষ্টি করা হয়।

## উদ্ভিদ জগত

উদ্ভিদ ক্রমোন্নতির ফলে প্রাণী জগতের সীমারেখায় প্রবেশ করে এবং তা এমন এক বৃক্ষ শ্রেণীতে পরিণত হয়, যা প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। যেমন, প্রবাল কীট, ঝিনুক। আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহের যুগে পদার্থ বিদ্যার ততটা উন্নতি হয়নি। তাই তিনি প্রবাল কীট ও ঝিনুকের উদাহরণ দেন। অধুনা

এমন কতক উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা একাধারে জৈবিক ও উদ্ভিজ্জ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন এক ধরনের গুল্ম (মানুষ খেকো গাছ), যা বৃক্ষে ঝুলে থাকে। কোন জীব নিকটে গেলে তার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে এবং সমস্ত রক্ত চুষে খায়। ফলে তার মৃত্যু ঘটে।

উদ্ভিদ ক্রমবিকাশের ফলে প্রাণী স্তরে উপনীত হয় এবং প্রথম ধাপে স্বাধীন গতিসম্পন্ন পোকা মাকড়ে পরিণত হয়। এ স্বাধীন গতি ছাড়া তা উদ্ভিদ থেকে আর কোন অংশে উন্নত নয়। কিন্তু ক্রমোন্নতির ফলে তাতে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ই নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তিও গজাতে আরম্ভ করে। এ ক্রমবিকাশের দরুন এমন প্রাণীরও সৃষ্টি হয়, যাতে ত্বক, কান, নাক, চোখ, জিহ্বা—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সব-কিছুই বিদ্যমান থাকে। এর পরেও উন্নতি অব্যাহত থাকে। প্রথম পর্যায়ের প্রাণী অবশ্য বুদ্ধিহীনই হয়। কিন্তু ক্রমশ তা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চাতুর্যের অধিকারী হয়ে উঠে। এমনকি, তারা ধীরে ধীরে উন্নতি করে মনুষ্য জগতের সীমারেখায় উপনীত হয়। যেমন বানর ইত্যাদি। এরা যখন পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে আরো উন্নতির পথে ধাবিত হয়, তখন মানুষের ন্যায় এদেরও দৈহিক গঠন সরল হয়ে উঠে। এদের কল্পনা শক্তিও অনেকটা মানুষের মত হয়ে উঠে। এই স্তরে পশুত্বের অবসান ঘটে এবং মনুষ্যত্বের সূচনা হয়। আমরা দেখতে পাই আফ্রিকার কোন কোন স্থানে মানুষ এবং পশুর মধ্যে তেমন বিশেষ ব্যবধান নেই।

ক্রমবিকাশের এ ধারা মানব জাতির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাশক্তি, ধীশক্তি, আত্মিক পবিত্রতা এবং চারিত্রিক উন্নতি সাধন করে মানুষ ফেরেশতার কাছাকাছি গিয়ে উপনীত হয়। এই স্তরকেই আমরা নবুওয়াত এবং রিসালত বলে অভিহিত করি।

## ওহীর হকিকত

মানুষের জ্ঞান-ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করে। মানুষ প্রথমে জড়বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করে; অতঃপর চিন্তামূলক বিষয়ের, অতঃপর কাল্পনিক বস্তুর। সে যখন শেষোক্ত পর্যায়ে উন্নীত হয় (পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ পর্যায়টি নবুওয়াত বলে অভিহিত), তখন কোন বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করার জন্য তাকে আর

অগ্রসর হতে হয় না। বরং সে একচোটেই যাবতীয় বস্তুর হকিকত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ যে ব্যাপারটি অন্যান্য লোক খণ্ডজ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও বিভিন্ন ভূমিকা প্রয়োগে উপলব্ধি করে, তা একজন নবী চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত একচোটেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। এটাকেই বলা হয় 'ওহী' বা 'ইলহাম'। এর মাধ্যমেই নবী সবকিছু উপলব্ধি করেন।

নবী কখনো কখনো কল্পনার স্তর থেকে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্তরে নেমে আসেন। তিনি বিচার বুদ্ধি বলে কোন একটি বিষয়বস্তুর গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করেন; অতপর তা চিন্তা-শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে; অতঃপর চিন্তা-শক্তি কল্পনা-শক্তির উপর; অতঃপর কল্পনা-শক্তি ইন্দ্রিয়-শক্তিকে প্রভাবিত করে। ফলে, যে বিষয়টি ছিল কাল্পনিক এবং জড়ত্বের ঊর্ধ্বে, তা তাঁর কাছে ভৌতিক বলে অনুভূত হয়। এটা এমন একটি ব্যাপার, যেমন কল্পনা-শক্তির সাহায্যে মানুষ স্বপ্নযোগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারসমূহ দেখতে পায় বা আওয়াজ শুনতে পায়।

ইন্দ্রিয় এবং জড়জ্ঞান উন্নতি করে যেমন অজড় এবং ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানে পরিণত হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানও নিম্নস্তরে নেমে এসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার ধারণ করে। নবিগণ ফেরেশতার যে আকার দেখতে পান বা যে আওয়াজ শুনতে পান, তার রহস্য এখানেই নিহিত।

দার্শনিক এবং পয়গাম্বরের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, দার্শনিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে উপরের স্তরে যান। পক্ষান্তরে, নবিগণ সাধারণ মানুষের নাগালে আসার জন্য জ্ঞানের উন্নত শিখর থেকে অবরোহণ করেন।

আল্লামা ইবনে মিস্‌কাওয়াইহ্ নবিগণের ওহী প্রাপ্তি, কল্পনা জগত থেকে তাঁদের অবতরণ, তাঁদের গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ ইত্যাদির যে হকিকত বর্ণনা করেন, ইমাম গাযালী 'আল্-মাদ্‌নুনো-বিহী-আলা-গাইরে-আহলিহী' নামক গ্রন্থে তাই নিজ ভাষায় বর্ণনা করেন।

'আল্-গাযালী' নামক গ্রন্থে আমি তাঁর পুরো ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি। এখানে শুধু কয়েকটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ক্ষান্ত করছি :

"যে কোন ভাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ধারণ করতে পারে'—এই বৈশিষ্ট্য শুধু নবী এবং রসূলদের জন্যই। এটা এমনি ধরনের

ব্যাপার, যেমন, সাধারণ লোকেরা কাল্পনিক বস্তুকে স্বপ্নযোগে জড় আকারে দেখতে পায় এবং কথাবার্তাও শুনতে পায়।”

“তাই পয়গম্বরগণ এসব বস্তু জাগ্রত অবস্থায়ই দেখতে পান এবং জাগ্রত অবস্থায়ই এগুলো তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলে থাকে।'

আবদুর রায্যাক লাহিজী ‘গওহারে মুরাদ’ নামক গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

“আমাদের মস্তিষ্ক যেভাবে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়াতীত করে কাল্পনিক বস্তুতে পরিণত করে, তেমনি নবীদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও কাল্পনিক বিষয়কে ভৌতিক রূপ দান করে।”

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কেবল দার্শনিকগণই ওহী ও ইলহামের এ হকিকতে বিশ্বাস করেন। প্রকাশ্যবাদী ওলামার (ওলামা-এ-যাহির) মতে এ অভিমত কুফ্র বই কিছুই নয়।

এ সময়ই ‘ইখ্ওয়ানুস-সাফা’ নামক সংঘটি গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শরীয়ত এবং দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

এ সংঘের সভ্যগণ দর্শন এবং শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একান্নটি পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকাগুলো বর্তমানে ‘রাসাইলে-ইখওয়ানুস্ সাফা’ নামে চার খণ্ডে পাওয়া যায়। কিন্তু আপন নাম প্রকাশ করার মত সৎসাহস এ সংঘের সভ্যগণের ছিল না। ‘কাশফুয্যুনুন’ নামক গ্রন্থে এঁদের যে নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে, তা হলো ঃ আবু সুলায়মান মোহাম্মদ ইবনে নাসির আল-বাসতী, আবুল হাসান আলী ইবনে হারওয়ান আয্যান জানি, আবু আহমদ হুনার জুরী, সাইদ ইবনে রিফায়াহ্।

এটা সর্বস্বীকৃত যে, এসব পুস্তিকার লেখকমণ্ডলীর সবাই ছিলেন মুসলিম দার্শনিক। ‘কাশফুয্যুনূন’ গ্রন্থে লিখিত আছে, “তাঁরা সবাই ছিলেন ‘হুকামা’। তাঁরা একমত হয়ে এসব পুস্তিকা রচনা করেন।”

শহরজুরী ‘তারীখুল হুকামা’ নামক গ্রন্থে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এঁদের আলোচনা করেন। সংঘটি নিজেই এক জায়গায় আপন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এর সারাংশ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"প্রাচীন দার্শনিকগণ (হুকামা) নানামুখী জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে বহুগ্রন্থ রচনা করেন। যেমন, চিকিৎসাশাস্ত্র, অংক, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ-বিজ্ঞান—এসব বিষয়ে তাঁদের রচনা রয়েছে। এসব রচনাবলীকে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছে। এক সম্প্রদায় এগুলোর বিরোধিতা করেছে। তারা হয়তো এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি, নয়তো এ বিষয়গুলো ছিল তাদের জ্ঞান সীমার উর্ধ্বে। অন্য সম্প্রদায় এগুলো অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু পুরো-পুরি আয়ত্ত করতে পারেনি। তাতে ফল এই দাঁড়ালো যে, তাঁরা শরীয়তের বিধিবিধান অস্বীকার করে বসলো এবং ধর্মীয় বিষয়গুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করলো।

"আমাদের এ সংঘের সর্ববিজ্ঞ ভাইদের উদ্দেশ্য হলো, শরীয়ত এবং দর্শন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এজন্য আমরা একান্নটি পুস্তিকা লিখে ইসলামী শরীয়ত এবং দর্শনের বিষয়াদির হাল হকিকত ব্যক্ত করছি।"

হিজরী পঞ্চ শতাব্দীতে ইমাম গাযালী পয়দা হন। তিনি ছিলেন এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের শিরোমণি। তিনি ওহীবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয় সাধন করেন এবং এমনভাবে সমন্বয়সাধন করেন যে, কোনটির অস্তিত্বই ক্ষুণ্ণ হয়নি। আজ যদি আধুনিক ইলমে কালামের ইমারত গড়তে হয়, তবে তাঁর ভাবধারার উপর ভিত্তি করেই তা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যেই আমি গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে তাঁর ভাবধারার পূর্ণ আলোচনা করতে চাই। তবে এখানে কেবল এতটুকু বলে রাখতে চাই যে, প্রত্যেক বিষয়ে ইমাম গাযালীর রচনাবলী রয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানেই তাঁর একটা নতুন রূপ ফুটে উঠেছে। তিনি কোথাও মুতাকাল্লিম, কোথাও ফকীহ, কোথাও ধর্মীয় উপদেশক, কোথাও দার্শনিক, আবার কোথাও জ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেন। এজন্য এটা বলা কঠিন যে, তাঁর আসল ঝোঁক কোন দিকে ছিল এবং তাঁর আসল ভাবধারাই বা কি? তাঁর সমস্ত রচনা যদি একত্র করা যায়, একটাকে অপরটার সাথে তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, এবং তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষার ইঙ্গিতসমূহ উপলব্ধি করা যায়, তবেই এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। এজন্য আমি তাঁর জীবন চরিতের উপর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছি। তাতে এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম গাযালী যদিও প্রকাশ্যবাদী ওলামার ভয়ে আপন মতামত প্রকাশে খুব সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করেছেন, তথাপি সমঝদার লোকেরা বুঝে নিয়েছেন যে. তিনি দার্শনিক ভাষার মধ্য দিয়েই আপন চিন্তাধারা ব্যক্ত করে গেছেন। এজন্যই প্রখ্যাত বড় বড় ওলামা যেমন, কাযী আইয়ায, মুহাদ্দিস ইবনে জওযী, ইবনে কাইয়েম প্রমুখ তাঁকে ভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্টরূপে ঘোষণা করেন।

কাযী আইয়াযের আদেশে স্পেনে ইমাম গাযালীর সমস্ত গ্রন্থ বিনষ্ট করে দেয়া হয়। আমি এ বিষয়টি 'আল্-গাযালী' নামক তাঁর জীবনী গ্রন্থে ফলাও করে বর্ণনা করেছি।

ইমাম গাযালীর পদক্ষেপেই দর্শন ধর্মীয় মহলে স্থান লাভ করে। দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যা-শিক্ষা প্রসার লাভ করে। এর ফলে এমন অনেক লোক আবির্ভূত হলেন, যাঁরা ধর্মকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে শায়খুল ইশরাক শায়খ শিহাবুদ্দিন মকতুল (নিহত) সকলের মধ্যমণি ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে এত উদারতা প্রদর্শন করেন যে, বলতে গেলে তিনিই দর্শনকে ধর্মের পাঁজরে এনে বসিয়ে দিলেন। তাঁর চিন্তাধারার সাথে পাঠকেদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে আমি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিকমাতুল্-ইশ্‌রাক' এর ভূমিকা থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছিঃ

"আমি যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছি এবং এর যে ভূমিকা বর্ণনা করেছি, আশা করি, সকল মারিফত-পন্থী সে সম্পর্কে আমার সাথে একমত হবেন। এ পন্থাটি দর্শনের শিরোমণি প্লেটোরই অভিরুচি মাফিক, যিনি ছিলেন ঐশী ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং স্বর্গীয় নূরের অধিকারী। দার্শনিকদের পুরোধা হারমিসের যুগ থেকে যত বড় বড় দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন, সবারই এ পন্থা ছিল। পারস্যের দার্শনিকগণও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেন যাঁদের মতবাদের ভিত্তি ছিল আলো এবং অন্ধকার। কিন্তু এ পন্থা অগ্নি-পূজকদের এবং মানীর নাস্তিক্য নয়।"

শায়খুল ইশরাক হিজরী ৫৫০ সালের কাছাকাছি সময় পয়দা হন। তিনি ইমাম রাযীর শিক্ষক মাজ্‌দ জিলীর নিকট বুদ্ধিভিত্তিক বিদ্যা শিক্ষা করেন। আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও প্রতিভা বলে তিনি

অল্প বয়সে এমন দক্ষতা অর্জন করেন যে, তদানীন্তন মুসলিম জাহানে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না।

হিজরী ৫৭৯ সালে তিনি যখন হালাব গমন করেন, তখন সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান সালাহ্উদ্দীনের পুত্র মালিকুয্-যাহির গাযী। তিনি শায়খুল ইশরাকের খুবই সম্মান করতেন। তিনি এক বিতর্ক সভার আয়োজন করেন। তাতে সমস্ত বড় বড় ওলামা যোগদান করেন। শায়খুল ইশরাক সে সভায় আলোচ্য বিষয়ের সূক্ষ্ম দিকগুলোর উপর এমন মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করেন যে, সমসাময়িক সুধীবর্গ তাঁর সামনে নিজেদের পরাস্ত বলে মনে করেন। সাধারণ ওলামা তাঁর দুশমন হয়ে উঠেন। তাঁরা সুলতান সালাহ্ উদ্দীনকে লিখেন, "যদি এ ব্যক্তি জীবিত থাকে, তবে কেবল আপনার খান্দানই নয়, সমস্ত মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করে দেবে।" তাই সুলতান সালাহ্ উদ্দীন, আল্-মালিকুয্-যাহিরকে তাঁর হত্যার আদেশ দেন। তদনুসারে হিজরী ৫৮৬ সালে তাঁকে হত্যা করা হয়। 'তাবাকাতুল আতিব্বা' নামক গ্রন্থে অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থেও এ প্রমাণ রয়েছে যে, সুলতান সালাহ উদ্দীন ওলামার কথানুসারেই তাঁর হত্যার আদেশ দেন। কিন্তু আমার কাছে এটা মনে হয় না যে, কেবল ওলামার অসন্তোষ এবং তাঁদের ঈর্ষার কারণেই সুলতান তাঁর হত্যার আদেশ দেন। বস্তুতঃ তিনি নিজেও শায়খুল ইশরাককে পথভ্রষ্ট বলে মনে করতেন।

শায়খুল ইশরাকের গ্রন্থবলী আজও বিদ্যমান রয়েছে। তাতে এমন শত শত বিষয় আছে, যা ফকীহ্দের মতে, কুফর এবং ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। 'হিকমাতুল-ইশরাক' নামক গ্রন্থে তিনি জরোয়াস্টার প্রমুখকে পয়গাম্বররূপে অভিহিত করেন। গ্রীক দার্শনিক-দের আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে আখ্যায়িত করেন। কুফরী করার জন্য এর চাইতে আর বেশী কি প্রয়োজন ?

শায়খুল ইশরাক দর্শন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই অ্যারিস্টটলের দর্শন মোতাবেক রচিত। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে একমাত্র 'হিক্মাতুল্ ইশরাক' নামক গ্রন্থটি তাঁর স্বরুচি মোতাবেক রচিত।

প্রাচীন মুতাকাল্লিমদের যুগ থেকেই গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদের সমালোচনা শুরু হয়। ইমাম গাযালী ও রাযীর সময় এ সমালোচনা খুবই প্রসার লাভ করে। এ বিষয়ে শায়খুল ইশরাকের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। ইমাম গাযালী প্রমুখের উদ্দেশ্য ছিল কেবল সমালোচনা করা। তাঁরা কোন নতুন দর্শন প্রবর্তন করেন নি। পক্ষান্তরে শায়খুল ইশরাক একটি স্বতন্ত্র দর্শন প্রবর্তন করেন এবং তা 'ইশরাক দর্শন' নামে অভিহিত করেন। এতে তিনি অ্যারিস্টটলের অধিকাংশ মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত করেন এবং যুক্তি প্রমাণ দিয়ে নিজস্ব অভিমত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। 'হিকমাতুল ইশরাক' এর শেষ দিকে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, "আমার এসব মতবাদ" আল্লাহ্‌প্রদত্ত। দর্শন ছাড়া যুক্তিবিদ্যায়ও তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং এর কোন কোন বিষয়কে ভুল প্রমাণিত করেন। কোন কোন বিষয়ের ভ্রম সংশোধন করেন। পাঠকদের ঔৎসুক্যের প্রেক্ষিতে এখানে সেগুলোর কোন কোনটি উদ্ধৃত করছিঃ

যুক্তিবিদ্যায় ( মানতিক ) কোন বস্তুর সংজ্ঞা পদ্ধতি হলো যে বস্তুর সংজ্ঞা বা হকিকত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তার সত্তাগত দুইটি গুণ উল্লেখ করা। তন্মধ্যে একটি হবে এমনি ধরনের, যা সংজ্ঞাধীন বস্তুর মধ্যেও পাওয়া যায়, অপরাপর বস্তুর মধ্যেও দৃষ্ট হয়। যেমন মানুষের অনুভূতিশীল হওয়া এবং তার স্বেচ্ছাধীন গতিশীলতা। এ বৈশিষ্ট্যটি মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীতেও দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বা গুণ হবে এমনি ধরনের, যা শুধু সংজ্ঞাধীন বস্তুর মধ্যেই পাওয়া যাবে, অন্য কোন বস্তুতে নয়। যেমন মানুষের বাকশীলতা, এ গুণ শুধু মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্য প্রাণীতে নয়। এ দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যই হলো সে বস্তুর সংজ্ঞা বা হকিকত। বৈশিষ্ট্য বা এ গুণকে যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায় যথাক্রমে 'জিন্‌স' (জাত) এবং 'ফস্‌ল' (প্রভেদকারী) বলা হয়।

শায়খুল ইশরাকের মতে সংজ্ঞার এ পদ্ধতি যথার্থ নয়। তিনি বলেন, সংজ্ঞাধীন বস্তুর বৈশিষ্ট্যটি যে, একমাত্র তারই বৈশিষ্ট্য এবং তা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না, একথা সম্বোধিত এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি করে জানতে পারবে? যেমন যুক্তিবিদ্যায় ঘোড়ার সংজ্ঞায় বলা হয় যে, এটা হ্রেষারবকারী প্রাণী। হ্রেষারব একটি বিশেষ

আওয়াজ। এ শুধু ঘোড়ার মধ্যেই দৃষ্ট হয়, অন্য কোন প্রাণীতে নয়। এখন মনে করুন এক ব্যক্তি ঘোড়ার হকিকত জানে না। সে পূর্বেও কোন সময় ঘোড়া দেখেনি। ঘোড়ার হ্রেষারবও সে শোনেনি। এমতাবস্থায় যদি তার কাছে বলা হয় যে, ঘোড়া একটি জন্তু, যা হ্রেষারব করে, তবে সে কি করে তা বুঝতে পারবে?

এজন্য শায়খুল ইশরাকের মতে, কোন বস্তুর সংজ্ঞা-পদ্ধতি হলো তার সত্তাগত সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা গুণের উল্লেখ করা। সেগুলো হয়তো পৃথক পৃথকভাবে অন্যত্র দৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু একত্রে কোথাও পরিলক্ষিত হবে না।

বাক্যের যে অংশটিকে 'বিধেয়' বলা হয়, যুক্তিবিদ্যায় তাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শায়খুল ইশরাক এ বিভাগের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়'—বাক্যের এ দুটি অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, তা আপাতদৃষ্টিতে অনিবার্যতা-মূলক, সম্ভাবনামূলক বা অসম্ভাব্যতামূলক—যা-ই প্রতীয়মান হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা হলো অনিবার্যতামূলক সম্পর্ক। যেমন, যখন আমরা বলি—'মানুষ লেখক হতে পারে', তখন তার মানে হয়—মানুষের লিখনী-শক্তির সম্ভাবনা আবশ্যকীয়। তাই বলতে হয় যে, সম্ভাবনাও মূলত অপরিহার্যতার অর্থই বহন করে!

দর্শনের বহু বিষয়ে শায়খুল ইশরাক অ্যারিস্টটলের বিরোধিতা করেন। যেমন, অ্যারিস্টটল প্রত্যেক পদার্থের মৌল উপাদান সৃষ্টির পক্ষপাতী! কিন্তু শায়খুল ইশরাক এ মতবাদ নাকচ করে দেন। অ্যারিস্টটল প্রমুখ সৃষ্টির অস্তিত্বকে আল্লাহর সত্তা-বহির্ভূত বলে মনে করেন। কিন্তু শায়খুল ইশরাক সত্তার অন্তর্গত বলে মত পোষণ করেন। অ্যারিস্টটল প্রমুখ দশ আত্মা বা ফেরেশতায় (উকূল-এ-আশরাহ্) বিশ্বাসী। কিন্তু শায়খুল ইশরাকের মতে, 'আত্মা' দশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং শত শত, হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ আত্মাও রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর স্রষ্টা এক একটি আত্মাস্বরূপ। প্লেটো আত্মার চিরন্তনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু শায়খুল ইশরাক তাঁর এ মতবাদ খণ্ডনে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেন। অ্যারিস্টটল প্রমুখ ব্যক্তি বা বস্তুর দশটি প্রয়োজনীয় এবং সর্বব্যাপক বৈশিষ্ট্যে

(মাকুলাতে আশার) বিশ্বাসী ছিলেন। শায়খুল ইশরাকের মতে, এ সব হলো ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন দিক।

এ ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে। এ সবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া এখানে সম্ভব নয়। তাই শুধু তাঁর আল্লাহ্-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চাই। কারণ, এর সাথে ইলমে কালামের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

শায়খুল ইশরাক আল্লাহ্-তত্ত্বে প্রধানতঃ বু-আলী সীনার অনুকরণ করেন। আবার এটাও বলা চলে যে, এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে গতানুগতিকভাবেই মতৈক্য সাধিত হয়েছে। কিন্তু ওহী; ঐশিক জ্ঞান (ইলহাম), ফেরেশতার সাথে সাক্ষাত—এসব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতবাদ রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

শায়খ সাহেবের মতে, অস্তিত্ব কয়েক ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি হলো সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব, অর্থাৎ 'সদৃশ জগতের প্রতিচ্ছবি'। ওহী, ঐশিক জ্ঞান ইত্যাদি সদৃশ জগতের অস্তিত্বরই অভিব্যক্তি। তিনি বলেন,

"নবী এবং ওলী প্রমুখ বিভিন্নভাবে অদৃশ্য বস্তু উপলব্ধি করেন। তাঁরা কখনো লিখিত বস্তু দেখতে পান, কখনো মধুর আওয়াজ, কখনো ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পান। কখনো সৃষ্টিরাজির আকৃতি, আবার কখনো অতি সুন্দর মনুষ্য-আকৃতি অবলোকন করেন। এসব প্রতিচ্ছবি তাঁদেরকে অদৃশ্য বিষয়ে ওয়াকিফহাল করে।"

যাক, এ ধরনের আরো অনেক অবস্থা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন,

"এগুলো হলো আলমে মিসালের (সদৃশ জগত) বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি, যা স্বনির্ভরশীল। সুগন্ধ ইত্যাদিরও একই অবস্থা।"

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, এই চিন্তাধারা কারুর মতে, কুফরী কাজ, আবার কারুর মতে হকিকত ও রহস্যের আলোকবর্তিকা।"

সূফী মহলে শায়খুল ইশরাকের কি মর্যাদা রয়েছে, তা সকলেরই জানা ব্যাপার। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাঁর সম্পর্কে যে মত পোষণ করেন, তা ব্যক্ত করার মত নয়।

## ইলমে কালামের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

### ইলমে কালামের অধিকাংশ বিষয় গ্রীক দর্শন থেকে গৃহীত— এ ধারণা ভ্রান্ত

অধিকাংশ লোকের ধারণা, ইলমে কালামের প্রায় বিষয়ই গ্রীক দর্শন থেকে গৃহীত। এ ধারণার মূলে কাজ করেছে ইমাম গাযালীর ভাষ্য। তিনি 'মাযনূন-এ-সগীর-ও-কবীর', 'জাওয়াহিরুল কুরআন' ইত্যাদি গ্রন্থে নুবুওয়াত, ওহী, স্বপ্ন, শাস্তি, প্রতিদান এবং মুজিযার যে ব্যাখ্যা দেন, তা পুরাপুরি ইবনে সীনা ও ফারাবী থেকে গৃহীত এবং এ দুজন যা লিখেছেন, তা গ্রীক দর্শনেরই অনুকরণ। এ ধারণায় মারাত্মক গলদ রয়েছে। এটা সত্য যে, উপরিউক্ত বিষয়াদিতে ইমাম গাযালীর তথ্যসমূহ ইবনে সীনা এবং ফারাবী থেকেই গৃহীত। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, এ সবই গ্রীক দর্শন। বরং এগুলো ছিল স্বয়ং ইবনে সীনা ও ফারাবীর আবিষ্কার। গ্রীক দর্শনের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই নেই। আল্লামা ইবনে-রুশ্‌দ 'তাহাফা' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"প্রাচীন দার্শনিকগণ মুজিযার আলোচনা করেন নি। স্বপ্ন সম্পর্কে ইমাম গাযালী দার্শনিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে যা লিখেছেন, তা সত্যিই প্রাচীন দার্শনিকদের অভিমত বলে আমার মনে হয় না। গাযালীর মতে, দার্শনিকগণ দৈহিক হাশর অস্বীকার করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রাচীন দার্শনিকদের কোন মতামত দৃষ্ট হয় না।"

আসল কথা হলো মুসলিম সাধকগণ যদিও অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রমুখের দর্শনকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং তাঁদের দেয়া বিষয়াদি থেকে উপকৃত হন, কিন্তু একমাত্র পদার্থবিদ্যা এবং অংক শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁদের পুরোপুরি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। আল্লাহ্‌তত্ত্ব বিষয়ে গ্রীক দার্শনিকগণ এত পশ্চাদপদ ছিলেন যে, তাঁদের কাছে মুসলমানদের পাওয়ার মত কিছুই ছিল না। ইলমে কালামের বিশেষজ্ঞগণ গ্রীকদের আল্লাহ্‌তত্ত্বকে সব সময় হেয় চোখে দেখতেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া মুতাকাল্লিমদের ভক্ত ছিলেন না। এক স্থানে তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"মুতাকাল্লিমদের অধিকাংশ কথা বাজে।"

তা সত্ত্বেও তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

"অ্যারিস্টটল এবং মুতাকাল্লিমীন—উভয়ের ভাষ্য আমাদের সামনেই রয়েছে। মুতাকাল্লিমদের ভাষ্য অ্যারিস্টটল প্রমুখের চাইতে অনেকটা নিশ্চিত ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

'তাহাফাতুল্ ফলাসিফা' নামক গ্রন্থে ইমাম গাযালী নুবুওয়াত, মুজিযা, পরকালীন পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়াদিকে গ্রীক দর্শন বলে অভিহিত করেন। অথচ তা গ্রীক দার্শনিকদের অবদান নয়, তা হলো ইবনে সীনার আবিষ্কার। মূলত তা ইবনে সীনারও আবিষ্কার নয়, বরং তিনি প্রাচীন মুতাকাল্লিমদের গবেষণালব্ধ বিষয়কে কতকটা রদবদল করে নতুন মতবাদের আকারে পেশ করেন।

ইবনে তাইমিয়া 'আর্ রদ্দু-আলাল-মানতিক' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

'ইবনে সীনা আল্লাহ্তত্ত্ব, নুবুওয়াত, পুনরুত্থান এবং শরীয়ত সম্পর্কে যা বলেছেন, তা গ্রীক দার্শনিকদের ভাষ্য নয়। তাঁদের চিন্তাধারা সেই পর্যন্ত পৌঁছতেও পারেনি। এ বিষয়গুলো ইবনে সীনা মুসলমানদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হন।"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানবিজ্ঞানে সাধারণ্যে খ্যাত নন। এজন্য হয়তো তাঁর মতামত এ ব্যাপারে লোকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কিন্তু আল্লামা ইবনে রুশদের চিন্তাধারার ব্যাপারে এ প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ, মুসলমানদের মধ্যে তাঁর চাইতে বড় দার্শনিক আর কেউ পয়দা হয় নি। 'তাহাফা' নামক গ্রন্থে অনেক বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ইবনে সীনা এগুলো মুতাকাল্লিমদের নিকট থেকেই গ্রহণ করেন।" যেমন স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

"ফারাবী এবং ইবনে সীনা এ বিষয়ে আমাদের মুতাকাল্লিমদের অনুসরণ করেন।"

অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেন ঃ

"ইবনে সীনা এ পদ্ধতি মুতাকাল্লিমদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হন।"

## ইলমে কালামের অবদান

ইলমে কালামের যে অবদানটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তা হলো, বদৌলতে গ্রীকদের অনুকরণ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রীক দর্শন পৃথিবীতে এত বেশী প্রচলন লাভ করেছিল যে, সেই চিন্তাধারাকে ওহীর মতই মান্য করা হতো। মুসলমানেরাও সে দর্শনকে অনুরূপ চোখেই দেখতো এবং অ্যারিস্টটল ও প্লেটোকে 'জ্ঞান দেবতা'রূপে মনে করতো। ফারাবীর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যারিস্টটল সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আমি যদি তাঁর যুগে জন্মগ্রহণ করতাম, তবে তাঁর একজন যোগ্য শিষ্য হতাম।' বুআলী সীনা 'শিফা' নামক গ্রন্থে পরোক্ষভাবে বলেন, 'এত কাল অতিবাহিত হলো, কিন্তু অ্যারিস্টটলের গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানে বিন্দুমাত্র জ্ঞানও সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।'

যতদিন ইলমে কালামবিদগণ দর্শনকে সমালোচকের চোখে দেখেন নি, ততদিন গ্রীকদের এই একচ্ছত্র নেতৃত্ব কায়েম ছিল। নাযযামই সর্বপ্রথম অ্যারিস্টটল রচিত 'আত্‌তাবায়ে' নামক গ্রন্থের প্রতিবাদ লেখেন। অতঃপর জুব্বাই, অ্যারিস্টটল প্রণীত 'কওন-ও-ফাসাদ' এর খণ্ডনে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ সমালোচনা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইমাম গাযালী 'তহাফাতুল্ ফলাসিফা' রচনা করেন। আবুল বারাকাত তাঁর 'আল্‌মুতাবার' নামক গ্রন্থে গ্রীক দর্শনের অনেক ভুল প্রতিপন্ন করেন। ইমাম রাযী তো গাদা গাদা রচনাই জনসমক্ষে উপস্থিত করেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া নিছক দর্শনের সমালোচনায় চার খণ্ডবিশিষ্ট একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ রচনাগুলো যদিও ইলমে কালামের সমর্থনে রচিত হয়নি, তথাপি এগুলোর বদৌলতে লোকের মন থেকে গ্রীক দর্শনের প্রভাব বিমোচিত হয়। ফলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এর সমালোচনায় এগিয়ে আসেন এবং এর শত শত ভুল-ত্রুটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

অধিকাংশ ইওরোপীয় গ্রন্থকার লিখেছেন, সাধারণ মুসলমানরা অ্যারিস্টটলের অন্ধ অনুকারী। একজন গলাবাজ লেখক লিখেছেন, মুসলমানরা ছিল অ্যারিস্টটলের গাড়ীর কুলি। এইরূপ হীনমনা লোকদের উচিত, ফারাবী এবং ইবনে সীনার স্থলে আবুল বারাকাত, ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী, আমুদী এবং ইবনে তাইমিয়ার রচনাবলী পাঠ করা। মুসলমানরা কেবল দর্শনেরই নয়, গ্রীক যুক্তি-বিদ্যারও এমন সব ভুল-ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করেন, যেগুলো সম্পর্কে কারুর ধারণাও ছিল না।

আল্লামা মুরতাযা হোসাইনী 'এহ্ইয়াউল উলুম' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম যুক্তিবিদ্যার দোষ-ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করেন এবং তার অনেক পরস্পর বিরোধী ও বিবেক পরিপন্থী বিষয় তুলে ধরেন, তিনি হলেন আবু সাঈদ সীরাফী। অতঃপর কাজী আবুবকর, কাজী আবদুল জাব্বার, জুব্বাই, ইবনে জুব্বাই, আবদুল মায়ানী, আবুল কাসিম আনসারী এবং আরো অনেকে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বশেষে ইবনে তাইমিয়া এ বিষয়ে দুটি বিশেষ চমৎকার ছোট-বড় গ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে তাইমিয়ার কিতাব আমার ঘরে আছে। আমি অন্যত্র সেগুলোর বিষয়বস্তু পাঠকের সামনে পেশ করবো।

## আযাদী ঃ

ইলমে কালামের ইতিহাসে সবচাইতে বিস্ময়কর বস্তু হলো আব্বাসী শাসকদের দেয়া আযাদী এবং কালামপন্থীদের আযাদ চিন্তাধারা। বস্তুত আযাদীই ইলমে কালামকে উন্নতির এ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। কতক লোক ছিল, যারা পদে পদে এ প্রশ্ন তুলতো, "প্রশ্ন করা বেদাত।" যদি তাদের কথায় কর্ণপাত করা হতো, তবে আজ ইলমে কালামের অস্তিত্বই পাওয়া যেতো না। এই আযাদীর ফলেই এক শতাব্দীর মধ্যে নানা চিন্তাধারার জোয়ার বয়ে যায় এবং তা ক্রমাগত প্রসার লাভ করে। বহু নব নব সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। যদিও এ সম্প্রদায়গুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে পরস্পর বিরোধী ছিল, তথাপি তাদের মতামতের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। প্রত্যেকটি দল আপন ইচ্ছানুসারে মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম ছিল।

বিখ্যাত মুতাযিলী ওয়াসিল ইবনে আতা খলীফা মনসুরের সময় প্রত্যেক মুসলিম দেশে আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিসকে ইউরোপে, হাফ্‌স ইবনে সালেমকে খোরাসানে, কাসিমকে ইয়ামেনে, আইয়ুবকে জাযিরায়, হাসান ইবনে যাক্‌ওয়ানকে কুফায় এবং ওসমান তবীলকে আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করেন। তাঁর প্রতিনিধিগণ প্রত্যেক স্থানে স্বাধীন মতবাদ প্রচার করেন এবং বিরোধীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন।

আব্বাসীদের দরবারে পার্সী, মানী মতাবলম্বী, ইহুদী, খ্রীস্টান— প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক ধর্মের বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকতেন। দরবারেই বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হতো। অনেক সময় স্বয়ং খলীফাও পক্ষ অবলম্বন করতেন। এ সত্ত্বেও লোকেরা পুরোপুরি আযাদী এবং নির্ভীকতার সাথে আপন মনোভাব প্রকাশ করতো। তারা এটা চিন্তাও করতো না যে, খলীফার ধর্ম কি, তাঁর ভাবধারাই বা কি ?

তৃতীয় শতাব্দীতে ইবনুর রাবেন্দী নামক একজন লোক ছিলেন (মৃত্যু ৩৪৫ হিজরী)। তাঁর মূল নাম ছিল আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া। তিনি একজন বড় বিজ্ঞ লোক ছিলেন। ইবনুল খাল্লিকান তাঁকে 'বিখ্যাত আলেম'রূপে অভিহিত করেন এবং বলেন, তিনি একশ' চৌদ্দটি গ্রন্থ রচনা করেন।

জানি না, তিনি কেন যে ধর্মান্তরিত হলেন এবং কেন-ই-বা ইসলামের বিরুদ্ধে এত গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন ? তিনি 'কিতাবুত্তাজ' নামক গ্রন্থে সমস্ত তওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন। কুরআন মজীদের বিরুদ্ধেও (নাউযুবিল্লাহ্) একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। 'ফরীদ' নামক অপর একটি গ্রন্থে সমস্ত নবীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনয়ন করেন। 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থে তাঁর কোন কোন অভিযোগ উদ্ধৃত করা হয়। এসব হীনমন্যতা সত্ত্বেও তাঁকে হত্যাও করা হয়নি, শাস্তিও দেয়া হয়নি, দ্বীপান্তরও করা হয়নি। কেবল ওলামাই তাঁর নাস্তিক্যধর্মী গ্রন্থসমূহ নাকচ করেন এবং তাঁর অভিযোগসমূহের বিরূপ সমালোচনা করেন, এ ছাড়া আর কিছু করা হয়নি।

আযাদী এবং স্বাধিকারের এর চাইতে বড় সাক্ষ্য আর কি হতে পারে ? ইওরোপবাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে হীনমন্যতা এবং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে থাকে। কিন্তু তারা নিজেদের সেই পুরনো যুগ ভুলে গেছে, যখন যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রয়োগের অজুহাতেও লোকদের জীবিত অবস্থায় দগ্ধ করা হতো। ইওরোপের আদিযুগে যেসব বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্ম বিরোধিতার অভিযোগ আনীত হয় এবং তাঁদেরকে কারাবরণও করতে হয়। দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারকও তাদের ধরাপাকড় থেকে রেহাই পান নি।

## ইলমে কালামের অপূর্ণতা এবং তার কারণ

ইলমে কালাম যদিও বারশ' বছর স্থায়ী ছিল, কিন্তু তা পূর্ণতার শিখরে উন্নীত হতে পারেনি। কারণ উৎপত্তির সাথে সাথেই তাকে নিত্য কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্ত মুহাদ্দিস এবং ইমাম আবু হানিফা ছাড়া সমস্ত মুজতাহিদ এর প্রতি বৈরিতা পোষণ করতেন। আব্বাসী শাসকদের সমর্থনের ফলে তা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু জনপ্রিয় হতে পারেনি। যে লঘিষ্ঠ দলটি তা সমর্থন করতেন এবং এর উন্নতি কামনা করতেন, তাঁরা মুতাযিলী বলে অভিযুক্ত ছিলেন। 'আহলে সুন্নাত ও জামায়াত' অনেক কাল পর এদিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু তাঁরা দর্শন এবং বুদ্ধিবাদের সাথে পরিচিত ছিলেন না। কারণ তাঁদের কাছে তখনও দর্শন কেন যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করাও ছিল অবৈধ। ইমাম গাযালীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে যুক্তিবিদ্যা ধর্মপ্রিয় সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে পরিচিত হয়। এই পরিচিতির ফলে দর্শনও তাঁদের আসরে স্থান লাভ করে। দর্শন এবং যুক্তিবাদের সংমিশ্রণে ইলমে কালাম নবরূপ ধারণ করতে আরম্ভ করে এবং এতে ইমাম রাযী ও আমুদীর ন্যায় লোকের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। কিন্তু তাতার থেকে হঠাৎ এমন এক জোরালো ঝড় উঠলো, যার ফলে ইসলামের যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। প্রাচ্য তো আর মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারলো না। সিরিয়া এবং রোম দেশ অবশ্য পায়ের উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সেই মাটিতে প্রাচ্যের মন-মেযাজ সৃষ্টি হওয়া ছিল মুশকিল। অচিরে সমগ্র মুসলিম জাতির ইজতেহাদ-শক্তি লোপ পেলো। আশয়ারীদের ভগ্ন ইমারতের কিছুটা চিহ্ন অবশিষ্ট রইলো। পরবর্তী মুতাকাল্লিমগণ তাতে জোড়া-তালি দিতে থাকেন। সেই ইমারতের যতটুকু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে, সেটা দিয়েই আজ সকলেই চক্ষু জুড়ায়। ইমাম গাযালী এবং ইবনে রুশ্দ এতে যে সব কারুকার্য করেছিলেন, তা জানে কয়জন?

## ইলমে কালামের অপূর্ণতার সবচাইতে বড় কারণ

ইলমে কালামের অপূর্ণ থাকার সবচাইতে বড় কারণ হলো—স্বাধীন ভাবধারা প্রকাশের অনধিকার। আব্বাসী শাসনামলে স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকার ছিল। সেজন্য তাঁদের প্রশংসাও করেছি। কিন্তু আদতে

এই স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ছিল সরকারী নির্দেশ পর্যন্তই। সরকারের দিক থেকে মতামত প্রকাশে কোন বাধা বিপত্তি ছিল না। কিন্তু যে বিষয় জনগণের বোধগম্য ছিল না, তা ব্যক্ত করা হলে তারা প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়াতো। সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে কেবল প্রাণ বাঁচানো যেতো। কিন্তু এ হস্তক্ষেপের মূল্যই বা কি? সর্বসাধারণ যাকে ইচ্ছা, তাকে কোণঠাসা করে রাখতে পারতো, গালি দিতে পারতো এবং শান্তিময় জীবন যাপনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারতো। তদুপরি অপর একটি আপদ ছিল এই যে, প্রকাশ্যবাদী ফকীহ্গণও সর্বসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করতেন এবং কুফ্রের ফতোয়া দিয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতেন। ইমাম গাযালী, আমুদী, রাযী, ইবনে রুশ্দ, শহরিস্তানী এবং ইবনে তাইমিয়ার জীবন-চরিত পূর্বেই আপনারা পাঠ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনও ফকীহ্দের ফতোয়ার হামলা থেকে রেহাই পান নি। অথচ তাঁরা স্বাধীন চিন্তাধারা খুব কমই প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরা যা কিছু বলতেন, শত দিক ভেবেচিন্তেই বলতেন।

ইমাম গাযালী প্রমুখের রচনাবলী পাঠ করলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, তাঁদের অন্তর ছিল শত শত ধ্যান ধারণায় ভরা। কিন্তু সেগুলো মুখে আনার মত অধিকার তাঁদের ছিল না। 'জওয়াহিরুল্-কুরআন' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন, "কোন কোন গ্রন্থে আমি আমার কিছু আদত ধারণা বর্ণনা করেছি। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে একথাও বলেছি যে, বিশেষ উপযুক্ত লোক ছাড়া যেন সেগুলো অন্য কারুর হাতে না পড়ে। ইমাম সাহেব এবং অন্যান্য সুধীদের এ ধরনের উক্তি এ গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে বর্ণনা করবো।

এসব কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ ইমামদের প্রকৃত ধারণা হয়তো মোটেই প্রকাশিত হয়নি, নয়তো প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কেউ তা বুঝেছে, আবার হয়তো অনেকেই তা বুঝেনি।

মুতাযিলীদের যা বলার ছিল, তা তাঁরা স্পষ্টতই বলেছেন। কেননা সর্বসাধারণের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই তাদের পরোয়াও করতে হয়নি। তাঁরা উপদেশও দিতেন না, ফতোয়াও প্রচার করতেন না, ইমামত্ও করতেন না। এর পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, আজ তাঁদের একটি রচনাও বেঁচে নেই। বিভিন্ন

গ্রন্থে যদি তাঁদের জীবনচরিত এবং মতবাদের উল্লেখ না থাকতো, তবে আজ এটা বলাও মুশকিল হতো যে, তাঁরা পৃথিবীতে কখনো বিদ্যমান ছিলেন কি না?

## ইলমে কালামের বিষয়বস্তু

ইলমে কালাম গোড়ার দিকে সংক্ষিপ্ত ও সরল ছিল। কিন্তু ক্রমশ এতে অনেক বিষয় জুড়ে দেয়া হয়। বর্তমানে ইলমে কালাম বলতে মোটামুটি দু'টি বস্তুকে বুঝায়ঃ

১. ইসলামী আকাইদের প্রতিষ্ঠা।

২. নাস্তিকদের দর্শন ও অন্যান্য ধর্ম নাকচ করা।

## অসত্য ধর্মের অসারতা প্রমাণ

ইলমে কালামে অসত্য ধর্মের অসারতা প্রমাণ প্রথম থেকেই আরম্ভ হয়। কেননা, আব্বাসী খলীফাদের দরবারে প্রত্যেক ধর্মের সুধী থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হতো।

মুসলিম দার্শনিকদের পুরোধা ইয়াকুব কিন্দী সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কয়েকটি পুস্তিকা লিখেন। ইবনুন্ নাদিম 'আল-ফিহ্‌রিস্ত' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলোর নাম উল্লেখ করেনঃ

১. 'রিসালাতুন-ফির-রদ্দে আলাল্ মানানিয়াহ্'—পার্সীদের এক বিশেষ সম্প্রদায়—'মানানিয়ার' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

২. 'রিসালাতুন-ফির-রদ্দে আলাস্ সান্‌ভিয়াহ্'—দুই স্রষ্টার সমর্থক সান্‌ভিয়াহ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

৩. 'রিসালাতুন-ফির-ইহ্‌তিরাসে-মিন-খাদায়িস্ 'সুফাস্তাইন' 'সোফাস্তাইয়াহ্' একটি সম্প্রদায়, যারা প্রত্যেক বস্তুতে সন্দেহ পোষণ করতো। এই পুস্তিকাটি তাদের ভ্রম প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে লিখিত।

ইয়াকুব কিন্দীর পর জাহিয্ খ্রীস্টান এবং ইহুদী ধর্মের খণ্ডনে বিভিন্ন গ্রন্থে রচনা করেন। এর পরেও এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়। তন্মধ্যে 'কাশফুয্‌যুনুন' এর রচয়িতা তাঁর গ্রন্থে সংক্ষিপ্তরূপে 'আন্‌নসিহাতুল্ ঈমানিয়াহ্' 'তোহফাতুল্ আরীব' 'তাজাইউল' 'ইনতি-সারাত-এ-ইসলামিয়া' নামক গ্রন্থাদি ছাড়াও আবদুল জব্বার মাগরিবী, কাজী আবুবকর, ইমাম জুওয়াইনী, ইবনুত তাইয়েব তারসসী,

ইবনে এওয় দামইয়াতী প্রমুখের রচনাবলীর উল্লেখ করেন। আল্লামা ইবনে হাযম্ 'আল-মিলাল-অন-নিহাল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এ দু'টি ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেন। যাঁরা ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মের খণ্ডনে গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে দু'ব্যক্তির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন: আবদুল্লাহ্ তরজুমান এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাযালা। ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাযালা প্রথমে ছিলেন খ্রীস্টান। তিনি ওলিদ মুতাযিলীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষকের হিদায়েত এবং যুক্তি-শক্তিতে প্রভাবিত হয়ে তিনি হিজরী ৪৬৬ সালে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি ইন্‌জিল এবং তওরাতে দক্ষ ছিলেন। এ দু'টি কিতাবে রসূল করীম সম্পর্কে যে সব ভবিষ্য-দ্বাণী রয়েছে, সেগুলো নিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। এটাই বোধ হয় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম রচনা।

ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি ইল্‌ইয়ার নামে পুস্তিকাকারে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। ইল্‌ইয়া ছিলেন সে সময়কার একজন বিশপ্।

ইবনে জাযালা তাঁর রচনায় যুক্তি দিয়ে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন যে, খ্রীস্টান এবং ইহুদিগণ জেনে শুনেই রসূল করীম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো গোপন করে এবং তা মিথ্যা বলে ঘোষণা করে।

আবদুল্লাহ্ তরজুমানও প্রথমে খ্রীস্টান ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কারণ ছিল এই যে, তিনি তওরাত ও ইনজীলে রসূল করীম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ দেখে ওস্তাদের নিকট এর হকিকত জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর ওস্তাদ ছিলেন সে সময়কার একজন বড় পাদরী। তিনি বললেন, "এতে কোন সন্দেহ নাই যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী রসূল করীমের আগমনবার্তা বহন করছে। কিন্তু পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আমরা তা প্রকাশ করতে পারছি না। তোমাকে আল্লাহ্ তওফীক দিলে মুসলমান হয়ে যাও।" ওস্তাদের উপদেশ অনুসারে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং 'তুহ্‌ফাতুল্ আরীব' নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাতে তিনি এসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রসূল করীমের আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা প্রমাণ করেন।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে এবং তা আমি পাঠ করেছি।

ইমাম গাযালীও এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেটি আমি পড়েছি। ইনজীল এবং তওরাতে যে সব বিকৃতি সাধিত হয়েছে, উপরিউক্ত গ্রন্থাবলীর রচয়িতাগণ দু'টি যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করে দেখান। একটি হলো—এসব আসমানী কিতাবের বিভিন্ন সংস্করণে এমন ভীষণ গরমিল দেখা যায়, যাতে কোন প্রকারেই সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। তাই এ সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, এগুলোর কোনটাই নির্ভরযোগ্য নয়। দ্বিতীয় যুক্তি হলো—এ গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ বিষয় বিবেক বিরোধী। তাই এগুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত হতে পারে না। পূর্বসূরী ওলামা মনে করতেন, বিবেক বিরোধী বাণী কখনো আল্লাহ্ প্রদত্ত হতে পারে না। এটা লক্ষণীয় বিষয়।

## দর্শনের খণ্ডন

মুতাকাল্লিমদের দর্শন রদের পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যে বিষয়গুলো ইসলাম ধর্ম বিরোধী, কেবল তা নাকচ করা। কিন্তু তাঁরা এ গণ্ডি ছাড়িয়ে যান। তাঁরা গ্রীক দর্শনের ভ্রম উদঘাটনেরও প্রয়াস পান। এর কারণ হল এই যে, গ্রীক দর্শন যখন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলো, তখন লোকেরা সেদিকে তড়িৎ গতিতে ধাবিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দর্শনের ভক্ত হয়ে উঠে। দর্শনের প্রতিটি বিষয়ের উপর তাদের সুনজর পড়তে আরম্ভ করে। দর্শনের দুর্বল বিষয়গুলোও তাদের কাছে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাস্য বলে মনে হতে লাগলো। এ সবের মধ্যে অল্প কিছু বিষয় এমনও ছিল, যা বাহ্য দৃষ্টিতেই ইসলাম বিরোধী। মুতাকাল্লিমগণ যখন বিশেষ করে এ বিষয়গুলো বাতিল বলে ঘোষণা করলেন, তখন দর্শন ভক্তগণ মনে করলো যে, যদি এর অন্যান্য বিষয় যথার্থ হয়, তবে এর গুটি-কতক বিষয় দুর্বল এবং ইসলাম বিরোধী হবে কেন?

এ অবস্থার নিরিখে মুতাকাল্লিমগণ দর্শনের প্রতি ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং এর শত শত ভ্রম উদ্‌ঘাটন করেন। পূর্ববর্তী মুতাকাল্লিমগণ প্রয়োজন-পরিমাণে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তিগণ এবং বিশেষ করে ইমাম রাযী দর্শনের আগাগোড়া কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখেন। দর্শনের এই সমালোচনামূলক অংশকে যদি পৃথক করা যায়, তবে তা হবে সত্যিকার একটি

স্বতন্ত্র দর্শন। অবসর পেলে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছা আছে। তবে এটাও বলছি যে, এ অংশটি মূলত ইলমে কালামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

## মুতাকাল্লিমগণ গ্রীক দর্শনের অনুধাবনে যে সব ভুল করেছেন

সত্যিকার বলতে গেলে, মুতাকাল্লিমগণ গ্রীক দার্শনিকদের ভাবধারা অনুধাবনে অনেক ভুল করেছেন। তার কারণ হলো, মুসলিম দার্শনিক (যেমন ইবনে সীনা প্রমুখ) গ্রীক ভাষা জানতেন না। হোনাইন ও ইসহাক-অনূদিত দর্শনের উপরই তাঁদেরকে নির্ভর করতে হতো। ইবনে সীনা এ ভুল করেছেন সবচাইতে বেশী। আল্লামা ইবনে রুশদ্ 'তাহাফাতুত তাহাফা' নামক গ্রন্থের বহু স্থানে একথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন। ভুলের আরো একটি কারণ ছিল এই যে, অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যাকার হিসেবে ইবনে সীনার অত্যধিক খ্যাতি ছিল। যা কিছু তাঁর কণ্ঠ থেকে বের হতো, সেটাকেই লোকেরা অ্যারিস্টটলের হুবহু অভিমত বলে মনে করতো। এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যার সাথে অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর মতবাদের কোন সম্পর্কই নেই। অথচ ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী এবং সমস্ত মুতাকাল্লিমগণ ইবনে সীনার কথার উপর ভর করে সেগুলোকে অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর অভিমত বলে প্রচার করেন এবং সেগুলোর প্রতিবাদ করে মনে করলেন যে, তাঁরা গ্রীক দর্শনেরই প্রতিবাদ করেছেন। অথচ সেগুলো ছিল স্বয়ং ইবনে সীনার আবিষ্কার।

হাকীম আবু নসর ফারাবীর 'আল্-জাম্‌য়ু-বাইনার-রাআইন' নামক পুস্তিকাটি বর্তমানে ইউরোপে প্রকাশিত হয়েছে। এতে এ ধরনের অনেক ভুলের সন্ধান পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে রুশদও 'তাহাফাতুত্ তাহাফা' নামক গ্রন্থে এ ধরনের ভুলের কথা উল্লেখ করেন। তাই আমি এ দুটি গ্রন্থ থেকে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করছি।

১. এ অভিমত সাধারণ্যে প্রচলিত আছে যে, অ্যারিস্টটল বিশ্বের চিরন্তনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ তিনি 'উসুলোজিয়া' নামক গ্রন্থে পরিষ্কার বলেন যে, আল্লাহ্ অনস্তিত্ব (শূন্যতা) থেকে মৌল উপাদান সৃষ্টি করেন। অতঃপর মৌল উপাদান থেকে বিশ্বের

যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে প্লেটো 'তাইমাবুস' এবং 'বুলিতা' নামক গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, আল্লাহ্ অনস্তিত্ব থেকেই এসব বস্তু সৃষ্টি করেন।

২. কথিত আছে যে, প্লেটো 'আলম-এ-মিসাল' (সদৃশ জগত) এর সমর্থক ছিলেন। অর্থাৎ যে সব বস্তু আমাদের এ জগতে আছে, অনুরূপভাবে অপর একটি জগতেও সেসব বিদ্যমান রয়েছে। কেবল পার্থক্য হলো—এগুলো জড়াত্মক, আর সেগুলো অজড় এবং সেগুলোর কোন বিনাশনেই। কিন্তু সাধারণ লোকের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। প্লেটো বলতে চেয়েছেন যে, সমগ্র জগতে যা কিছু আছে বা ভবিষ্যতে হবে, সব কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞান-জগতে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কোন কারিগর যদি একটি ঘর প্রস্তুত করতে চায়, তবে সেই ঘরের নকশা তার অন্তরে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকে। এটাকেই প্লেটো 'আলম-এ-মিসাল" বা সদৃশ জগত বলে অভিহিত করেছেন।

৩. সাধারণতঃ বলা হয় যে, অ্যারিস্টটল এবং প্লেটো পরকালীন শাস্তি ও প্রতিদান অস্বীকার করেন। এ ধারণা ভুল। সিকান্দরের (আলেকজাণ্ডার) মৃত্যুর পর তাঁর মায়ের নিকট অ্যারিস্টটল যে পত্রখানি লিখেন, তার একটি বাক্য হলো এই ঃ

"এমন কাজ (বিলাপ) করবেন না, যাতে আপনি কিয়ামতের দিন সেকান্দরের সাক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হন।"

প্লেটো 'কিতাবুস সিয়াসাহ' নামক গ্রন্থের শেষভাগে পুনরুত্থান, ইনসাফ, দাড়িপাল্লা, প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেন। (আল্-জাময়ু-বাইনার রাআইন্' থেকে গৃহীত)

৪. সাধারণত বলা হয় যে, দার্শনিকগণ মুজিযা অস্বীকার করেন। তাঁরা ওহী, স্বপ্ন ইত্যাদির যে ব্যাখ্যা দেন, তা ইসলামী আকিদার পরিপন্থী। কিন্তু আল্লামা ইবনুর রুশদ্-এর মতে মুজিযা এবং স্বপ্ন সম্পর্কে দার্শনিকগণ কোন অভিমতই ব্যক্ত করেন নি।

আদত কথা হলো, ইবনে সীনা 'শিফা' এবং 'ইশারাত' নামক গ্রন্থে নবুওয়াত, মুজিযা, কিয়ামত, ওহী ও ইলহামের যে হকিকত বর্ণনা করেন, তা ছিল যুক্তিভিত্তিক। এ গ্রন্থ দুইটির যাবতীয় বিষয়বস্তু ছিল গ্রীক দর্শন থেকে গৃহীত। তাই লোকেরা মনে করলো যে, উপরিউক্ত ধর্মীয় বিষয়গুলোও গ্রীক দর্শন থেকেই গৃহীত।

৫. প্রচলিত ধারণা হলো, অ্যারিস্টটল প্রমুখের মতে "একটি বস্তু হতে কেবল একটি বস্তুই উৎপন্ন হতে পারে। এ নীতি অনুসারে বিশ্ব সৃষ্টির যে ক্রমবিকাশ ঘটলো, তার বিন্যাস হলো এই যে, আল্লাহ্ কেবল 'চালক বুদ্ধি' (আকল্-এ-ফা'য়াল) সৃষ্টি করেন। অতঃপর চালক বুদ্ধি 'দ্বিতীয় বুদ্ধি' এবং 'প্রথম আকাশ' সৃষ্টি করে। এভাবে ক্রমানুসারে সমগ্র দুনিয়া এবং নভোমণ্ডলের সৃষ্টি হয়।" এই যে ধারণা—এটা অ্যারিস্টটলের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সৃষ্টি নীতি এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো ইবনে সীনারই আবিষ্কার। আল্লামা ইবনে রুশ্দ 'তাহাফাতুত্ তাহাফা' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি অ্যারিস্টটলের প্রকৃত অভিমত ব্যক্ত করে শেষ পর্বে বলেন ঃ

> দেখুন! লোকেরা দার্শনিকদের সম্পর্কে কেমন ভুল ধারণা পোষণ করছে? তাদের এ ধারণা কতটুকু যুক্তিযুক্ত, তা আপনাদের খতিয়ে দেখা কর্তব্য। আপনাদের আরো উচিত, ইবনে সীনা প্রমুখের গ্রন্থ পাঠ না করে পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করা। কেননা, ইবনে সীনা প্রমুখ আল্লাহ্তত্ত্ব সম্পর্কে দার্শনিকদের মতামত বর্ণনায় গড়বড় করে ফেলেছেন।

ইবনে রুশ্দ 'দশ আত্মা বা ফেরেশতা' (উকুল-এ-আশারা) এর 'কার্যকারণ' সম্পর্কে বলেন ঃ

ইবনে সীনা বর্ণনা করেন যে, 'দশ আত্মা বা ফেরেশতা' এর একটি অপরটি থেকে উৎপন্ন। অথচ দার্শনিকগণ এ সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নন।

৬. দর্শন গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে, দার্শনিকদের মতে, আল্লাহ্র সত্তাই সৃষ্টির কারণ। অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টি আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন ব্যাপার ছিল না, তা ছিল এমনি ধরনের, যেমন সূর্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলো বিকীর্ণ হয়। এই অভিমতের জন্য ইমাম গাযালী এবং ইমাম রাযী গ্রীক দার্শনিকদের বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ আনয়ন করেন। অথচ, মূলত এগুলো দার্শনিকদের অভিমতই ছিল না। ইবনে রুশ্দ 'তাহাফা' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

৭. ইবনে সীনা সমগ্র অস্তিত্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন ঃ (১) অনিবার্য সত্তা (আল্লাহ্) (২) পরোক্ষভাবে অনিবার্য, প্রত্যক্ষ

ভাবে সম্ভাব্য। (৩) সম্ভাব্য। শেষ যুগীয় মুতাকাল্লিমদের মতে. এগুলো ছিল অ্যারিস্টটলের অভিমত। অথচ আসল ব্যাপার হলো এই যে, পরোক্ষ অস্তিত্ব বলে কিছু আছে—এমন বিশ্বাসই তাঁদের ছিল না। তাঁদের মতে, যে অস্তিত্ব সম্ভাব্য, তা কোন প্রকারেই অনিবার্য হতে পারে না।

গ্রীক দার্শনিকগণ কেবল দুই প্রকার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ঃ অনিবার্য এবং সম্ভাব্য। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বকে চিরন্তন এবং অনিবার্য বলে মনে করতেন, তাঁরা একে সত্তাগতভাবেই অনিবার্য মনে করতেন এবং তাকে আল্লাহ্‌র কার্য বলে পরিগণিত করতেন না। আর যাঁরা সত্তাগত অনিবার্য বলে বিশ্বাস করতেন না, তাঁরা বিশ্বকে নশ্বর বলে মনে করতেন। ইবনে রুশ্‌দ 'তাহাফা' নামক গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 'আর রদ্দু-আলাল-মানতিক' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি বারবার উল্লেখ করেন।

মোটকথা, এ ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলোকে মুতাকাল্লিমগণ অ্যারিটস্টল এবং প্লেটোর অভিমত বলে মনে করেন। অথচ সেগুলো ছিল আবু আলী সীনা প্রমুখেরই আবিষ্কৃত।

যে মতবাদগুলো বস্তুতই গ্রীক দার্শনিকদের নিকট থেকে গৃহীত ; মুতাকাল্লিমগণ ভুলবশত সেগুলোকে ইসলাম বিরোধী বলে মনে করেন। অথচ সেগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই। সেগুলো 'হ্যাঁ'বোধক হোক, আর 'না'বোধক হোক, তাতে ইসলামের কিছু আসে যায় না। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি বিষয় পেশ করা হল ঃ

| দার্শনিকদের অভিমত | আশায়েরাবাদী মুতাকাল্লিমদের অভিমত |
| --- | --- |
| ১. অস্তিত্ব বলতে সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্বকে সমভাবে বুঝায়। | ১. তা বুঝায় না, বরং প্রত্যেকটি সৃষ্টির অস্তিত্ব পৃথক। |
| ২. আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তাঁর পরম সত্তাভুক্ত। সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্ব তাঁর সত্তা বহির্ভূত। | ২. অনিবার্য এবং সম্ভাব্য—উভয় শ্রেণীর অস্তিত্ব বস্তুর সত্তাভুক্ত। |
| ৩. বস্তুর অস্তিত্ব কাল্পনিকও হতে পারে। | ৩. হতে পারে না। |

| | |
|---|---|
| ৪. অনিবার্যতা, অবাস্তবতা এবং সম্ভাব্যতা—এসব বস্তুর মৌলিক গুণ। | ৪. আপেক্ষিক গুণ। |
| ৫. সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্বের মূলে রয়েছে মুখাপেক্ষিতা ও সম্ভাব্যতা। | ৫. সম্ভাব্যতা নয়, বরং বস্তুর অস্থায়িত্ব হলো তার সত্তা বহির্ভূত। |
| ৬. পরমূর্ত পদার্থ পরমূর্ত পদার্থের সাহায্যে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। | ৬. পারে না। |
| ৭. পরমূর্ত পদার্থ স্থায়ী হতে পারে। | ৭. অনবরত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। |
| ৮. সংখ্যা ও পরিমাণ কালের অঙ্গ। | ৮. এগুলোর কোনটারই অস্তিত্ব নেই। |
| ৯. শূন্যজগত অবাস্তব। | ৯. সম্ভব। |
| ১০. অবিভাজ্য পরমাণুর অস্তিত্ব নেই। | ১০. অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেকটি জড় পদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুর যৌগিক। |
| ১১. প্রত্যেকটি জড়বস্তু মৌল উপাদান এবং আকারের যৌগিক। | ১১. মৌল উপাদান বলতে কিছুই নেই। |

এ ধরনের আরো অনেক বিষয় আছে, যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এবং যুক্তিযুক্ত প্রমাণ 'শরহে মাওয়াফিক্' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

মুতাকাল্লিমগণ এসব বিষয়কে ইসলাম ধর্মের সাথে কিভাবে জড়ালেন, তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করছি ঃ

দার্শনিকদের মতে, পদার্থ যৌগিক বস্তু, যা মৌল উপাদান এবং আকারযোগে গঠিত। মুতাকাল্লিমগণ বলেন, পদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। এতে আপাতদৃষ্টিতে সংমিশ্রণ আছে বলে মনে হলেও মূলত কোন সংমিশ্রণ নেই। এখান থেকে মুতাকাল্লিমগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সমস্ত পদার্থের হকিকত এক। কেননা পদার্থ হলো অবিভাজ্য পরমাণুসমূহের নামান্তর মাত্র এবং

সেগুলো একই হকিকত বিশিষ্ট। এ বিষয়টিকে মুতাকাল্লিমগণ 'পদার্থ-সাদৃশ্য' বলে অভিহিত করেন। পদার্থ-সাদৃশ্য সম্পর্কে আল্লামা তাফতাযানী 'শরহে মওয়াকিফ' গ্রন্থে বলেন ঃ

"এটা একটি বুনিয়াদ। এর উপর ইসলামের অনেক নীতি, যেমন আল্লাহ্‌র সর্বশক্তি বিশিষ্ট সত্তার প্রমাণ, নবুওয়াত ও কিয়ামতের হাল-হকিকত—অনেক কিছু নির্ভর করে।"

মুতাকাল্লিমগণ এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে উপরিউক্ত বিষয়টিকে ধর্মের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করেন। এটা পূর্বেও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি পদার্থ একই হকিকতবিশিষ্ট। সুতরাং তদনুসারে প্রত্যেক পদার্থের একই গুণবিশিষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো স্বয়ং পদার্থ-উদ্ভূত নয়। বরং তা হলো এক সর্বশক্তিমান সত্তার সৃষ্টি এবং তাকেই আমরা আল্লাহ্ বলে অভিহিত করে থাকি।

অলৌকিক ঘটনাবলীর সত্যতা প্রমাণও এ বিষয়টির উপর নির্ভরশীল। কেননা এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সকল জড়পদার্থ একই প্রকৃতিবিশিষ্ট। তাই একটি পদার্থে যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, তা স্বভাবত অন্য পদার্থেও বিদ্যমান থাকার কথা। যেমন আগুন যে নীতিতে দগ্ধ করে, সে নীতি অনুসারে পানিরও দগ্ধ করার কথা। এটাকেই বলা হয় মুজিযা।

বস্তুত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ উপরিউক্ত বিষয়টির উপর নির্ভরশীল নয়। মুতাকাল্লিমদের একটি বড় দলও পদার্থ-সাদৃশ্যের সমর্থক নন। এ সত্ত্বেও তাঁরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং নবীদের অলৌকিকত্বের সমর্থক।

খুব টানা হেঁচড়া করলে ধর্মের সাথে উপরিউক্ত বিষয়টির যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। এ বিষয়টির কথা বাদই দিলাম। যেসব বিষয়ের সাথে আপাতদৃষ্টিতে ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, বস্তুত সেগুলোর সাথেও ধর্মের তেমন বিশেষ সম্পর্ক নেই। যেমন বিশ্বের চিরন্তনতা। মুতাকাল্লিমদের মতে, এটা সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী। অথচ কুরআন-হাদীসে এর চিরন্তনতা বা অচিরন্তনতার প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই। মুতাকাল্লিমদের যুক্তি হলো—বিশ্ব যদি অবিনশ্বর হয়,

তবে আল্লাহ্ তার স্রষ্টা হতে পারেন না। কিন্তু দার্শনিকদের মতে চিরন্তনতা এবং নশ্বরতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাঁদের নিকট বিশ্ব অবিনশ্বরও বটে এবং তা আল্লাহ্ সৃষ্টও বটে। মানুষের হাত যখন নড়ে, তখন কলমও নড়ে। উভয়ের গতির সময় একই। অথচ হাতের স্পন্দনের ফলেই কলমের স্পন্দন সৃষ্টি হয়।

অন্য একটি উদাহরণ হলো, মুতাকাল্লিমদের ধারণায় দার্শনিকগণ আল্লাহর খণ্ডজ্ঞানে বিশ্বাসী নন। আর এটা অস্বীকার করার মানে হলো পরিষ্কারভাবে কুরআন অস্বীকার করা। কিন্তু ব্যাপারটি মূলত তা নয়। আদত কথা হলো, দার্শনিকগণ মূল বিষয়টি অস্বীকার করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ সমস্ত খণ্ড জ্ঞানেরও অধিকারী। তবে তাঁরা এটা সমর্থন করেন না যে, খণ্ড বস্তু যখন বাস্তব রূপ লাভ করে, কেবল তখনই আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জ্ঞাত হন, এবং পূর্বে নয়। কেননা, এতে আল্লাহ্র জ্ঞান অচিরন্তন হয়ে দাঁড়ায়।

## নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন

আপনারা পূর্বের বর্ণনা থেকে অনুমান করেছেন যে, দার্শনিক, ইহুদী ও খ্রীস্টানদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইলমে কালামকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কেবল নাস্তিকদের মোকাবিলা করতে গিয়েই মুতাকাল্লিমদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। 'মুলহিদ' বা নাস্তিকরা কোন ধর্মেই বিশ্বাসী ছিল না। তারা প্রত্যেক ধর্মেরই সমালোচনা করতো। ইসলামের প্রত্যেকটি নীতির প্রতি তাদের আক্রোশ ছিল। তবে কুরআন মজীদের প্রতি ক্ষোভ ছিল সবচাইতে বেশী। তারা কুরআন মজীদ সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন তোলে, ইমাম রাযী তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' নামক গ্রন্থের স্থানে স্থানে সম্প্রদায়ের নামধামসহ সেগুলোর উদ্ধৃতি দেন। যেমন কুরআন মজীদে হযরত সুলাইমান, হুদ্‌হুদ্, বিলকিস এবং পিপড়া সম্পর্কে যে সব ঘটনার উল্লেখ রয়েছে এবং সে সম্পর্কে নাস্তিকদের যে সব সন্দেহ ছিল, ইমাম রাযী তাঁর তফসীরে সে সব বিষয় তুলে ধরেন।

## নাস্তিকদের সন্দেহ

১. হুদ্‌হুদ্ এবং পিঁপড়া কি করে জ্ঞানাত্মক কথাবার্তা বলতে পারে?

২. হযরত সুলাইমান ছিলেন সিরিয়ায়। সেখান থেকে হুদহুদ কি করে এক নিমিষে ইয়ামেনে গেলো, আবার ফিরেও এলো ?

৩. হযরত সুলাইমান সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি সমস্ত পৃথিবীর, বরং জিনদেরও বাদশাহ্ ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি বিলকিসের ন্যায় শাসনকর্তার নাম-নিশান পর্যন্ত জানতে সক্ষম হলেন না কেন ?

৪. হুদহুদ কি করে জানতে পারলো যে, সূর্যকে সেজদা করা অবৈধ এবং কুফরী কাজ ?

আল্লামা ইবনে হায্মের সময় আবদুল্লাহ্ ইবনে শানিফ্ নামক একজন বিখ্যাত নাস্তিক ছিল। ইবনে হায্মের সাথে তার বিতর্ক হয়। তিনি 'মিলাল ও নিহাল' নামক গ্রন্থে এ বিতর্কের উল্লেখ করেন।

সাক্কাকী 'মিফ্তাহ' নামক গ্রন্থের শেষভাগে একটি অধ্যায় সংযোজিত করেন এবং তাতে নাস্তিকদের সে সব অভিযোগের উত্তর দেন, যা রচনাশৈলীর দিক থেকে কুরআনের বিরুদ্ধে আনীত হয়। অন্যান্য রচনাবলীতেও নাস্তিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের পর্যাপ্ত জওয়াব দেখতে পাওয়া যায়। একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, আজ দর্শন এতখানি এগিয়ে গেছে, মানুষ সমালোচক ধর্মী হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে সন্দেহের পর সন্দেহের অবতারণা করা হচ্ছে, তা সত্ত্বেও ধর্মীয় বিষয়াদিতে আজকাল যেসব প্রশ্নের অবতারণ করা হচ্ছে, তার শক্তি, সূক্ষ্মতা এবং সংখ্যার দিক থেকে আগেকার নাস্তিকদের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের তুলনায় কোন অংশে অতিকতর জটিল নয়।

ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে নবুয়তের আলোচনায় আনুমানিক ষাট পৃষ্ঠা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা কেবল নাস্তিকদের উত্থাপিত অভিযোগের বর্ণনায় লিখিত। এমনিভাবে কুরআন মজীদের মুজিযা অস্বীকারকারীদের অভিযোগসমূহকেও তিনি 'নিহাইয়াতুল উকুল' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। এসব সন্দেহের নিরসন করাই হলো ইলমে কালামের আসল উদ্দেশ্য। নাস্তিকগণ কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনে, তা ছিল তিন ধরনের ঃ

১. কুরআন মজীদে এমন ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে, যা প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী। যেমন, অলৌকিক ঘটনা, জীবজন্তুর কথাবার্তা, পাহাড়ের তসবীহ্ পাঠ।

২. কুরআন মজীদে এমন অনেক বিষয় আছে, যা সংস্কারজনিত। যেমন, যাদুর প্রতিক্রিয়া, শয়তানের মানুষকে পেয়ে বসা।

৩. কুরআনে এমন অনেক বিষয় আছে, যা গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিরোধী। যেমন, সূর্যের কূপে ডুবে যাওয়া, ছয় দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হওয়া, পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থলে বীর্যের সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

এসব অভিযোগের উত্তরে মুতাকাল্লিমদের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। আশয়ারিগণ কুরআন মজীদের এসব বিষয় সমর্থন করেন এবং নাস্তিকদের আরোপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন। পূর্বসূরী মুতাকাল্লিমগণ এসব ব্যাপার অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, অবিশ্বাসকারিগণ কুরআন মজীদের অর্থ বুঝতেই ভুল করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমি কুরআন মজীদ সম্পর্কে অবিশ্বাস-কারীদের কয়েকটি অভিযোগ এবং সেগুলোর উত্তর পেশ করছি।

## প্রথম উদাহরণ

কুরআন মজীদে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ঃ

"ওয়ামা— কাতালূহূ—ওয়ামা — সালাবূহূ— অলাকিন্— শুব্বিহা লাহুম"। সাধারণ তফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখায় বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) নিহতও হন নি, শূলবিদ্ধও হন নি, বরং কোন একজন লোক তাঁর আকার ধারণ করে। লোকেরা তাকেই হযরত ঈসা মনে ক'রে শূলবিদ্ধ করে। এ ধারণার অনেক বিরূপ সমালোচনা করা হয়।

১. যদি এভাবে আকৃতি বদলে যায়, তবে কোন ব্যক্তি সম্পর্কেই এটা নিশ্চিত বলা যাবে না যে, এ কি সেই ব্যক্তি, না অন্য কেউ?

২. হযরত ঈসা (আঃ)-কে বাঁচানো যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হতো, তবে অন্যভাবে বাঁচাতে পারতেন, তাঁর জন্য একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে শূলবিদ্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল?

৩. হযরত ঈসা (আঃ) এর সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিব্রাইলকে নিয়োগ করেন। তাঁর কতটুকু শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন

ছিল, তা আল্লাহ্র অজানা থাকার কথা নয়। এ সত্ত্বেও তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে ইহুদীদের কবল থেকে বাঁচাতে পারলেন না। তাঁকে রক্ষা করার জন্য একজন নিরপরাধ ব্যক্তির আকৃতিকে হযরত ঈসার আকৃতিতে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন হলো।

ইমাম রাযী 'তফসীর-এ-কবীর' নামক গ্রন্থে এসব বিরূপ সমালোচনা উদ্ধৃত করেন এবং সেগুলোর উত্তরও দেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ সকলেই এটা সমর্থন করবে যে, সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে করিম, রহিম সকলকে একই আকৃতি বিশিষ্ট করতে পারেন। তা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কে কারুর এ ধারণা হয় না যে, তাদের পূর্বের আকৃতি হয়তো বদলে গেছে। এমনি-ভাবে বর্তমান আকৃতি সম্পর্কেও কারুর মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় না যে, হয়তো এ আকৃতি কোন সময় বদলে যাবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম রাযী বলেন, অন্য কোন উপায়ে যদি আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আঃ)-কে বাঁচাতেন, তবে মুজিযাটি প্রকাশ্য এবং রহস্যহীন ঘটনায় পরিণতি হতো এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়তো। কিন্তু মুজিযার উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, লোকেরা বাধ্য হয়ে তাঁর উপর ঈমান গ্রহণ করুক। ইমাম রাযী আশায়েরাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসব উত্তর প্রদান করেন।

কিন্তু অন্যান্য ধর্মের গবেষকগণ এ আয়াত নিয়ে গবেষণা করেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এ ভুল ব্যাখ্যার ফলেই বিভিন্ন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে। মুহাদ্দিস ইবনে হায্ম্ 'কিতাবুল-মিলাল-অন্‌নিহাল' নামক গ্রন্থে জোরালো ভাষায় উপরিউক্ত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন ঃ

> যদি কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির মনে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে এবং সে ব্যক্তি নবুওয়াতপ্রাপ্ত লোকটির আকৃতি নিরূপণ করতে গিয়ে বিভ্রাটে পরিণত হয়ে থাকে, তবে গোটা নবুওয়াতের ব্যাপারটাই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে পড়ে।

মুহাদ্দিস সাহেব উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) নিহতও হন নি, শূলবিদ্ধও হননি ; কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা যখন তাঁকে শূলবিদ্ধ করা হয়েছে বলে প্রচার করলো, তখন লোকের

কাছে আসল ব্যাপারটি চাপা পড়ে গেল। তাদের সন্দেহ হলো যে, আসল ব্যাপারটি কি?

## দ্বিতীয় উদাহরণ

কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন সামিরীকে বাছুর প্রস্তুত করার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন, তখন সে বললো, "ফা-কাবায্তু-কাব্যাতাম-মিন্-আসরির্ রাসূলে।" সাধারণ তফসীরবিদগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সামিরী হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে ঘোড়ার উপর সওয়ার দেখতে পায়। তখন সে তাঁর ঘোড়ার খুরের নিম্নস্থ ধূলি তুলে বাছুরটির পেটে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে মাটির তৈরী বাছুরটির দেহে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং সে হাম্বা রব করতে আরম্ভ করে। উপরিউক্ত আয়াতে এই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এটাই আয়াতের ঠিক ব্যাখ্যা। তাঁরা বলেন, মাটির এরূপ গুণ বিচিত্র নয়।

কিন্তু আবু মুসলিম ইস্ফাহানী আয়াতটির এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, আরবের বাগধারা মতে, "আররাজুলু ইয়াক্ফু আসরা ফুলানিন্ ও ইয়াকবিযু আসরাহু'—এ কথাগুলো অনুসরণ এবং আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাঁর মতে, এখানে 'রসূল' বলতে হযরত মূসা (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ হবে—সামিরী বলেছিল, "আমি হযরত মূসা (আঃ) -এর অনুসরণ করেছিলাম এবং তাঁর ধর্মকে সত্য বলে মনে করে-ছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম যে, সে ধর্ম অসত্য। তাই আমি তা ত্যাগ করলাম।" এখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সামিরী নিজেই হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলছিল। সুতরাং তার বলা উচিত ছিল—'আমি পয়গাম্বরের অনুসরণ করেছিলাম'-এটা না বলে 'আমি আপনার অনুসরণ করেছিলাম'—একথা বলা। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমীর-কবীদের সাথে সাধারণ লোকের এমনিভাবেই কথাবার্তা বলতে হয়। আব্বাসীদের দরবারে লোকেরা খলীফাদের 'আপনি' শব্দে সম্বোধন না করে 'আমিরুল মুমেনীন' শব্দেই সম্বোধন করতো। আবু মুসলিম ইসফাহানীর এ ব্যাখ্যাটি সাধারণ তফসীরবিদদের কাছে গ্রহণীয় নয়। তা সত্ত্বেও ইমাম রাযী তার 'তফসীর-এ-কবীরে' এ ব্যাখ্যাটিকেই উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা

করেন এবং এই উৎকৃষ্টতার বিভিন্ন কারণও বর্ণনা করেন। কারণ-গুলোর আলোচনা আমি এখানে বাদ দিলাম।

## তৃতীয় উদাহরণ

কুরআন মজীদে আছে ঃ

"আল্লাহ্ বলেছিলেন, চারটি পাখী আন, অতঃপর সেগুলো খণ্ড-বিখণ্ড কর; অতঃপর প্রত্যেকটি পাহাড়ে তাদের এক একটি অংশ রেখে আস, অতঃপর তাদের আহ্বান কর; দেখতে পাবে সেগুলো উড়ে চলে আসছে।"

এটা হলো সে সময়কার ঘটনা, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহকে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি কি করে মৃতকে জীবিত করবে? আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি কি তা বিশ্বাস করছ না? হযরত ইব্রাহীম বললেন ঃ করবো না কেন? তবে তোমার প্রতি আমার আস্থাকে দৃঢ় করতে চাই। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ চারটি পাখী আন ইত্যাদি ইত্যাদি। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী এই অর্থ করেন এবং বলেন ঃ বস্তুতই হযরত ইব্রাহীমই পাখীগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিলেন। অতঃপর সেগুলো জীবিত হয়েছিল। কিন্তু আবু মুসলিম ইসফাহানী এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন ঃ সুরহুন্না ইলাইকা" এর মানে খণ্ড-বিখণ্ড করা নয়। আরবী ভাষায় 'সারা-ইয়াসুরু'—ক্রিয়াটি এ অর্থে ব্যবহৃত হলে 'ইলা' শব্দটি বিভক্তিরূপে তার সাথে ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়ত "উদ্‌য়ুহুন্না" এ বাক্যে যে (হুন্না) রয়েছে, তা প্রাণীবাচক বস্তুর পরিবর্তেই ব্যবহৃত হয়। তাই এর মানে হবে—"পাখীদের আহ্বান।" অথচ সাধারণ তফসীরবিদদের মতে তার অর্থ হচ্ছে—তাদের খণ্ড-বিখণ্ডিত অঙ্গগুলোকে ডাক।

এ দুটি প্রশ্নের চাইতে আরো একটি অধিকতর জোরালো প্রশ্ন হলো—যদি হযরত ইব্রাহীমের আস্থা অর্জন করাই উদ্দেশ্য হতো, তবে চারটি পাখীর কি প্রয়োজন ছিল? একটি পাখীকে খণ্ড-বিখণ্ড করা এবং সেটিকে জীবিত করাই যথেষ্ট ছিল। মনের সন্দেহ দূর করার সম্পর্ক হলো জীবিত করার সাথে। এক, দুই বা চারটি পাখীর সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আবু মুসলিম ইস্‌ফাহানী সমস্ত তফসীরবিদদের মতের বিরোধিতা করেন।

তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্ রূপক বাক্যের আকারে হযরত ইব্রাহীমকে বললেন ঃ ধরুন আপনি চারটি পাখী এনে পোষ মানালেন। সেগুলো যেন আপনার নিকট থেকে পৃথক হইতেই চায় না! অতঃপর আপনি তাদের বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে এসে ডাকতে আরম্ভ করলেন। তখন দেখলেন যে, তারা আপনার দিকে দৌড়ে চলে আসছে। এমনিভাবে আমি (আল্লাহ্) যখন সকল আত্মাকে আহ্বান করবো, তখন এরা দৌড়ে এসে আপন দেহে প্রবেশ করবে।

## চতুর্থ উদাহরণ

কুরআন মজীদে আছে ঃ

আমি পাহাড়গুলোকে দাউদের এত অনুগত করে দিয়েছিলাম যে, সেগুলো তাঁর সাথে সাথে তসবীহ্ পাঠ করতো। পাখীদেরও আমি তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম।

এ ব্যাপারে নাস্তিকগণ প্রশ্ন তুললো যে, পাহাড় জড়-পদার্থ। তা কি তসবীহ পাঠ করতে পারে? আশায়েরা বলেন ঃ জড়ত্বের সাথে বাক-শক্তির কোন বিরোধ নেই। তাই পাহাড় ইত্যাদির পক্ষে কথা বলাও অসম্ভব নয়। ঈমাম রাযীও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আশয়ারী-দের মতানুসারে অনুরূপ জওয়াব দেন। কিন্তু সাধারণ মু'তাযিলী এবং কোন কোন অন্তঃবাদী ব্যাখ্যাকারী আয়াতটির এ তফসীর সমর্থন করেন নি। তাঁরা বলেন ঃ পাহাড়ের তসবিহ পাঠ হলো এমনি ধরনের, যেমন কুরআন শরীফের অন্যত্র রয়েছে—"এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্র তসবীহ পাঠ করছে না।" অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই আপন আপন ভাব-ভঙ্গীতে আল্লাহ্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ রয়েছে।

## পঞ্চম উদাহরণ

কুরআন মজীদে আছে ঃ

"যাকারিয়া বললেন : হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে তার কিছুটা লক্ষণ বাতলে দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ সেই লক্ষণ হলো, আপনি তিন দিন যাবত কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবেন না। কেবল ইঙ্গিতেই কথাবার্তার কাজ চালাতে হবে।"

সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কে তার সন্তান লাভের লক্ষণ বাতলে দেন। তিন দিন তাঁর মুখ বন্ধ থাকে। কেবল ইঙ্গিতেই তিনি কথাবার্তার কাজ চালিয়ে যান।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। প্রথমত এটা বলা হয় যে, এ ব্যাপারটি যুক্তি বিরোধী। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—কথা বলা না বলার সাথে সন্তান লাভের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তফসীরবিদগণ বলেনঃ এটা হলো অলৌকিক ব্যাপার এবং অলৌকিকত্ব একটি বৈধ-বিষয়। আবু মুসলিম ইসফাহানী বলেনঃ জবান বন্ধ থাকা বলতে 'ইতেকাফ'কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, ইতেকাফের অবস্থায় ইঙ্গিত ছাড়া কথাবার্তা বলা অবৈধ ছিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত যাকারিয়াকে বললেনঃ যখন আপনি ইতেকাফ এবং ইবাদতে মশগুল হবেন, তখনই আপনি সন্তানলাভ করবেন। ইমাম রাযী আবু মুসলিমের এই ভাষ্য উদ্ধৃত করে বলেনঃ

এই ব্যাখ্যা আমার মতে উৎকৃষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত। কুরআনের ব্যাখ্যায় আবু মুসলিমের মতামত বিচার বুদ্ধিসম্মত। তিনি সাধারণত সূক্ষ্ম দিকগুলো তুলে ধরেন।

## ষষ্ঠ উদাহরণ

কুরআন মজীদে হযরত সুলাইমান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ

"আমাকে পাখীর ভাষা শেখানো হয়েছে।"

আশায়েরাগণ বলেনঃ পাখীর কথাবার্তা বলা সম্ভব। হযরত সুলাইমান তাদের কথাবার্তা বুঝতে সক্ষম ছিলেন। এটা ছিল তাঁর মুজিযা।

কিন্তু মুহাদ্দিস ইবনে হাযম এই আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ

জীবজন্তু প্রয়োজনের তাকিদে—যেমন খাদ্যের অনুসন্ধান, কষ্টের অনুভূতি, লড়াই, যৌন-সঙ্গম, ছানাকে ডাকা এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রয়োজনে কিছু একটা আওয়াজের মাধ্যমে মনের কথার অভিব্যক্তি করে থাকে—এটা আমরা অস্বীকার করি না। হযরত সুলাইমানকে আল্লাহ সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি সেসব আওয়াজ শুনে তাদের মনোভাব বুঝতে পারতেন।

## সপ্তম উদাহরণ

কুরআন মজীদে আছে ঃ

"ইয়া আইয়ুহান্নাসুত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন্ নফসেঁ-ও ওয়াহিদাহ্।"

সাধারণ তফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাহ হযরত আদমকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর বাম পাঁজরের হাড় দিয়ে হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু আবু মুসলিম ইসফাহানী বলেন ঃ 'মিন্‌হা' এর অর্থ হলো 'মিনজিনসিহা।' অর্থাৎ হযরত হাওয়াকে হযরত আদমের সমজাত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু এ সৃষ্টি তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে নয়। মোটকথা এ ধরনের জায়গায় গবেষকদের মতে, লোকেরা কুরআনের ভুল অর্থ করেছে এবং তার ফলেই এ ধরনের প্রশ্নের উদ্ভব হচ্ছে।

## নাস্তিকদের আরো একটি বড় প্রশ্ন

নাস্তিকদের আরো একটি বড় প্রশ্ন ছিল এই যে, পরকালীন ভোগবিলাস সম্পর্কে ইসলাম যে সব বস্তুর বর্ণনা দেয়, যেমন দুধ, মধুর ঝরণা, কচি বয়স্কা হুর, মনোহরা তরুণী, রংবেরংগের ফুল, রত্নখচিত বড় বড় মহল—এসব ছেলে ভোলানো ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরকাল আগাগোড়া একটি পবিত্র জগত। সেখানে যদি পার্থিব মনষ্কাম সিদ্ধির ব্যবস্থা থাকে, তবে এ অধম দুনিয়ার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব কি করে প্রতিপন্ন হবে? এ ছাড়া আরো অনেক অসম্ভব ও অবাস্তব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। যেমন—হাত পায়ের সাক্ষ্যদান, পুলসিরাত অতিক্রম, কৃতকর্মের পরিমাপ, দোযখে জীবিত থাকা ইত্যাদি।

এ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে তিনটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। আশায়েরা বলেন ঃ এসব ঠিক এমনিভাবেই ঘটবে, কুরআনে যেমন উল্লেখ আছে। এখানে অবাস্তবতার কোন প্রশ্নই উঠে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান, কৃতকর্মের পরিমাণ, চিরস্থায়ী শাস্তি এসব অতি প্রাকৃতিক ব্যাপার হলেও মোটের উপর অসম্ভব কিছু নয়। আশায়েরা ছাড়া বাকী সমস্ত সম্প্রদায় বলেন ঃ পরকালীন বিষয়া-

দির আসল রূপ অন্য কিছু। তবে যে শব্দে এবং যে পন্থায় সেগুলোর ধারণা দেয়া হয়েছে, সেটা ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। মুহাদ্দিস ইবনে তাইমিয়া ছিলেন একজন বাহ্যপন্থী। তা সত্ত্বেও তিনি নুজুল নামক হাদীসের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা পেশ করার পর বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে কিয়ামতের দিন যে শান্তি ও শাস্তি দেবার ওয়াদা করেছেন, যে পানাহার, শয়ন ও সঙ্গমের সুসংবাদ দিয়েছেন, সে সব ওয়াদাকৃত বস্তুসমূহের সাথে সামঞ্জস্য আছে, এমন সব পার্থিব বস্তুগুলো যদি আমরা না জানতাম, তবে অমাদের কাছে আল্লাহর ওয়াদা ও সুসংবাদ নিরর্থক হয়ে দাঁড়াতো। এ সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও আমরা এটা বুঝি যে, আল্লাহর ওয়াদাকৃত বস্তু এবং এই পার্থিব বস্তু মোটেই সমকক্ষ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ দুনিয়া এবং পরকালীন বস্তুসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র নামেরই মিল রয়েছে। তা না হয় উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না।"

ইমাম গাযালী 'জাওয়াহিরুল কুরআন' নামক গ্রন্থে পরকালীন শাস্তির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন ঃ মানুষের মধ্যে যে ষড় রিপু রয়েছে, সেটাকেই রূপক আকারে সাপ এবং বিছারূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহর এবং রসূলের নিম্নলিখিত বাণীগুলোও এমনিভাবে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

১. "তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনেই হাযির করা হবে।" (আল-হাদীস)

২. কিয়ামতের দিন মানুষ তার সৎকর্মের ফল প্রস্তুত দেখতে পাবে।" (আল-কুরআন)

৩. "তোমাদের যদি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতো, তবে দোযখকে এক্ষুণি দেখতে পেতে" (আল-কুরআন)-এর মানে—দোযখ তোমাদের অন্তরেই রয়েছে। সুতরাং সেটাকে চাক্ষুষ দেখার পূর্বেই বিশ্বাস-সূত্রে এক্ষুণি দেখে নাও।

৪. "কাফেরগণ আপনার (রসূল করীম) নিকট শাস্তির বিষয়ে তাড়াহুড়া করছে। অথচ শাস্তি তাদের চারদিকে ঘিরে রেখেছে।" (আল-কুরআন)

এখানে আল্লাহ এটা বলেন নি যে, ভবিষ্যতে ঘিরে ফেলবে। বরং এটাই বলা হয়েছে যে, তা এখনো ঘিরে রেখেছে।

কারো কারো মতে, "বেহেশ্‌ত এবং দোযখ এখনো প্রস্তুত।" তাদের একথাটিও সেই গোত্রীয়।

ইমাম গাযালী বলেন: আপনারা যদি বিষয়গুলো এমনিভাবে বুঝে নিতে না পারেন, তবে কুরআনের সারগর্ভে পৌঁছতে পারবেন না, বরং আপনাদের কাজ হবে কেবল খোসা নিয়ে টানাটানি করা। এর উদাহরণ হলো এমনি ধরনের, যেমন চতুষ্পদ জন্তু গমের শ্বাসের জন্য লালায়িত নয়, বরং তাদের প্রয়োজন হলো কেবল ভুষির। কুরআন মজীদ সকলের পক্ষেই জীবিকাস্বরূপ। তবে তা মানুষের জ্ঞানের পরিসর অনুসারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পর্যায়ের, সে কুরআন থেকে সে পরিমাণেই আহার্য সংগ্রহ করতে সক্ষম। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক প্রকারের খাদ্যেই সারাংশ, খোসা ও ভুষি এই তিনটি বস্তু রয়েছে।

## নাস্তিকদের আরো একটি প্রশ্ন

নাস্তিকদের আরো একটি বড় প্রশ্ন ছিল এই যে, ইহুদী ও পার্সীদের মধ্যে যে সব অলীক কাহিনী এবং গল্প প্রচলিত ছিল, কুরআন সে সবে পরিপূর্ণ। যেমন হারূত-মারূত নামক দুজন ফেরেশতা ব্যাবিলনের কূপে মাথা নত অবস্থায় আবদ্ধ রয়েছেন। তাঁরা লোকদের মন্ত্র শেখাচ্ছেন। ইয়াজুজ-মাজুজ দুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট কওম। তাদের জন্যই সিকান্দর (আলেকজাণ্ডার) বাদশা সিকান্দরী দেয়াল স্থাপন করেন।

আরো প্রচলিত ছিল যে, হযরত দাউদ তাঁর দরবারের একজন অফিসারের স্ত্রীকে প্ররোচনা দিয়ে বাধ্য করেন। হযরত সুলাইমানের জন্য অস্তমিত সূর্য পুনঃ উদিত হয়। শয়তান আল্লাহর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করে হযরত আইয়ুবের সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করে দেয় এবং তাঁকে এমন রুগ্ন করে দেয় যে, তাঁর গায়ে পোকা ধরে। হযরত ইব্রাহীম কয়েকবার মিথ্যার শিকারে পরিণত হন। হযরত আদম শির্‌ক করেছিলেন অর্থাৎ আপন সন্তানদের নাম আব্দুল হারেস রেখেছিলেন। হারেস ছিল শয়তানের নাম।

এ প্রশ্নগুলোর জওয়াব দেওয়া ইলমে কালামের অবশ্য কর্তব্য বিষয় ছিল। কিন্তু এ বিষয়ের গ্রন্থসমূহে এরূপ কিছু দেখা যায় না। মুতাকাল্লিমগণ মনে করেন যে, এটা হাদীসবিদ ও তফসীরবিদদেরই দায়িত্ব।

তফসীর রচয়িতাগণ এ ধরনের কিস্‌সা সম্পর্কে যা লিখেছেন, তার সারমর্ম হলো-নবী সংক্রান্ত কিস্‌সাসমূহের যে অংশটুকু কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, ততটুকু যথার্থ। কিন্তু বনি ইসরাইলেরা আসল কিস্‌সার সাথে যতটুকু জুড়ে দিয়েছে, তা যথার্থ নয়। এ জন্যই যেসব প্রাচীন তফসীরকারগণ তাঁদের তফসীরে বনি ইসরাইল প্রবর্তিত কিস্‌সা কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করেন, মুহাদ্দিসগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহকে, বরঞ্চ এসব তফসীরকারদেরকেও অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য বলে বিবেচনা করেন। প্রাচীন তফসীর রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের নাম হলো—মুজাহিদ, মুকাতিল্‌, ইবনে সুলাইমান, কালবী, যাহ্‌হাক ও সাদারী। তাঁরা কুরআনে বর্ণিত নবী-কাহিনীর সাথে ইহুদী মহলে প্রচলিত অনেক গল্প-গুজব জুড়ে দিয়েছেন। 'তফসীর এ কবীর' ইত্যাদিতে নবী:দের কিস্‌সার সাথে যে সব কৃত্রিম বর্ণনা স্থান লাভ করে, তা প্রাচীন তফসীর রচয়িতাদের নিকট থেকেই গৃহীত। মুজাহিদ ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম। কিন্তু তাঁর তফসীরের বিষয়বস্তু বনি ইসরাইল থেকে গৃহীত হয়েছে বলে তাও অগ্রহণীয় বলে বিবেচিত। যাহাবী রচিত 'মিযানুল ই'তেদাল' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কেউ আ'মাশকে জিজ্ঞেস করলেন, মুজাহিদের তফসীর সাধারণ মতামতের পরিপন্থী কেন? তিনি বললেন, তাঁর তফসীর ইহুদী ভাবধারা থেকে গৃহীত।

মুহাদ্দিসীন মুকাতিলকে স্পষ্ট ভাষায় মিথ্যাবাদী ও বানওয়াটী বলে ঘোষণা করেন। তাঁর একমাত্র দোষ ছিল এই যে, তিনি আহ্‌লে কিতাবের বর্ণনা গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে তাঁরা কাল্‌বী, সাদারী এবং যাক্‌হাক্‌-এর বর্ণনাকে সাধারণভাবে গ্রহণীয় বলে মনে করেন। যাহাবী রচিত 'মিযানুল-ইতেদাল' নামক গ্রন্থে এঁদের প্রত্যেকের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়।

আল্লামা ইবনুল খালদুন এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে একটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। তার অনুবাদ পেশ করা হলো :

পূর্ববর্তী ইমামগণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন খুব বেশী। কিন্তু তাঁদের রচনাবলীতে খাঁটি, মেকি, গ্রহণীয়, অগ্রহণীয় সব কিছুই

রয়েছে। এর কারণ হলো, আরবরা ছিলেন একটি অশিক্ষিত জাতি। যাযাবরতা ও মূর্খতা যেন তাদের ধাতেই বদ্ধমূল ছিল। সাধারণ মানুষের ন্যায় তাদের মনেও স্বভাবতঃ কতগুলো প্রশ্ন জাগতো। যেমন, দুনিয়া কি করে সৃষ্টি হলো? সৃষ্টির মূল কোথায়? অস্তিত্বের রহস্য কি? তারা এ প্রশ্নগুলো 'আহলে কিতাবের' নিকট জিজ্ঞেস করতো। সে সময়কার আরবের আহলে কিতাবেরা ছিল বেদুঈন। তাদের চিন্তাধারা ছিল মূর্খদের ন্যায়। তারা প্রধানতঃ ছিল 'হুমাইর' গোত্রভুক্ত। তারা এক সময় ইহুদী ছিল। পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তারা শরীয়ত বিষয়ে মতামত প্রকাশে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতো। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টির কারণ, নবীদের কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব ধর্মীয় মতামতই পোষণ করতো। কায়াব, আহ্‌বার, ওহ্‌হাব, ইবনে মুনাব্বাহ্‌, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম প্রমুখ ছিলেন তাদেরই অন্যতম। ইহুদী ধর্মের যে সব গল্প, কাহিনী এবং প্রচলিত মতামত তাঁরা ধরে রেখেছিলেন, সেগুলো তাঁদের মাধ্যমে তফসীরের গ্রন্থসমূহে প্রবেশ করে। তাঁদের এই বর্ণনাগুলো শরীয়তের আদেশ নিষেধ বিষয়ক ছিল না। তাই তফসীর রচয়িতাগণ সেগুলো গ্রহণ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করেন নি। ফলত যাবতীয় তফসীরগ্রন্থ এসব প্রচলিত কিস্‌সা কাহিনীতে ভরে যায়। অথচ এই বর্ণনাগুলোর মূলে ছিল সেই যাযাবর ইহুদী, যাদের শুদ্ধ-অশুদ্ধ যাচাই করার কোন শক্তিই ছিল না। কিন্তু ধর্মপরায়ণতার দিক থেকে তারা ছিল খ্যাত ও সুপরিচিত। তাই লোকেরাও তাদের সম্মান করতো। এটাই হলো তাদের কিংবদন্তীসমূহের জনপ্রিয়তা লাভের একমাত্র কারণ।

তফসীরবিশারদগণ এ ব্যাপারে কেবল সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁরা তফসীরে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ কিস্‌সা সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, এগুলো ভ্রান্ত এবং কৃত্রিম। ইমাম রাযী তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থের অনেক স্থানে জোরালো ভাষায় এসব কিস্‌সা কাহিনীর অসারতা প্রমাণ করেন।

এ ছাড়া গবেষকগণ এ দিকটাও খতিয়ে দেখেছেন যে, কুরআন মজীদে যে সব কিস্‌সা রয়েছে, তা ঐতিহাসিক ঘটনারূপে বিধৃত হয়েছে, না কেবল শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেগুলো লোকদের সামনে

উপস্থাপিত করা হয়েছে? শাহ্ ওলী উল্লাহ্ 'ফওযুল-কবীর-ফী উসুলীত তফসীর' নামক গ্রন্থে বলেন :

"আল্লাহ্তায়ালা অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। অনুগতদের পুরস্কার এবং অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কিত অনেক সংক্ষিপ্ত কিস্‌সা কুরআনে স্থান লাভ করেছে। এসব কাহিনীর উৎস বিভিন্ন। নূহ্, আদ, সামুদ এসব কওমের কিস্‌সাগুলো আরবগণ তাদের পূর্ব পুরুষ থেকেই শিক্ষালাভ করে। আরবগণ ইহুদীদের সাথে যুগ যুগ ধরে সহঅবস্থান করে এবং তাদের অনেক প্রচলিত লৌকিক উপাখ্যানও গ্রহণ করে। এরই ফলে হযরত ইব্রাহীম এবং বনি ইসরাইলের নবীদের কিস্‌সা-সমূহ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সব প্রচলিত কিস্‌সা-সমূহের কিছুটা অংশ মানুষের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কুরআনে বিধৃত করা হয়। যাবতীয় কিস্‌সা হুবহু বর্ণিত হয়নি।"

"সুতরাং এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব কিস্‌সা কাহিনীর উদ্দেশ্য ইতিহাসের ঘটনাবলী শেখানো নয়, বরং শিরক ও গোনাহের অশুভ পরিণাম, গোনাহ্গারের প্রতি আল্লাহর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে সৎ বান্দাদের তৃপ্তি লাভ—এসব বিষয়ের প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হলো এসবের উদ্দেশ্য।"

## অপ্রকাশ্য ও পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ (তাবীল)

মুতাকাল্লিম এবং প্রাচীন তফসীরবেত্তাগণ কুরআন মজীদের শব্দ এবং মূল বচনের যে ব্যাখ্যা দেন, তাতেই নাস্তিকদের উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর প্রত্যুত্তরের কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু অপর একটি বড় প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। তা হলো, কুরআন মজীদে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা কোন্খানে বৈধ, আর কোন্খানে বৈধ নয়? এ বিষয় নিয়ে তুমূল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। 'মুজাস্‌সিমা' এবং 'মুশাব্বিহা' সম্প্রদায়ের মতে, কোন শব্দেরই পরোক্ষ অর্থ করা বৈধ নয়। তাঁরা এ মত থেকে আদৌ হটতে রাযী নন। তাঁরা বলেন, কুরআন মজীদে যেখানে 'আল্লাহ্র হাত'—বলা হয়েছে, সেখানে হাতই অর্থ করা হবে। পক্ষান্তরে, 'বাতিনিয়া' সম্প্রদায় বলেন, কুরআন মজীদের

প্রত্যেকটি শব্দে পরোক্ষ অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা আরো বলেন, রোযা, নামায, যাকাত এসবেরও প্রকাশ অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, এগুলোতে বর্তমানে যেভাবে কুরআন মজীদের পরোক্ষ অর্থ করা হচ্ছে, তেমনি পূর্ববর্তীকালের হিতৈষী লোকেরাও এ অনুরূপ অর্থ করতেন। ইমাম রাযী 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থে কুরআনের সূরায়ে সাবার আয়াত "অলে-সুলাইমানার রীহু গুদুব্বুহা শাহরুন"-এর তফসীরে কোন কোন লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কুরআন মজীদের প্রকাশ্য শব্দে বুঝায় যে, বাতাস, জিন এবং শয়তান হযরত সুলায়মানের সেবায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, তিনি বাতাসের মত বেগবান ঘোড়া পালতেন এবং দৈত্যাকৃতি মানুষ তাঁর এখানে কাজ কর্ম করতো।

কুরআন শরীফে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মুজিযার বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতেন। সেখানে কোন কোন লোক এই পরোক্ষ অর্থ করেছেন যে, তিনি মৃত-প্রাণ ব্যক্তিদের হেদায়েত করতেন। এটাই ছিল তাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন।

'কোথায় পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা হবে, আর কোথায় হবে না'—এ সম্পর্কে 'মুশাব্বিহা' এবং 'বাতিনিয়া' ছাড়া বাকী সম্প্রদায়সমূহ বাধ্য হয়ে কতগুলো নীতি নির্ধারণ করেন।

আশায়েরা এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, যে স্থানে প্রকাশ্য এবং আভিধানিক অর্থ গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা দাঁড়ায়, কেবল সেখানেই পরোক্ষ অর্থ করা বৈধ, অন্যথা নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্‌র 'ইয়াদ' আছে। 'ইয়াদ' এর মানে হলো হাত। এখানে যদি 'আল্লাহ্‌র হাত' এ অর্থ করা হয়, তবে তিনি 'শরীরী' হয়ে দাঁড়ান। অথচ যুক্তিতে পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি শরীরী হতে পারেন না। এ জন্যই আশায়েরা কবরের সাপ, বিছা, তুলাদণ্ড, পুল-সিরাত—এরূপ বিষয়াদির প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করছেন। কারণ এ গুলোর প্রকাশ্য অর্থে কোন অসুবিধা দাঁড়ায় না। অন্যান্য গবেষকগণ এ নীতিকে আরো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত আলোচনা করেন ইমাম গাযালী তাঁর 'তাফ্‌রিকাতু বাইনাল-ইসলাম-অয্‌-যানদাকাহ্‌' নামক গ্রন্থে। আমি এখানে যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুর সারমর্মই পেশ করছি।

'তসদীক' অর্থাৎ বিশ্বাসের মানে হলো রসূল করীম যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে উক্তি করেছেন, তা বিশ্বাস করা। অস্তিত্বের পাঁচটি শ্রেণী রয়েছে। এ সব শ্রেণী সম্পর্কে অবহিত না থাকার ফলেই এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে। তাই অস্তিত্বের বিভিন্ন শ্রেণীর বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি ঃ

১. সত্তামূলক অর্থাৎ বাস্তব অস্তিত্ব।

২. অন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব। যেমন স্বপ্নে দেখা বস্তু। এ অস্তিত্ব কেবল আমাদের অন্তর ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রুগ্ন ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থায় কাল্পনিক ছবি দেখা অথবা আগুনের ফুলকিকে বৃত্তাকার দেখা—এসবও এ গোত্রীয় অস্তিত্ব। মূলত আগুনের কোন বৃত্ত নেই। কিন্তু আমাদের কাছে তা বৃত্ত বলেই মনে হয়।

৩. কাল্পনিক অস্তিত্ব। যেমন, হামীদকে একবার দেখলাম। অতঃপর চোখ বন্ধ করলাম। তখন তার যে আকৃতিটি আমাদের চোখে ভাসে, তা'ই কাল্পনিক অস্তিত্ব।

৪. বুদ্ধিজাত অস্তিত্ব। যেমন, আমারা যখন বলি, এ বস্তুটি আমাদের হাতে আছে, তখন এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, এ বস্তুটি আমাদের এখতিয়ার এবং ক্ষমতাধীন আছে। এমতস্থলে এখতিয়ার এবং ক্ষমতার যে অস্তিত্ব ধরে নেয়া হয়, সেটাই বুদ্ধিজাত অস্তিত্ব।

৫. সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব। অর্থাৎ যে বস্তু স্বয়ং বিদ্যমান নয়। কিন্তু তার মত অন্য একটি বস্তু বিদ্যমান রয়েছে।

বিভিন্ন অস্তিত্বের বর্ণনা দেবার পর ইমাম গাযালী প্রত্যেক প্রকার অস্তিত্বের কয়েকটি উদাহরণ দেন। যেমন হাদীসে আছে, "কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে ভেড়ীর আকারে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জবাই করা হবে।" ইমাম সাহেব এ অস্তিত্বকে অন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। দ্বিতীয় উদাহরণ হলো—রসূল করীম বলেছেন, "আমি ইউনুসকে দেখছি।" ইমাম সাহেব এ অস্তিত্বকে কাল্পনিক অস্তিত্ব বলে বর্ণনা করেন।

বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার পর ইমাম গাযালী বলেন, শরীয়তে যত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তাদের কোন একটাকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করা কুফর। অবশ্য অস্তিত্বের উপরিউক্ত শ্রেণীসমূহের যে কোন

একটির আওতায় ফেলে যদি তা মোটামুটি স্বীকার করে নেয়া হয়, তবে কুফর হবে না। কারণ, এটা হলো পরোক্ষ অর্থ প্রয়োগের শামিল। পরোক্ষ অর্থ প্রয়োগ থেকে কোন সম্প্রদায়ের গত্যন্তর নেই।

ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল পরোক্ষ অর্থ (তাবীল) এড়াবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু নিম্নলিখিত হাদীসসমূহে তাঁকেও পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করতে হলো ঃ

রসূল করীম বলেন ঃ

"কালো পাথর (হাজরে আসওয়াদ) হলো আল্লাহ্‌র হাত।"

"মুসলমানের অন্তর আল্লাহ্‌র অঙ্গুলীসমূহের মধ্যে অবস্থিত।"

"আমি ইয়ামেন থেকে আল্লাহ্‌র খোশবু পাচ্ছি।"

অতঃপর ইমাম সাহেব লিখেন, হাদীসে আছে যে, "কিয়ামতের দিন মানুষের কৃতকর্ম (আমল) ওজন করা হবে।" এটা জানা কথা যে, আমল গুণবাচক বস্তু। তা ওজন করা সম্ভব নয়। তাই সবাই ওজনের পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আশায়েরা বলেন, এর অর্থ আমলনামার কাগজ ওজন করা হবে। মুতাযিলা বলেন, ওজন করার অর্থ হলো, বিষয়টি সমক্ষে তুলে ধরা। মোট কথা, উভয় সম্প্রদায়কেই তাবীল করতে হলো। হাঁ, যারা বলেন, 'আমল গুণবাচক বস্তু, সেটাই ওজনবিশিষ্ট বস্তুতে পরিণত হবে এবং সেটাই ওজন করা হবে'—তাদের আমি নিরেট মূর্খ এবং নির্বোধ বলে মনে করি।

এরপর ইমাম গাযালী 'তাবীলের নীতি' বর্ণনা করেন এবং বলেন, শরীয়তে যে সব বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, তাদের বাহ্য অস্তিত্বকে মেনে নেওয়াই উচিত। যদি এমন কোন অকাট্য প্রমাণ থাকে, যাতে বুঝা যায় যে, বিশেষ কোন বস্তুর বাহ্য অস্তিত্ব সমর্থন-যোগ্য নয়, তবে তাকে অন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব বা কাল্পনিক অস্তিত্ব বা বুদ্ধিজাত অস্তিত্ব বা সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব বলে ধরে নিতে হবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, একজনের নিকট যা অকাট্য প্রমাণ বলে বিবেচিত, তা হয়তো অন্যের নিকট তদ্রূপ নয়। যেমন, আশয়ারীদের মতে, আল্লাহ্ কোন দিকের সাথে সীমাবদ্ধ হতে পারেন না। কারণ, এ ব্যাপারে তাঁদের কাছে দৃঢ় যুক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে, হাম্বলীদের

মতে, এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। এমন ক্ষেত্রে তাবীল করার দায়ে কাউকেও কাফের বলে অভিযুক্ত করা সমীচীন হবে না। বেশীর পক্ষে এতটুকু বলা যাবে যে, সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট বা বেদা'তী।

অতঃপর ইমাম গায্যালী বলেন, যদি তাবীল করার দায়ে কাউকেও কাফের বলে আখ্যায়িত করতে হয়, তবে আমাদেরকে সর্বপ্রথম খতিয়ে দেখতে হবে যে, তাবীল সংক্রান্ত ঐশী বাণীটি পরোক্ষ ও অপ্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত হবার যোগ্য কি না। যদি হয়, তবে তা সহজবোধ্য, না কঠিন? সেটি 'হাদীস-এ মুতাওয়াতির, না হাদীস-এ-আহাদ? অর্থাৎ তা বহু রাবী (বর্ণনাকারী) বর্ণিত, না একক রাবী বর্ণিত? তা ইজমাতে পরিণত হয়েছে কিনা অর্থাৎ তাতে যুগের সমস্ত ওলামার সমর্থন রয়েছে কিনা? যদি সেই ঐশীবাণী 'হাদীস-এ-মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হয়, তবে দেখতে হবে যে, তাতে তাওয়াতুরের (মুতাওয়াতির হওয়া) শর্তাবলী পাওয়া যায় কি-না? 'মুতাওয়াতির' এর সংজ্ঞা হলো বর্ণনার দিক থেকে তা হবে সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে। যেমন, নবিগণ, বিখ্যাত শহর, কুরআন মজীদ—এসবের অস্তিত্ব মুতাওয়াতির পর্যায়ের অর্থাৎ সন্দেহাতীত। কিন্তু কুরআন ছাড়া অন্য কোন বস্তুর নিঃসন্দেহ হওয়াটা খুবই দুষ্কর। কেননা এমন একটি ব্যাপারেও বেশীর ভাগ লোকের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যা মূলত যথার্থ নয়। যেমন হযরত আলীর খিলাফত সম্পর্কে শিয়া জামাত বর্ণিত হাদীসসমূহ। 'ইজমা'-এর যথার্থতা নিরূপণ করা আরো মুশকিল। কেননা, ইজমা বলতে আমরা বুঝি—কোন ব্যাপারে ধর্মীয় জনকদের মতৈক্যে উপনীত হওয়া এবং বেশ কিছুকাল, আবার কারো কারো মতে প্রথম যুগ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেই মতের উপর কায়েম থাকা।

এ ধরনের ইজমা কেউ অস্বীকার করলে সে ব্যক্তি কাফের হবে কিনা—এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। কেননা কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, ইজমা প্রতিষ্ঠিত হবার সময় যখন কোন এক ব্যক্তির বিরোধিতা অবৈধ ছিল না, তবে এখন তা অবৈধ হবে কেন?

অতঃপর তাওয়াতুর বা ইজমা থাকা সত্ত্বেও দেখতে হবে যে, যিনি তাবীল করছেন, তিনি তাওয়াতুর বা ইজমা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল কি-না? যদি ওয়াকিফহাল না হন, তবে এই তাবীলের জন্য তিনি গুণাহগার হতে পারেন, কিন্তু মিথ্যাবাদী হতে পারেন না।

অতঃপর দেখতে হবে যে, যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে তিনি তাবীল করছেন, তা প্রমাণের শর্তানুসারে উত্তীর্ণ হয় কিনা? প্রমাণের শর্ত বলতে কি বুঝায়, তা ব্যাখ্যা করতে হলে একটি স্বতন্ত্র বড় গ্রন্থের প্রয়োজন। আমি 'মুহিক্কুল ফিতর' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছুটা বর্ণনা করেছি। কিন্তু এ যুগের অধিকাংশ ফকীহ্ ব্যাপারটি বুঝতে অক্ষম। অবশ্য প্রমাণটি যদি অকাট্য হয়, তবে এমন তাবীল করার অনুমতি রয়েছে, যা মূল বচনের প্রকাশ্য এবং প্রত্যক্ষ অর্থের কাছাকাছি। দূরবর্তী অর্থে তাবীল করা বৈধ নয়।

অতঃপর দেখতে হবে যে, যে বিষয়টির পরোক্ষ অর্থ করা হচ্ছে, তার সাথে ধর্মের মৌলিক নীতির কোন যোগসূত্র রয়েছে কিনা? যদি না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পরোক্ষ অর্থ করা বা না করার ব্যাপারে কোন কড়াকড়ি নেই। যেমন শিয়াগণ মনে করেন যে, ইমাম মেহেদী মাটির তলায় উধাও হয়ে গেছেন। এটা হলো একটা সংস্কার। এরূপ বিশ্বাসের ফলে ধর্মে কোন ব্যাঘাত জন্মায় না।

এখন পাঠকবৃন্দ বুঝতে পারেন যে, কোন ব্যক্তিকে কাকেও কাফের বলে আখ্যায়িত করার জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনারা আরো বুঝতে পারবেন যে, আশয়ারীদের বিরোধিতার উপর নির্ভর করে কাউকেও কাফের বলা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফকীহ্দের পক্ষে কেবল ফিকহ্ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং যখনি আপনারা দেখবেন যে, কোন ফকীহ্ কেবল ফিকহের উপর ভর করে কোন ব্যক্তিকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করছেন, তখন তাঁর মতের মোটেই গুরুত্ব দেবেন না।

ইমাম সাহেব অন্যত্র বলেন, "যে সব বস্তু আকাইদ সংক্রান্ত নয়, তাতে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করার দায়ে কাউকেও কাফের বলা উচিত হবে না। যেমন কোন কোন সূফী তাবীল করে বলেন, হযরত ইব্রাহীম সূর্য এবং চন্দ্রকে আল্লাহ্ বলে মনে করেন নি। কেননা, কোন জড় বস্তুকে তিনি আল্লাহ্ বলবেন—এটা নবীর পদমর্যাদার বরখেলাফ। বরং আকাশের মৌল উপাদানের স্রষ্টাকেই আল্লাহ্ বলে মনে করেন।"

## আকাইদ প্রমাণ

বস্তুত আকাইদ প্রমাণ করাই হলো 'ইলমে কালাম'। এটাই 'ইলমে কালামে'র প্রাণবস্তু। কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্বসূরী ইমামগণ তাঁদের রচনায় এ বিষয়ের উপর মোটেই আলোকপাত করেন নি। শেষ যুগীয় ইমামগণ যদিও ভূরি ভূরি লিখেছেন, কিন্তু তাঁদের লেখা নিম্নের চরণটির মর্ম কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

"নানা ব্যাখ্যার দরুন আমার স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো এক বিভ্রাট।"

## শেষ যুগীয় ইমামদের প্রথম ভুল

শেষ যুগীয় ইমামদের সবচাইতে বড় ভুল হলো এই যে, তাঁরা এমন সব বিষয়কে ইসলামী আকাইদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যার প্রতিষ্ঠা বা অপ্রতিষ্ঠার সাথে ইসলামের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। অথচ এসব বিষয় ইলমে কালামের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। "শরহে মাওয়াকিফ', 'শরহে মাকাসিদ' ইত্যাদি গ্রন্থে যে সব বিষয়কে আকাইদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো গণনা করলে তার সংখ্যা দাঁড়াবে কয়েক শতকে। অথচ এর মধ্যে এমন দশটি বিষয়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেগুলোকে বস্তুত আকাইদরূপে পরিগণিত করা চলে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করছিঃ

আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সত্তাভুক্ত নয়।

আল্লাহ্‌র সত্তায় নশ্বর কিছুই জড়িত হতে পারে না।

স্থায়িত্ব অস্তিত্বের একটি গুণ। কিন্তু তা সত্তা বহির্ভূত।

শ্রবণ ও দর্শন এগুলো আল্লাহ্‌র গুণ। কিন্তু জড় বস্তুর সাথে জড়িত হতে পারে।

আল্লাহর বাণীতে একাধিক্য নেই। তা সর্বতোভাবে একক।

আল্লাহ্‌র সত্তাগত বাণী শ্রবণযোগ্য।

ঐশী শক্তি কর্মের পূর্ব শর্ত।

শূন্য বলতে কিছুই নেই।

জীবনের জন্য দেহ শর্ত নয়।

## দ্বিতীয় ভুল

শেষ যুগীয় ইমামদের দ্বিতীয় ভুল হলো এই যে, তাঁরা এমন অনেক বিষয় বাড়িয়ে-চড়িয়ে বলেন, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল

কখনো বলেন নি। তাঁরা এসব মনগড়া বিষয়কে আকাইদের অঙ্গরূপে পরিগণিত করেন। তাদের এসব অভিনব সংযোজনের বেশীর ভাগ ছিল কল্পনাপ্রসূত। সেগুলো প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁদেরকে অনেক গলাবাজিও করতে হয়। কিন্তু তা মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি। যেমন ওহীভিত্তিক একটি প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদ হলো এই যে, কিয়ামতের দিন মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান হবে। কিন্তু তাতে উল্লেখ ছিল না যে, পুনরুত্থান সাবেক দেহ সমেত হবে, না অন্য একটি অভিনব দেহ নিয়ে। শেষ যুগীয় আশায়েরাবাদিগণ এর সাথে এতটুকু বাড়িয়ে দিলেন যে, সেই পুনরুত্থান হবে সাবেক দেহ নিয়ে। এই উক্তির ফলে তাঁদের সামনে দেখা দিল অপর একটি সমস্যা। তা হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তি হয় কি করে? এ প্রশ্নটি হয়ে উঠে ইলমে কালামের এক গুরুগম্ভীর বিষয়। এর বৈধতা প্রমাণের জন্য তাঁদেরকে অনেক যুক্তি দাঁড় করাতে হয়। মোট কথা, এমনিভাবে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয় ইলমে কালামে প্রবেশ লাভ করে। মজার ব্যাপার হলো—'সুন্নী' হবার জন্য এই মনগড়া আকাইদগুলোকে মাপকাঠিরূপে নির্ধারণ করা হলো। শেষ পর্যন্ত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মরহুম এসব ভ্রম নিরসনে ব্রতী হন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ্' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন:

> "যে সব বিষয়ে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায় পরস্পর বিরোধী মতবাদ পোষণ করেন, তা দু'প্রকার: ১. আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশ রয়েছে, এমন সব বিষয়। ২. কুরআন—হাদীসে কোন নির্দেশ নেই, সাহাবাগণও কোন মতামত ব্যক্ত করেন নি, এমন সব বিষয়। যেমন, ক. 'কার্যকারণ'। এর মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা অনিবার্যতামূলক নয়। খ. ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর পুনঃঅস্তিত্ব সম্ভব। গ. শ্রবণ ও দর্শন আল্লাহ্র দুটি স্বতন্ত্র গুণ। ঘ. আরশের উপর আল্লাহর আসীন হওয়া মানে তাঁর আধিপত্য কায়েম হওয়া ইত্যাদি। 'আহলে সুন্নাত-অল-জামাত'ভুক্ত হতে হলে এ সব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে'—এরূপ কোন মাপকাঠি হতে পারে না।"

শাহ সাহেব আরো বলেন:

এসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কোন সম্প্রদায় যদি নিজকে সুন্নী বলে দাবী করে এবং সেজন্য গর্ব অনুভব করে, তবে তা ন্যায় হবে না"

এরপর শাহ্ সাহেব ব'লেন ঃ

এ বিষয়গুলো সুন্নী হবার জন্য কি করে মাপকাঠি হতে পারে? কেননা, সুন্নী বলতে যদি খাঁটি সুন্নাতের অনুসরণ বুঝায়, তবে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই উচিত হবে না। বলা যেতে পারে, কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যার পূর্ব-শর্ত থেকে এ বিষয়গুলোর উৎপত্তি হয়েছে এবং সেজন্যই এগুলোকে ঐশী বাণী সংক্রান্ত বিষয়রূপে পরিগণিত করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করাও ঠিক হবে না। কেননা তাঁরা কুরআন-হাদীস থেকে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা পুরোপুরি শুদ্ধ ও গ্রহনীয় নাও হতে পারে; যে সব বিষয়কে তাঁরা পূর্ব-শর্তরূপে ধরে নিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ব-শর্ত না-ও হতে পারে; যে সব বিষয়কে তাঁরা অগ্রাহ্য করেন, তা মূলত অগ্রাহ্য করার বিষয় নাও হতে পারে; আবার তাঁরা এসব বিষয়ে যে ব্যাখ্যা-বিবরণ দিয়েছেন, তা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা থেকে হয়তো অধিকতর শ্রেয় নয়।

এখন রইলো সে সব বিষয়, যা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মৌলিক বিষয়রূপে পরিগণিত। এগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু শেষ যুগীয় ইমামগণ এ গুলো প্রমাণ করতে গিয়ে এমন নীতি অবলম্বন করেন, যে সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন দাঁড়ায়। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করছি, যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শেষ যুগীয় ইমামগণ যুক্তি প্রমাণে কিরূপ পন্থা অবলম্বন করেছেন।

## আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ

কুরআনে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের যে প্রমাণ রয়েছে তা দু'প্রকার ঃ ১. সম্বোধনমূলক ২. যুক্তিমূলক। কিন্তু ইলমে কালাম গ্রন্থে এগুলোর কোন উল্লেখ নেই। তাতে যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তা এই ঃ

১. বিশ্ব নশ্বর; যা নশ্বর, তা হেতু-নির্ভরশীল; তাই বিশ্ব হেতু-নির্ভরশীল। এই হেতু-ই আল্লাহ্।

২. বিশ্ব অনাবশ্যক; যা অনাবশ্যক, তা হেতু নির্ভরশীল।

৩. পরমূর্ত পদার্থ (বর্ণ, গন্ধ) নশ্বর; যা নশ্বর তা হেতু-নির্ভরশীল।

৪. সমস্ত পদার্থ সাদৃশ্যমূলক; যা সাদৃশ্যমূলক, তা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য হেতু-নির্ভরশীল।

এ প্রমাণ চারটি ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা, বিশ্বের নশ্বরতা ও অনাবশ্যকতা একটি বিতর্কমূলক বিষয়। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত পদার্থের সাদৃশ্যমূলক হওয়াও প্রমাণ-সিদ্ধ নয়। এ ছাড়া এ সব প্রমাণ কেবল তখনি ফলপ্রসূ হতে পারে, যদি 'কার্য-কারণে'র অনন্ত ধারাকে নাকচ করা যায়। তা না হলে একজন প্রকৃতিবাদী প্রশ্ন করতে পারে যে, 'কার্য-কারণে'র অনন্ত ধারা তো আদিকাল থেকেই চলে আসছে। মুতাকাল্লিমগণ অনন্তধারার এ প্রশ্নটি নাকচ করার জন্য বহু প্রমাণ দেন। কিন্তু এ সব প্রমাণ দিয়ে কেবল সেই অনন্তধারাকেই বাতিল করা যায়, যার অঙ্গগুলো পরস্পর সংহত ও অভিন্ন। আর যদি স্বীকার করা হয় যে, পূর্ববর্তী হেতুগুলো বিলুপ্ত হয়ে থাকে, তবে এ সব যুক্তি দিয়ে 'কার্যকারণে'র অনন্ত ধারা বাতিল করা সম্ভব নয়।

এ ছাড়া এখানে আরো অনেক কথা রয়েছে। উপরিউক্ত প্রমাণ চারটি যদি ত্রুটিবিহীন হয়, তবে তা দিয়ে কেবল হেতু প্রমাণ করাই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সেই হেতু যে এখতিয়ারসম্পন্ন এবং ক্ষমতাশীল হবে, তাতো প্রমাণিত হয় না। কেননা হেতু দু'প্রকার : সত্তা-উদ্ভূত। যেমন সূর্য হলো আলোর হেতু। দ্বিতীয় হলো স্বেচ্ছা-উদ্ভূত। যেমন মানুষ হলো তার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্যবলীর হেতু। তাই নিছক হেতু প্রতিষ্ঠিত হলেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাপরিচালিত বা এখতিয়ারসম্পন্ন হেতু হওয়া কি করে প্রতিষ্ঠিত হবে? অথচ উদ্দেশ্য হলো সেটাই।

নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণে পূর্ববর্তী ইমামগণ কিভাবে প্রমাণ পেশ করেছেন, তা গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। শেষ যুগীয় ইমামগণ কেবল মুজিয়ার উপর ভিত্তি করেই নবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করেন। এতে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং শেষ যুগীয় ইমামগণ তার পাল্টা জওয়াবও দিয়েছেন। আমি সেগুলো বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করছি। ইমাম রাযী এ প্রশ্নগুলো তাঁর 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। 'শরহে মাওয়াকিফ' নামক গ্রন্থে এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা হয়। ইমাম রাযী মোটামুটিভাবে প্রশ্নাবলীর সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন। কিন্তু 'শরহে মাওয়াকিফ' ইত্যাদি

গ্রন্থে প্রথমে বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে উত্তর দেয়া হয়। অতঃপর প্রত্যেকটি প্রশ্নের বিস্তারিতভাবে পৃথক পৃথক উত্তর প্রদান করা হয়।

## মুজিযা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

### প্রথম প্রশ্ন

যদি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম এবং অলৌকিকত্ব বৈধ হয়, তবে বাস্তব এবং নিঃসন্দেহ বস্তু থেকেও মানুষের বিশ্বাস উঠে যাবে। যদি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমের ফলে মানুষ গাধায় পরিণত হয়, সূর্য অস্তমিত হয়ে আবার উদিত হয়, পাথর কণা বাকশীল হয়, মৃত ব্যক্তি কবর থেকে জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসে, হামিদ হাবীবে পরিণত হয়, তবে কোন্ বস্তুটির প্রতি মানুষের আস্থা অটুট থাকতে পারে? যে সব বস্তুকে মানুষ বাস্তব ও নিশ্চিত বলে ধারণা করে, এমতাবস্থায় সেগুলো কি করে বাস্তব ও নিশ্চিত থাকতে পারে? কেননা সেগুলোও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের ফলে মৌলিক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে।

### উত্তর

আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির চাইতে স্বভাবের ব্যতিক্রম অধিক বিস্ময়কর নয়। তাই স্বভাবের ব্যতিক্রম যে সম্ভব, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও কারুর মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় না যে, হামিদ হয়তো হাবীবে পরিণত হয়েছে, গাধা হয়তো মানুষে পরিণত হয়েছে। তাই যদি স্বাভাবিক নিয়মে ছিটে-ফোঁটা দু' একটি ব্যতিক্রম ঘটে, তবে বাস্তবের বাস্তবতায় এবং স্বতঃসিদ্ধতায় কোন ব্যাঘাত জন্মায় না।

### দ্বিতীয় প্রশ্ন

যে বস্তুটি মুজিযা বলে অভিহিত, তা যে মন্ত্র বা যাদু নয়, সেটা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে?

### উত্তর

মুজিযার প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে যত বড় ব্যতিক্রম ঘটতে পারে, যাদুর প্রভাবে তা কখনো সম্ভব নয়। যেমন দরিয়া বিদীর্ণ হওয়া,

মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়া, আজন্ম মূক ও বধিরের বাকশক্তি ও শ্রবণ শক্তি লাভ করা ইত্যাদি। এ উত্তর দিয়েছেন মাওয়াকিফের ব্যাখ্যাকার এবং আরো অনেকে। কিন্তু তাঁরা এটা ভেবে দেখেন নি যে, নবীদের সব মুজিযা মহান ও বিশাল হয় না। এ ছাড়া আশয়ারিগণ এটা মেনে নিয়েছেন যে, যাদুর প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে যে কোন ব্যতিক্রমই ঘটতে পারে। অবশ্য মুতাযিলিগণ এতটুকু শর্ত আরোপ করেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ পদার্থ, জীবন, বর্ণ এবং স্বাদ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু আশায়েরাবাদিগণ মুতাযিলাবাদীদের এ মতবাদ সমর্থন করেন নি। ইমাম রাযী তাঁর 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থে হারুত-মারুতের ঘটনায় বিষয়টি বিস্তারিত ভরে আলোচনা করেন। তিনি এক স্থানে বলেন ঃ

'আহলে–সুন্নাত' এটা বিশ্বাস করেন যে, যাদুকর বাতাসে উড়তে পারে এবং সে মানুষকে গাধায়, আবার গাধাকে মানুষে পরিণত করতে পারে।"

গাধাকে মানুষে পরিণত করা অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি দেয়ার চাইতে বেশী বিস্ময়কর নয় কি?

## তৃতীয় প্রশ্ন

মুজিযার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'কেউ এর প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম নয়।' এর অর্থ কি? "কেউ" বলতে যদি সংশ্লিষ্ট যুগের মানুষকে বুঝায়, তবে মুজিযার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। কেননা, জোরোয়াস্টার এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মুকান্না, এর ন্যায় অনেক যাদুকর ও নবুওয়াতের দাবীদার বিগত হয়েছে, যাদের প্রত্যুত্তর তখনকার মানুষরা দিতে সক্ষম হয়নি। আর যদি এ অর্থ হয় যে, তার প্রত্যুত্তর কেয়ামত পর্যন্ত কেউ দিতে সক্ষম নয়, তবে এ নিশ্চয়তা কে দেবে যে, নবিগণ যে অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেন, তার প্রত্যুত্তর কেয়ামত পর্যন্ত কেউ দিতে সক্ষম হবে না। ইমাম রাযী এ প্রশ্নটি তাঁর 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন এবং এর সংক্ষিপ্ত উত্তরও প্রদান করেন। উত্তরটি পরে আলোচিত হবে। 'শরহে-মাওয়াকিফ' ইত্যাদি গ্রন্থে এ প্রশ্নটির উল্লেখ নেই।

## চতুর্থ প্রশ্ন

চতুর্থ প্রশ্ন হলো, আশয়ারীদের মতে জিন এবং শয়তান যে কোন পদার্থে অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং অভ্যন্তর থেকে কথাবার্তাও বলতে পারে। এ মতবাদে অনেক মুজিযা সন্দেহযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, কোন নবী এ মুজিযা দেখালেন যে, বৃক্ষ থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে। এতে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, হয়তো জিন বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কথাবার্তা বলছে।

## উত্তর

আশায়েরাবাদিগণ এর উত্তরে বলেন, 'যাবতীয় কার্যের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্। তাই জিন ইত্যাদির যে কার্যাবলী রয়েছে, তা মূলতঃ আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি।' কিন্তু এ প্রশ্ন এবং এ উত্তরের মধ্যে আমি কোন সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি না। এই তো হলো বিস্তারিত জওয়াব। 'শরহে মাওয়াফিক' গ্রন্থে উপরিউক্ত প্রশ্নাবলীর মোটামুটি উত্তর দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, এসব প্রশ্ন কল্পনাপ্রসূত। তা কারুর বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে না।

মাওয়াকিফের ব্যাখ্যাকার যে উত্তর দেন, তা আশায়েরা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুজিযার প্রভাবে লোকের মনে নবুওয়াত সম্পর্কে যে বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে, তা যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং তা হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, নবী থেকে যখন কোন মুজিয়া জাহির হয়, তখনি উপস্থিত লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা বিশ্বাস করে নেয়। মাওয়াকিফ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার 'মুজিযার চিহ্ন' শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়টি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনেকটা যথার্থ। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় যাদুর উপর মুজিযার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কেননা নবুওয়াতের দাবীদার যদি একজন যাদুকর হয় এবং সে বিশাল আকারে যাদু দেখাতে সক্ষম হয়, তবে অজস্র লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা বিশ্বাস করে নেয়। এমন অনেক মিথ্যাবাদী নবীরও আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের প্রতি হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ লোকও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' নামক গ্রন্থে এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলেন, সমস্ত কর্মের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্। তাই মুজিযারও স্রষ্টা হলেন তিনি। মুজিযার উদ্দেশ্য হলো নবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা। তাই

মুজিযার এ উদ্দেশ্য সাধিত না হয়ে পারে না। ইমাম রাযী আশায়েরাবাদীদের চিন্তাধারার আলোকেই এ জওয়াব দেন। কিন্তু তিনি নিজেই এ উত্তরের গুরুত্ব দেননি। তিনি নবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্য একটি পন্থা অবলম্বন করেন এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'আমার এ প্রমাণ-পদ্ধতি সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত'। 'মাতালিবে আলিয়া নামক' গ্রন্থে তিনি এ পদ্ধতিটি ফলাও করে বিশেলষণ করেন। কিন্তু পরবর্তী ইমামগণ তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেন।

মোট কথা, শেষ যুগীয় ইমামদের ধারা হলো, তাঁরা প্রমাণক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যা অধিকতর জটিল এবং যাতে পদে পদে সমস্যা দেখা দেয়। এটা অবশ্য তাঁদের দুঃসাহসিকতারই পরিচয় বহন করে। কিন্তু এসব সমস্যা সমাধানে তাঁরা কতটুকু সক্ষম হন, তা'ই বিচার্য।

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকাইদ প্রতিষ্ঠায় পূর্ববর্তী ইমামগণ যে সব প্রমাণ রেখে গেছেন, তা'ই ইলমে কালামের প্রাণধন। আমি বিষয়টি গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে আলোচনার জন্য তুলে রাখলাম।

'আখিরু-দা'ওয়ানা আনিল্-হামদু-লিল্লাহি-রব্বিল-আলামীন'।

———

ইসলামী দর্শন
দ্বিতীয় খণ্ড

## আধুনিক ইল্‌মে কালাম

গ্রন্থের প্রথমাংশেই বলা হয়েছে যে, প্রাচীন ইলমে কালামের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক ইলমে কালাম গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ইলমে কালামকে সাজানো গোছানোর ফলে যে নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে আধুনিক ইলমে কালামরূপে আখ্যায়িত করা হলে তা মোটেই অসমীচীন হবে না। নিম্নে বিষয়টির বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ঃ

পাঠকগণ পূর্বেই অবগত হয়েছেন যে, ইল্‌মে কালামের বিভিন্ন শাখা রয়েছে এবং সেগুলোর বর্ণনায় কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ বিভিন্ন পদ্ধতিও অবলম্বন করেছেন। পূর্বসূরিগণ যে বর্ণনা-রীতি অবলম্বন করেছিলেন, সেটাই ছিল সত্যিকারের ইলমে কালাম। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, বর্তমানে পূর্বসূরীদের একটা রচনাও খুঁজে পাওয়া যায় না। 'মিলাল ও নিহাল্‌', 'তফ্‌সীর-ই-কবীর' এবং ইলমে কালামের অপরাপর গ্রন্থে পূর্ববর্তীদের কিছু কিছু উক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইলমে কালামের জরুরী বিষয়গুলো অনুধাবনের জন্য এসবের পুরো-পুরি সংকলন করা প্রয়োজন।

পরবর্তীদের মধ্যে যাঁরা বাস্তবধর্মী ছিলেন, তাঁরা ব্যতিক্রমধর্মী পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা পাঠ্যসূচীভুক্ত পুস্তকগুলো রচনা করতেন জনসাধারণের মতিগতি অনুসারে। কিন্তু তাঁদের প্রকৃত ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করতেন অপরাপর গ্রন্থে। শেষোক্ত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাই নির্দেশ দিতেন যে, এগুলো যেন সাধারণ্যে প্রকাশ না করা হয়। এ প্রসংগে ইমাম গাযালী রচিত 'কাওয়াইদুল্‌ আকায়েদ্‌', 'ইক্‌তেসাদ্‌', 'তাহাফাতুল্‌-ফালাসিফাহ্‌' এবং আরো অন্যান্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

পূর্ববর্তিগণ বিভিন্ন স্থানে তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রথমোক্ত রচনাবলী সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় এ মন্তব্য করেছেন ঃ এগুলোর মধ্যে

যে সব কথা বিবৃত হয়েছে,তা প্রকৃত কথা নয় ; জনগণের প্রচলিত ধ্যানধারণা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই এগুলো রচিত হয়েছে।

**ইমাম গাযালী স্পষ্টতঃই বলেছেন যে, তিনি সাধারণ্যে প্রচলিত গ্রন্থসমূহে তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন নি।**

'জওয়াহিরুল্ কুরআন' নামক গ্রন্থে তিনি কুরআন কেন্দ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

"কাফেরদের সাথে তর্কবিতর্ক করা—এটা হলো একটি বিশেষ বিদ্যা। এ বিদ্যা থেকেই ইলমে কালামের সৃষ্টি। এর উদ্দেশ্য হলো—বিদা'তসমূহ রোধ করা এবং সন্দেহ দূরীভূত করা। বিষয়টি পরিচালনা করার দায়িত্ব বর্তায় মুতাকাল্লিমদের (কালামশাস্ত্রবিদদের) উপর। আমি বিষয়টি দু'টি পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছি : কতগুলো গ্রন্থ লিখেছি সাধারণ লোকের জন্য। 'রিসালা-ই-কুদ্সিয়া' এ শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার কতগুলো রচনা করেছি ওঁদের জন্য, যাঁরা জনসাধারণের উর্ধ্বে রয়েছেন। 'আল্-ইক্তেসাদ্ ফিল্ ই'তেকাদ্' নামক গ্রন্থটি এ শ্রেণীভুক্ত। এ বিদ্যার লক্ষ্য হলো জনসাধারণের আকীদা অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিদা'তের অনুপ্রবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখা। এ বিদ্যায় সাধারণত গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করা হয় না। আমার 'তাহাফাতুল-ফলাসিফাহ্', 'মুস্তায্হিরী' (বাতিনিয়াদের খণ্ডনে রচিত), 'হুজ্জাতুল্-হক্', 'কাসিমুল্ বাতিনিয়াহ্' এবং 'কিতাবুল্ মুফাস্সাল্ লিল-খিলাফ্ ফী উসুলীদ্দীন্' শীর্ষক গ্রন্থগুলো এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।"

এ স্বীকারোক্তির কথা বাদই দিলাম। ইমাম গাযালীর গ্রন্থাবলী স্বয়ং এ বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করছে। ইলমে কালামের কিতাবসমূহে তিনি যে সব আকায়েদ জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে তিনি অন্যান্য রচনায় বলেছেন : এ সব আকায়েদের আসল রূপ অন্য কিছু! এখানে যা বিবৃত হয়েছে, ব্যাপারটি মূলত তা নয়!

ইমাম গাযালী সে সব রচনায় ইসলামের আসল আকায়েদ এবং সেগুলোর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি সূক্ষ্ম কৌশলে গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। এজন্যই সংক্ষিপ্ত ও সহজ হওয়া সত্ত্বেও সে গ্রন্থগুলো জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়নি। আল্লাহর সত্তা, গুণবলী, কর্ম এবং কেয়ামত সংক্রান্ত আকায়েদকে

তিনি 'ইহ্-ইয়াউম্-উলুম' এবং অন্যান্য গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেন। 'জওয়াহিরুল্ কুরআন' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন :

"আমার হাতে সময় ছিল খুবই কম ; অসুবিধা ও বিপদ ছিল অনেক ; বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারী বলতে গেলে ছিলই না। তা সত্ত্বেও আমি সাধ্যমত আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী, কর্ম এবং কেয়ামত—এ চারটি বিষয়ের প্রাথমিক তত্ত্বকথা কোন কোন রচনায় বর্ণনা করেছি। কিন্তু আমি সেসব গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিনি। কেননা, অধিকাংশ লোকই এসব তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম। এতে তাদের লাভ না হয়ে ক্ষতিই সাধিত হয়। যাঁরা এসব বিষয়ে কিছুটা জানেন-শোনেন বলে দাবী করে থাকেন, মূলত তাঁরাও অজ্ঞ। এ ধরনের রচনাবলী কেবল সেই সব লোকের কাছেই প্রকাশ করা উচিত, যাঁরা প্রকাশ্য জ্ঞান লাভে পূর্ণতা অর্জন করেছেন ; কু-রিপু দূর করে নিজেদের মধ্যে সু-প্রবৃত্তি গড়ে তুলেছেন ; দুনিয়ার লোভ-লালসা ত্যাগ করেছেন ; যাঁরা সত্যের অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই জানেন না ; তদুপরি তাঁরা হবেন মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সরল প্রাণের অধিকারী। এসব রচনাবলী যাঁদের হস্তগত হবে, তাঁদের পক্ষে সেগুলো এমন লোকের কাছে ব্যক্ত করা হারাম হবে, যারা উপরিউক্ত গুণাবলীর অধিকারী নয়।"

ইমাম গাযালীর নিম্নলিখিত কথাগুলো ভাল করে চিন্তা করে দেখুন, তিনি বলেন : "সাধারণ লোকের পক্ষে গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এরূপ বৃথা চেষ্টায় লাভ না হয়ে তাদের ক্ষতিই সাধিত হয়।" কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, ইমাম গাযালী কেবল সাধারণ লোক সম্পর্কেই এ কথাগুলো বলেছেন। তাই আলেম-বর্গের কাছে গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করতে কি অসুবিধা রয়েছে? এ সন্দেহ দূর করার জন্যেই ইমাম গাযালী বলেছেন : বর্তমানের আলেম-বর্গও সাধারণ লোকের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম গাযালীর মতে, কেবল উপযুক্ত শ্রোতার কাছেই গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করা যায়। উপযুক্ত শ্রোতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন : এরূপ ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থের লেশমাত্র নেই। এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আসল সত্য প্রকাশে সাধারণ লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তাই সত্য শ্রবণের জন্য উপযুক্ত হবে সেই ব্যক্তি, যে সাধারণ লোকের মোটেও পরোয়া করে না।

ইমাম রাযীর জীবন-চরিতে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে, আসল কথাটা তিনি কি অদ্ভুত ভংগিতে প্রকাশ করেছেন। ইব্নে রুশ্দ্ তাঁর রচনাবলীতে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, জনসাধারণের কাছে আসল হকিকত বর্ণনা করা উচিত নয়।

আধুনিক ইলমে কালাম-রচয়িতাদের উচিত, এ মহৎ লোকেরা যে সব সম্পদ অস্পষ্ট রেখে গেছেন, তা জনসমক্ষে তুলে ধরা।

প্রাচীন ইলমে কালামে কেবল ইসলামী আকায়েদ নিয়ে আলোচনা করা হতো। কারণ তখন বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করতো, তা ছিল আকায়েদ সংক্রান্ত। কিন্তু বর্তমানে ধর্মকে ঐতিহাসিক, নৈতিক, তমুদ্দুনিক—বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে দেখা হয়। ইউরোপে আকায়েদের দিক থেকে কোন ধর্মকে ততটা দূষণীয় বলে মনে করা হয় না, যতটা তাকে আইনগত ও নীতিগত বিষয়াদির দিক থেকে মনে করা হয়। তাঁদের মতে, কোন ধর্ম যদি একাধিক বিবাহ, তালাক, দাসত্ব বা যুদ্ধকে বৈধ বলে মনে করে, তবে সেটাই সে ধর্মের অযথার্থ ও বাতিল বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য সব চাইতে বড় যুক্তি। তাই ইলমে কালামে এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত। ইলমে কালামের এ অংশটি হবে 'আধুনিক ইলমে কালাম'।

এর জন্য যা সবচাইতে বেশী প্রয়োজন, তা হলো : এর যুক্তি-গুলো হবে সাদাসিধে ; তাহলে যেন তা খুব শিগগীর উপলব্ধিতে আসে এবং মানুষের মনে রেখাপাত করে। প্রাচীন ইলমে কালামে থাকতো জটিল ভূমিকা, যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত পরিভাষা এবং খুব সূক্ষ্ম চিন্তা-মূলক কথাবার্তা। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্য নীরব হয়ে যেতো, কিন্তু তাদের মনে বিশ্বাস ও অভিজ্ঞানের উদয় হতো না।

মোটকথা, আধুনিক ইলমে কালাম সংকলনের সময় এ বিষয়-গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সর্বশেষে সে সব মহৎ লোকদের নামগুলোও বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন, যাঁরা এই ইলমে কালামের উৎসমূল। তাঁরা হলেন : আবূ মুসলিম ইস্ফাহানী, কাফ্ফাল্, ইব্নে হায্ম্, ইমাম গাযালী, রাগিব ইস্ফাহানী, ইব্নে রুশ্দ্, ইমাম রাযী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ।

# আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম

সারা বিশ্বে এ মর্মে হৈ-চৈ সৃষ্টি হয়েছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন নাকি ধর্মের বুনিয়াদকে শিথিল করে দিয়েছে। দর্শন ও ধর্মের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমনি হৈ-চৈ সব সময়েই উত্থিত হয়ে আসছে। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু যে বিষয়টি নতুন, তা হলোঃ আজকাল দাবী করা হচ্ছে যে, প্রাচীন দর্শনের ভিত্তি ছিল অনুমান ও অনুসিদ্ধান্তের উপর। তাই সে দর্শনবলে ধর্মকে উৎখাৎ করা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে, আধুনিক দর্শনের ভিত্তি হলো —পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। তাই ধর্ম এর সামনে টিকে থাকতে পারে না।

এই আওয়াজটি উঠেছে ইউরোপ থেকে এবং তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। এটা কতটুকু সত্য বা অসত্য, তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।

গ্রীসে পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, আল্লাহতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা—এ সবকে এক সঙ্গে বলা হতো দর্শন। কিন্তু ইউরোপীয় জ্ঞানীরা সঠিক নীতির অনুসরণ করে এগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করেনঃ যে সব বিষয়ের হকিকত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে, সেগুলোকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'বিজ্ঞান' রূপে। আর যেগুলো পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার নাগালের বাইরে, সেগুলোকে অভিহিত করা হয়েছে 'দর্শন' রূপে।

আধুনিক গবেষণা-লব্ধ বিষয়াদি সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা হলোঃ এগুলো নিশ্চিত ও বিশ্বাস্য। এ ধারণায় মস্তবড় গলদ রয়েছে। তা হলোঃ কেবল বিজ্ঞান-প্রমাণিত বিষয়গুলোকেই সত্য ও সুনিশ্চিত বলে মনে করা যায়, অন্য কিছুকে নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিজ্ঞান-প্রমাণিত তত্ত্ব নিয়ে ইউরোপীয় বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু দর্শনের ব্যাপারটা তদ্রূপ নয়।

বর্তমান ইউরোপে দর্শনকেন্দ্রিক নানা চিন্তাধারা রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে এমন তীব্র মত-বিরোধ রয়েছে যে, সে সবগুলোকে যদি সত্য বলে ধরা হয়, তবে একই বস্তুকে একাধারে সাদাও বলতে হবে, আবার কালোও বলতে হবে।

এখন দেখা উচিত, ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে? বিজ্ঞান যে সব বস্তুকে সত্য বা অসত্য বলে প্রমাণিত করে, সেগুলো সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই। হরেক বস্তুতে মৌল উপাদান কতটুকু বা পানিতে কি কি উপাদান রয়েছে বা বাতাস কতটা ভারী বা আলোর গতি কতটুকু বা ভূ-গর্ভে কয়টি স্তর রয়েছে—এসব হলো বিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রশ্ন। ধর্মের সাথে এগুলোর কোন সংযোগ নেই। আল্লাহ্ আছে, কি নেই বা মৃত্যুর পর আর কোন জীবন রয়েছে কি-না বা ভাল-মন্দ বলে কোন বস্তু আছে কি-না বা প্রতিদান ও শাস্তি সঠিক কি-না—এসব প্রশ্ন নিয়েই ধর্ম বোঝা-পড়া করে। এগুলোর মধ্যে এমন কোন্ বিষয়টি রয়েছে, যাতে বিজ্ঞান প্রশ্রয় পেতে পারে? বিজ্ঞানের শিক্ষকগণ যদি এ সম্পর্কে কিছু বলে থাকেন, তবে এতটুকু বলেছেন যে, এসব বস্তু সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই; অথবা বলেছেন যে, এগুলো পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে; অথবা বলেছেনঃ আমরা এগুলো বিশ্বাস করি না; কারণ আমরা কেবল সেই সব বস্তুকেই বিশ্বাস করি, যা পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের অজ্ঞতার দরুনই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। বিজ্ঞানীরা যখন বলেনঃ এ বস্তু সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই, তখন অজ্ঞ লোকেরা তার অর্থ করে, 'এ সব বস্তু নেই বলেই আমরা জানি।' অথচ এ দু'টি কথার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে।

ইউরোপে বিভিন্ন কাজের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ চিহ্নিত রয়েছে। সে মহাদেশে প্রত্যেক বিষয়ের লোক নিজ নিজ কর্ম ভাগ করে নিয়েছে। প্রতিটি দল নিজ কর্ম নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, তারা বিভাগীয় দায়িত্ব ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায় না। তন্মধ্যে একটি দল হলো জড়বাদীদের। এদের বিষয়বস্তু হলো—জড় পদার্থ। এ সম্প্রদায় জড়বস্তু সম্পর্কে অনেক অদ্ভুদ রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে। এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয় "এরা ধর্ম, আল্লাহ্ ও আত্মায়

অবিশ্বাসী।" কিন্তু মূলত এরা এ সব বিষয়ের কোনটাতেই অবিশ্বাসী নয়। এ সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো—এগুলো প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় না। অধ্যাপক লিট্রা এ সম্প্রদায়ের একজন বড় নেতা। তিনি বলেন, বিশ্বের আদি ও অন্ত সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। তাই বলে কোন চিরন্তন অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অধিকার যেমন আমাদের নেই, তেমনি সেগুলোকে সত্য বা অসত্য বলে প্রমাণিত করার দায়িত্বও আমাদের নেই। জড়বাদীরা 'প্রথম জ্ঞান' (আক্‌ল-এ-আউ-ওয়াল)-এর অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে না। কারণ, জড়বাদ এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। জড়-বাদীরা বলে, "আমরা দৈব জ্ঞান স্বীকার করি না, আবার অস্বীকারও করি না। তার সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায় না।"

ফরাসীর কোন এক চিকিৎসা বিজ্ঞান পত্রিকায় এ মর্মে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল যে, মানুষের মস্তিষ্কে যে ফস্‌ফরাস থাকে, সে উপাদান থেকেই চিন্তা ও বোধ-শক্তির উৎপত্তি হয়। বীরত্ব, সরলতা, শালীনতা—এ সব মানবীয় গুণ হলো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন-সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। এর প্রত্যুত্তরে ফরাসীর জনৈক খ্যাতনামা জ্ঞানী ও পদার্থবিদ প্লামার-ইয়ন অপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি প্রথমোক্ত নিবন্ধকারকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

"এমন কথা আপনার কাছে কে বললো? লোকের ধারণা হবে যে, আপনার শিক্ষকরাই বোধ হয় আপনাকে এ শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না। আমি জানি না, আপনার এ নিরর্থক দাবী বেশী বিস্ময়কর, নাকি তথাকথিত বিদ্যার দাবি-দারদের আস্পর্ধা? নিউটন কোন বিষয় বর্ণনা করার সময় বলতেন, "বাহ্যত এমনি হবে বলেই মনে হয়।" কেপলার সব সময় বলতেন, "তোমরা বিষয়গুলোকে এরূপ বলে মনে করতে পার।" অথচ আপনি বলছেন, "আমরা প্রমাণ করছি; আমরা নাকচ করছি; এটা আছে; ওটা নেই; এটা জ্ঞানেরই সিদ্ধান্ত; জ্ঞান এটা প্রমাণ করে দিয়েছে।" আপনার এ-সব দাবিতে জ্ঞানমূলক যুক্তির লেশও নেই। আপনি বোকামির দরুন দুঃসাহস করে বিদ্যা-বুদ্ধির ঘাড়ে এত বড় বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন? আপনি যা বলছেন, তা যদি জ্ঞানীদের

কানে পড়ে (এবং পড়বেই তো, কারণ আপনি হলেন জ্ঞানের সন্তান), তবে আপনার বোকামি দেখে তাঁদের হাসির উদ্রেক হবে। আপনি বলছেন, "জ্ঞান প্রমাণ করে দিচ্ছে; নাকচ করে দিচ্ছে"—এসব কথা উচ্চরণ করে আপনি হতভাগা জ্ঞানের ওষ্ঠে একটি বড় ও ভারি শব্দের বোঝা তুলে ধরছেন, যাতে হয়তো জ্ঞানের অন্তরে অহংকারের উদয় হতে পারে। প্রিয়, মনে রাখুন—জ্ঞান এসব বিষয়ের কোনটাকে সমর্থনও করে না, আবার অস্বীকারও করে না।"

এগুলো ছিল জ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কিন্তু অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী জড়বাদীরা নিজেদের সীমারেখা ছাড়িয়ে নৈতিবাচক দাবী করে বসে। এদের বাড়াবাড়ি ও কৃত্রিম আভা আমাদের দেশের নও-জোয়ানদের চোখকে ঝল্‌সে দিয়েছে। তাই আমাদের বিশেষ চিন্তা করে দেখতে হবে যে, তারা তাদের দাবির প্রতিষ্ঠায় কি ধরনের যুক্তি পেশ করছে? দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের কয়েকটি উক্তির উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

ডক্‌টর শেফ্‌লার বলেন, "আত্মা হলো স্নায়ু-উদ্ভূত একটি জড়াত্মক শক্তি। ডায়ার শ' বলেন, "আত্মা এক প্রকার প্রক্রিয়া জনিত গতি।" বুশ্‌নার বলেন, "মানুষ জড় পদার্থ থেকে উদ্ভূত।" দু. বুওয়া রিমন বলেন : "স্নায়ুসমূহে এক প্রকার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ রয়েছে। যাকে আমরা 'চিন্তা' বলে আখ্যায়িত করে থাকি, তা-হলো জড় বস্তুর একটি গতি।" ডু. ডুট্রেশে ছিলেন একজন বড় পদার্থ-বিজ্ঞানী। তিনি বলেন, "জীবন প্রকৃতির বাঁধাধরা নিয়মাধীন বস্তু নয়, বরং তা হলো এমন একটি দৈব ব্যতিক্রম, যা জড়বস্তুর সাধারণ নিয়ম বিরুদ্ধ।" কোন এক বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, মস্তিষ্কে যে ফস্‌ফরাস রয়েছে, সেই উপাদান থেকেই চিন্তা-শক্তির উদ্ভব হয় এবং যে সব বস্তুকে আমরা অকপটতা, বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বলে আখ্যায়িত করে থাকি, তা হলো—দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তরঙ্গমালার নামান্তর।

উপরিউক্ত অভিমতগুলোকে আমরা কি নিশ্চিতরূপে সত্য বলে মনে করতে পারি? এগুলোর উপর ভিত্তি করে এটা কি দাবি করা যায় যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মার অসারতা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ

হয়েছে বা আত্মাকে অস্বীকার করেছে। আসল কথা হলো-ধর্ম ও বিজ্ঞানের গণ্ডি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম যে সব বস্তু নিয়ে আলোচনা করে, বিজ্ঞান তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মের সাথে দর্শনের বিরোধ দেখা যায়। তাই বলে দর্শনের অভিমত-সমূহকে নিশ্চিত সত্য বলে পরিগণিত করা যাবে না। দর্শন শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। কোন কোন মতবাদে আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করা হয় না। আবার কোন কোন মতবাদে তাঁর অস্তিত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করা হয়। কোন কোন দার্শনিক আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আবার কেউ তা অস্বীকার করেন। এক সম্প্রদায়ের কাছে যা নৈতিকতার মাপকাঠি বলে বিবেচিত, তা অন্য সম্প্রদায়ের কাছে সমর্থনযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় ধর্মের সান্ত্বনা হলো ঃ

"তুমি কি দেখেছ! লেগেছে লড়াই দুশমনে দুশমনে।" জটিলতা ও গড়বড়ির সৃষ্টি হয় ঐ সময়, যখন বিজ্ঞান বা ধর্ম নিজ নিজ গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যের সীমারেখায় অনুপ্রবেশ করে। এই সীমা লংঘনই নাস্তিক ও ধর্ম-অবিশ্বাসীদেরকে তাদের চিন্তাক্ষেত্রে নাস্তিক্যের ইন্ধন যুগিয়েছে। সত্যিকার বলতে গেলে, এই দ্বন্দ্বই নাস্তিকতা ও ধর্ম-হীনতামূলক চিন্তাধারার দ্বার খুলে দিয়েছে।

পূর্বকালে ইউরোপে ধর্মের গণ্ডি এত প্রশস্ত ছিল যে, জ্ঞানমূলক কোন বিষয়ই ধর্মীয় আলোচনা ও ধর্মীয় হস্তক্ষেপ থেকে বাদ পড়তো না। এ উদ্দেশ্যে স্পেনে 'অনুসন্ধান' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাজ ছিল—যারা ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলবে, তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং তাদেরকে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা। এই নিরিখে ১৪৮১ খ্রীঃ হতে ১৪৯৮ খ্রীঃ এই আঠার বছরে দশ হাজার দু'শ' বাইশটি লোককে ধর্মহীনতার অভিযোগে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। এ সমিতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার লোককে কাফের ও ধর্মহীন বলে আখ্যায়িত করে। এর মধ্যে লক্ষাধিক লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

কি কি কারণে নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতো, তা নিম্ন ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হবে। কোপার্নিকাস বাতলিমুসের

নীতি অস্বীকার করেন এবং প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী ও চাঁদ ইত্যাদি সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে। এতে 'অনুসন্ধান সমিতি' এ মর্মে ফতোয়া দিল যে, কোপানিকাসের অভিমত ঐশ কিতাব-বিরোধী। তাই তিনি ধর্মান্তরিত ও কাফের।

গ্যালিলিও ছিলেন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। তিনি কোপানিকাসের সমর্থনে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে। এতে 'অনুসন্ধান সমিতি' ফতোয়া দিল যে, তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। তদনুসারে তাঁকে হাঁটু গেড়ে বসানো হলো এবং আদেশ দেওয়া হলো যে, তিনি যেন এ মত প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তিনি নিজ মতে অবিচল ছিলেন বলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। দশ বছর কাল তিনি কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন।

কলম্বাস যখন নতুন দ্বীপ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সফরে যেতে চাইলেন, তখন গির্জা থেকে ফতোয়া দেওয়া হলো যে, এ ধরনের ইচ্ছা ধর্ম-বিরোধী। 'পৃথিবী গোলাকার'—এ ধারণা তিনি যখন ব্যক্ত করলেন, পাদরীরা তখন তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলে উঠলেন: এ বিশ্বাস পবিত্র কিতাব-বিরোধী।

মোটকথা, পাদরিগণ প্রত্যেক প্রকার আবিষ্কারকেই নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতেন। কিন্তু তাঁদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেননা, তাঁদের পক্ষে অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে নাস্তিকতার অভিযোগের মধ্য দিয়েই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার লাভ করে।

পাদরীদের কুসংস্কার যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারেনি। শিক্ষিত সমাজ মনে করলেন, যা পাদরীদের ধ্যান-ধারণা, সেটাই ধর্ম। এই নিরিখে তাঁরা দৃঢ়ভাবে এ মত পোষণ করতে লাগলেন যে, ধর্ম মাত্রই জ্ঞান-বিরোধী এবং হকিকতের (বাস্তব সত্যের) পরিপন্থী। এই যে ধারণা শিক্ষিত সমাজের অন্তরে শিকড় গজালো, তা আজও মুছে যায় নি। এর প্রতিধ্বনি আজও ইউরোপে ধ্বনিত হচ্ছে।

ধর্মের স্বরূপ যদি সত্যই এমনি হয়, তবে তা কিছুতেই বিজ্ঞানের সামনে তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু ইসলাম তার জন্মলগ্নেই ঘোষণা

করেছিলঃ "বৈষয়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তোমরাই ভাল বোঝ।" বলা বাহুল্য, প্রাচীন বিজ্ঞান বা আধুনিক বিজ্ঞান—এ সবই পার্থিব বিষয়। এগুলোর সাথে কেয়ামত ও পরকালের কোন সম্পর্ক নেই।

এটা অবশ্য লক্ষণীয় বিষয় যে, ইসলাম ধর্মে শত শত সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এত মতবিরোধ ঘটেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে কাফের বলেও আখ্যায়িত করেছে। এ আখ্যাদান কেবল বড় বড় বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, নিতান্ত ছোট-খাট ব্যাপারেও তারা একে অপরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ করে দিয়েছে। এত সব সত্ত্বেও এটা জোরগলায় বলা যায় যে, জ্ঞানমূলক তথ্য উদ্ঘাটন বা আবিষ্কারের অজুহাতে কোন ব্যক্তিকে কখনো কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয় নি। প্রাচীন তফসীরবিদ-গণের ধারণা ছিলঃ বৃষ্টি আকাশ থেকেই বর্ষিত হয়—আকাশে একটি দরিয়া আছে; মেঘ সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে বারি-পাত ঘটায়। তাঁদের আরো ধারণা ছিলঃ সূর্য কানায় কানায় ভরা একটি কূপে নিমজ্জিত হয়; জমিন সমতল, গোলাকার নয়; যেসব নক্ষত্র আকাশ থেকে খসে পড়ে, সেগুলো হলো শয়তানের প্রতি নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তফসীরবিদ্গণ এসব কথা কুরআনের ভাষা থেকেই প্রমাণ করতেন। ইমাম রাযী প্রাচীন তফসীরকারদের এসব উক্তি তাঁর 'তফসীর-ই-কবীর' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন।

যখন আব্বাসীদের জ্ঞান-সাধনার যুগ সূচিত হলো এবং দর্শন ও পদার্থবিদ্যার প্রসার ঘটলো, তখন থেকেই জ্ঞান-সাধকেরা উপরিউক্ত ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেন। তা সত্ত্বেও কোন লোক, এমনকি একজন তফসীরকারও এসব মত-পোষকদের কাফের বা কুরআনের অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করেন নি। মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলেনঃ কুরআন সৃষ্ট ও নশ্বর। তাই মুহাদ্দিস সম্প্রদায় তাঁদেরকে কাফেররূপে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তাঁরা (মু'তাযিলা) যে যাদুর হকিকত বিশ্বাস করেন না, সেজন্য কেউ তাঁদেরকে কাফের বলে অভিহিত করেনি। মোটকথা, অনুসন্ধানকার্যে যতই অগ্রগতি হোক না কেন, দেখতে পাবেন যে, মুসলমানেরা তথ্যের অনুসন্ধান বা আবিষ্কারকে কখনো ধর্মের পরিপন্থী বলে বিবেচনা করেনি। বরং গবেষকগণ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, পার্থিব ঘটনা-প্রবাহ,

জ্যোতির্বিদা ও অন্যান্য বিষয়াদি নুবুওয়াতের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের চরিত্র সংস্কার ছাড়া নবীদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। শাহ্ওলীউল্লাহ্ সাহেব তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক গ্রন্থে নবীদের নীতি বর্ণনা করে বলেন ঃ

"যে সব বিষয়ের সঙ্গে চরিত্র-সংস্কার বা জাতীয় রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই, সেগুলোর প্রতি নবিগণ মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। যেমন বৃষ্টি, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ও রামধনু সৃষ্টির কারণ, উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের রহস্য, চন্দ্র-সূর্যের গতি, দৈনন্দিন ঘটনা-প্রবাহের কারণ, নবিগণ ও বাদশাহ্দের কাহিনী, বিভিন্ন শহরের ইতিহাস—এসব বিষয় নিয়ে নবিগণ চিন্তা-ভাবনা করেন না। তবে এসব বিষয় যদি জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং লোকের বিবেক সেগুলো গ্রহণ করে নেয়, তবে নবিগণও আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনায় পরোক্ষ-ভাবে সেসব কাহিনী উল্লেখ করেন এবং সেগুলোকে ভাবার্থ ও রূপ-কার্থে গ্রহণ করেন। এ কারণেই জনগণ যখন নবী করীমকে চাঁদের হ্রাস ও বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, তখন তাঁর পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে মাসদিন নির্ধারণের যে উপকারিতা সাধিত হয়, সেটাই বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ তারা আপনার নিকট চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। হে রসূল! আপনি বলে দিন ঃ চাঁদ মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ করে এবং হজের কাল নিরূপণ করে।"

শাহ সাহেব নবীদের শিক্ষা ও নীতি সম্পর্কে যে বর্ণনা পেশ করেন, তারপর কে বলতে পারে যে, বিজ্ঞান ও আধুনিক বিদ্যার দরুন ধর্মের কোন ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

## ধর্ম মানুষের স্বভাবজাত বিষয়

মানুষ ও জন্তুর মধ্যে তুলনা করুন। জীব-জন্তু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগে নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। তাদের পোশাক তাদের সংগেই থাকে এবং ঋতু পরিবর্তনের নিরিখে তারও পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। দুশমনকে পরাভূত করার জন্য কব্জি, নখ ও দংশন-যন্ত্র সংগে নিয়েই তারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। জীবন ধারণের জন্য যে সব খাদ্যের প্রয়োজন, তা জন্ম গ্রহণের সংগে সংগেই তারা জঙ্গল,

পাহাড়, জল-স্থল, আবাদী-অনাবাদী সব জায়গায় প্রস্তুত দেখতে পায়।

অথচ মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন তার কাছে জীবিকার কোন ব্যবস্থাই থাকে না। তার ত্বক থাকে খুবই স্পর্শকাতর; হাত-পা থাকে দুর্বল; শরীরে কোন পোশাক থাকে না; দুশমন থেকে বাঁচার জন্য তার সংগে শিং বা নখর থাকে না। তদুপরি চারদিকে প্রকৃতির যে সব সৃষ্টি রয়েছে, সবই তার কাছে শত্রু বলে মনে হয়। সূর্যের উত্তাপ, মেঘের বর্ষণ, লু-হাওয়ার ঝাপটা, শীতের প্রকোপ—প্রত্যেক বস্তুই তাকে ধ্বংস করতে চায়।

এ সব বিপদ-আপদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য প্রকৃতি তাকে কোন দৈহিক হাতিয়ার দেয়নি। কারণ, যে অসংখ্য ও জোরালো শত্রুর সাথে তাকে মোকাবিলা করতে হবে, তার জন্য দৈহিক হাতিয়ার যথেষ্ট নয়। এ সব হাতিয়ারের পরিবর্তে প্রকৃতি তাকে এমন একটি সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করেছে, যার ফলে সে সকল প্রকার দুশমনের সংগে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার প্রস্তুত করে নেয়; রোদ, তাপ ও শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা ধরনের পোশাক ও ঘর-বাড়ী তৈয়ার করে; জীব-জন্তুকে পরাভূত করার জন্য তরবারি, খঞ্জর ইত্যাদি প্রস্তুত করে; নদীর উপর পুল নির্মাণ করে; পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে; লোহা গলায়; বিদ্যুৎ বশীভূত করে; বাতাসকে রুখে দেয়—মোটকথা, এভাবে আবিষ্কার করার কিছু-কাল পর সে দেখতে পায় যে, সারা পৃথিবী তার করায়ত্ত।

এই সাধারণ শক্তির নাম সার্বিক বুদ্ধি বা মানবিক বুদ্ধি। প্রকৃতির উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যেন ধাপে ধাপে উন্নতি করতে পারে এবং কোথাও থেমে না যায়। তাই সে মানুষকে কোন সময় নিশ্চল ও নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে দেয় না। সে মানুষের বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলোকে নতুন নতুন হাতিয়ার সরবরাহ করে। ফলে মানুষের বিরুদ্ধে নতুন নতুন হামলা চলতে থাকে; একটি রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ত্ত করা হলে অপর একটি নতুন রোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। জানা পৃথিবীর ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হতে না হতেই নব জনপদের সন্ধান মেলে এবং নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়। ভোগ-বিলাসের আশা-আকাঙ্খা বেড়ে যাওয়ার ফলে সুখ-শান্তির

বর্তমান সামগ্রী অপর্যাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধ্য হয়ে মানুষ নব নব সাধ মেটানোর জন্য নব নব প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং অগ্রগতির পূর্ব সীমারেখা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

মানুষ ও অপরাপর সৃষ্টির এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বই হলো মানবিক উন্নতির চাবিকাঠি। এর ফলেই আজ কেবল শত শত নয় বরং হাজার হাজার আবিষ্কার সাধিত হচ্ছে এবং ক্রমাগত তা বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই বাহ্যিক দুশমন ও বিরুদ্ধবাদীর চাইতে আরো বেশী ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক এক শ্রেণীর শত্রু মানুষের আছে, যা তার অভ্যন্তরেই রয়েছে এবং যাদের সংগে তাকে অহরহ কঠিন লড়াই করে যেতে হচ্ছে। লোভ তাকে আত্মীয়, অনাত্মীয়, শত্রু, মিত্র, নিকটবর্তী, দূরবর্তী—সকলের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য প্ররোচনা দেয়। হিংসা চায় যে, বিরোধীরা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে মুছে যাক। শক্তির মোহ চায় যে, সারা পৃথিবী তার সামনে মাথা নত না করা পর্যন্ত অভিযান চালানো হোক। কামাসক্তির লক্ষ্য হলো—দুনিয়ায় কারুর সততা যেন অক্ষত না থাকে। এসব দুশমন থেকে আত্মরক্ষায় বিবেক-বুদ্ধি অনেকটা কাজে আসে। বিবেক সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেঃ তোমরা যদি কারো মান-সম্মানে আঘাত হান, তবে সেও তদ্রূপ করতে উদ্যত হবে; তুমি কাউকে ধ্বংস করতে চাইলে সেও অনুরূপ পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করবে; তুমি অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করলে সেও তোমার প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করবে। কিন্তু কথা হলো এরূপ পরিণামদর্শী বিবেক-বুদ্ধি তো সকলের ভাগ্যে জোটে না। কেবল বিশেষ বিশেষ শিক্ষিত লোকেরাই এ গুণের অধিকারী হয়। এ ছাড়া মানুষকে তার জীবনে এমন অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে প্রতিপক্ষের দিক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় থাকে না; সরকারের অসন্তোষের দুশ্চিন্তা, গুপ্তচরের আশংকা, দুর্নামের সম্ভাবনা—এসবের বালাই মোটেও থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি দৃঢ় বিরুদ্ধবাদী শক্তির মোকাবেলা করতে পারে না। এ সময় অন্য একটি শক্তি বুক ফুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মানুষকে সে সব শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করে। এ শক্তির নাম হলো 'ঈমানের আলো' বা বিবেক-বুদ্ধি। এটাই ধর্মের ভিত্তি।

এ শক্তি মানুষের প্রকৃতিগত। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, অভদ্র, বাদশাহ্, ফকীর, আফ্রিকার বর্বর এবং ইউরোপের শিক্ষিত—সবাই সমভাবে এ গুণের অধিকারী। নিম্নে প্রদত্ত কুরআনের আয়াটিতে এ কথাই বিধৃত হয়েছে :

"সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মের দিকে তাকাও। এটা আল্লাহ্র স্বভাব (ধর্ম); এ স্বভাব-মাফিক করেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র স্বভাবে কোন পরিবর্তন ঘটে না। এটাই যথার্থ ধর্ম। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক তা বোঝে না।"

জার্মানীর গিস্লার নামক জনৈক দার্শনিক বলেন : ধর্ম একটি চিরন্তন বস্তু। কেননা, তা যে অনুভূতি থেকে উদ্ভূত, সেটা কখনও লয়প্রাপ্ত হতে পারে না।" ফরাসীর বিখ্যাত জ্ঞানী শিক্ষক রীনান স্বয়ং ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। তিনি তাঁর "ধর্মের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলেন : যে সব পার্থিব বস্তুকে আমরা ভালবাসি বা যে সব পার্থিব বস্তু অবলম্বনে আমরা জীবনে ভোগ-বিলাস করে থাকি, সে সবই লয়প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু ধর্ম পৃথিবী থেকে লয়প্রাপ্ত হতে পারে না এবং এর ক্ষমতায় ভাটাও পড়তে পারে না। এ ধর্ম সব সময় প্রমাণ দেবে যে, জড়বাদভিত্তিক ধর্ম সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ তা চায় যে, মানুষের চিন্তাশক্তি চিরকাল সেই হীন ও মর্ত্য জীবনের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থেকে যাক।"

অধ্যাপক সেবেটা 'ধর্মীয় দর্শন' নামক গ্রন্থে বলেন : "আমি ধর্মের অনুসারী কেন হলাম? এর কারণ হলো—এছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না! কারণ ধর্মের অনুসারী হওয়াটাই ছিল আমার জন্য স্বাভাবিক; এটা আমার স্বভাবজাত বস্তু। কোন কোন লোক বলবে, এটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে উদ্ভূত বা মতিগতিরই ফলশ্রুতি। আমিও প্রথমে এরূপ ভাবতাম। কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম—যদি তাই হয়, তবে প্রশ্নের পর প্রশ্নই দাঁড়ায় এবং তা সমাধান করার কোন জো থাকে না। আমার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য ধর্মের যতটুকু প্রয়োজন রয়েছে, তার চাইতেও এর বেশী প্রয়োজন অনুভূত হয় সামাজিক জীবনের জন্য। ধর্মের ডাল-পল্লব হাজার বার কাটা হয়েছে। কিন্তু এর মূল সব সময় অটুটই রয়েছে এবং সেখান থেকেই এর নব নব শাখা-প্রশাখা গজিয়েছে। তাই বলতে হয় যে, ধর্ম চিরন্তন বস্তু। এটা কখনও লয়প্রাপ্ত হতে পারে না।

ধর্মের ভিত্তি দিন দিনই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দার্শনিক চিন্তাধারা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা একে আরো সুদূরপ্রসারী করে তুলছে। মনুষ্য জীবন এর উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং এই উৎস থেকেই তা ক্ষমতা লাভ করে থাকে।

দুনিয়ার নৈতিক শৃঙ্খলাবোধকে ধর্মই অটুট রেখেছে। নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা যদি কেবল শিক্ষা-দীক্ষার উপরেই নির্ভর করতো, তবে ইউরোপেই এর মান সবচাইতে উঁচু থাকতো। কারণ সারা পৃথিবীর তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষায় সেখানকার লোকেরাই বেশী অগ্রণী।

## ধর্ম স্বভাবজাত বিষয়-এর দ্বিতীয় যুক্তি

পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন ভাষা, গোত্র, দেশ, আকৃতি ও বর্ণভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য। এগুলো বাদ দিলে যে সব বস্তু সকল মানুষের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে ধর্ম অন্যতম। ধর্ম যে স্বভাবগত—এটাই তার একটি বড় যুক্তি। সন্তান-সন্ততির ভালবাসা, প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মত্ততা, গুণের স্বীকারোক্তি—এসব প্রবণতাকে আমরা মানব-স্বভাব বলে আখ্যায়িত করে থাকি। এই আখ্যাদানের কারণ হলো এই যে, দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। আমরা দেখতে পাই যে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি কওম, বংশ ও সম্প্রদায় যে কোন একটি ধর্মে বিশ্বাসী। তাই পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম স্বভাবজাত বস্তু। ধর্মের প্রধান প্রধান যে সব নীতি রয়েছে, তা সব ধর্মেই প্রায় এক ও অভিন্ন। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর উপাসনা, পরকাল ও কর্মের প্রতিফলে বিশ্বাস স্থাপন, দয়া, সহানুভূতি ও সততার মূল্যায়ন, মিথ্যা, প্রতারণা, ব্যভিচার ও চুরির প্রতি ঘৃণা পোষণ—এসব দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্মেরই মৌলনীতি।

প্রকৃতি মানুষে মানুষে গুণগতভাবে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, বিবেক-বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা ইত্যাদি প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহ্‌ এত বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন যে, যার চাইতে বেশী কল্পনা করা যায় না। এ বদান্যতার নমুনা দেখতে হলে আলেকজাণ্ডার, তৈমুর, অ্যারিস্টটল, প্লেটো, হোমার ও ফিরদৌসীকে দেখা উচিত। অন্যদিকে কার্পণ্য দেখতে হলে মানুষ ও বানরের মধ্যকার সামান্যতম পার্থক্যটুকু দেখা উচিত। এদের মধ্যে এত সূক্ষ্ম

পার্থক্য রয়েছে যে, ডারউইনের নজরেও তা ধরা দেয়নি। তা সত্ত্বেও জীবন ধারণের জন্য যে সব বস্তুর প্রয়োজন, প্রকৃতি তা সকল মানুষকেই সমভাবে দান করেছে। আফ্রিকার অজ্ঞের চাইতেও অজ্ঞ ব্যক্তি এমনিভাবেই পানাহার করে, চলাফেরা করে, নিদ্রা যায় ও কথাবার্তা বলে, যেমন গ্রীসের মহৎ থেকে মহত্তর দার্শনিক এসব প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

এতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের যে অংশটুকু পৃথিবীর সকল কওমের মধ্যে সমভাবে দেখা যায়, তা মানুষের জন্য ছিল অপরিহার্য। তাই প্রকৃতি ধর্মের এ অংশটুকু সকল জাতিকে সমভাবে দান করেছে। অ্যারিস্টটল ও বেন্থাম অনেক যুক্তির পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সত্যতা, সাধুতা, সচ্চরিত্র, জ্ঞান—এসব ভাল গুণ। অথচ আফ্রিকার একজন বর্বরও শিক্ষা-দীক্ষা না থাকা সত্ত্বেও কোন যুক্তি ছাড়াই এসব গুণাবলীকে ভাল বলে জ্ঞান করে।

## ইসলাম ধর্ম

ইতিপূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্ম মানুষের স্বভাবজাত। মানুষের সহানুভূতি, ভালবাসা, উদ্দীপনা, প্রতিশোধের বাসনা—এসব ভাবাবেগ যেমন প্রকৃতিগত ব্যাপার, তেমনি তার ধর্মীয় অনুভূতিও স্বাভাবিক উপলব্ধি। প্রকৃতিগত ভাবাবেগ কারো মধ্যে বেশী থাকে, আবার কারো মধ্যে অল্প, কারো ভাবাবেগ সক্রিয়, আবার কারো নিষ্ক্রিয়, আবার দু'চারজন লোক এমনও আছে, যাদের মধ্যে এ সব মোটেই পরিলক্ষিত হয় না। ধর্মীয় প্রেরণার পরিমাণেও তদ্রূপ।

আগেই বলা হয়েছে, ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার কারণ ছিল এই যে, এছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব ছিল না। তাই ধর্মের যে অংশটুকু সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে দেখা যায়, তা খুবই সাদাসিধে ও অপূর্ণ এবং এমনি হওয়ার প্রয়োজনও ছিল। আরো পরিষ্কার কথায়, মানুষের জীবিত থাকার জন্য পানাহার ও শীত-তাপ থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। এজন্য প্রকৃতি অতি সাধারণ মানুষকেও এসব প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করে থাকে। সকলকে উচ্চমানের সামগ্রী দেওয়া প্রকৃতির জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। ক্ষুধা নিবারণের জন্য সামান্যটুকু খাদ্য, থাকার জন্য তৃণ-কুটির; পরার জন্য গাছের পল্লব দেওয়া হলেই প্রকৃতির ফরয

সম্পন্ন হয়ে যায়। সবাইকে নানা ধরনের নেয়ামত, বড় বড় মহল বা মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ দেওয়া তার কর্তব্য নয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি কতক লোককে কতক লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

## এক ধর্মের উপর অন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব

সকল ধর্মের একই অবস্থা—তবে এক ধর্মের উপর অন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি, উপাসনার প্রেরণা, পরকালের ধারণা, প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস, নবুয়তের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন—এ সবই ছিল মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাই সকল সম্প্রদায়ে এ সব ধারণা সমভাবে বিদ্যমান ছিল। কোন সম্প্রদায় বা দলের লোকদের বিশ্বাসে এ ব্যাপারে কোন তারতম্য ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্র গুণাবলী বলতে কি বুঝায়?, কি প্রকারের ইবাদত করা ফরয এবং কেন ফরয? পরকালের হকিকত কি?, প্রতিদান ও শাস্তির উদ্দেশ্য কি?, নবুওয়াতের অর্থ কি?—এসব প্রশ্নের জওয়াব সব ধর্মে একই প্রকার পাওয়া যায় না। যে ধর্ম যতবেশী সঠিক জওয়াব দিতে সক্ষম, সেই ধর্ম তত বেশী যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত।

ইউরোপে ধর্ম-অবিশ্বাসীদের একটি দল আছে এবং ধীরে ধীরে তা বেড়েই চলেছে। ধর্মের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কারণ হলো—তারা বর্তমান ধর্মগুলোতে উপগুলিতে উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না।

## ইউরোপ ধর্ম-বিরোধী কেন?

অধ্যাপক লরাউস ধর্মের বিরোধিতা করে বলেন ঃ

"আমি যদি বলি, কেবল সেসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, যা বুদ্ধিসম্মত, তখন আমাকে উত্তরে বলা হয় যে, তা হতে পারে না এবং কখনো হতে পারে না। যে বিবেক বা বুদ্ধি ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়, ধর্মে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়; এতে জ্ঞান-চক্ষুকে এরূপ অন্ধ করে দেয়া হয় যে, অলৌকিক ও অতিস্বাভাবিক ঘটনাবলীও তখন মামুলি ব্যাপার বলে মনে হয়; সাদাকে কালো বলে ধারণা করা হয়; বিশ্রী বস্তুকে সুশ্রী বস্তু বলে পরিগণিত করা হয়। এখানেই শেষ নয়। এরপরেও ধর্ম এসে দাঁড়ায় এবং বলে ঃ মাথা নত করে দাও। কিন্তু নত করবে কার

সামনে ? বুদ্ধির সামনে ? ধর্ম উত্তরে বলে, না, তা হতে পারে না। তবে কি প্রকৃতি আরোপিত কর্তব্যের সামনে মাথা নত করা হবে ? ধর্ম উত্তরে বলে, না, তাও হতে পারে না। তবে কি অন্তর্নিহিত অনুভূতির সামনে মাথা নত করা হবে ? ধর্ম উত্তরে বলে, না তাও হতে পারে না। তবে কি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সামনে ? না, তাও হতে পারে না।"

মসিয়ো বেঞ্জামিন ছিলেন ফরাসীর একজন বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি ধর্মের স্বরূপ ও তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি ধর্মের দোষসমূহ বর্ণনা করে বলেন, ধর্ম জ্ঞান-বিরোধী বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এটা সুনিশ্চিত যে, সব ধর্ম একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

বার্টলো বলেন, জ্ঞান এখন পূর্ণ আযাদী লাভ করেছে। তাই ধর্ম তাকে আর চেপে রাখতে পারবে না।

## স্বাভাবিক ধর্ম

এ সব ভাষ্যের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় বিধি-বিধান গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী বলেই ধর্ম-অবিশ্বাসিগণ ধর্মকে যথার্থ বলে মনে করে না। তবে যে ধর্মের সকল নীতি বুদ্ধিসম্মত, সে ধর্ম কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এ দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ইউরোপের গবেষকেরা স্বভাবসম্মত ধর্মের একটি কল্পনাভিত্তিক নক্শা এঁকেছেন। তাঁরা বলেন, বর্তমান ধর্মসমূহ ভ্রমাত্মক। যদি এমন একটি ধর্ম প্রবর্তন করা হয়, যার বিধি-বিধান হবে নিম্নরূপ, তবে তা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য হবে এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের সাথেও তা তাল মিলিয়ে চলতে পারবে।

## স্বাভাবিক ধর্মের কল্পিত নক্শা

জুল সিমন এই বুদ্ধি-সঞ্জাত ধর্মের যে বিস্তারিত নক্শা এঁকেছেন, তা নিম্নরূপ :

"পরকালীন পুণ্যের অর্থ হলো—মানুষ নীতির অনুসারী হবে। এখন প্রশ্ন জাগে, সেই নীতি কি ? তা হলো—নিজের রক্ষণাবেক্ষণ

করা, নিজ স্বভাবে যে সব বৈশিষ্ট্য ও শক্তি সুপ্ত রয়েছে, তা রূপায়িত করা ও তাদের উন্নতি বিধান করা, মানুষকে ভালবাসা, তার সেবা করা এবং আল্লাহ্‌র উপাসনা করা। এখন প্রশ্ন জাগে—আল্লাহ্‌র উপাসনার অর্থ কি? এর মানে হলো—আপন কর্তব্য পালন করা, সৎকাজ করা, দেশকে ভালবাসা, কাজে লেগে থাকা ও কপটতা পরিহার করা—এটাই হলো স্বাভাবিক ধর্ম এবং এটাই স্বাভাবিক উপাসনা।"

এগুলো হলো স্বাভাবিক ধর্মের করণীয় বিষয়। এ ধর্মে যা বিশ্বাস করতে হবে, তা হলো: এমন এক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, যিনি সকল কিছুই করতে পারেন; কোন বস্তুই যাঁর কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না, যাঁর সমস্ত কাজ হবে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সুশৃঙ্খল।

লরাউস বলেন: যদি ধর্মের এ সংজ্ঞাই হয় যে, তা বুদ্ধিসম্মত চিন্তাধারার নামান্তর, তার উদ্দেশ্য হবে মানব জাতিকে একই সূত্রে আবদ্ধ করা এবং তার বৈষয়িক স্বার্থকে এমনিভাবে চরিতার্থ করা, যেমন বুদ্ধিজাত শক্তি দিয়ে চরিতার্থ করা হয়, তবেই তোমরা বলতে পার যে, ধর্ম মানব সমাজের জন্য একটি অপরিহার্য বস্তু।"

## একটি উচ্চমানসম্পন্ন ধর্মে কি কি নীতি থাকা উচিত?

একটি যথার্থ, পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন ধর্মে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ থাকা প্রয়োজন:

১. যুক্তির মাপকাঠিতে ধর্মের যথার্থতা ও অসারতা নিরূপণ করা হোক, অনুকরণ বা অন্ধ বিশ্বাসের মাধ্যমে নয়।

২. ধর্মের কোন আকীদা (বিশ্বাস) যুক্তিবিরোধী হওয়া উচিত নয়।

৩. ইবাদতের অর্থ এটা হওয়া উচিত নয় যে, ইবাদতের জন্যেই ইবাদত করা হোক। তাতে এ ধারণাও থাকা উচিত হবে না যে, যত বেশী কষ্ট করা যাবে, ততই আল্লাহ্ খুশী হবেন। বরং মানুষের উপকার সাধন করাই এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইবাদতে সাধ্যাতীত কষ্ট থাকা উচিত নয়।

৪. ধর্মীয় ও পার্থিব কর্তব্যসমূহ এমন সুন্দরভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাতে একটি দ্বারা অপরটির কোন ক্ষতি সাধিত না হয়; বরং উপকারই সাধিত হয়।

৫. ধর্ম যেন নিজেকে যে কোন উন্নত ধরনের তমদ্দুনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ধর্মের বদৌলতে তহযীবতমদ্দুন যেন অধিকতর উন্নতির পথে ধাবিত হতে পারে।

এ গ্রন্থে আমি ইসলামকে সর্বাগ্রে উপরিউক্ত নীতিসমূহের মাপ-কাঠিতে পরীক্ষা করে নিতে চাই।

## বুদ্ধি ও ধর্ম

সর্বাগ্রে দেখা উচিত, পৃথিবীর ধর্মসমূহ বুদ্ধির উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করছে এবং ইসলাম এর কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে? দুনিয়াতে যত ধর্ম আছে, প্রত্যেকটাতেই সর্ব প্রথম এ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, "ধর্মে আকল্ (বুদ্ধি)-কে স্থান দিও না।" এই কড়া নির্দেশের ফলে ধর্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং তাতে গবেষণা ও ইজতেহাদের প্রয়াস দেখা যায় না। অন্যদিকে গবেষণা ও ইজতেহাদ না থাকায় ধর্মে স্বেচ্ছাচারিতাও হ্রাস পাচ্ছে না। কোন কোন লোক যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং অংক শাস্ত্রে শত শত অদ্ভুত আবিষ্কার সাধন করছে; অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ভ্রম প্রতিপন্ন করছে; কিন্তু তাদের সামনে যদি ত্রিত্ববাদের বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং বলা হয় যে, একের মধ্যে তিন, আবার তিনের মধ্যে এক রয়েছে—এটা কি করে হয়, তখন তাদের সমালোচনা ও পর্যালোচনা-শক্তি খর্ব হয়ে পড়ে। সক্রেটিস এত বড় দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও জীবন দানের সময় এ মর্মে উপদেশ দিয়ে গেলেন যে, ওমুক মূর্তির নামে আমি যে মানত করেছি, তা যেন পুরো করা হয়। শত শত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করছেন, কিন্তু ধর্মে বুদ্ধির কোন স্থান না থাকায় ধর্মের নিরর্থক বিশ্বাসগুলো সম্পর্কে তাঁদের মনে মোটেই সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে না। বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার ফলে ধর্মে কেবল ভুল ধারণাই শিকড় গজায় না, বরং তাতে দিন দিন নানা কুসংস্কারও বাসা বাঁধে, এমনকি কিছুকাল পর এর ভাল আকীদাগুলোও কুসংস্কারের অন্তরালে চাপা পড়ে যায় এবং ধর্মটি হয়ে দাঁড়ায় কতগুলো ধাঁধাঁ ও অবাস্তব বস্তুর সমষ্টি মাত্র। এই কারণেই ইউরোপের স্বাধীনচেতা লোকদেরকে ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করে তুলেছে। ধর্ম বুদ্ধিকে পঙ্গু করে দেয় বলেই অধ্যাপক লরাউস ধর্মের লয়প্রাপ্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন; ধর্ম অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। এই

অধ্যাপকই অন্যত্র বলেন, "আমরা যদি স্বার্থ ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে এটা বুঝতে চেষ্টা করি যে, পৃথিবীতে ধর্মীয়, মানসিক ও নৈতিক যে উন্নতি সাধিত হচ্ছে, তার মূল কারণ কোথায়, তবে আমরা বুঝতে পারবো যে, বুদ্ধিকে বন্ধনমুক্ত রাখার ফলেই এসব অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে।"

## ইসলামের শিক্ষা

এখন দেখুন, ইসলাম কি শিক্ষা দিচ্ছে?

কুরআন মজীদের শত শত স্থানে বিভিন্নভাবে ইহুদী, খ্রীস্টান, মূর্তি-পূজক ও নাস্তিকদেরকে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুধাবন করার অন্য আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও এ মর্মে আহ্বান করা হয়নি যে, অন্ধ অনুকরণ করে এসব ধর্মীয় বিশ্বাসকে বরণ করে নাও। বরং প্রত্যেক স্থানেই ইজতেহাদ ও চিন্তা অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং অন্ধ অনুকরণের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে। ইসলাম বিরোধীদের প্রতি সবচাইতে বড় যে অভিযোগটি ছিল, তা হলো এই ঃ

"আকাশ-জমিনে রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন এবং সেগুলো তাদের সামনেই রয়েছে। অথচ তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না।" (ইউসুফ)

"তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা কাজে লাগায় না।" (আ'রাফ)

"আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি বিশেষ (নির্দিষ্ট) পথ অবলম্বন করতে দেখেছি। আমরা তাঁদের পথই অনুসরণ করবো।"

"কোন কোন লোক অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্কে অবতীর্ণ হচ্ছে। তারা কুরআনের বাণী সম্পর্কে চিন্তাই করছে না।"

"তারা আকাশ-জমিনের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছে না?"

মোটকথা, কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতসমূহে এ মর্মে নির্দেশ রয়েছে যে, বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। অনুরূপভাবে ধর্মের মূলনীতি ও শাখানীতি সম্পর্কে ইসলামের যে শিক্ষা রয়েছে, তাও যুক্তি ও বুদ্ধিভিত্তিক।

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন মজীদ বলে ঃ

"সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মের দিকে তাকাও। এটা আল্লাহ্‌র স্বভাব (ধর্ম)। এ স্বভাব-মাফিক করেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র স্বভাবে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না।"

ইসলাম প্রচারের রীতি-নীতি বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তুমি আল্লাহ্‌র পথে লোকদের কৌশল ও সদুপদেশ সহকারে আহবান কর। হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা কর।"

যেখানেই ইসলামের বিশেষ বিশেষ আকীদার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেখানেই বুদ্ধিজাত যুক্তি দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণে এত বেশী যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, এ গ্রন্থে সে সবের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণ করতে গিয়ে কুরআন বলে ঃ

"যদি আকাশ-জমিনে একাধিক আল্লাহ্ হতো, তবে উভয়স্থলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো।"

আল্লাহ্ যে প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞাত, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জ্ঞাত নন?"

রসুলুল্লাহ্‌র নুবুওয়াত সম্পর্কে ইসলাম-বিরোধীদের যে বিস্ময় ছিল, তা নিরসন করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আপনি (রসূল করীম) বলুন—আমি কোন নতুন পয়গাম্বর নই।"

পুনরুত্থান অসম্ভব কিছু নয়—এ বিষয়ে লোকের আস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা কি মনে করছ যে, আমি তোমাদের বৃথাই সৃষ্টি করেছি! তোমরা কি আমার কাছে ফিরে আসবে না?"

মোটকথা, প্রত্যেক ধর্মেই ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইসলামের প্রতি—ইসলামের বিশেষ বিশেষ আকায়েদের প্রতি লোকের বিশ্বাস ও আস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কুরআন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা যুক্তিসহকারেই করা হয়েছে। কোন স্থানেই এরূপ বলা হয়নি যে, ওমুক আকীদাকে যুক্তি ছাড়াই বরণ করে নাও।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো—বর্তমান যুগের ফ্যাশান অনুসারে সকল ধর্মাবলম্বীরাই এ দাবি করছে যে, তাদের ধর্ম

বুদ্ধিসম্মত। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, এটা কি তাদেরই দাবি, নাকি তাদের ধর্মও অনুরূপ দাবি করেছে ?

ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন ধর্মই এ দাবি করেনি যে, এ ধর্ম বুদ্ধিসম্মত এবং বিবেক-বুদ্ধির তাগিদেই এ ধর্মকে মানতে হবে। এটা এমন একটি পার্থক্য, যা ইসলামকে সুস্পষ্টভাবে অন্যান্য ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে।

## আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

পূর্বসূরিগণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণে বলতেন ঃ পৃথিবী পরিবর্তনীয় এবং যা পরিবর্তনীয় অর্থাৎ অচিরন্তন, তা অবশ্যই হেতু নির্ভর। এই হেতুই হলেন আল্লাহ্। এই প্রমাণের দ্বিতীয় ভূমিকা স্পষ্ট। প্রথম ভূমিকা প্রমাণে বলা হতো যে, পৃথিবীতে অহরহ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং যে বস্তু পরিবর্তনশীল, তা নশ্বর, অচিরন্তন। এ প্রমাণ বাহ্যত খুবই স্পষ্ট ছিল। এজন্যেই তা ভালরূপে খতিয়ে দেখা হয় নি। মূলত এ প্রমাণটি ছিল ভ্রমাত্মক। কারণ পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই দু'টি বস্তুর যৌগিক ঃ জড় উপাদান ও বিশেষ একটি আকার। কেবল আকারই পরিবর্তিত হয়। কিন্তু জড় বস্তু ও মৌল উপাদান সব সময় একই অবস্থায় থাকে। কোন বস্তু ধ্বংস হচ্ছে—এর মানে কেবল তার আকারই ধ্বংস হচ্ছে। মৌল উপাদান কোন না কোন আকারে সব সময়ে বিদ্যমান থাকে। একখণ্ড কাগজ পুড়িয়ে ফেলুন। দেখবেন—তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কাগজটি তো ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তার ছাই বিদ্যমান রয়েছে। এটা মৌল উপাদানেরই অন্য একটি আকার। ছাইকে ধ্বংস করে দিন। কিন্তু তা যে কোন আকারে বিদ্যমান থাকবেই। মোট কথা, কেবল আকারই পরিবর্তিত হয়। মূল জড়বস্তু পরিবর্তিত হয়—এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ বা পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত কোন অভিজ্ঞতা নেই। কোন প্রমাণও এ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

## অ্যারিস্টটলের প্রমাণ

তাই আকারের দিকটি বিবেচনা করে পৃথিবীকে অচিরন্তন বলা যায়। কিন্তু মৌল উপাদানের দিক থেকে বলা যায় না। পৃথিবীর নশ্বরতা যখন প্রমাণিত হয়নি, তখন তার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্‌র

অস্তিত্ব প্রমাণ করাও সংগত হবে না। এ প্রশ্নটি বিবেচনা করেই অ্যারিস্টটল অন্য এক প্রকার প্রমাণ অবলম্বন করেন। তা হলো— পৃথিবীর সকল অংগই গতিশীল। কারণ তা বাড়ে ও কমে। এ হ্রাস-বৃদ্ধি হলো এক ধরনের গতি। যে সব বস্তুকে একই অবস্থায় থাকে বলে আমরা মনে করি, তাদের অংগগুলো পরিবর্তনশীল। পুরনো অংগ ধ্বংস হয়ে যায় এবং নতুন অংগ সে সব জায়গা দখল করে নেয়। অংগের পরিবর্তনও এক প্রকার গতি। তাই বলতে হয় যে, গোটা বিশ্ব গতিশীল। আবার যে বস্তু গতিশীল, তার গতির একজন নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক নিশ্চয়ই রয়েছে। এখন সামনে আছে দু'টি বিকল্প ঃ হয়তো বলতে হবে যে, এই গতি-শৃঙ্খল কোথাও গিয়ে থেমে যাবে, অর্থাৎ এমন একটি বস্তু প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, যা নিজেই হবে সকল বস্তুর গতি-নিয়ামক ; কিন্তু তা স্বয়ং গতিশীল হবে না। এই নিয়ন্ত্রকই হলেন আল্লাহ্। তা না হয় বলতে হবে যে, এই গতি-শৃঙ্খল অনন্ত রেখার দিকে এগুতে থাকবে, যার কোন শেষ সীমা নেই। অথচ এটা হতে পারে না। কারণ অন্তহীনতা অবান্তর।

অ্যারিস্টটলের আসল মত হলো—বিশ্ব চিরন্তন। তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার গতি অচিরন্তন। আল্লাহ্ই এ গতির স্রষ্টা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই অ্যারিস্টটল গতির আলোকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ইবনে রুশ্দ্ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন।

## বু-আলী সিনার প্রমাণ-পদ্ধতি

বু-আলী সিনাও বিশ্বের চিরন্তনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইসলামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই তিনি একথা বলতে পারেন নি যে, বিশ্ব আল্লাহ্-সৃষ্ট নয়। তাই তিনি এ মত অবলম্বন করলেন যে, বিশ্ব চিরন্তনও বটে, আবার আল্লাহ্-সৃষ্টও বটে। এর উপর প্রশ্ন দাঁড়ালো যে, বিশ্ব ও আল্লাহ্ উভয়ই যদি স্থায়ী ও চিরন্তন হয়, তবে একটি 'কারণ' আর অপরটি 'কার্য' কি করে হতে পারে? 'কারণ' ও 'কার্যের' মধ্যে কালের ব্যবধান অত্যাবশ্যক। বু-আলী সিনা এর উত্তরে বলেন, কারণের সত্তার দিক থেকে পূর্ববর্তিতা থাকলেই যথেষ্ট, কালের দিক থেকে এর প্রয়োজন নেই। যেমন তালা খুলে

যাওয়ার কারণ হলো চাবির গতি। অথচ চাবির গতি ও তালা খুলে যাওয়া—এ দু'টির মধ্যে মুহূর্তেরও ব্যবধান নেই।

মুতাকাল্লিমগণ মনে করেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর চিরন্তনতা মেনে নেয়া হলে আল্লাহ্র অদ্বিতীয়তা ও অতুলনীয়তার পক্ষে তা নেতিবাচক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তারা দাবী করলেন যে, বিশ্ব অচিরন্তন। এই অচিরন্তনতার উপর ভিত্তি করেই তাঁরা আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাঁরা বিশ্বের অচিরন্তনতা কিভাবে প্রমাণ করলেন, তা বুঝতে হলে নিম্নলিখিত সূত্রগুলো মনে রাখা প্রয়োজন ঃ

## মুতাকাল্লিমদের প্রমাণ

১. বিশ্বে দু'প্রকার বস্তু দেখতে পাওয়া যায় ঃ (ক) গুণ অর্থাৎ যা স্বমূর্ত নয়, যা অস্তিত্ব লাভ করে অপর বস্তুর সহায়তায়। যেমন ঃ গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ, দুঃখ, আনন্দ, প্রেরণা। (খ) দ্রব্য অর্থাৎ যা স্বমূর্ত। যেমন ঃ পাথর, মাটি, পানি।

২. কোন দ্রব্য গুণশূন্য নয়। কেননা প্রত্যেক দ্রব্যই কোন না কোন আকারে বা অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এই আকার বা অবস্থাই হলো গুণ। প্রত্যেক দ্রব্যে কোন না কোন প্রকার গতি রয়েছে। এই গতি হলো গুণবাচক বস্তু। মোটকথা, প্রত্যেক দ্রব্যেই গুণ রয়েছে। কোন দ্রব্য গুণশূন্য নয়।

৩. গুণ অচিরন্তন। তা সৃষ্টিও হয়, আবার ধ্বংসও হয়ে যায়।

৪. যে বস্তু গুণমুক্ত নয়, তা অবশ্যই নশ্বর। কেননা, তা যদি অবিনশ্বর হয়, তবে গুণকেও অবিনশ্বর হতে হবে। এ দু'টি বস্তু পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। তাই তাদের মধ্যে একটি যদি চিরন্তন হয়, তবে অপরটিকেও চিরন্তন হতে হবে।

এখন বিশ্বের নশ্বরতা এভাবে প্রমাণ করা যায় যে, বিশ্বে যা আছে, তা হয়তো দ্রব্য হবে, নয়তো গুণ। দ্রব্য ও গুণ—উভয়ই অচিরন্তন। গুণ কেন অচিরন্তন, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কোন দ্রব্য গুণমুক্ত হতে পারে না বলে প্রত্যেকটি দ্রব্যকে অচিরন্তন বলতে হবে। পূর্বেও বলা হয়েছে, যে বস্তু গুণশূন্য হতে পারে না, তা অচিরন্তন।

এটা যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্ব অচিরন্তন, তখন অবশ্যই বলতে হবে যে, এর পেছনে কোন একটি কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। এই কারণ-শৃঙ্খল যেখানে গিয়ে থেমে যাবে, তাই হবে আল্লাহ্। আর যদি থেমে না যায়, তবে অন্তহীনতার প্রশ্ন দাঁড়াবে; আর অন্ত-হীনতা অবান্তর।

মুতাকাল্লিমদের এ প্রমাণ ফরফুরিউস থেকে গৃহীত। 'ইলমে কালাম'-এর ইতিহাসেও এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ প্রমাণ কেবল সে সময় যথার্থ হতে পারে, যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, অনন্ত-অসীম কালের অস্তিত্ব নেই। আর যদি এটা মেনে না নেয়া হয়, তবে মুতাকাল্লিমদের পেশকৃত আল্লাহ্র অস্তিত্বের এ প্রমাণ ভ্রমাত্মক বলে বিবেচিত হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্লেটো আর অ্যারিস্টটলও এ বিষয়টি সুরাহা করতে পারেন নি। মুতাকাল্লিমগণ তাঁদেরই অনুসরণ করেন। তাই এঁরাও এ বিষয়ে অকৃতকার্য হন।

এখন দেখুন, কুরআন মজীদ কিভাবে এ সমস্যাটির সমাধান করেছে।

## আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনের প্রমাণ-পদ্ধতি

আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা নেওয়া—এটা মানুষের একটি প্রকৃতিগত বিষয়। অন্য কথায়, আল্লাহ্র স্বীকৃতি মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে। যাঁরা মানব জাতির ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ, তাঁরা ফলাও করে বলেছেন যে, মানুষ যখন প্রকৃতির যুগে বাস করতো, অর্থাৎ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান আর তহযীব-তমদ্দুনের অস্তিত্বও ছিল না, তখন তারা কি মূর্তিপূজা করতো, নাকি আল্লাহ্র ইবাদত? জড়বাদী ছাড়া অন্য মতবাদের সকল বিশেষজ্ঞ এ মত প্রকাশ করেন যে, মানুষ সর্বপ্রথম আল্লাহ্র ইবাদতই অবলম্বন করেছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্স্মুলর তাঁর গ্রন্থে বলেনঃ "আমাদের পূর্বপুরুষগণ যখন আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করেছিলেন, তখন তাঁরা এটাও জানতেন না যে, তাঁকে কোন্ কোন্ নামে ডাকতে হবে? এরপর সাকার আল্লাহ্র পূজা-অর্চনা শুরু হয় এবং নিরাকার আল্লাহ্র ধ্যান-ধারণা তার অন্তরালে চাপা পড়ে যায়।

যে যুগ থেকে পৃথিবীর ইতিহাস শুরু হয়, সে যুগ থেকেই দেখা যায় যে, মানুষ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে আসছে। আসুরী, মিসরী, কালদানী, ইহুদী—সবাই আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী ছিলেন।

প্লুটার্ক বলেন ঃ আপনারা যদি পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করেন, তবে এমন অনেক স্থান দেখতে পাবেন, যেখানে দুর্গ, রাজনীতি, বিদ্যা, শিল্প, ধন-দৌলত—এসবের কিছুই নেই। কিন্তু এমন একটি স্থান কোথাও খুঁজে পাবে না, যেখানে আল্লাহ্‌ নেই।

ফুলিটার ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত জ্ঞানী। তিনি ওহী ও দৈব জ্ঞানে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, জোরায়াস্টার, মনুসুলুন, সক্রেটিস, সস্‌রু—এঁরা সবাই এক প্রভুর পূজা করতেন। এবং এটাই ছিল তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ আল্লাহ্‌কে যুগে যুগে স্বীকার করে নিয়েছে—এ বিষয়টি বর্ণনা করে কুরআন বলে ঃ

"আল্লাহ্‌ যখন বনি আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশ নির্গত করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী করে বললেন ঃ আমি কি তোমাদের আল্লাহ্‌ নই? তখন সবাই বলে উঠলো ঃ হাঁ, আমরা সাক্ষী রইলাম।"

অনেক সময় বাহ্যিক কারণে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের এই স্বাভাবিক অনুভূতি চাপা পড়ে যায়। তাই আল্লাহ্‌ বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রাকৃতিক আইন-কানুনের নিয়ন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন ঃ

"এমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে কি তোমাদের সন্দেহ হতে পারে, যিনি আকাশ-জমিনের স্রষ্টা।"

চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মানুষ যে সব বিষয় বুঝতে পারে, তন্মধ্যে একটি হলো যখন সে কোন বস্তুকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল দেখতে পায়, তখন সে এ কথা বিশ্বাস করে নেয় যে, কোন বুদ্ধিমান সত্তাই এটি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। আমরা যদি কোন স্থানে কতগুলো এলোমেলো বস্তু দেখতে পাই, তখন আমাদের ধারণা হয় যে, হয়তো এগুলো এমনিতেই অগোছালো হয়ে গেছে। কিন্তু বস্তুগুলোকে যদি এমন সুচারুরূপে সাজানো গোছানো অবস্থায় দেখতে পাই, যা একজন দক্ষ শিল্পীর পক্ষেও করা মুশকিল, তখন এ ধারণা কখনো মনে জাগে না যে, এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে। বিষয়টি অন্য একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিন। খাজা হাফিয

বা নিযামীর কোন একটি কবিতা তুলে নিন। অতঃপর তার শব্দ-গুলোকে এলোমেলো করে একজন সাধারণ লোকের হাতে দিন এবং শব্দগুলোকে পুনরায় গুছিয়ে সাজিয়ে দিতে বলুন। দেখতে পাবেন যে, শতবার উলট-পালট করলেও, এমন কি দৈবক্রমেও তা পুনরায় কখনো হাফিয বা নিযামীর কবিতায় পর্যবসিত হবে না। অথচ শব্দ, অক্ষর, বাক্য—সবই পূর্ববত রয়েছে। কেবল সাজানো গোছানোর পার্থক্য। তা হলে এখন বুঝতে পারবেন যে, যে বিশ্ব এত সুন্দর-ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, তা কি করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কায়েম হয়ে গেলো? কুরআন মজীদে এ সুনিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ ক'রে তা নিম্নরূপ ভাষায় প্রমাণ করা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্‌র কারিগরি দেখ! তিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে খুবই পাকা করে প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ্‌র কারিগরিতে কোন তারতম্য দেখতে পাবে না। আবার দেখ! কিন্তু কোথাও কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সুচারুরূপে তার নিয়ন্ত্রণও সাধন করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন রদবদল সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র বিধানে কখনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।"

উপরিউক্ত আয়াতে বিশ্বকে তিনটি গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে ঃ (১) পূর্ণাঙ্গ ও নির্দোষ (২) সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত (৩) বিশ্ব এমন বিধি-বিধানভুক্ত, যাতে কখনো পরিবর্তন সূচিত হবে না। এটা হলো যুক্তির প্রথম ভূমিকা। দ্বিতীয় ভূমিকা স্পষ্ট। তা হলো যে বস্তু পূর্ণাঙ্গ ও চিরনিয়ন্ত্রিত, তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। বরং কোন শক্তিমান সত্তাই তা সৃষ্টি করেছে। আজ গবেষণা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে; বিশ্বের শত শত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অনেক সত্য ঘোমটা ফেলে আত্মপ্রকাশ করেছে। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বহু চিন্তা-ভাবনার পর আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণে সে সব যুক্তিই পেশ করলেন, যা কুরআন মজীদ তেরশ' বছর পূর্বে সাদাসিধে ও পরিষ্কার ভাষায় পেশ করেছিল।

নিউটন বলেন ঃ "বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে স্থান ও কালের হাজার হাজার বিপ্লব অতিক্রম করেছে। তা সত্ত্বেও তাতে যে শৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়, তা একজন নিয়ন্তা ছাড়া সম্ভব নয়। এই নিয়ন্তা হলেন সর্বাদি সত্তা, জ্ঞানবান ও শক্তিমান।"

## ইউরোপীয় দার্শনিক কর্তৃক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের স্বীকৃতি

এ কালের সবচাইতে বড় দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন: "এ রহস্যগুলো নিয়ে যতই চিন্তা-ভাবনা করি, ততই তা সূক্ষ্ম বলে মনে হয়। এতে নিশ্চিত বোঝা যায় যে, মানুষের উপর এমন একটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ক্ষমতা রয়েছে, যেখান থেকে হয়েছে সকল বস্তুর উৎপত্তি।"

ক্যামিল প্লামারিয়ন বলেন: "কোন শিক্ষাগুরুই এটা বুঝতে পারছে না যে, বিশ্বের অস্তিত্ব কি করে হলো এবং কিভাবে তা অটুট রয়েছে? বাধ্য হয়ে তাঁরা এমন একজন স্রস্টা স্বীকার করে নিলেন, যিনি সদা বিরাজমান ও সক্রিয়।"

অধ্যাপক লিনি বলেন: "শক্তিমান ও বুদ্ধিমান আল্লাহ্ নিজ অদ্ভুত কারিগরির মহিমা নিয়ে আমার সামনে এভাবে উদ্ভাসিত হন যে, আমার চোখ দু'টি তাঁর প্রতি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং আমি পুরোপুরি তন্ময় হয়ে পড়ি। প্রত্যেকটি বস্তুতেই, তা যতই ছোট হোক না কেন, তাঁর অদ্ভুত শক্তি, আশ্চর্য কৌশল ও বিচিত্র অনবৈদ্যতা পরিলক্ষিত হয়।"

ফ্রুণ্টল বিশ্বকোষে বলেন: "আমাদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করাই পদার্থবিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর মহৎ উদ্দেশ্য হলো—বুদ্ধি-সঞ্জাত দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বস্রষ্টার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উদ্‌ঘাটনে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করা।"

## নাস্তিকদের অভিযোগ

সবকিছুর আগে বলে রাখা উচিত, আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করা—এটা কোন একটা নতুন ধ্যান-ধারণা নয়। সর্বকালেই নাস্তিকদের একটি দল ছিল, যারা পুরোপুরি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো; অন্তত এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো। বর্তমান বিজ্ঞান ও দর্শন এ বিষয়ে নতুনভাবে কিছু আলোকপাত করেনি। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাসের সমর্থনে নতুন কোন যুক্তি দাঁড় করানো এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী নাস্তিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো—পূর্বসূরীদের যুক্তি খুব সূক্ষ্ম ও জোরালো হতো। কিন্তু বর্তমান নাস্তিকদের যুক্তিকে যুক্তিই বলা চলে না। এদের যাবতীয় আলোচনার সার কথা হলো ঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কোন প্রমাণ মেলে না। জড় বস্তু ছাড়া বিশ্বে আর কিছুই নেই। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার না করেও বিশ্ব-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়।" বলা বাহুল্য, এটা প্রমাণ নয়, বরং অজ্ঞতার পরিচায়ক।

মুসলিম মুতাকাল্লিমগণ পূর্বসূরী নাস্তিকদের যুক্তিগুলো বিস্তারিত-ভাবে উদ্ধৃত করেন। ইবনে হায্‌ম্ তাঁর 'মিলাল্-ও-নিহাল্' নামক গ্রন্থটি নাস্তিকদের অভিযোগের বর্ণনা দিয়েই শুরু করেন। তিনি অভিযোগগুলোর উত্তরও দেন। এই অভিযোগগুলো খুবই দৃঢ় ও জোরালো। কৌতূহল নিবারণের জন্য একটি অভিযোগের বর্ণনা দিচ্ছি ঃ

### আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রাচীন নাস্তিকদের অভিযোগ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করা হলে আমরা (প্রাচীন নাস্তিকেরা) জিজ্ঞেস করবো—যে ঘটনাটি আজ ঘটলো, তার 'কারণ' চিরন্তন হবে, না অচিরন্তন? চিরন্তন হলে বলতে হবে যে, এ ঘটনাটিও

চিরন্তন। কেননা, কারণের সঙ্গে কার্যের বিদ্যমানতাও প্রয়োজন। আর ঘটনাটি অচিরন্তন হলে তার কারণও অচিরন্তন হবে এবং সেহেতু তার জন্য আরো আরো কারণের প্রয়োজন হবে। এখন কথা হলো, এ কারণ-শৃঙ্খল যদি এমন এক স্থানে গিয়ে শেষ হয়, যা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী, তবে পুরো শৃঙ্খলটাকেই চিরন্তন বলতে হবে। কেননা, সর্বোদ্ধ কারণ যদি চিরন্তন হয়, তবে তার প্রথম কার্যটিও চিরন্তন হবে। প্রথম কার্যটি যখন চিরন্তন হলো, তখন পরবর্তী কার্যগুলোও চিরন্তন হবে এবং এভাবেই সামনে চলতে থাকবে। আর এই কার্য-শৃঙ্খল যদি কোন চিরস্থায়ী কারণে গিয়ে শেষ না হয় এবং তা সীমাহীনভাবে চলতেই থাকে, তবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব কোথায়?

পূর্বসূরী নাস্তিকদের আরো অনেক জোরালো অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু আমি সেগুলোর উল্লেখ করে ঘুমন্ত ফ্যাসাদগুলোকে পুনঃ জাগাতে চাই না। ইউরোপের নাস্তিকেরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আজ-কাল যে সব অভিযোগ আনছে এবং যার ফলে আমাদের দেশে ধর্মহীনতা প্রসার লাভ করছে, আমরা কেবল সেসব অভিযোগই উদ্ধৃত করবো এবং সেগুলোরই উত্তর দেবো।

## জড়বাদী

যারা আল্লাহ্য় অবিশ্বাসী, তাদেরকে জড়বাদী বলা হয়। মূলত জড়বাদীরা আল্লাহ্ নেই বলে দাবি করে না। তাদের কথা হলো— "আল্লাহ্ আমাদের আলোচনার গণ্ডির বাইরে।" ব্যাপারটা তাই। কেননা, তাদের জ্ঞানের দৌড় জড় পদার্থ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ জাড্য নন। অধ্যাপক লিট্রার ভাষ্যের উদ্ধৃতি আমরা পূর্বেই দিয়েছি। তাঁর বক্তব্য হলো—জড়বাদ প্রথম জ্ঞান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। কারণ সে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই। জড়বাদীরা বলতে চায়ঃ আমরা এই কৌশল অস্বীকার করি না, আবার তা স্বীকারও করি না। এ 'হ্যাঁ' বা 'না' নিয়ে আমাদের কাজ নেই।

## জড়বাদীরা আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী নয় কেন?

এ সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে বলেঃ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করা ও অস্বীকার করা—এ দু'টি বিকল্পের মধ্যে অস্বীকার করার দিকটাই বেশী জোরালো। তারা বলেঃ

আমাদেরকে সবকিছুর আগে স্থির করতে হবে যে, কোন বস্তুকে স্বীকার করা বা অস্বীকার করা, অথবা কোন বস্তুকে হাঁ-সূচক বা না-সূচক বলে পরিগণিত করার জন্য প্রাথমিক নীতি কি আছে? বর্তমানে প্রচলিত দর্শনের প্রাথমিক নীতি হলো—কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি নিশ্চিত প্রমাণ না থাকে, তবে আমাদের উচিত হবে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। ক্যান্ট ও বেকন তাঁদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন এ নীতির উপর। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ নীতিরই অনুসরণ করে থাকি। মনে করুন—একটি বস্তুর অস্তিত্বেরও প্রমাণ নেই, আবার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় আমরা সে সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে থাকি? আমরা এটা বলি না যে, এ বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানি না। বরং আমরা বলে থাকি যে, যতটুকু জানি, এ বস্তুটি বিদ্যমান নয়। যেমন আমরা বলে থাকি—পৃথিবীর কোন অংশে এমন লোকও থাকতে পারে, যার দু'টি মাথা রয়েছে; এমন জন্তুও থাকতে পারে, যার আকৃতি মানুষের ন্যায়; এমন নদীও থাকতে পারে, যাতে মাছ নেই, বরং মানুষ বাস করে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে এ সকল বস্তু নেই বলেই আমরা বিশ্বাস করে থাকি। কেন করে থাকি? উত্তরে বলা হয় যে, এসবের অস্তিত্বের কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। আল্লাহ্‌র বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা—এ দু'টি বিকল্পের মধ্যে কোনটাই যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হয়, তবে উপরিউক্ত নীতি মোতাবেক আল্লাহ্ নেই বলেই নিশ্চিতভাবে মনে করতে হবে।

নাস্তিকেরা আরো বলে :

সুতরাং আল্লাহ্‌র অবিদ্যমানতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেবল দেখতে হবে যে, তার অস্তিত্বের পক্ষে যেসব প্রমাণ পেশ করা হয়, তা কতটুকু যথার্থ? অস্তিত্বের যত প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে একটি সাধারণ বস্তু দেখা যায়। তা হলো—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব না মানলে অনন্ত ও অসীম কারণ-শৃঙ্খল মেনে নিতে হয়। কিন্তু অন্তহীনতা অবান্তর বলে আস্তিকেরা কোন যুক্তি পেশ করতে পারছে না।

এর উত্তরে হয়তো এটা বলা হবে যে, অন্তহীনতার ধারণা মানুষের অনুভূতি-শক্তির ঊর্ধ্বে। এজন্যই তা অবান্তর। কিন্তু এতেও

প্রশ্ন দাঁড়ায়। তা হলো—আল্লাহ্কে যেভাবে চিরস্থায়ী ও চিরন্তন বলে বিবেচনা করা হয়, সেটাওতো এক ধরনের অন্তহীনতা। আল্লাহ্র চিরন্তনতা ও অন্তহীনতা কি কোন বস্তুর অন্তহীন কারণ শৃঙ্খল থেকে কম আশ্চর্যের কথা?

নাস্তিকেরা আরো বলে ঃ

আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণে এ ভূমিকাটি জোরেশোরে পেশ করা হয় : আমরা প্রকাশ্যে দেখতে পাই যে, কারণ ছাড়া কোন বস্তু সৃষ্টি হয় না। কোন বস্তুর সৃষ্টির জন্য কারণের প্রয়োজন রয়েছে —এ কথাটি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। এটা ঠিক যে, যে সব বস্তুকে আমরা সৃষ্টি হতে দেখেছি, সেগুলো কারণ ছাড়া সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কত সংখ্যক বস্তুকে সৃষ্টি হতে দেখেছি। আমরা কি মৌল উপাদানকে সৃষ্টি হতে দেখেছি? আমরা যা দেখেছি, তা হলো মৌল উপাদানের বিভিন্ন আকারের সৃষ্টি। মৌল উপাদানের সৃষ্টি আমরা দেখিনি। তাই এতটুকু বলা যেতে পারে যে, আকার সৃষ্টির জন্য কারণের প্রয়োজন রয়েছে। এর চাইতে বেশী কিছু বলতে গেলে তার ভিত্তি অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর হবে না, বরং তা হবে কল্পনার উপর। তাই বিশ্ব-সৃষ্টির জন্য কারণের প্রয়োজন রয়েছে—এ দাবি যথার্থ নয়। কেননা বিশ্ব মৌল পদার্থের নামান্তর। মৌল পদার্থ নশ্বর ও সৃষ্ট বলে কোন প্রমাণ নেই। তাই তার কারণও প্রমাণিত হতে পারে না।

হয়তো বলা হবে য, মৌল উপাদান চিরন্তন হলেও তা কোন সময় আকারশূন্য হয় না। তাই এসব আকার সৃষ্টির জন্য কোন একটি কারণের প্রয়োজন এবং সেই কারণই হলো আল্লাহ্। এ প্রমাণও যথার্থ নয়। কেননা মৌল উপাদান চিরন্তন। তার আকারগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টিও হয়, আবার লয়প্রাপ্তও হয়ে যায়। তাই এসব সৃষ্টির 'কারণ' চিরন্তন হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ ধ্বংসনীয় কারণের।

তারা আরো বলে ঃ

আসল কথা হলো—আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় বিশ্ব-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই আমাদের এটাই দেখতে হবে যে, বিশ্বের অস্তিত্ব ও তার শৃঙ্খলা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ছাড়া কল্পনা করা যায়

কি-না? যদি করা যায়, তবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শূন্য থেকে কোন বস্তু সৃষ্টি হয় না। এ নিরিখেই বলা হয়, বিশ্বের মৌল উপাদান চিরন্তন। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্ব যখন তার যৌগিক আকৃতি ধারণ করেনি, তখন অসীম শূন্য-জগতে অণু-পরমাণু ছড়ানো ছিল। এই অণু-পরমাণু পরস্পর মিলিত হয়েই সেগুলো ক্রমান্বয়ে বিশ্বের আকার ধারণ করেছে। এই অণুগুলোকে পরিভাষায় ডেমোক্রাইটাসের নামানুসারে 'ডেমোক্রাইটাসী' অণু বলা হয়।

এ মতবাদে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়। তা হলো—এই অণু ও অংগ-গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কি করে একত্র হলো? এ বিভিন্ন যৌগিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে কি করে সৃষ্টি হলো? প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, মৌল উপাদান যেমন চিরন্তন, গতি আর শক্তিও তদ্রূপ চিরন্তন। গতি হলো অমিশ্র অণুনিচয়ের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। যে সব পদার্থ আমাদের কাছে নিশ্চল বলে মনে হয়, তাদের অঙ্গগুলোও মূলত সব সময় গতিশীল। কেবল পরস্পর আকর্ষণীয় দু'টি বস্তুর সংঘর্ষের ফলেই সেগুলো নিশ্চল হতে পারে। মোট কথা, মৌল উপাদান যেমন চিরন্তন, তার গতিও তেমনি চিরন্তন। মৌল উপাদান কোন সময় গতিশূন্য হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হবে যে, শূন্য জগতে ছড়ানো ডেমোক্রাইটাসী অণুসমূহের পরস্পর মিলন মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

এখন শুধু এ প্রশ্ন থাকে যে, এ অদ্ভুত সৃষ্টিরাজি, যার আগা-গোড়া কলা-কৌশল আর শিল্প চাতুর্যে ভরা, তা কি করে দৈবক্রমে সৃষ্টি হতে পারে? ধর্ম সুচারুরূপে এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে এবং বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এ প্রশ্নটিই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে। রসিন বলেন:

"হে আকাশ! তুমি আমায় বল! হে দরিয়া! আমায় বল! হে জমিন, আমায় উত্তর দাও! হে অসংখ্য তারা, আমায় বল—কোন্ অদৃশ্য হাত তোমাদেরকে আকাশ-দিগন্তে ধরে রেখেছে? হে চতুর্দশী রাত! কে তোমার অন্ধকারকে আলো বিতরণ করেছে? তুমি কত জাঁকালো ও মহিমান্বিত! তোমার ভাব-ভংগী বলে দিচ্ছে—তোমার

পেছনে একজন শিল্পী রয়েছেন, যিনি তোমাকে অক্লেশে সৃষ্টি করেছেন ; তোমার ছাদকে আলোর গম্বুজ দিয়ে সাজিয়েছেন ; জমিনের উপর মাটির ফরশ বিছিয়েছেন এবং ধূলোবালির জাল সৃষ্টি করেছেন। হে সুসংবাদবাহী প্রভাত! হে চিরউজ্জ্বল তারা! হে জ্যোতিষ্মান সূর্য— সত্যিকারভাবে বল—তুমি কার আনুগত্যের জন্য পরিব্যাপ্ত অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসছ এবং বদান্যতা সহকারে পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছ?"

"হে ভয়াল সমুদ্র! তুমিতো ক্ষিপ্ত হয়ে জমিনকে গ্রাস করতে চাইছো। কে তোমাকে এমনি আবদ্ধ করে রেখেছে, যেমন সিংহকে কুঠরীতে আবদ্ধ করে রাখা হয়? তুমি অনর্থক এ কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছো। তোমার শক্তি কখনো নির্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।"

## আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যক্ষ স্রষ্টা, না-কি পরোক্ষ স্রষ্টা?

এ প্রশ্নের জওয়াব দিতে হলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে, ধর্মাবলম্বিগণ বিশ্বের সৃষ্টি ও তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে ঐশ নীতি বর্ণনায় কি বলেছেন? এ বিষয়ে ধর্মালম্বীদের দু'টি দল আছে ঃ একদলের মতে, বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি হয়, তার প্রত্যেকটিকে আল্লাহ্ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে 'কারণ' বা মধ্যবর্তী কোন বস্তুর মোটেই দখল (ভূমিকা) নেই। বৃষ্টি বর্ষিত হয়—তার কারণ এই নয় যে, সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠে, তা শূন্যে উঠে শীতল বায়ুর স্পর্শে পানি-বিন্দুতে পরিণত হয় এবং তা মেঘের আকার ধারণ করে বর্ষিত হয় বরং আল্লাহ্ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে বারিপাত ঘটান।

দ্বিতীয় দল বলেন, আল্লাহ্ বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন বিশ্বে সৃষ্টি-ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ পানিতে এ বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, উত্তাপ পড়লে তা বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পের বৈশিষ্ট্য হলো—ঠাণ্ডা লাগলে তা জলকণায় পরিণত হয়। এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির পর প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে আল্লাহ্কে হস্তক্ষেপ করতে হয় না। বরং এসব বৈশিষ্ট্যের ফলে নির্দিষ্ট সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাষ্পের সৃষ্টি হয়, তা উপরে

উত্থিত হয়, জলকণায় পরিণত হয় এবং শেষ পর্যায়ে বর্ষিত হয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির জন্য কতগুলো নিয়ম নির্ধারিত করে রেখেছেন। তদনুসারেই পৃথিবীতে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে এবং নব নব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করছে। ধর্ম-বিশ্বাসী পণ্ডিতগণ মোটামুটি এ মতই পোষণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে আশায়েরা ছাড়া বাকি সকল সম্প্রদায় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

এটা যখন সমর্থন লাভ করেছে যে, বিশ্বের সৃষ্টি-ধারা কতগুলো প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই প্রবাহিত হয়, তখন একটিমাত্র আলোচ্য বিষয় বাকি থাকছে। তা হলো প্রাকৃতিক নিয়মাবলী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে, নাকি আল্লাহ্ সেগুলো সৃষ্টি করেন? যদি প্রথমোক্ত কথাটি মেনে নেয়া হয়, তবে আল্লাহ্র মোটেই প্রয়োজন থাকে না।

## প্রাকৃতিক নিয়ম স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠে

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৌল উপাদান চিরন্তন। আধুনিক বিজ্ঞান আরো প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কেবল মৌল উপাদানই নয়, তার গতিও চিরন্তন। মৌল উপাদানের অমিশ্র অংগগুলো ছিল নিত্য ঘূর্ণায়মান। সেই অংগগুলোর সংমিশ্রণে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টির পরেও তাদের ঘূর্ণায়মানতা লোপ পায়নি। বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে তাদের অংগগুলো পূর্ববত ঘূর্ণায়মান রয়েছে, যদিও তা আমাদের নজরে ধরা দেয় না।

এ বিষয়টি মেনে নেয়ার পর প্রাকৃতিক নিয়মের জন্য কোন স্রষ্টারই প্রয়োজন থাকে না। মৌল উপাদানের অঙ্গসমূহের সংমিশ্রণে বিভিন্ন আকারের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকটি আকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজনেরই ফল, বাহির থেকে কারো দেওয়া নয়। বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া হোক। প্রাচীন দর্শনে এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, বস্তুর বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয় না, বরং তা আপনা-আপনি জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আল্লাহ্ বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। এ সবের প্রত্যেকটির ডাল, পাতা, ফুল, ফল, স্বাদ ও বর্ণ,—সবই স্বতন্ত্র ধরনের। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে এসব স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেন নি। তিনি কেবল বৃক্ষ শ্রেণী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তার জন্য এসব

বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন রয়েছে বলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সেগুলোর সৃষ্টি হয়েছে।

শাহ ওলীউল্লাহ্ 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ' গ্রন্থে বলেন :

"আল্লাহ্ প্রত্যেক শ্রেণীর বৃক্ষের জন্য স্বতন্ত্র ধরনের পাতা, ভিন্ন রকমের ফুল, বিশেষ প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। এসব বৈশিষ্ট্যের দরুন বোঝা যায় যে, এটা এই শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ, আর ওটা ঐ শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ। এসব স্বাতন্ত্র্য শ্রেণীগত রূপের অধীন।"

তিনি আরো বলেন :

"আমাদের এটা জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই যে, খুরমা ফল এ ধরনের হয় কেন? এরূপ প্রশ্ন করা বৃথা। কেননা, সত্তাগতভাবে পদার্থের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই বৈশিষ্ট্য সঙ্গে নিয়েই প্রত্যেকটি পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং এখানে এ প্রশ্ন করা ঠিক হবে না যে, পদার্থটি এরূপ হলো কেন?"

## শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য চিরন্তন, নাকি নৈমিত্তিক

বেশীরভাগ প্রাকৃতিক দৃশ্য পদার্থের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে এগুলো সৃষ্টি করেন নি। এগুলো হলো শ্রেণীগতরূপে অবশ্যম্ভাবী ফল। এগুলো পদার্থের সাথেই সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়টি মেনে নেয়ার পর শুধু একটি প্রশ্ন বাকি থাকে। তা হলো—শ্রেণীগত রূপের স্রষ্টা কে? এতটুকু পূর্ববর্তী দার্শনিকগণও মেনে নিয়েছেন যে, শ্রেণীগত রূপ চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

'নাশ্রুত্ তওয়ার্লে' নামক গ্রন্থে আছে :

"অ্যারিস্টটল, আবু নসর ফারাবী ও আবু আলী সিনার মতে, স্বর্গমণ্ডলের মৌল উপাদান, তার পরিমাণ ও আকার চিরন্তন। কেবল তাদের গতি চিরন্তন নয়। পদার্থের মৌল উপাদান ও তার শ্রেণীগত তথা জাতিগত রূপ—এ সবই চিরন্তন।"

শ্রেণীগত রূপ চিরন্তন—এ অভিমতটি ধর্ম-বিশ্বাসীরাও সমর্থন করে। এখন কথা হলো—শ্রেণীগত রূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, নাকি আল্লাহ্ সেগুলো সৃষ্টি করেছেন? শ্রেণীগত রূপ আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন,—এ মর্মে ধর্মে-বিশ্বাসীরা কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেনি। তাই অনুমিত হয় যে, এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

কেননা এগুলো চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। দৃঢ় যুক্তি পেশ করা ছাড়া এগুলোকে কোন 'কারণের' ফলশ্রুতি বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সার কথা হলো—মৌল উপাদানের অংগগুলো চিরন্তন এবং তাদের গতিও চিরন্তন। গতির ফলে সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয় এবং তা বিভিন্ন শ্রেণীগত রূপ ধারণ করে। প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তি বিভিন্ন শ্রেণীগত রূপেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। এটাই হলো ধর্মাবলম্বীদের অভিমত।

রবার্ট এঙ্গারসল আমেরিকার একজন বিখ্যাত নাস্তিক। তিনি তাঁর 'আল্লাহ্ অস্বীকার' গ্রন্থে বলেন ঃ

"মনে করুন, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আর কোন শক্তি নেই ; মৌল উপাদান ও শক্তি—এ দু'টি সৃষ্টির আদি থেকেই বিদ্যমান আছে। এখন ভেবে দেখুন, দু'টি অণু যদি পরস্পর মিলিত হয়, তবে কি কোন ফল দাঁড়াবে? হাঁ দাঁড়াবে বই কি? যদি সে দু'টি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে সমপরিমাণ শক্তি নিয়ে মুখোমুখি অগ্রসর হয়, তবে উভয়ই একই স্থানে এসে থেমে যাবে এবং এটাই হবে তাদের পরস্পর মিলনের ফল। যদি ব্যাপারটি তাই হয়, তবে বলতে হবে যে, জড় উপাদান শক্তি ও তাদের ফলাফলের পেছনে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আর কোন শক্তি নেই। এ ধরনের কার্যকারণকেই বলা হয়—প্রকৃতির নিয়ম ও মৌল উপাদানের সংযোজন। এখন অনুসিদ্ধান্তে বলা যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম ও উপাদানীয় সংযোজনের পেছনে এমন কোন শক্তি নেই, যা প্রকৃতির চাইতে বেশী শক্তিশালী।"

কেউ হয় তো বলতে পারে,—এটাও ধরে নেয়া যেতে পারে যে, মৌল উপাদান ও তার অঙ্গগুলো চিরন্তন বটে, আবার আল্লাহ্ স্রষ্টাও বটে এবং তাদের সংযোজন ও সংমিশ্রণের ফলেই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এটা বলতে যদি কোন সমস্যা না থাকে, তবে এ বিষয়টি মেনে নেয়াই শ্রেয়ঃ এবং এ অভিমতই পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোক মেনে নিয়েছে।

কিন্তু এ ধারণাও ঠিক নয়। কারণ বাস্তব দিক থেকে বিচার করতে গেলে উপরের কথা দু'টি এক নয়। কোন বস্তু সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান লাভ করতে হলে সে বিষয়টিকে অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হবে। বিষয়টি যতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে, ততই তা হবে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। যতই তা অতিন্দ্রিয় হবে, ততই তার নিশ্চয়তা হ্রাস

পাবে। বিষয়টির বিশ্লেষণের পরেও যদি তার সীমারেখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের গণ্ডিতে প্রবেশ না করে, তবে সেই জ্ঞান হবে গোলক ধাঁ ধাঁ। এটা সর্বজনবিদিত যে, মানুষ কেবল সে সব বস্তুকেই বুঝতে পারে, যা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নয়তো তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে উদ্ভূত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম কথাটি অর্থাৎ শুধু মৌল উপাদান ও তার গতিই বিশ্বের চালক—এ অভিমতটি বেশী বিশ্বাস্য। বিশ্বে উপলব্ধি করার মত বস্তু হলো—মৌল উপাদান, গতি ও শক্তি। সারা পৃথিবী মিলেও কোন পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারে না। আবার শূন্যতা থেকেও কোন বস্তুর উদ্ভব হয় না—এ বিষয়টিও মানুষ ইন্দ্রিয় উদ্ভূত জ্ঞান থেকে উপলব্ধি করে। এতেও প্রতীয়মান হয় যে, জড় উপাদান চিরন্তন এবং তার চিরন্তনতা অনেকটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রকৃতির কতগুলো নিয়ম রয়েছে, যেমন পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণ, বিবর্তনবাদ, ব্যক্তিগত রুচি—এসব নীতির অধীনেই বিশ্ব আজ এগিয়ে চলেছে।

## আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ধারণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান থেকেও উদ্ভূত নয়। প্রত্যেকটি নশ্বর পদার্থের অস্তিত্ব কারণের উপর নির্ভরশীল। এতটুকু অবশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে কি করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলা যায়? আমরা জানি, উপাদান নশ্বর নয়। গতি ও শক্তি হলো জড়ের অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য। তাই গতি আর শক্তিও নশ্বর নয়। যেহেতু জড়, শক্তি ও গতি চিরন্তন এবং বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ এসব থেকেই উদ্ভূত, সেহেতু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে কি করে জড়জ্ঞান-উদ্ভূত বলা যায়? অধ্যাপক লিট্রা বলেন, 'যেসব কারণে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো স্পষ্টতই বিশ্বে বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। এসব কারণকেই আমরা প্রকৃতির নিয়ম বলে আখ্যায়িত করে থাকি।" আরো একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক বলেন, "প্রকৃতির নিয়ম ও আল্লাহ্—এ দুটোর মধ্যে আমাদের প্রয়োজন কেবল একটির।"

এ চিন্তাধারা হলো সে সব নাস্তিকদের, যারা বলে থাকে: "আমরা আল্লাহর অস্তিত্বের কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না। যদি

অনুমানের উপর নির্ভর করি, তবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের চাইতে অনস্তিত্বের দিকটাকেই অধিকতর প্রবল দেখতে পাই।" কিন্তু নাস্তিকদের মধ্যে অন্য একটি সম্প্রদায়ও রয়েছে, যারা প্রকাশ্যভাবে বলছে যে, সাধারণত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের যে বর্ণনা দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ অবান্তর।

এরা আরো বলে ঃ আল্লাহ্ বলতে যদি আদি কারণকে বুঝায়, তবে আমাদের বলার কিছুই নেই। আর যদি দাবি করা হয় যে, সে সর্বশক্তিমান, জ্ঞানী, সর্বাধিনায়ক, ন্যায়বান ও দয়ালু, তবে এরূপ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে না। বরং এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি পাওয়া যায়। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ

## আল্লাহ্-অবিশ্বাসীদের যুক্তি

১. ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যাবতীয় সৃষ্টি নিতান্ত নীচ স্তর হতে উন্নতি লাভ করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যে মানব জাতি সৃষ্টির সেরা, তা ছিল নীচ ধরনের প্রাণী বিশেষ। তা উন্নতি লাভ করে বানরের সীমারেখায় উপনীত হয়। অতঃপর তা ওঁাশের আকার অতিক্রম করে মানুষে পরিণত হয়। তাই কি করে অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর স্রষ্টা সর্ব শক্তিমান ও জ্ঞানবান? রবার্ট এঙ্গবারসল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অস্বীকার করে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ

"মনে করুন, কোন একটি দ্বীপে দশ লক্ষ বছরের একজন লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার কাছে রয়েছে খুব সুন্দর একটি গাড়ী। সে দাবি করেছে যে, এ গাড়ী তার লক্ষ লক্ষ বছরের পরিশ্রমের ফল। এর এক একটি অংশ আবিষ্কার করতে তার পঞ্চাশ হাজার বছর লেগেছে। এতে কি আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, সে ব্যক্তি প্রথম থেকেই কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ ছিল?"

"সৃষ্টিরাজির উন্নতি সাধনে কি একথা বুঝায় না যে, তাদের সংগে সংগে স্রষ্টারও উন্নতি হয়েছে? একজন সৎ, বুদ্ধিমান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যদি মানুষ সৃষ্টি করতো তবে সে কি প্রথম পর্যায়ে তাকে একটি নিতান্ত নিকৃষ্ট প্রাণীরূপে সৃষ্টি করতো, অতঃপর দীর্ঘ ও অনির্দিষ্ট কালের পর আস্তে আস্তে উন্নীত করে মানুষে

পরিণত করতো? সে কি এমন সব আকৃতি-প্রকৃতির সৃষ্টিতে অসংখ্য বছর কাটিয়ে দিতো, যেগুলোকে শেষ পর্যন্ত বাদ দিতে হলো।”

২. দুনিয়াতে ভীষণ জোর-জুলুম, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড ও দুঃখ-কষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় কি করে অনুমান করা যায় যে, বিশ্ব-স্রষ্টা দয়াবান বা ন্যায়পরায়ণ? এঙ্গারসল বলেনঃ “দুনিয়াটকে এমন সব ভয়াল ও হিংস্র জন্তু দিয়ে বোঝাই করার মধ্যে কি কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে? প্রত্যেকটি প্রাণী অপর প্রাণীকে সাবাড় করতে চায়; প্রত্যেকটি মুখ যেন একটি কসাইখানা; প্রত্যেকটি পেট যেন একটি গোরস্তান। এমতাবস্থায় কেউ কি করে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দয়ার কদর করতে পারে? সর্বসাধারণের এ নিত্যকার হানাহানির মধ্যে আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানবত্তার কদর ও তার প্রতি ভালবাসার উদয় কি করে সম্ভব হতে পারে?”

“দীর্ঘস্থায়ী অজ্ঞতার মাঝে মানুষ কি যে কষ্ট ভোগ করছে, তা অকল্পনীয়। এসব কষ্ট বেশী ভোগ করছে দুর্বল, সৎ ও নিরপরাধ লোকেরাই। মহিলাদের সাথে এমন সব ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন হিংস্র প্রাণীর সংগে করা হয়। নিরপরাধ শিশুদেরকে পোকা-মাকড়ের ন্যায় পায়ের তলায় পিষে মারা হয়েছে। দাসত্বের বৈধতার ফতোয়া দিয়ে বহু জাতিকে শত শত বছর ধরে চেপে রাখা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এমন এক জুলুমের রাজত্ব ছিল, যা ভাষা ও কলমে প্রকাশ করা যায় না।”

“কেউ যদি বলে, পরকালে এসব বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে তাদের কষ্টের প্রতিদান দেয়া হবে, তবুও এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। কারণ আমরা কি করে এটা আশা করতে পারি যে, একজন প্রকৃষ্ট, বুদ্ধিমান, সৎ ও শক্তিমান বিচারক আমাদের সংগে বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে অধিকতর ভাল ব্যবহার করবে? তখন কি আল্লাহ্‌র শক্তি বেড়ে যাবে? সে কি আরো দয়ালু হয়ে উঠবে? অসহায় সৃষ্টির প্রতি তার মেহেরবানী কি তখন বেড়ে যাবে?”

৩. এটা সর্বজনবিদিত যে, শত শত লোক স্বভাবতই নিতান্ত নিষ্ঠুর, পাষাণ, অসৎ ও কামাসক্ত। সত্যিকার বলতে গেলে, মানব জাতির বেশীর ভাগই খারাপ। এমতাবস্থায় আমরা কি করে ভাবতে পারি যে, একজন বিচারক এ ধরনের মানব জাতির সৃষ্টি

বৈধ মনে করতে পারে? কেয়ামতের দিবসের প্রতিদান বা শাস্তি এ সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কারণ আসল প্রশ্ন হলো—এসব লোক সৃষ্টি করারই-বা কি প্রয়োজন ছিল? সৃষ্টি ক'রে পুনরায় তাদেরকে কেয়ামতের সন্ধিক্ষণে শাস্তি দেয়ার মধ্যে কি মঙ্গল রয়েছে? আল্লাহ্ যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে তাঁর উচিত ছিল পৃথিবীতে কেবল ন্যায় বিচার, সততা ও সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠা করা। প্রতারণা, মিথ্যা, পাপাচার, কলহ, হিংসা, শত্রুতা, প্রতিশোধ ও নিষ্ঠুরতার কি প্রয়োজন ছিল? এসব কাজের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয় যে, কোন স্বাধীন ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বিদ্যমান নেই, বরং রয়েছে শুধু প্রকৃতির নিয়ম এবং তদনুসারেই বিশ্বের শৃঙ্খলা বজায় থাকছে। কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়াই বিশ্বে যা হওয়ার আছে, হয়ে যাচ্ছে।

একজন বিখ্যাত নাস্তিক বলেন: "আমার জ্ঞানানুসারে আমি যতটুকু বুঝতে পারি, প্রকৃতির ভালবাসা বা তার সদিচ্ছা বলতে কিছুই নেই। তা' সব সময় বিভিন্ন বস্তু গড়ে থাকে, আবার তা ভেঙ্গেও দেয়। তার কাছে চিন্তা, হাসি, খুশী, বিষ, খাদ্য, সুখ, দুঃখ, জীবন, মৃত্যু—সবই সমান। সে দয়ালু নয়; সে খোশামোদেও খুশী হয় না; অশ্রু বিসর্জনেও প্রভাবান্বিত হয় না।"

## নাস্তিকদের অভিযোগের উত্তর

আমরা এটা অস্বীকার করি না যে, বিশ্ব 'ডেমোক্রাইটাসী অণু' দ্বারা গঠিত। আমরা এটাও সমর্থন করি যে, বিশ্ব চিরন্তন। 'মু'তাযিলা' নামক মুসলমানদের একটি বড় সম্প্রদায় ও মুসলিম হুকামার মধ্যে ফারাবী, ইবনে সিনা আর ইবনে রুশদও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। ইবনে রুশদ তাঁর 'তালখীসুল মাকাল্' গ্রন্থে বলেন, কুরআন মজীদের আয়াত—"আকাশ-জমিন ছিল বদ্ধ এবং তাঁর (আল্লাহর) আরশ ছিল পানির উপর ভাসমান। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করলেন আকাশ পানে, যা ছিল ধূম্রময়"—এতেও এম তবাদের সমর্থন মেলে। আমরা এটাও সমর্থন করি যে, মৌল অণুগুলো গতিশীল। গতি জড় পদার্থের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে এবং তদনুসারেই মৌল অণুগুলো পরস্পর মিলিত হয়, সংযোজিত হয় এবং তাতে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি

হয়। কিন্তু এসব যুক্তি দিয়ে বিশ্বের সমস্যার সমাধান হবে না। কথাটি বিস্তারিতভাবে বলছি ঃ

## প্রকৃতির শক্তিরাজি পরস্পর সহায়ক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ

এতে সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের শৃঙ্খলা প্রকৃতির নিয়মসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই নিয়মগুলো স্বতন্ত্র ও পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিহীন নয়। এগুলোর একটির সাথে অপরটির সামঞ্জস্য রয়েছে; একটি অপরটির সহায়তা করে। প্রকৃতির এই নিয়মগুলোর মধ্যে এত সুন্দর পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে যে, একটি ক্ষুদ্রতম বস্তু সৃষ্টির সময়েও এগুলো একযোগে কাজ করে। মাটি, বাতাস, পানি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে সৌর জগতের বড় বড় পদার্থ —যেমন সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির সহযোগিতার ফলেই একটি দুর্বল তৃণের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। মানুষের শরীরে শত শত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্নায়ু রয়েছে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতন্ত্র এবং সেগুলোর ক্রিয়াও স্বতন্ত্র। কিন্তু এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পরের সহযোগিতা না করলে, অন্তত বিঘ্ন সৃষ্টি থেকে বিরত না থাকলে তাদের পক্ষে কোন কাজই সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তিগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং মানুষের মধ্যে অন্য এমন একটি সাধারণ শক্তি রয়েছে, যা যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে নিহিত শক্তিনিচয়ের উর্ধ্বে এবং যার অধীনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলেমিশে কাজ করে থাকে। এই সাধারণ শক্তিকেই বলা হয় আত্মা বা মেজাজ।

প্রাকৃতিক নিয়মেরও একই অবস্থা। বিশ্বে প্রকৃতির শত শত, বরং হাজার হাজার নিয়ম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটিও যদি পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অপরটি থেকে দূরে সরে থাকে, তবে গোটা বিশ্ব-শৃঙ্খলাই ওলট-পালট হয়ে যাবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতির এসব শক্তিরাজির উপর এমন একটি নিয়ামক শক্তি রয়েছে, যা সকল শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য, সম্বন্ধ ও ঐক্য বিধান করছে। জড়বাদীরা বলেন, জড় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সৃষ্টি হয়; জড় উপাদানের জন্মের সাথেই গতির সৃষ্টি হয়; আবার গতিই সংমিশ্রণ ও সংযোজনের সৃষ্টি করে এবং এমনি করে ক্রমান্বয়ে প্রকৃতির অজস্র নিয়ম জন্ম লাভ করে। কিন্তু তাঁরা এটা বলতে পারেন না যে,

প্রকৃতির শত শত, হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ নিয়মের মধ্যে এত সুন্দর সামঞ্জস্য আর এই ঐক্য কোথা থেকে এলো? এ সামঞ্জস্য ও ঐক্য প্রাকৃতিক নিয়মের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য নয়। কেউ যদি এমন কথা বলে, তবে তা হবে অনুমান মাত্র। অতীতেও এরূপ কথা কেউ বলেনি। এই সর্বাধিক শক্তি, যা প্রকৃতির সকল শক্তিকে বশীভূত করে রেখেছে এবং যা এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য বিধান করেছে- সেই সত্তাই হলেন আল্লাহ্। কুরআনের আয়াতে এ মর্মকথাই উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আকাশ-জমিনে যা কিছু আছে, খুশীতে হোক, আর না খুশীতেই হোক, সবই তাঁর (আল্লাহ্র) আনুগত্য স্বীকার করে।" এ দিকটি বিবেচনা করেই ইওরোপের বড় বড় জ্ঞানী ও দার্শনিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

মিলন এড্ওয়ার্ড বলেন ঃ স্রষ্টার ভূরি ভূরি জীবন্ত নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক বলছে যে, এ সমস্ত ভবলীলা দৈবক্রমেই ঘটছে। তাদের এ ধারণা কি মানুষের কাছে বিস্ময়কর নয়? অন্য শব্দে বলতে গেলে, তারা বলছে, এসব সৃষ্টিরাজি মৌলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যেরই ফলশ্রুতি। এসব মনগড়া অনুমানকে কোন কোন লোক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান বলেও আখ্যায়িত করছে। সত্যিকার জ্ঞান এসব আনুমানিক ও কাল্পনিক চিন্তা-ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা কখনো এসব কথা বিশ্বাস করতে পারে না!

হার্বার্ট স্পেনসার বলেন ঃ প্রকৃতির এ রহস্যমালা দিনদিনই জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করছে। আমরা যদি সেগুলো নিয়ে ভালরূপে চিন্তা-ভাবনা করি, তবে বুঝতে পারবো যে, মানুষের উপর একটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী শক্তি রয়েছে, যা থেকে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হয়ে থাকে।

অধ্যাপক লিনা বলেন ঃ সেই মহিমান্বিত আল্লাহ্, যিনি চিরন্তন, যিনি সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত, যিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী, তিনি নিজ কারিগরির অদ্ভুত মহিমা নিয়ে আমার সামনে এমনিভাবে উদ্ভাসিত হন যে, আমি বিহ্বল ও হতবাক হয়ে পড়ি।

এখন আমি সেসব অভিযোগ তুলে ধরছি, যা আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তা, দয়া ও ন্যায়নিষ্ঠার বিরুদ্ধে দাঁড় করা হয়ে থাকে। প্রশ্ন করা হয় যে, "আল্লাহ্‌ যদি সর্বশক্তিমান হতো, তবে পৃথিবীকে ধাপে ধাপে ক্রমান্বয়ে কেন সৃষ্টি করলো?"—এটা এমন একটি বাজে প্রশ্ন, যার প্রতি ধ্যান দেয়ার প্রয়োজন নেই।

এক ফোটা পানির মাতৃগর্ভে পতিত হওয়া, তার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করা, তাতে রক্ত-মাংসের আবরণ গড়ে উঠা, বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি হওয়া, প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া, রক্ত থেকে খাদ্য গ্রহণ করা, অতঃপর নূরের প্রতীকে পরিণত হয়ে মানব-অস্তিত্ব লাভ করা—এ পর্যায়ক্রম অধিকতর আশ্চর্যের বিষয়, নাকি এক ধাপে এক চোটে গোটা মানুষের সৃষ্টি হওয়া?

দুনিয়াতে মঙ্গলের সংগে অমঙ্গল কেন সৃষ্টি করা হলো—এ প্রশ্নটি অবশ্য লক্ষ্য করার মত।

বু-আলী সিনা তাঁর 'শিফা' গ্রন্থে এ অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, পৃথিবীর হিতাহিত ক্ষেত্রেতিনটি অবস্থার কল্পনা করা যেতে পারে:

(১) কেবল মঙ্গলই সৃষ্টি করা যেতো (২) কেবল অমঙ্গলই সৃষ্টি করা যেতো (৩) অধিকাংশ মঙ্গল এবং কিছুটা অমঙ্গল সৃষ্টি করা যেতো।

মনে করুন, প্রকৃতির সামনে এই তিনটি বিকল্প পেশ করা হয়েছে। এখন তার কি করা উচিত?

প্রথম বিকল্প যে গ্রহণযোগ্য, তাতে কারো মতানৈক্য থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় বিকল্পটিতেও মতবিরোধের কিছু নেই। কারণ এটা কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতিও তাই করেছে। কেবল তৃতীয় বিকল্পটি সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিত। চিন্তা করা উচিত, প্রকৃতির পক্ষে এমন একটি পৃথিবী সৃষ্টি করা সমীচীন হবে কি-না, যাতে মঙ্গল থাকবে বেশী, আর অমঙ্গল থাকবে কম। এ ধরনের দুনিয়াই আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন। যদি এ ধরনের দুনিয়া সৃষ্টি করা না হতো, তবে লাভ অবশ্য এতটুকু হতো যে, গুটিকতক অমঙ্গল পৃথিবীতে স্থান লাভ করতো না। কিন্তু এর ফলে এই পৃথিবী হাজার হাজার মঙ্গল থেকে বঞ্চিত থাকতো।

ইবনে রুশ্‌দ্‌ এ অভিযোগের অন্য একটি উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে যে সব অমঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়, তা মূলত অমঙ্গল নয়। বরং সেগুলো মঙ্গলের তাবেদার এবং মঙ্গলের পথে পরিচালক। ক্রোধ একটি খারাপ বস্তু। কিন্তু তা সংবেদনেরই ফল, যার রেসে মানুষ আত্মরক্ষা করে। এ অনুভূতি না হলে মানুষ হত্যাকারীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজের প্রাণ বাঁচাবারও চেষ্টা করতো না। পাপাচার খারাপ বস্তু। কিন্তু এর সম্পর্ক রয়েছে সেই শক্তির সংগে, যার উপর নির্ভর করে মানব জাতির স্থায়িত্ব। আগুন ঘর-দোর পুড়িয়ে ফেলে ; শহর ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু আগুন যদি না হতো, তবে মানুষের জীবন যাপন করাই মুশকিল হতো।

এখন শুধু এ সন্দেহ থাকছে যে. কেবল এমন সব বস্তু সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল কি-না, যাতে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গলের কিছুই নেই। ইবনে রুশ্‌দ্‌ বলেন, এরূপ জগত সৃষ্টি করাই সম্ভব ছিল না। এমন কোন আগুন সৃষ্টি করা যায় না, যাতে ইচ্ছা করলে কেবল খাদ্যই পাকানো যাবে ; কিন্তু মসজিদ পুড়তে চাইলে তা করা যাবে না।

এখন একটি মাত্র অভিযোগ বাকি রয়েছে। তা হলো—দুনিয়াতে ভাল মানুষেরাই বেশী কষ্ট পায় এবং মন্দ লোকেরা সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করে। এর উত্তরে বলা যায়ঃ মানুষের জীবন এই ধ্বংসনীয় জীবনের ক্রান্তি বিন্দুতেই শেষ নয়। এর পরেও আরো জীবন রয়েছে। তাই কি করে বলা যাবে যে, যাদেরকে আমরা সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করতে দেখছি, সেটাই তাদের পুনর্জীবনের প্রতিচ্ছবি। আমরা মানব জীবনের ক্ষুদ্রতর অংশটাই দেখছি। এ অংশটুকু দেখে আমরা কি করে পুরো জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারি ? সামনে আমরা প্রমাণ করে দেখাবো যে, প্রতিদান ও শাস্তি মনুষ্যকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। কর্মের সংগে প্রতিদান ও শাস্তির এমনই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, যেমন মৃত্যুর রয়েছে বিষ ভক্ষণের সাথে এবং তৃষ্ণা নিবারণের রয়েছে পানি পানের সাথে। তাই এটা বলা ঠিক হবে না যে, অনেক লোক ভাল বা মন্দ কাজ করছে। কিন্তু তারা তাদের কর্মফল ভোগ করছে না।

পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যে সকল অমঙ্গল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি, কে বলতে পারে যে, এগুলো সত্যিই ত্রুটি-বিচ্যুতি।

পৃথিবীর পুরো ইতিহাস ও পুরো ছবি আমাদের সামনে নেই বলেই হয়তো এগুলো আমাদের কাছে অমঙ্গল বলে মনে হয়। এমতাবস্থায় কেবল এতটুকু দৃশ্য বস্তুর উপর ভর করে আল্লাহ্‌র মহিমা ও তাঁর শক্তিমত্তাকে কি করে অস্বীকার করা যায়? কুরআন মজীদে আছে—"তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা খুবই কম।"

## তওহীদ

প্রত্যেকটি ধর্মই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মোটামুটি স্বীকার করেছে। এ জন্যই ইসলাম এ বিষয়ের উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করেনি। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো—তওহীদ। কেননা অন্যান্য ধর্মে হয়তো তওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদই ছিল না, নয়তো তা পূর্ণাঙ্গ ছিল না। এজন্যই কুরআন মজীদ বারবার ঘোষণা করেছে যে, নাস্তিকেরা তো আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের কথা শুনলেই আঁতকে উঠে। কুরআন মজীদ বলে :

"যদি একক আল্লাহ্‌কে ডাকা হয়, তবে তোমরা তাঁকে অস্বীকার কর। আর যদি অংশীদার জুড়ে দেয়া হয়, তবে তোমরা মেনে নিচ্ছ। যদি একক আল্লাহ্‌র কথা আলোচিত হয়, তবে কেয়ামতের অবিশ্বাসীরা আঁতকে উঠে।"

আসল কথা হলো, যে সব কারণে আমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছি, সে সব কারণে আল্লাহ্‌র একত্ববাদকেও মেনে নিয়েছি। পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, যদিও বাহ্যত সেগুলো সংখ্যায় অনেক এবং সেগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, কিন্তু সবগুলো মিলে একটি সত্তায় পরিণত হয়েছে। অন্য কথায়, বিশ্বের প্রত্যেকটি নিয়ম অন্যটির সংগে এমনিভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, কেবলমাত্র সেই একক সত্তাই (আল্লাহ্) সেগুলো পরিচালনা করতে পারেন, যিনি সেগুলোর স্রষ্টা ও সামঞ্জস্য বিধানকারী। কুরআন মজীদ কথাটা এভাবে বর্ণনা করেছে :

"আসমান-জমিনে যদি একাধিক আল্লাহ্ হতো, তবে বিশ্বের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতো।"

যুক্তিবিদ্যার প্রমাণ-পদ্ধতি অনুসারে যদি এ বিষয়টি প্রমাণ করতে হয়, তবে নিম্নের সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে :

১. বাহ্যত যদিও পৃথিবীতে হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ পদার্থ দেখা যায়, কিন্তু মূলত পৃথিবী একক বস্তু। এসব পদার্থ হলো তার অংগ। একটি মানুষের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝানো যায়। মানুষের হাত, পা, কান, চোখ, নাক—অনেক অংগই রয়েছে। এ সত্ত্বেও তা একটি পদার্থ মাত্র।

২. একটি বস্তুর অস্তিত্বের জন্য দু'টি পূর্ণাঙ্গ হেতু থাকতে পারে না। কেননা পূর্ণাঙ্গ হেতুর মানে হলো—তা পাওয়া গেলেই কার্যটির অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না। এজন্যই একটি কার্যের জন্য যদি দু'টো পূর্ণাঙ্গ হেতু থাকে, তবে তন্মধ্যে একটি হবে সম্পূর্ণ বৃথা।

৩. আল্লাহ্ হলেন বিশ্বের হেতু বা কারণ।

## একত্ববাদের সমর্থনে যুক্তি

একত্ববাদ প্রমাণের সূত্রগুলো হলো এই ঃ বিশ্ব একক বস্তু; একক বস্তুর দু'টি পূর্ণাঙ্গ কারণ হতে পারে না। এজন্য বিশ্বের অস্তিত্বেরও দু'টি পূর্ণাঙ্গ কারণ হতে পারে না। আল্লাহ্ বিশ্বের পূর্ণাঙ্গ কারণ। পূর্ণাঙ্গ কারণ একাধিক হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ও একাধিক হতে পারে না। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মূলত সকল ধর্মই মোটামুটিভাবে তওহীদের শিক্ষা দেয়। যে সব কওমকে 'মুশ্‌রিক' বা অংশীবাদী বলা হয়, তারাও মোটামুটি একক সর্বশক্তিমান সত্তায় বিশ্বাসী। তবে তারা আল্লাহ্‌র অভিব্যক্তি ও গুণাবলীকে একাধিক বলে মনে করে। এটা বাহ্যত শির্‌ক বা অংশীবাদ বলেই মনে হয়। খ্রীস্টানেরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু সংগে সংগে তারা একথাও বলে যে, এই তিনের মধ্যেই এক আল্লাহ্‌র ধারণা রয়েছে। তাদের এই ব্যাখ্যা যতই ভ্রমাত্মক হোক না কেন, এতে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, তারাও অল্লাহ্‌র একাধিকত্ব পছন্দ করে না। এ দিক থেকে বলতে হয় যে, ন্যূনাধিক তওহীদ কোন একটা নতুন বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো—তা তওহীদকে পূর্ণাঙ্গ করেছে এবং অংশীদারিত্বের লেশ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। এটা হলো ইসলামের অনন্য সাধারণ পূর্ণতা সাধন, যার ফলে ইসলামের পর আর কোন ধর্মের প্রয়োজন রয়নি। কেননা পূর্ণতা সাধনের পর উন্নতি বিধানের আর কোন স্তর বাকি

থাকে না। পূর্ণাঙ্গ তওহীদের মানে হলো : যেভাবে আল্লাহ্‌র সত্তার কোন অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর গুণাবলীরও কোন অংশীদার নেই। সৃষ্টি করা, জীবিত রাখা, অদৃশ্যকে জানা, দূর ও নিকটের সাথে সমান সম্পর্ক বজায় রাখা —এসব গুণাবলী আল্লাহ্‌র সত্তাভুক্ত। ইসলামপন্থী ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা অবতার বা পয়গম্বরদেরকেও এসব গুণে গুণান্বিত করেছে, আর এখনো করছে। এটাই হলো তাদের তওহীদের ত্রুটি।

## আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও তাঁর ইবাদতে তওহীদের ধারণা

দুঃখের বিষয়, আজকাল অনেক মুসলমানও বিশেষ পরিভাষার অন্তরালে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যান্যদেরকেও এসব গুণে গুণান্বিত করতে আরম্ভ করেছে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র সত্তাগত তওহীদের ন্যায় তাঁর গুণগত ও ইবাদতগত তওহীদকেও আবশ্যক বলে মনে করে। অন্যান্য ধর্মে আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন কোন মানুষকে সম্মানসূচক সেজদা করাও বৈধ ছিল। কিন্তু ইসলাম পূর্ণাঙ্গ তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাও হারাম ঘোষণা করেছে।

সত্যিকার বলতে গেলে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকারের ফলে মানুষের অন্তরে যে নৈতিক প্রভাব পড়ে, তা পূর্ণাঙ্গ তওহীদের বিশ্বাস ছাড়া হয় না। মানুষ যদি মনে করে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ও আশা-ভরসার স্থল, তবেই তার মধ্যে আনুগত্য, বাধ্যতা, নম্রতা, নির্ভরশীলতা, দৃঢ়তা ও অকপটতার মনোভাব জন্মাতে পারে। মানুষের মধ্যে যদি পূর্ণাঙ্গ তওহীদ না থাকে, তবে তার মধ্যে দৃঢ়তা, স্বাধীনতা, নির্ভীকতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার গুণ সৃষ্টি হতে পারে না।

## নুবুওয়াত

নুবুওয়াতের স্বরূপ কি? এর শর্ত কি? নবী ও অনবীর মধ্যে পার্থক্য কি—এ সব প্রশ্নের জওয়াব আজকাল মুসলিম সম্প্রদায়-গুলোর পক্ষ থেকে সাধারণত এ বলেই দেয়া হয় যে, নুবুওয়াত আল্লাহ্‌-প্রদত্ত একটি পদ। আল্লাহ্‌ যাঁকে চান, তাঁকেই তা দান করে থাকেন। নুবুওয়াতের জন্য মুজিযা শর্ত এবং এটাই নুবুওয়াতের

চিহ্ন। যাহিরপন্থী আশ্‌য়ারিগণই সর্বপ্রথম এ ধরনের উত্তর দেন। পরবর্তী সময় এ বিশ্বাস ধীরে ধীরে সকল মুসলিম সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

রসূল করীম ও সাহাবাদের সময় বিশেষ পরিভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার প্রশ্ন উঠেনি। আব্বাসীদের সময় দর্শন যখন ধর্মের গণ্ডিতে প্রবেশ করলো, তখন থেকেই এ বিষয়টি নিয়ে জোরালো আলোচনা আরম্ভ হয়।

## জাহিযই সর্বপ্রথম নুবুওয়াতের ব্যাখ্যা দেন

যতটুকু জানি, জাহিযই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধারণ করেন এবং একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং হাদীস-কুরআন সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী। এ বিষয়ে তিনি কতটুকু লিখেছেন, তা তাঁর গভীর জ্ঞান-পরিসর থেকেই আঁচ করা করা যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ এ বিষয়ে যা লিখে গিয়েছিলেন, সে সব আজ নিশ্চিহ্ন। 'ইসারুল হক' নামক গ্রন্থটি নবম শতকের একজন ইয়ামেনী মুজতাহিদের লেখা। এটি সম্প্রতি মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে এক স্থানে জাহিযের গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। 'শর্‌হে মওয়াকিফ' নামক গ্রন্থে নুবুওয়াত প্রমাণের জন্য যে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেন যে, এটা হলো জাহিযেরই অভিমত। ইমাম গাযালীও তাঁর এ মতবাদের প্রশংসা করেন।

আশ্‌আরীদের যে ধ্যান-ধারণা ছিল, তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এ মতবাদের প্রতি বর্তমানে যে সব অভিযোগ আনীত হচ্ছে, আশ্‌আরীদের যুগে এর চাইতেও বেশী অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছিল। এজন্যই ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী, ইবনে রুশ্‌দ, রাগিব ইস্‌ফাহানী ও শাহ ওলী উল্লার ন্যায় ইলমে কালামবিদ্‌গণ আশআরীদের পদচিহ্ন ত্যাগ করে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু আশায়েরা মতবাদ ছিল জনসাধারণের মন-মেজাজমাফিক। তাই সে ধ্যান-ধারণা জনগণের মনে এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ইমাম গাযালী প্রমুখ আশ্‌য়ারীদের সমর্থনে যে কিছুটা কথা বলেছিলেন, তাই আজ ছোট বড় প্রত্যেকটি লোকের অন্তরে অংকিত, সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত। কিন্তু তাঁরা যে সব বিশেষ

ধরনের মতবাদ ব্যক্ত করেন, তা হুজুগের মধ্যে কারো কানে প্রবেশ করেনি। বাধ্য হয়ে তাঁরা জনসাধারণের ভীড় থেকে দূরে সরে একটি বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের যা বলার ছিল, বিশেষ গণ্ডিতে তা ব্যক্ত করেন।

আল্লাহ্‌র শুকর! তাঁদের গোপনীয় মতামতগুলো যদিও প্রসার লাভ করেনি, কিন্তু সেগুলো সম্পূর্ণ মুছেও যায়নি। আমি এ বিষয়টি ফলাও করে লিখবো। এর উদ্দেশ্য হলো নিম্নের কথাগুলো প্রমাণ করা ঃ

১. নুবুওয়াতের হকিকত সম্পর্কে মুজতাহিদ ও বিশেষজ্ঞদের ব্যক্তিগত যে ধ্যান-ধারণা ছিল, তা প্রকাশ করা।

২. নুবওয়াতের হকিকত সম্পর্কে যে সব অভিযোগ আনীত হয়, তা নতুন নয়, বরং পূর্বে আরো বেশী অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছিল।

৩. এসব অভিযোগ কেবল 'প্রকাশ্যবাদী'* সম্প্রদায়কেই স্পর্শ করে। গবেষক ও পণ্ডিতদের মতবাদ এসব হামলার নাগালের বাইরে।

৪. ইলমে কালামের প্রচলিত ও পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থগুলো জনসাধারণের রুচিমাফিক করে রচনা করা হয়। গবেষক ও ইলমে কালামের বিশেষজ্ঞদের মতামত এসব গ্রন্থে হয়তো মোটেই স্থান লাভ করেনি, নয়তো সেগুলো এত দুর্বল পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, সেদিকে কারো নজর আকৃষ্ট হয় না।

এখন আমি আসল বিষয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছি।

## নুবুওয়াতের প্রতি অতি স্বাভাবিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত অভিযোগ

### আশায়েরার মতে নুবুওয়াতের স্বরূপ

'মওয়াকিফ' নামক গ্রন্থের ভাষ্যানুসারে, আশায়েরা সম্প্রদায় নুবুওয়াতের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং এটাকেই 'মওয়াকিফ'-এর গ্রন্থকার সত্যপন্থীদের অভিমত বলে বর্ণনা করেন ঃ

---

* যাঁরা কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য ভাব ও শব্দার্থ গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'আহলুয্‌যাহির' বা 'প্রকাশ্যবাদী' বলে। (অনুবাদক)

"পয়গাম্বর হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেছেন' "আমি আপনাকে পাঠিয়েছি।" অথবা বলেছেন, "আপনি আমার পক্ষ থেকে লোকদের বাণী পৌঁছে দিন।" অথবা এ ধরনের অন্য কিছু বলেছেন। পয়গাম্বর হওয়ার জন্য কোন যোগ্যতার শর্ত নেই। আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তাকেই এ বিশেষ রহমত দান করেন।"

এ সংজ্ঞানুসারে, কোন নবীর পরিচয় লাভ করা নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, সাধারণ লোক কি করে বুঝতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তির সংগে আল্লাহ্ কথাবার্তা বলেছেন এবং তাঁকে অমুক-তমুক বাণী প্রদান করেছেন। এজন্যই আশ্আরীপন্থিগণ মুজিযাকে নবুওয়াতের নিদর্শন বলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি থেকে মুজিযার অভিব্যক্তি ঘটবে, তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করতে হবে যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেছেন। এর জন্য নিম্নকথাগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন ঃ

মুজিযার সংজ্ঞা কি এবং তার শর্তই বা কি ?

মুজিযা দিয়ে কি নুবুওয়াত প্রমাণ করা যায় ?

মুজিযার সংজ্ঞায় আশায়েরা বলেন, মুজিযা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হলো– নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা। এর জন্য তাঁরা সাতটি শর্ত নির্ধারণ করেন ঃ

(১) মুজিযা হবে মূলত আল্লাহ্‌রই কর্ম (২) মুজিযা হবে অতি-স্বাভাবিক (৩) কেউ মুজিযার প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হবে না (৪) এমন ব্যক্তি থেকেই মুজিযা আত্মপ্রকাশ করবে, যিনি হবেন নবুওয়াতের দাবিদার। (৫) নবী যেভাবে দাবি করবেন, মুজিযাও হবে ঠিক তেমনি। (৬) কেউ নবীকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করবে না। (৭) নুবুওয়াত দাবি করার পুর্বে মুজিযার অভিব্যক্তি ঘটবে না।

নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য অতি স্বাভাবিক ঘটনা প্রদর্শনের যে শর্তটি করা হয়েছে, তার অর্থ কি ? যদি তা প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী হয়, তবে প্রশ্ন দাঁড়াবে যে, এমন মুজিযা সংঘটিত হতে পারে কি-না ?

মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে, তা দু'প্রকার ঃ স্বতঃসিদ্ধ ও চিন্তা-মূলক। স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আয়ত্তে আসে ;

যুক্তি-প্রমাণ ব্যতিরেকেই মানুষ তা' বিশ্বাস করে। যেমনঃ সূর্য দীপ্যমান ; আগুন পুড়িয়ে ফেলে ; অংশের চেয়ে গোটা বস্তু বড় ; দু'টো পরস্পরবিরোধী বস্তু এক স্থানে সন্নিবিষ্ট হতে পারে না—এসব স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

চিন্তামূলক বিষয় হলো—যা চিন্তা-ভাবনা করে হাসিল করা যায় ; যেমনঃ বিশ্ব নশ্বর ; আল্লাহ্ বিদ্যমান ; আত্মা চিরন্তন। চিন্তামূলক বিষয় স্বয়ং যদিও স্বতঃসিদ্ধ নয়, কিন্তু তার সীমারেখা অবশ্যই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের সীমারেখার সাথে মিলিত।

স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নানা প্রকার। প্রকৃতির নিয়মানুসারে যে সব ঘটনা নিত্য একইভাবে ঘটে থাকে, সেগুলো খতিয়ে দেখার পর যে সার্বিক জ্ঞান অর্জিত হয়, তাও এক ধরনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এসব স্বতঃবিষয়ের মধ্যে বিশ্বের ঘটনাবলীর 'কার্য-কারণ'ও রয়েছে। অন্য কথায়, বিশ্বে যা কিছু ঘটে, তার পেছনে কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। কোন পদার্থের পেছনে অস্তিত্ব লাভ করার কারণ থাকলেই তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তাই মুজিযার সংজ্ঞায় যদি বলা হয় যে, তা 'কার্যকারণ' ছাড়াই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে তার অবান্তরতা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়। কেননা 'কার্য-কারণ' ছাড়া কোন বিষয়ই স্পষ্টত বোঝা যায় না। মুজিযার পেছনে যদি 'কার্য-কারণ' না থাকে, তবে তা হবে স্বতঃসিদ্ধতার পরিপন্থী।

ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে এ প্রশ্নটি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, "জ্ঞান দু'প্রকার ঃ স্বতঃস্ফূর্ত ও চিন্তামূলক। চিন্তামূলক জ্ঞান শেষ পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। তাই কোন চিন্তামূলক জ্ঞান যদি স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের পরিপন্থী হয়, তবে তার মানে হবে—শাখা মূলের পরিপন্থী। আর এটা অবান্তর। এতে বোঝা গেল যে, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের পথে বাধা সৃষ্টি করার অধিকার চিন্তালব্ধ জ্ঞানের নেই।"

"এখন চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারবো যে, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করে এবং যাতে তার কোন সন্দেহ থাকে না, সেটাকেই বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ বা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান।"

"এসব ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বলতে চাই যে, আমরা যখন কোন মানুষকে দেখতে পাই, তখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে,

এ ব্যক্তি প্রথমে ছিল মাতৃগর্ভে ; অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয় ; অতঃপর যুবকে পরিণত হয়। কিন্তু কেউ যদি বলে, ব্যাপারটা তা নয়, বরং সে জন্মগ্রহণ করেই আকস্মিকভাবে যুবকে পরিণত হয়েছে, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে ধারণা করবো যে, এ লোকটি ভুল বলছে। তার কথা ভ্রমাত্মক ও মিথ্যে।"

"এতে প্রতীয়মান হয় যে, অতি-প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর দাবি করা একটি কাল্পনিক বিষয়। এ সঠিক নীতিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে বলছি ঃ

১. কেউ যদি বলে, সাগর ও কূপের পানি সোনালী হওয়া সম্ভব, পাহাড়ের খাঁটি সোনায় পরিণত হওয়া সম্ভব—তবে প্রত্যেকেই তাকে পাগল বলবে।

২. কেউ যদি বলে, আমার ঘরে যে পাথরটি পড়ে রয়েছে, তার দার্শনিক হওয়া এবং সূক্ষ্ম দর্শনে নৈপুণ্য অর্জন করা সম্ভব, ঘরে যত কীট-পতঙ্গ আছে, সবার বিজ্ঞ মানুষে পরিণত হওয়া সম্ভব, আমি ঘরে ফিরে গিয়ে দেখবো যে, আমার গাধাটি টলেমিতে পরিণত হয়েছে এবং সে 'মেজিস্তী' নামক গ্রন্থটি পাঠ করছে, ঘরে যত কীট-পতঙ্গ ছিল, সেগুলো মানুষ হয়ে জ্যামিতি, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যা আলোচনা করছে—তবে কে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে? কারণ এসবই তো সম্ভব? কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ তাকে পুরোমাত্রার পাগলই বলবে।

৩. কেউ যদি হাতের তালু দেখে বলে, এখানে রাজমিস্ত্রী ও সরঞ্জাম ছাড়াই জাঁকালো সৌধ ও মহল নির্মিত হবে, স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে, তবে প্রত্যেকেই তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করবে।

এতে প্রমাণিত হলো যে, মানুষের বিবেক খুব সহজেই এটা বুঝতে পারে যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, সবই প্রকৃতি-নির্ধারিত নিয়মানুসারেই ঘটছে। এর বিরুদ্ধে সন্দেহ করার মানে হলো—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে ছিদ্রের অন্বেষণ করা।"

মোটকথা, অতি স্বাভাবিক ঘটনাবলীকে মু'জিযা বলার মানে হলো—মুজিযার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই কতক শীর্ষস্থানীয় আশায়েরাপন্থী অলৌকিকত্বের শর্তটি মুজিযার

সংজ্ঞা থেকে খারিজ করে দিয়েছেন। 'শর্‌হে মওয়াকিফ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আমাদের মতে, মুজিযার সংজ্ঞা হলো—এর ফলে নবীর দাবির সত্যতা প্রমাণিত হবে, যদিও তা অতিস্বাভাবিক কিছু না হয়।"

আমরা অবশ্য ধরে নিতে পারি যে, অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব এবং মুজিযা এরই অপর নাম। আমরা আরো বলতে পারি যে, কারণ ছাড়াও একটি কার্য অস্তিত্ব লাভ করতে পারে, আবার কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন কার্য অস্তিত্ব লাভ করে না। যেমন, যদি বলা হয়, কোন এক বিশেষ পয়গাম্বরকে আগুন দগ্ধ করেনি, তবে এ অবস্থায় তার মানে এই হবে যে, দগ্ধ করার কারণ অর্থাৎ আগুন তো বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তা দগ্ধ করতে পারেনি। যদি বলা হয়, কোন এক বিশেষ পয়গাম্বর পাথরের উপর লাঠি মেরেছিলেন এবং তাতে একটি ঝর্ণারও সৃষ্টি হয়েছিল, তবে তার মানে হবে—ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার কোন কারণই বিদ্যমান ছিল না। তথাপি তা সংঘটিত হয়।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলোতে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়। তা হলো—এটা কি করে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, বস্তুত এসব ঘটনার পেছনে কোন কারণই বিদ্যমান ছিল না। আশায়েরা সম্প্রদায়ের মতবাদ গ্রহণ করলে তো এ সন্দেহ আরো বেড়ে যাবে। আশ্‌আরীপন্থিগণ বলেন, জিন ও শয়তান মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করতে পারে। ফলে মানুষ থেকে সে সব অদ্ভুত কার্য সংঘটিত হতে পারে, যা জিন ও শয়তান থেকে সাধারণত উদ্ভূত হয়ে থাকে। এখন মনে করুন, নবুওয়াতের একজন দাবিদার অতি স্বাভাবিক কাজ সম্পন্ন করছে। এমতাবস্থায় এটা কি করে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, এর পেছনে জিনের কোন আমল-দখল অর্থাৎ ভূমিকা নেই।

আশায়েরা আরো স্বীকার করছেন যে, যাদুর বলে যে কোন অতি-প্রাকৃতিক কাজ সংঘটিত হতে পারে, এমনকি মানুষ গাধায় এবং গাধা মানুষে পরিণত হতে পারে। এমতাবস্থায় কিভাবে নিশ্চয় করে বলা যাবে যে, অতিপ্রাকৃতিক কাজ কেবল মুজিযারই চিহ্ন বহন করে; এক্ষেত্রে কি করে বলা যাবে যে, এটা যাদু নয়। 'শর্‌হে মওয়াকিফ' গ্রন্থে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ "যাদু-বলে বড় বড়

অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে না। কোন যাদুকর থেকে যদি অতিস্বাভাবিক কোন মহৎ ঘটনা সংঘটিত হয়, তবে সে নুবুওয়াতের দাবি উত্থাপন করতে সক্ষম হবে না। যদি এরূপ কিছু দাবি করে, তবে আল্লাহ্ তার অতিস্বাভাবিক কার্যাবলী বন্ধ করে দেবেন।"

কিন্তু এ জওয়াব যথেষ্ট নয়। কেননা আশায়েরার মতে, যাদু-বলে মানুষ বাতাসে উড়তে পারে; মানুষ গাধায় এবং গাধা মানুষে পরিণত হতে পারে, জমিন থেকে ঝরনা প্রবাহিত হতে পারে, জড় পদার্থেও গতি সঞ্চারিত হতে পারে। এ সব কি বড় বড় অতি-স্বাভাবিক কার্য নয়? এ ছাড়া আরো বলতে হয় যে, নবীদের সব মুজিযাও বড় অর্থাৎ মহান হয় না। এখন বাকি রইলো—"কোন যাদুকরই বড় রকমের অলৌকিকত্ব নিয়ে নুবুওয়াতের দাবি করতে পারে না।"—এ কথাটি অসার দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। যাদুকর থেকে যদি সাধারণত অতি-স্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে, তবে কোন্ ব্যক্তি এটা স্বীকার করবে যে, নুবুওয়াতের দাবি করার পর তার অনুরূপ কার্য-ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যাবে?

আবদুল্লাহ ইবনুল মুকান্না' ও জোরোয়াস্টার বড় বড় অতি-স্বাভাবিক ঘটনা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁরা নুবুওয়াতেরও দাবি করেছিলেন। তাই এটা কিভাবে নিশ্চয় করে বলা যাবে যে, যে বস্তুটিকে মুজিযা বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তাতে যাদুর লেশমাত্র নেই?

মোটকথা, মুজিযা সম্পর্কে সব ক্ষেত্রে এ সন্দেহ থেকে যায় যে, হয়তো কোন অপ্রকাশ্য কারণের ফলে এই অতিপ্রাকৃতিক কার্যের উৎপত্তি হয়েছে। তাই মুজিযাকে মুজিযা বলা খুবই মুশকিল।

এ প্রশ্ন বাদ দিলেও 'কেউ মুজিযার প্রত্যুত্তর দিতে পারবে না'—এ দাবিটি কি করে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে? 'কেউ এর প্রত্যুত্তর দিতে পারবে না'—এর অর্থ যদি এই হয় যে, মুজিযা প্রদর্শনের সময় অতীতে কেউ এর উত্তর দিতে পারেনি, তবে আবদুল্লাহ ইবনুল মুকান্না' ও জোরোয়াস্টার প্রমুখকে নবী বলে মানতে হবে। কেননা তাঁরা যখন অতিস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা করেছিলেন, তখন

কেউ তাঁদের প্রত্যুত্তর দিতে এবং তাঁদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি। আর যদি এ অর্থ হয় যে, কেয়ামত পর্যন্ত কেউ এর প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হবে না, তবে এ প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কেয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ সর্বকালের জন্য এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা কার পক্ষে সম্ভব? হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় তাঁর মুজিযাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি। কিন্তু এ কথা কি করে বলা সম্ভব হবে যে, কেয়ামত পর্যন্ত কেউ এর প্রত্যুত্তরে সক্ষম হবে না?

এ সব মেনে নেয়ার পরেও এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, মুজিযা কি কেবল সে সব লোকের জন্যই নুবুওয়াতের নিদর্শন ছিল, যারা নুবুওয়াতের দাবির সময় বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী বংশধরেরা তো কেবল পরম্পরাগত কথন বা কাহিনী থেকেই তা জানতে পারে। কিন্তু কথা হলো, এসব কথন বা কাহিনীকে নিশ্চিত বলে কিভাবে প্রমাণ করা যাবে? পরম্পরাগত বিবরণের মধ্যে সবচাইতে দৃঢ় ও বিশ্বাস্য হলো 'তওয়াতুর'ভিত্তিক বিবরণ, অর্থাৎ এত অধিক লোক তা বিবৃত করেছে যে, ব্যাপারটি সত্য বলেই মনে হয়। যে খবরটি 'তওয়াতুর' পর্যায়ের, সেটাকে 'নিশ্চিত খবর' বলা যায়। কিন্তু 'তওয়াতুর' পর্যায়ের সব বিবরণ কি নিশ্চিত? 'তওরাতে কোন বিকৃতি সাধিত হয়নি'—ইহুদীদের এ বর্ণনাটিও ছিল 'তওয়াতুর' পর্যায়ের। ইহুদী ও খ্রীস্টানেরা মিলিতভাবে তওয়াতুরভিত্তিক বর্ণনায় বলেন, হযরত ঈসা শূলবিদ্ধ হয়েছিলেন। পার্শীরাও তওয়াতুর পর্যায়ের বর্ণনা দিয়ে জোরোয়াস্টারের মুজিযা প্রমাণ করার প্রয়াস পান।

মোটকথা, প্রত্যেকটি সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে তওয়াতুর সূচকভাবে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন। আমরা কি এ সব ব্যাপারকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করতে পারি? এর উত্তরে হয়তো বলা হবে যে, পরম্পরাগত বিবরণের যথার্থতা বিচারের জন্য ইসলামের শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ কেবল মুসলমানদের তওয়াতুর-ভিত্তিক বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু একরোখা সিদ্ধান্তকে বিরোধীরা মেনে নেবে কেন?

এ সব আলোচনা ছিল মুজিযার অবতারণা ও তার সম্ভাবনা-সম্পর্কিত। এখন মনে করুন, মুজিযা সম্ভব, তা বাস্তবও বটে,

তওয়াতুর ভিত্তিক বর্ণনা দিয়ে তা প্রমাণ করাও সম্ভব। তথাপি এ সমস্যা থেকেই যাচ্ছে যে, এতে কি করে নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণিত হবে?

ধরুন, এক ব্যক্তি বলছে: "আমি জ্যামিতিবিদ" এবং যুক্তি-স্বরূপ সে দাবি করছে—"আমি উপর্যুপরি বিশ দিন ভুখা থাকতে পারি।" এক্ষেত্রে বিশ দিন ভুখা থাকলেও এবং ঘটনাটি অতি-স্বাভাবিক হলেও এটা কি করে প্রমাণিত হবে যে, সে ব্যক্তি জ্যামিতি-বিদ। এমনিভাবে এক ব্যক্তি বলছে—"আমি পয়গাম্বর।" এর মানে হলো—এ ব্যক্তি দু'জাহানেরই সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শক। সে নিজ দাবির যথার্থতা প্রমাণে বলছে—"আমি লাঠিকে সাপে পরিণত করতে পারি।" এক্ষেত্রে তার পক্ষে এটা করা সম্ভব হলেও এবং ব্যাপারটি বিস্ময়কর হলেও এতে তার পয়গাম্বরী কি করে সত্য বলে প্রমাণিত হবে? এখানে যুক্তির সাথে দাবির কি সম্পর্ক রয়েছে?

ইমাম রাযীও অভিযোগটির অনুরূপ বর্ণনা দেন। কিন্তু ইবনে রুশ্‌দ্ বিষয়টি আরো ফলাও করে বর্ণনা করেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মুজিযা দিয়ে নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করতে হলে যুক্তির নিম্নলিখিত ভূমিকাগুলো প্রয়োগ করতে হবে:

নবী থেকে মুজিযার উৎপত্তি হয়। যে ব্যক্তি থেকে মুজিযার উৎপত্তি হবে, তিনি নবী। এই ভূমিকার প্রমাণীকরণ নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর:

১. মুজিযার উৎপত্তি সম্ভব এবং তা বাস্তব।
২. নুবুওয়াতের দাবিদার থেকেই মুজিযার উদ্ভব হয়েছে।
৩. নুবুওয়াত ও পয়গাম্বরী সত্য ব্যাপার।
৪. যে ব্যক্তি থেকে মুজিযা সংঘটিত হয়, তিনি নবী।

সর্বপ্রথম স্থির করতে হবে যে, মুজিযার স্বরূপ ও তার চিহ্ন কি? এটা স্পষ্ট কথা যে, মুজিযা পয়গাম্বরীর মৌলিক উদ্দেশ্য নয়। যাঁরা মুজিযার সমর্থক, তাঁরাও মুজিযাকে পয়গাম্বরীর চিহ্ন বলেই বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য, চিহ্ন কোন বস্তুর আসল হকিকত হতে পারে না। পয়গাম্বরের হকিকত বর্ণনা করতে গিয়ে আশায়েরা সম্প্রদায় বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্-প্রেরিত, তিনিই পয়গাম্বর।

এখন প্রমাণ করতে হবে যে, 'রিসালত' সত্য বিষয়। আল্লাহ্ তাঁর বিধি-বিধান পৌঁছানোর জন্য বিশেষ মানুষ পাঠিয়ে থাকেন। এই প্রমাণীকরণের কারণ হলো—একটি বড় সম্প্রদায় রিসালতকে সমূলেই মানে না।

এর পর প্রমাণ করতে হবে যে, যে ব্যক্তি থেকে মুজিযা সংঘটিত হয়, তিনি পয়গাম্বর। আশায়েরা এ বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, যদি কোন বাদশাহ কারো কাছে তাঁর দূত পাঠান এবং তার কাছে বাদশাহ কর্তৃক কিছুটা চিহ্নও প্রদত্ত থাকে, তবে নিশ্চিত-ভাবে বলা যাবে যে, এ ব্যক্তি বাদশাহেরই দূত। এমনিভাবে মুজিযা হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি নিশান। যাঁর কাছে এ চিহ্ন থাকে, তিনিই আল্লাহ্‌র দূত ও পয়গাম্বর।

কিন্তু সর্বপ্রথম আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে, কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ বস্তুটি নিশানস্বরূপ দেয়া হয়েছে, তা কি করে জানা যাবে? এর কয়েকটি বিকল্প পথ আছে: (১) হয়তো নিশান প্রদানকারী নিজেই কোন সময় ঘোষণা করবে: আমি কোন দূত পাঠালে তার কাছে অমুক নিশানটি থাকবে। (২) নয়তো দূতের কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। (৩) নয়তো অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিতে হবে যে, এ ব্যক্তি বরাবর অমুক চিহ্ন নিয়েই আগমন করে থাকে। প্রথম বিকল্পটি স্পষ্টতই অবান্তর। কারণ আল্লাহ্ কোন সময় সব লোককে ডেকে বলেন নি: অমুক ব্যক্তি আমার তরফ থেকে প্রেরিত। দ্বিতীয় বিকল্পটিও সম্ভব নয়। কারণ পয়গাম্বরী নিয়েই তো এখানে প্রশ্ন। পয়গাম্বরী প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে পয়গাম্বরীর দাবিদারের কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? এখন হাতে আছে তৃতীয় বিকল্পটি। সেটা ফলপ্রসূ হলেও তা হবে পরবর্তী নবীদের বেলায়। কিন্তু যিনি সর্বপ্রথম নবীরূপে আবির্ভূত হলেন, তাঁর মুজিযা লোকের কাছে কি করে বিশ্বাস্য হবে?

মুজিযাকে পয়গম্বরীর চিহ্নরূপে অভিহিত করার ফলেই এসব অভিযোগের অবতারণা হয়। এ দিকটা এখন বাদ দিচ্ছি। অন্যদিক থেকে নুবুওয়াতের প্রতি যে সব অভিযোগ আনীত হচ্ছে, তা পরক্ষণে বর্ণনা করছি।

## নুবুওয়্যাতের প্রতি স্বাভাবিক ও সাধারণ অভিযোগ ঃ

১. নুবুওয়াতের উদ্দেশ্য হলো—ধর্মীয় বিশ্বাস, ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত বিষয়াদির সংস্কারের শিক্ষা দেওয়া। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, এসব কার্যের জন্য বিবেক-বুদ্ধিই যথেষ্ট ; আল্লাহ্র তরফ থেকে এর জন্য কোন নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজন নেই। এমন অনেক লোক বিগত হয়েছেন, যাঁদের কাছে ওহীও আসতো না, দৈব জ্ঞানও তাঁদের অন্তরে আলোকপাত করতো না। এ সত্ত্বেও তাঁরা উপরোক্ত বিষয়গুলো এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন যে, নবীরাও তাঁদের চাইতে বেশী কিছু করতে পারেন নি। সুতরাং রসূল ও পয়গাম্বরের কি প্রয়োজন রয়েছে ?

২. নবীদের শরীঅত একের পর একটি প্রত্যাহার করা হয়। অর্থাৎ এক পয়গাম্বর অন্য পয়গাম্বরের শরীঅতকে প্রত্যাহৃত বলে ঘোষণা করেন। এখন প্রশ্ন হলো—যে বিধি-বিধান প্রত্যাহৃত বলে ঘোষিত হলো, তা কি শরীঅতের মৌলিক বিষয় ছিল, নাকি আনুষঙ্গিক ও অতিরিক্ত বিষয় ? প্রথম বিকল্পটি হতেই পারে না। কারণ সব ধর্মেই শরীঅতের মৌলিক বিষয় একই হয়ে থাকে। সেগুলোকে বাদ দেয়ার মানে হলো—ধর্মকেই বাদ দেয়া। এখন রইল দ্বিতীয় বিকল্পটি। এটিও হতে পারে না। কারণ যখনই কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হয়, তখন সে নিজ ধর্মের প্রতি লোকের আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে (মৌলিক হোক বা আনুষঙ্গিক) খুব বেশী চাপাচাপি করে। যারা তা সমর্থন করে না, তাদেরকে সে পথভ্রষ্ট, ধর্মহীন ও দোযখীরূপে অভিহিত করতেও ইতস্ততঃ করে না যার ফলে লড়াই পর্যন্ত বেধে যায় এবং ভীষণ রক্তপাতও সংঘটিত হয়। তাই কি করে ভাবা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রেরিত, সে আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্যেও এ ধরনের বিবাদ ও নিষ্ঠুরতাকে বৈধ বলে মনে করতে পারে ?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নামাযের আসল উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করা ও নতি স্বীকার করা। খ্রীস্টান, ইহুদী, পার্সী—যে কোন ধর্মের নামাযেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। সুতরাং বিশেষ কোন ধর্মের নামাযকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করা এবং বাকি সব ধরনের নামাযকে অশুদ্ধ বলে ঘোষণা করা, তদুপরি এ ব্যবধান সৃষ্টির ফলে উদ্ভূত হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতকে বৈধ বলে

পরিগণিত করার কি মানে থাকতে পারে? ধর্মের অন্যান্য কার্যেরও একই দশা। সেগুলো যদি ধর্মের মৌলিক বিষয় হয়, তবে তা সব ধর্মেই সমভাবে থাকবে। আর যা সব ধর্মে সমভাবে নেই, তা কোন ধর্মেরই মৌলিক উদ্দেশ্য হতে পারে না।

৩. ধর্মের আসল উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা, সৎ কাজ সম্পন্ন করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি ধর্মের এ সব বিধানকে কাজে পরিণত করবে, সে-ই নিস্তার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু নবীরা তাদের নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমানের অংগ বলে ঘোষণা করে এবং সেটাকে মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে বলেঃ যে ব্যক্তি পয়গাম্বরকে সমর্থন করে না, সে তওহীদে বিশ্বাস করলেও এবং সৎকাজ সম্পন্ন করা হলেও নিস্তার লাভ করবে না। নবীদের এ নীতি সম্পূর্ণ বিবেক-বিরোধী।

৪. দুনিয়াতে যত ধর্ম আছে, সবটাতেই আপত্তিকর বিষয় দেখা যায়। ইহুদীরা আল্লাহ্‌কে সশরীরীরূপে অভিহিত করে এবং সেসব গুণে তাঁকে গুণান্বিত করে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। খ্রীস্টানেরা আল্লাহ্‌র পিতৃত্ব ও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। তারা একের মধ্যে তিন, আবার তিনের মধ্যে এক আল্লাহ্ প্রমাণ করে। পার্সীদের ধর্মে দুই আল্লাহ্‌র ধারণা রয়েছে। কুরআন মজীদে 'জব্‌র্' ও 'কদ্‌র্' সম্পর্কে অনেক পরস্পর বিরোধী আয়াত রয়েছে।

ইমাম রাযী তাঁর 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে নুবুওয়াতের প্রতি উপস্থাপিত অভিযোগসমূহকে নিম্নলিখিত শব্দে বর্ণনা করেনঃ

"কুরআন 'জব্‌র্' ও 'কদ্‌র্' সংক্রান্ত আয়াতে ভরা। এ সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা হবে ধূলি ও পাথর-কণার চাইতেও বেশী। এগুলো নিঃসন্দেহে পরস্পর-বিরোধী। এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার মানে—ভীষণ পথভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এতে প্রতীয়মান হয় যে এ ধর্মের প্রবক্তা (রসূল করীম) জব্‌র ও কদ্‌রের মধ্যে কোন একটি দিককে নিশ্চিতভাবে অবলম্বন করতে পারছে না।"

অভিযোগকারীদের শেষ বাক্যটি খুবই আপত্তিজনক। এজন্য এর অনুবাদ করার সাহস আমার হয়নি। এ কথাগুলো উদ্ধৃত করার পেছনে আমার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এখানে আমি এটা রাষ্ট্র করে দিতে চাই যে, আমাদের পূর্বসূরিগণ একান্ত নিরপেক্ষ-

ভাবে প্রত্যেক প্রকার ইসলাম-বিরোধী অভিযোগ শুনতেন এবং সেগুলো আপন রচনায়ও উদ্ধৃত করতেন। অতঃপর সেগুলোর উত্তর দিতেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আলেম সমাজ এ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, দুশমনকে আসতে দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলুন।

## নুবুওয়াত ও অতিস্বাভাবিক ঘটনাবলীর স্বরূপ

উপরিউক্ত অভিযোগগুলোর উত্তর ইমাম রাযী তাঁর 'মাতলিবে আলিয়া' গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন কাযী আযুদ তাঁর 'মওয়াকিফ' নামক গ্রন্থে। কিন্তু এ উত্তরগুলো এমনি প্রকৃতির, যা অভিযোগসমূহকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। আমি এ গ্রন্থের যে অংশে ইলমে কালামের ইতিহাস বর্ণনা করেছি, সেখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

এখন নুবুওয়াত সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে পেশ করছি। এতে অভিযোগকারীদের অভিযোগেরও নিরসন হবে এবং বিষয়গুলোর স্বরূপও উদ্ভাসিত হবে।

নুবুওয়াত সংক্রান্ত বিষয়গুলো বস্তুত নিম্নলিখিত সূত্রগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

১. অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া কি সম্ভব এবং তা কি বাস্তবে পরিণত হতে পারে ?

২. অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া কি নুবুওয়াতের মূলীভূত বিষয় ?

৩. এতে কি নুবুওয়াত প্রমাণিত হবে ?

৪. নুবুওয়াতের আসল স্বরূপ কি ?

## অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া কি সম্ভব ?

আসল কথা হলো—মানুষ যতই বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে অনবহিত থাকবে, ততই 'কার্য-কারণ' এর উপর তার নজর কম পড়বে এবং সে সরাসরি আল্লাহ্‌কেই প্রত্যেক বস্তুর কারণরূপে অভিহিত করবে।

## অতিস্বাভাবিকত্বের ধারণা মানুষের মনে কিভাবে উদিত হয়?

একজন কৃষকের ছেলে বর্ষাকালে যখন মেঘ দেখে, তখন সে বলে, "আল্লাহ্‌তাআলা আবির্ভূত হয়েছেন।" অর্থাৎ মেঘের আগমন মানে—আল্লাহ্‌রই আগমন। এ অবস্থা উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে বলে, "আল্লাহ্‌র আদেশে বৃষ্টি হয়েছে।" এতে দেখা যায় যে, সে আল্লাহ্‌ ও বৃষ্টির মাঝখানে মেঘকে মাধ্যমরূপে টেনে এনেছে। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, মেঘ সরাসরি আল্লাহ্‌র আদেশেই সৃষ্টি হয়, নাকি অন্য কোন কারণের মাধ্যমে তিনি তা সৃষ্টি করেছেন? একজন গোঁড়া ধর্মাবলম্বী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, মেঘ ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন কার্য-কারণ নেই। আল্লাহ্‌র আদেশেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেঘ সৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির আকারে তা বর্ষিত হয়। আবার অপর একজন গোঁড়া ধর্মাবলম্বী হয়তো বলবেন, "আকাশে খুব বড় একটি দরিয়া আছে। সেখান থেকেই পানি পড়ে এবং তা মেঘের আকার ধারণ করে।" পূর্ববর্তী তফসীরকারগণ অনুরূপ মতই পোষণ করতেন।

ইমাম রাযী "তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন" (আল-কুরআন)—এ আয়াতের তফসীরে পূর্ববর্তী তফসীরকারদের সমস্ত মতামত উদ্ধৃত করেন। কিন্তু পরবর্তী চিন্তাবিদগণ আরো এগিয়ে গেছেন। তাঁরা বলেন, মাটি ও সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠে এবং তা শূন্যে পৌঁছে ঠাণ্ডার স্পর্শে জলকণায় পরিণত হয়। মোটকথা, যতই সত্য-অনুসন্ধানের কাজ অগ্রসর হচ্ছে, ততই কারণ-শৃঙ্খল প্রশস্ত হচ্ছে। এই কারণ-শৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতাকেই বলা হয় প্রকৃতি (ফিত্‌রাত্‌), আল্লাহ্‌র রীতিনীতি (সুন্নাতুল্লাহ) বা আল্লাহ্‌র স্বভাব (খাল্‌কুল্লা)।

কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে উপরিউক্ত কথাটাই বিধৃত হয়েছে:

"আল্লাহ্‌র স্বভাবে কোন পরিবর্তন নেই।"

"আল্লাহ্‌র রীতিনীতিতে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।"

## কেবলমাত্র আশায়েরা সম্প্রদায়ই 'কার্য-কারণে' বিশ্বাসী নন

ইসলামী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র আশায়েরা সম্প্রদায়ই 'কার্য-কারণে' অবিশ্বাসী। তাঁদের মতে, কোন বস্তুই অপর কোন বস্তুর জন্য কারণ হতে পারে না। কোন বস্তুরই বিশেষত্ব বা প্রভাব নেই। ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'আর-রদ্দু আলাল মানতিক' নামক গ্রন্থে আশায়েরা সম্প্রদায়ের দলগত ও ভিন্ন মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে এ বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

আশায়েরা ছাড়া বাকি সব সম্প্রদায়, বরং সারা দুনিয়ার মানুষ কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের সমর্থক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আশায়েরা ছাড়া অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের উচিত ছিল—অতিস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে একবাক্যে অস্বীকার করা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদই দেখছি। ইমাম রাযী 'তফসীর-এ-কবীর' গ্রন্থে সূরা-এ- আ'রাফ' এর ব্যাখ্যায় হযরত মূসা (আঃ)-এর যষ্ঠি সংক্রান্ত মুজিযার বর্ণনায় বলেন, "আমাদের জেনে রাখা উচিত, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীতে পরিবর্তন সূচিত হয়, এ কথা সমর্থন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত।"

এরপর ইমাম সাহেব এ বিষয়ে তিনটি স্বতন্ত্র অভিমত উদ্ধৃত করেন ঃ

১. আশায়েরার মতে, যে কোন রকমের অতিস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এমনকি অবিভাজ্য পরমাণুর হঠাৎ বিদ্বান ও বুদ্ধিমানে পরিণত হওয়াও সম্ভব। স্পেনে উপবিষ্ট অন্ধের পক্ষেও চীনের কোন গ্রাম দেখতে পাওয়া সম্ভব।

২. পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৩. মু'তাযিলার মতে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা সম্ভব; কিন্তু সর্বত্র সম্ভব নয়।

## প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের মধ্যে যে মতানৈক্য রয়েছে, তা শব্দগত, মৌলিক নয়।

প্রকৃত কথা হলো—এ বিষয়ে যত মতভেদ আছে, তা শব্দগত, মৌলিক নয়। 'কারণ' ছাড়া কোন ঘটনা ঘটতে পারে—একথা আশায়েরা ছাড়া আর কেউ সমর্থন করেন না। আর যাঁরা এটা

সমর্থন করেন না, তাঁরা অতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়াকেও সমর্থন করতে পারেন না। এ মতভেদ সৃষ্টির কারণ হলো—যখন কোন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটে, তখন সাধারণ লোকেরা সেটাকে অস্বাভাবিক বলেই অভিহিত করে এবং বলে থাকে ঃ অস্বাভাবিক ঘটনাও ঘটতে পারে। তা না হয় অমুক অমুক ঘটনা কি করে ঘটলো? মূলত সে সব ঘটনা কোন কোন কারণ বশতই ঘটেছে, যদিও সেই কারণগুলো সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়।

ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার সম্ভাবনা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, নভোমণ্ডলের অসাধারণ গতির ফলে অতি-প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তিনি এটা অনুধাবন করতে পারলেন না যে, এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা এসবের পেছনে কারণস্বরূপ নভোস্থলের গতিই বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর এ যুক্তি প্রদর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যে কোন অতিস্বাভাবিক কাজকেই অতিপ্রাকৃতিক বলে গণ্য করেন, যদিও তার পেছনে কোন অসাধারণ কারণ বিদ্যমান থাকে।

## প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনাবলী সম্পর্কে আশায়েরার মধ্যে মতদ্বৈধতা

আশায়েরা সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ বিষয়টি নিয়ে মতদ্বৈধতা রয়েছে। সাধারণ আশায়েরা যে কোন প্রকৃতি বিরুদ্ধ ঘটনার সমর্থক ছিলেন। তাঁদের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির হাতেই এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। তাঁরা আরো বলেন, যে ধরনের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনা নবীদের হাতে সংঘটিত হয়, তা কেবল ওলীই নয়, কাফের, ধর্মহীন এবং যাদুকরের হাতেও সংঘটিত হতে পারে। পার্থক্য হলো নামকরণের মধ্যে। কাফের, ধর্মহীন ইত্যাদি থেকে যে অলৌকিকত্ব উদ্ভূত হয়, সেটাকে যাদু ও 'ইস্‌তিদ্‌রাজ' (ক্রমোন্নতি) বলা হয়। আর নবীদের হাতে যা সংঘটিত হয়, তাকে বলা হয় 'ইজায' (অক্ষমকরণ)। কিন্তু ক্রমাগত গবেষণার ফলে আশায়েরাদের এই উদার মতবাদে ভাটা পড়ে। আল্লামা আবু ইসহাক ইস্‌ফারাইনী একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন আশায়েরাপন্থী। তিনি বলেন ঃ কারামত অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর সীমারেখায় পেঁৗছতে পারে না।

আবুল কাসেম কুশায়রী আশায়েরাপন্থী একজন বড় সূফী ছিলেন। তিনি বলেনঃ এমন অনেক বস্তু আছে, যাদের রূপায়ণ অবশ্য আল্লাহ্র শক্তির কাছে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে, কোন ওলী থেকেও সেগুলো সংঘটিত হয় না।

## বু-আলী সিনার অভিমত

বু-আলী সিনা 'ইশারাত্' নামক গ্রন্থের শেষলগ্নে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত করেন এবং তাতে প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "আপনাদের কাছে কেউ যদি বলে, কোন এক দরবেশ অনেক দিন পর্যন্ত আহার করেন নি; অথবা এমন কাজ করেছেন, যা তাঁর সাধারণ শক্তি-বহির্ভূত; অথবা কোন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন; অথবা তাঁর শাপে কোন লোক মাটিতে গেড়ে গেছে; অথবা ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে; অথবা হিংস্র প্রাণী বশীভূত হয়েছে—তবে আপনারা তা অস্বীকার করবেন না। কেননা, হয়তো এগুলোর পেছনে এমন প্রকৃতিগত কারণ রয়েছে, যার ফলে এসব অস্তিত্ব লাভ করেছে। বু-আলী সিনা এ সব প্রকৃতিজাত কারণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আহার না করা সম্পর্কে তিনি বলেন, পাকস্থলি যখন অপাচ্য বস্তুর হজমে ব্যস্ত থাকে, তখন তা ভাল খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। ফলে কয়েকদিনেও মানুষের ক্ষুধা লাগে না। কারণ তখন তার শারীরিক ক্ষয় পূরণের প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে আল্লাহ্র আশেক বান্দাগণ যখন আল্লাহ্র স্মরণে বিভোর থাকেন এবং তাঁদের মন-মেজাজ খাদ্য হজমের দিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না, তখন এক খাদ্য দিয়েই তাঁদের অনেক দিন চলে। কেননা ক্ষয় পূরণের জন্য তাঁদের অন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, ভয়ের সময় মোটেও ক্ষুধা লাগে না।

বু-আলী সিনা যদিও এ সব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনার কারণ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি এসব কার্যাবলীকে অলৌকিক বলেই অভিহিত করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, যে বস্তু প্রকৃতির সাধারণ নিয়মবিরোধী, সেটাকেই অস্বাভাবিক বলে আখ্যায়িত করা হয়, যদিও তা প্রকৃতপক্ষে সার্বিকভাবে প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ নয়। শাহ

ওলীউল্লাহ মরহূম এ ব্যাপারে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি 'তাফ্হীমাত-এ-ইলাহিয়া' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"মুজিযা ও কারামত—এসবই কারণউদ্ভূত। কিন্তু এ কার্যগুলো পূর্ণতাপ্রাপ্ত বলেই অন্যান্য কার্য-কারণ উদ্ভূত কাজ থেকে স্বতন্ত্র।"

মোটকথা, আশায়েরা ব্যতীত অন্যসব ইসলামী সম্প্রদায় এ মর্মে একমত যে, প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ কোন বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই আশায়েরা ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায় যদি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোন ঘটনাকে সমর্থন করে, তবে তার মানে হবে—ব্যাপারটি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মবিরোধী; বস্তুত তা সর্বোতভাবে স্বভাববিরুদ্ধ নয়।

কোন্ বস্তু প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, আর কোন্টি নয়—এ নিয়েই মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। কোন বস্তুকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হলে তা কোন্ কোন্ নীতির উপর ভর করে করতে হবে—এ বিষয়ে ভীষণ মতানৈক্য দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিম্নলিখিত নীতিমালার উপর ভর করেই কোন বস্তুকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা যায় ঃ

১. ঘটনাবলী প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের যত কাছাকাছি হবে, ততই তা বিশ্বাসযোগ্য। আর যতই তা সাধারণ নিয়মবিরোধী হবে, ততই তাতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তত্ত্বতল্লাসের প্রয়োজন হবে। মনে করুন, এক ব্যক্তি খুবই সত্যবাদী। তিনি যদি বলেন, অমুক শহরে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তবে তা সত্য বলে গৃহীত হবে। কিন্তু তিনি যদি বারিপাতের স্থলে রক্তপাতের কথা বলেন, তবে তা সত্য বলে বিবেচিত হবে না। তা প্রমাণ করার জন্য জোরালো সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে। মোটকথা, ঘটনার প্রকৃতিভেদে বর্ণনাকারীর বর্ণনার মূল্যও হ্রাস-বৃদ্ধি পায়।

২. কোন ঘটনা সম্ভাব্য হলেই তা বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট নয়।

৩. যে সব ঘটনা সাধারণত ঘটে থাকে, না ঘটার সম্ভাবনা থাকলেও সেগুলোকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

৪. যে সব ঘটনার সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, সেসব বিষয়েও আমরা কিছু না কিছু অভিমত পোষণ করে থাকি। সেগুলোর সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার মধ্যে যে দিকটি বেশী বিশ্বাস্য, সে দিকেই আমরা ঝুঁকে পড়ি।

সাধারণ লোকেরা এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। এটাই মতভেদের কারণ। যেমন, এক ব্যক্তি বললেন, "ইবনুল খাল্লিকান লিখেছেন ঃ অমুক সূফী আগুনে প্রবেশ করেছে; কিন্তু আগুন তাঁকে স্পর্শ করে নি।" এ কথাটা শোনামাত্রই সাধারণ লোক তা বিশ্বাস করে নেবে। কিন্তু একজন বিবেচক ও সূক্ষ্ম বিচারক চিন্তা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, ঘটনাটি সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যেও হতে পারে। কেননা হয়তো ইবনুল খাল্লিকান ভুল করেছেন, নয়তো এ ঘটনার প্রথম বর্ণনাকারী ভ্রমের শিকারে পরিণত হয়েছে, নয়তো মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়াতে পারে নি, নয়তো কেউ ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা বলেছে। ঘটনাটি এমনিতেই অনিশ্চিত। তবুও তা সংঘটিত হওয়ার পক্ষে যদি জোরালো প্রমাণ থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে যে, এ ঘটনায় হয়তো এমন কোন কারণের উদ্ভব হয়েছিল, যার ফলে সূফীর শরীরে আগুন কোন ক্রিয়া করতে পারে নি।

আশায়েরা সম্প্রদায়ের অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়াটি খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়। বিষয়টি হলো—তাঁরা যখন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোন ঘটনা প্রমাণ করতে চান, তখন শুধু এতটুকু প্রমাণ করেন যে, ঘটনাটি সম্ভাব্য। আর এ সম্ভাবনার পরিসরকে তারা যেভাবে অনাহূত সম্প্রসারিত করেন, তাতে এমন সব বস্তুর অস্তিত্বও এ সম্ভাবনার আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে, যা পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত কোন দিন বাস্তবক্ষেত্রে ঘটেনি। অন্যদিকে তাঁরা এটাও ভাবেন না যে, ঘটনাটির অস্তিত্বের জন্য যে ধরনের সম্ভাবনা প্রমাণ করতে চাইছেন, তার চাইতে বর্ণনাকারীর দিক থেকে ভুল করার সম্ভাবনাটাই বেশী। তাই যে দিকটির সম্ভাবনা বেশী, সাধারণ লোক সে দিকটা গ্রহণ করবে না কেন?

মোটকথা, সাধারণভাবে কেউ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনা অস্বীকার করে না। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে তা কখন ও কতটুকু ঘটতে পারে, সেটাই প্রশ্ন। প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনা যে পরিমাণে প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী, সে তুলনায় তার সংঘটিত হওয়ার পক্ষে যদি অধিকতর জোরালো সাক্ষ্য থাকে, তবে তাকে অস্বীকার করার কি কারণ থাকতে পারে?

পৃথিবীতে সব যুগে এ ধারণা ছিল, আর বলতে গেলে এখনো সব লোক এ মনোভাব পোষণ করে যে, নবী ও ওলিগণ নিশ্চয়ই কোন না

কোন অতিপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। এ ধারণাটিকে বাড়িয়ে চড়িয়ে এতটুকু বলা হয় যে, নবীদের মধ্যেও ঐশ মহিমা রয়েছে। হিন্দুরা রাম ও কৃষ্ণকে এবং খ্রীস্টানেরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র বাস্তবরূপ বলে বর্ণনা করে। কালপ্রবাহে ও বুদ্ধির প্রসারের ফলে তাদের এ মনোভাব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে এবং অতি-স্বাভাবিক ঘটনার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এজন্যেই রসূল করীম (সঃ) যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত হলেন এবং নুবুওয়াত প্রচার আরম্ভ করলেন, তখন যে সব লোক এ যাবৎ নুবুওয়াতের জন্য অতিস্বাভাবিক কার্যাবলীকে পূর্বশর্ত বলে মনে করতো, তারা বিস্মিত হয়ে বলে উঠলো :

"তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন মুজিযা অবতীর্ণ হলো না কেন?" (ইউনুস)

"নাস্তিকেরা বলে থাকে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তাঁর কাছে কোন মুজিযা অবতীর্ণ হলো না কেন?" (রাআদ্)

"তিনি তাঁর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আমাদের কাছে কোন মুজিযা আনছেন না কেন?" (আল্-আম্বিয়া)

কেউ কেউ বলতো, মুজিযা না হোক, অন্য কিছু স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই থাকতে হবে।

"তারা বলতো, তুমি যদি আমাদের জন্য জমিন থেকে ঝরনা প্রবাহিত করতে না পার, অথবা তোমার কাছে খেজুর ও আঙ্গুরের এমন বাগান না থাকে, যাতে নহর প্রবাহিত করেছ, তবে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না।" (বনি-ইসরাঈল)

ইসলামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় নীতি সংক্রান্ত এমন ত্রুটিবিচ্যুতি নিরসন করা, যা ভুলবশত এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এর আরো উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মকে উন্নতি ও সংস্কারের এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করা, যেন কেয়ামত পর্যন্ত এর উন্নতি ও সংস্কারের আর প্রয়োজন না হয়। ইসলামের আরো লক্ষ্য ছিল তওহীদের পূর্ণতা সাধনের সংগেসংগে নুবুওয়াতের স্বরূপকেও লোকের কাছে তুলে ধরা। এজন্য ইসলাম সর্বপ্রথম সুন্দরভাবে স্বাধীন সুরে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণ করেছে যে, যে সব বস্তু অতি-মানবিক, তা পয়গাম্বরের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না। আল্লাহ্ বলেন :

"হে পয়গাম্বর! তাদেরকে বলুনঃ আমি দাবি করছি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্প্রদত্ত সম্পদ রয়েছে বা আমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানি বা আমি ফেরেশতা। আমার কাছে যে ওহী আসে, আমি কেবল তাই অনুসরণ করি।" (আন্আম্)

"হে পয়গাম্বর! আপনি লোকদের বলে দিনঃ আমার ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানও আমার হাতে নেই। আল্লাহ্ যা চান, তাই বাস্তবে পরিণত হয়। আমি যদি অদৃশ্য বিষয় জানতাম, তবে আমি আমার ব্যক্তিগত অনেক উপকার সাধন করতে পারতাম। আর আমার ক্ষতিও কেউ সাধন করতে পারতো না। আমার কর্তব্য হলো, মুমিনদের সুসংবাদ দেয়া এবং ভয় প্রদর্শন করা।" (আ'রাফ)

নুবুওয়াত ও মুজিযার বিষয়টি অবশ্য খুবই সূক্ষ্ম এবং জনসাধারণের বিশ্বাসবিরুদ্ধ। কিন্তু শরীয়ত-নিয়ন্তা (রসূল করীম) বিষয়টি এত সুন্দরভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ইসলামের আদি যুগে এ সম্পর্কে কারো মনে ভুল ধারণার উদ্রেক হয় নি। তিনি নুবুওয়াত সম্পর্কে বিশ্বজোড়াও পুরনো যে ভুল ধারণাটির অবসান ঘটান, তা হলো—নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণের জন্য মুজিযা অপরিহার্য।

অবিশ্বাসিগণ নবীজীকে মুজিযা প্রদর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করতো। কারণ তারা মনে করতো যে, নুবুওয়াত মুজিযার উপর নির্ভরশীল। শরীঅত-নিয়ন্তা তাদের এ চিন্তাধারা খণ্ডন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, নুবুওয়াত মুজিযার উপর নির্ভরশীল নয়ঃ

"নাস্তিকেরা বলে যে, তাঁর (রসূল করীমের) কাছে আল্লাহ্-প্রদত্ত কোন নিদর্শন (মুজিযা) অবতীর্ণ হয় না কেন? হে মুহম্মদ! আপনি কেবল একজন ভয়-প্রদর্শক। প্রত্যেক কওমের জন্যই একজন পথ-প্রদর্শক হয়ে থাকেন।" (রাআদ্)

"নাস্তিকেরা বলে, তাঁর কাছে আল্লাহ্প্রদত্ত মুজিযা এলো না কেন? হে মুহম্মদ! আপনি বলুন, মুজিযা তো আল্লাহ্র কাছেই থাকে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শক।" (আন্কাবূত্)

'সূরা-এ-বানী ইসরাঈল' এর মধ্যে আল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, অবিশ্বাসিগণ বলেঃ

"হে মুহম্মদ! আপনি যদি জমিন থেকে কোন ঝরনা প্রবাহিত করাতে পারেন, অথবা খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান প্রস্তুত করতে

পারেন, অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন, অথবা স্বর্ণের ঘর তৈয়ার করতে পারেন, অথবা আকাশে উত্তীর্ণ হতে পারেন, তবেই আপনার প্রতি আমরা বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করতে পারি।"

এসব প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ বলেন :

"হে মুহম্মদ! আপনি বলুন : আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে বলছি যে, আমি তো একজন মানুষ ও পয়গাম্বর বই কিছুই নই।"

এখানে এটা লক্ষণীয় যে, কাফেরগণ নবীজীর কাছে যে সব বস্তু চেয়েছিল, সেগুলো অসম্ভব ও অবান্তর ছিল না। তথাপি আল্লাহ্ সেগুলোর বাস্তবায়ন থেকে বিরত ছিলেন। তাতে এ বিষয়টি দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল যে, যদিও বিষয়গুলো আল্লাহ্র এখ্তিয়ার-ভুক্ত, তথাপি নুবুওয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য সেগুলো রূপায়িত করে দেখানোর মানে হলো—লোকদেরকে সেই পুরনো ভুল ধারণায় প্রলুব্ধ করা। 'আল্লাহ্তাআলা সেগুলো রূপায়িত করে দেখান নি'—তার মানে এই নয় যে, তিনি সেসব করতে অক্ষম ছিলেন। এক আয়াতে তিনি বলেন :

"কাফেরগণ বলে, মুহম্মদের কাছে আল্লাহ্প্রদত্ত কোন মুজিযা আসেনি কেন? আপনি বলুন, আল্লাহ্ মুজিযা অবতীর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু এ লোকগুলো অজ্ঞ।" (আন্আম্)

ইমাম রাযী 'সূরা-এ-আন্কাবুত্' এর আয়াত—"তারা বলে, তাঁর কাছে আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন মুজিযা এলো না কেন?"—এর ব্যাখ্যায় বলেন,

পয়গাম্বরীর জন্য মুজিযা পূর্বশর্ত নয়।

তিনি একটু অগ্রসর হয়ে বলেন,

হযরত শীশ, ইদ্রীস ও শুআইব প্রমুখ নবীদের কাছে কোন মুজিযা অবতীর্ণ হয়েছে বলে জানা যায় নি।

শাহ ওলী উল্লাহ সাহেব 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ্' নামক গ্রন্থে বলেন :

নুবুওয়াতের স্বরূপের সংগে মুজিযা, দোআ কবুল হওয়া এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু অধিকাংশ সময় এগুলো নুবুওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা যায়।

ইমাম গাযালী 'মুন্‌কিয্ মিনাদ্ দালাল' গ্রন্থে নুবুওয়াত সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত করেন। এতে তিনি নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন, নবী করীমের পথ প্রদর্শন ও উপদেশ প্রদানের ফলেই নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হয়।

এরপর তিনি বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের মনোভাব লক্ষ্য করে বলেন ঃ

আপনি এভাবেই নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন ; লাঠি সর্পে পরিণত হয়েছে বা চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে—এসবের উপর ভিত্তি করে নয়।

'নুবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি হলো নবীর মুজিযা প্রদর্শন'—এটা শুধু প্রকাশ্যবাদী আশায়েরাপন্থীদেরই অভিমত। কিন্তু তাঁরা এ দাবি করছেন না যে, নুবুওয়াত প্রমাণের জন্য বুদ্ধিজাত যুক্তি হলো মুজিযা। বরং তাঁদের বক্তব্য হলো—মুজিযা সংঘটিত হওয়ার সময় লোকেরা সাধারণত নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেয় ; এটা মানুষের স্বভাব, বুদ্ধিপ্রসূত ব্যাপার নয়।

'শর্‌হে মওয়াকিফ্' রচয়িতা বলেন,

এই উপলব্ধি কেবল বুদ্ধিজাত নয়, বরং স্বভাবজাত। 'মওয়াকিফ্' রচয়িতা তাঁর নিজ ভাষায় বলেন, "আমাদের (আশায়েরাপন্থীদের) কাছে এই উপলব্ধির ভিত্তি হলো—মুজিযা সংঘটিত হওয়া মাত্রই আল্লাহ্ লোকের মনে মুজিযা-অধিকারীর সত্যতা অংকিত করে দেন —এটাই আল্লাহ্‌র চিরাচরিত নিয়ম।"

এ দাবিও সার্বিকভাবে স্বীকার করা যায় না। কেননা এতে নবীর হেদায়ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এটা প্রকাশ্যে দেখা গেছে যে, মুজিযা সংঘটিত হওয়ার সময়ও হাজার হাজার লোক ঈমান গ্রহণ করেনি। বরং মুমিনের সংখ্যার চাইতে অমুমিনের সংখ্যাই ছিল সব সময় বেশী। এজন্যই এ বিষয়ের ইমাম ও বিশেষজ্ঞগণ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মুজিযা যথেষ্ট নয়।

ইমাম গাযালী 'মুন্‌কিয্‌ মিনাদ্‌ দালাল্‌' গ্রন্থে নুবুওয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ

আপনি এভাবেই নুবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু লাঠি সর্পে পরিণত হয়েছে বা চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে—এ সবের উপর নির্ভর করে নয়।

রাগিব ইস্ফাহানী বলেন ঃ

দুই ধরনের লোক মুজিযা অনুসন্ধান করে ঃ (১) যারা আল্লাহ্‌র বাণী ও মানুষের বাণীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। (২) আর যারা তদুপরি গোঁড়ামিও করে।

# নুবুওয়াতের স্বরূপ

আশায়েরার মতানুসারে নুবুওয়াতের স্বরূপ, এর নীতি ও শর্ত কি — এ সব পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম গাযালী এবং রাযীও তাঁদের সাধারণ রচনাবলীতে আশায়েরা সম্প্রদায়ের মতানুসারেই এ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ রচনায় তাঁরা নিজেদের গবেষণালব্ধ প্রকৃত মতামতও ব্যক্ত করেন। তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, আশায়েরা-পদ্ধতি অপর্যাপ্ত ও জটিল। ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে বলেন ঃ

নুবুওয়াত সমর্থকদের মধ্যে দু'টি শ্রেণী দেখা যায়। এক শ্রেণী বলেন, মু'জিযার আবির্ভাব নুবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ। এটা ধর্ম সম্বন্ধীয় পুরনো ধ্যান-ধারণা। দুনিয়ার সাধারণ ধর্মাবলম্বীরা এ মতই পোষণ করে থাকে।

## নুবুওয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বলেন, প্রথমে এটা স্থির করতে হবে যে, যথার্থ ধর্মীয় বিশ্বাস ও সৎ কাজ বলতে কি বোঝায়? এ বিষয়টি স্বীকৃত হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি লোকদের সত্য ধর্মের দিকে আহবান করছেন এবং তাঁর বাণীতেও বিরাট প্রভাব রয়েছে, তখন আমরা বুঝে নেবো যে, তিনি সত্যি পয়গাম্বর এবং তাঁর অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। এ মতবাদই বুদ্ধিবাদের বেশী নিকটবর্তী। এ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক খুব কমই হতে পারে।

## ইমাম রাযী দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদকেই বেশী পছন্দ করতেন

এরপর ইমাম রাযী দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদকে খুব বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ও

সংযোজিত করেন। তাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, কুরআন মজীদেও দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ

কুরআন মজীদে বোঝা যায় যে, নুবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদই পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃস্ট। তিনি আরো বলেন, মুজিযা দিয়ে নুবুওয়াত প্রমাণ করার চাইতে দ্বিতীয় পন্থায় প্রমাণিত করাই জোরালো যুক্তির পরিচায়ক।

"হে মানবগণ! তোমাদের কাছে আল্লাহ্-প্রদত্ত উপদেশ ও তোমাদের অন্তরের পরিশোধন ব্যবস্থা এসে গেছে।" (ইউনুস)—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী খুব সংক্ষেপে দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিমত বর্ণনা করেন এবং বলেন, নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠার জন্য এ নীতিই পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ।

কেবল ইমাম রাযীই নন, ইমাম গাযালী, ইবনে হায্‌ম্‌, ইবনে রুশ্‌দ্‌ আর শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌ও নুবুওয়াতের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করেন। আমি তাঁদের ভাষ্য উদ্ধৃত করছি, তা হলে যেন নুবুওয়াতের পুরো রূপরেখা পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং এ বিষয়টিও পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, ইলমে কালামের প্রচলিত গ্রন্থসমূহে যে সব মতামত ও মতবাদ রয়েছে, তা হলো কেবল প্রকাশ্যবাদী আশায়েরা সম্প্রদায় উদ্ভাবিত। ইমাম রাযীর 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থের সেই অংশটি হুবহু এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এখানে শুধু সার কথাটাই লিখছি। তিনি নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনার পূর্বে কয়েকটি ভূমিকা পেশ করেন। সেগুলো হলো এই ঃ

## ইমাম রাযীর মতে নুবুওয়াতের স্বরূপ

১. মানুষের মৌলিক পরিপক্কতা হলো—পদার্থের স্বরূপ ও তার মঙ্গলামঙ্গল উপলব্ধি করা। আরো পরিষ্কার ভাষায়, মানুষকে দু'প্রকারের শক্তি প্রদান করা হয়েছে ঃ চিন্তামূলক ও কার্যমূলক। চিন্তামূলক শক্তির কার্য হলো—বস্তুসমূহের হকিকত উপলব্ধি করা। এর পূর্ণতা সাধন হলো—বস্তুর হকিকত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা অর্থাৎ বস্তুর আসল রূপ হৃদয়ঙ্গম করা। কার্যমূলক শক্তির মানে হলো—কোন্ কাজ করণীয়, আর কোন্‌টা বর্জনীয়, তা নিরূপণ করা। এর পূর্ণতা সাধন হলো—মানুষের মধ্যে এমন শক্তি সৃষ্টি হওয়া, যার ফলে তার নিকট থেকে কেবল ভাল কাজই সম্পন্ন হবে।

২. এ দুই শক্তির নিরিখে মানব শ্রেণীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

(ক) যারা এসব গুণাবলীতে অপরিপক্ক।

(খ) যারা স্বয়ং পরিপক্ক। কিন্তু অপরিপক্কদের পূর্ণতা সাধনে অক্ষম।

গ) যারা স্বয়ং পরিপক্ক এবং অপরিপক্কদেরকেও পরিপক্ক করে তুলতে সক্ষম।

৩. পূর্ণতা ও অপূর্ণতার মাঝখানে অনেক স্তর রয়েছে। অপূর্ণতার এমনও স্তর রয়েছে, যেখানে পেঁছিলে মানুষ ও জীব-জন্তুর মধ্যে কেবল আকারের দিক থেকেই পার্থক্য থেকে যায়। এমনিভাবে পূর্ণতারও এমন একটি স্তর রয়েছে, যেখানে উত্তীর্ণ হলে মানুষ ফেরেশতায় পরিণত হয়। এই দুইটি স্তরের মাঝখানে হাজার হাজার স্তর রয়েছে। যদি হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থা নিয়েও তুলনা করা যায়, তবু দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি মানুষ গুণগত-ভাবে অন্য মানুষ থেকে স্বতন্ত্র।

উপরিউক্ত শক্তি দুইটির পূর্ণতা ও অপূর্ণতা—উভয়েরই চরম স্তর রয়েছে। তাই প্রত্যেক যুগেই এমন লোক পাওয়া যায়, যিনি পূর্ণতার চরম শিখরে উত্তীর্ণ। যে ব্যক্তি চিন্তামূলক ও কার্যমূলক উভয় দিক থেকে শীর্ষ পর্যায়ে পেঁছিতে সক্ষম এবং অপরকেও পূর্ণতার স্তরে পেঁছাতে সক্ষম, তিনিই নবী ও পয়গাম্বর।

ইমাম রাযীর মতে, চিন্তামূলক ও কার্যমূলক—উভয় শক্তির দিক থেকে পূর্ণতা অর্জনের নামই নুবুওয়াত। এতে মুজিযা, অলৌকিকত্ব ইত্যাদির আমল-দখল অর্থাৎ শর্ত নেই। এ বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ্ কাফেরদের দাবি উদ্ধৃত করে যা বলেছেন, তাতেও আমাদের উপরিউক্ত দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কাফেরদের বক্তব্য ছিল এই ঃ "হে মুহম্মদ! আপনি যদি মাটি থেকে আমাদের জন্য ঝরনা প্রবাহিত করতে না পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করবো না।"—এর উত্তরে আল্লাহ্ বললেন, 'হে মুহম্মদ! আপনি বলে দিন, আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি তো একজন মানুষ ও পয়গাম্বর

বই কিছু নই।" অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পয়গাম্বর হওয়ার জন্য কেবল শর্ত হলো এই যে, তিনি চিন্তামূলক ও কার্যমূলক—উভয় শক্তিতে পরিপক্ক হবেন এবং অপরিপক্কদেরকেও শক্তিদ্বয়ে পরিপক্ক করে তুলতে সক্ষম হবেন। এই শর্তের আলোকে এটা প্রতীয়মান হয় না যে, কাফেরগণ নবী করীমের কাছে যে বস্তু (মুজিযা) চেয়েছিল, সে কার্যেও তাঁকে সক্ষম হতে হবে।"

## শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র মতে নুবুওয়াতের স্বরূপ

শাহ ওলীউল্লাহ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে চরম সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনা করেন। আমি নিজ ভাষায় ও নিজ বর্ণনাভঙ্গিতে তাঁর ভাবধারার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আমি এ বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে কিছুই সংযোজিত করিনি:

"মানুষের উপর আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান আরোপিত হওয়া, দীন-ধর্মের প্রয়োজন অনুভূত হওয়া—এসবই স্বাভাবিক বস্তু। এ সব বুঝতে হলে প্রাকৃতিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত।"

"সর্বাগ্রে উদ্ভিদ সম্পর্কে চিন্তা করুন! বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! তাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রেণী রয়েছে। প্রত্যেক প্রকার বৃক্ষের শাখা, পাতা, ফল, ফুল, গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ—সবই ভিন্ন ধরনের। এ বিভিন্নতা তাদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যেরই ফল। আরো পরিষ্কার ভাষায়, প্রত্যেক বৃক্ষের যত বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো শ্রেণীগত আকৃতিরই সৃষ্টি। তাই আঙ্গুরকে মিষ্ট, রসালো ও সূক্ষ্ম আবরণ বিশিষ্ট করে কেন সৃষ্টি করা হলো, এরূপ প্রশ্ন করার কোন মানে থাকতে পারে না। কেননা এরূপ প্রশ্ন করার মানে হবে একথা বলা—আঙ্গুরকে আঙ্গুর করা হলো কেন? মিষ্ট, রসালো ও সূক্ষ্ম আবরণ বিশিষ্ট হওয়া—এগুলো আঙ্গুরের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য।"

"এখন জীবজন্তুর প্রতি দেখুন। উদ্ভিদের ন্যায় এদেরও প্রত্যেকের আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু এদের মধ্যে উদ্ভিদের চাইতে কিছুটা বস্তু বেশী আছে। তা হলো স্বাধীন মতি-গতি ও প্রাকৃতিক অভিজ্ঞান। প্রত্যেক প্রাণীকে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে সে প্রাণী জগতের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। এ অভিজ্ঞানই তার প্রয়োজন মেটায় এবং তাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। প্রত্যেক প্রকার জীবের প্রতিপালন এবং জীবন ধারণের জন্য তার

স্বভাব অনুসারে স্বতন্ত্র সাজ-সরঞ্জামের বন্দোবস্ত রয়েছে। উদ্ভিদ অনুভূতিশীল ও স্বাধীন গতির অধিকারী নয় বলেই তার মধ্যে রন্ধ্র ও স্নায়ু সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো পানি, বাতাস ও মাটির কোমল অংশ শোষণ করে এবং তা সমস্ত শাখা-প্রশাখা ও পাতায় সঞ্চারিত করে। জীব-জন্তুকে অনুভূতিশীল ও স্বাধীন মতিগতিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তাকে এমন প্রাকৃতিক অভিজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, যাতে সে স্বয়ং ও স্বেচ্ছায় চলাফেরা করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। প্রত্যেক প্রকার জীব-জন্তুর পানাহারের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। চতুষ্পদ জন্তু ঘাস খায়; হিংস্র প্রাণী মাংস ভক্ষণ করে; পাখী উড়ে; মাছ সাঁতার কাটে—এসব পার্থক্য তাদের শ্রেণীগত বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিরই ফল। এই শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক প্রকার প্রাণীকে তার প্রয়োজন মোতাবেক বিশেষ ধরনের উপলব্ধি ও জ্ঞান প্রদান করে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এই উপলব্ধি ও জ্ঞান প্রকৃতিরই দেওয়া; এর সাথে অর্জন ও আহরণের কোন সম্পর্ক নেই। বরং এগুলো সাথে নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করে। এই বিশেষত্বই মানুষকে জীব-জন্তু থেকে পৃথক করে দেয়। প্রকৃতিগত ধ্যান-ধারণা ছাড়াও মানুষকে অন্য এক প্রকার অনুভূতি শক্তি দেওয়া হয়েছে। সেটা অর্জনীয় ও চিন্তাপ্রসূত। এ শক্তি অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা ও বিভিন্ন সূত্রের সংযোজনের ফলেই জন্মলাভ করে। এই অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই মানুষ ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প—সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করে। এই শক্তিই বিভিন্ন রূপ ধারণ ক'রে কাউকে বাদশায়, কাউকে সেনানায়কে, কাউকে দার্শনিকে, আবার কাউকে শিল্পপতিতে পরিণত করে।

এ সব জ্ঞান ও উপলব্ধি-শক্তি মানুষের শারীরিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া মানুষকে অন্য এক প্রকার শক্তিও প্রদান করা হয়েছে। সেটা হলো আত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং এটাকেই বলা হয় ঐশ শক্তি। এ ক্ষমতার বলেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। সে খতিয়ে দেখে যে, এ বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কি করে প্রতিষ্ঠিত হলো? কে আমাকে সৃষ্টি করলো? কে আমাকে খাবার দেয়? এসব প্রশ্নের জওয়াবে সে এক মহাশক্তিকে স্বীকার করে নেয়; তার সামনে মাথা নত করে দেয় এবং সমস্ত প্রকার

সৌজন্য প্রদর্শন করে। অন্যদিকে বৃক্ষ, পাথর, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, জমিন, আকাশ—এ সমস্ত সৃষ্টিও সেই মহাপ্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং তাঁর সামনে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"তোমরা কি দেখছ না যে, আকাশ-জমিনের সবকিছু—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বৃক্ষ, চতুষ্পদ জন্তু—সবই আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করে?"

"কিন্তু পার্থক্য হলো এই যে, অন্যান্য সৃষ্টি কেবল ভাব-ভঙ্গিতে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাঁর সামনে বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু মনুষ্যজাতি কেবল ভাব-ভঙ্গিতেই নয়, ভাষা দিয়েও আনুগত্যের মনোভাব প্রকাশ করে। সে তার আত্মিক শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। আরো পরিষ্কার কথায়, মানুষ যখন কোন ভাল বা মন্দ কাজ করে, তখন তার মনেও সে প্রভাব প্রতিফলিত হয়। কাজটি যদি ভাল হয়, তবে তার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। আর যদি কাজটি মন্দ হয়, তবে সংকোচের সৃষ্টি হয়। জীব-জন্তুর মধ্যে এ অনুভূতি মোটেও দেখা যায় না।"

"মোটকথা, এই আত্মিক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও কার্যাবলীর ভাল-মন্দ নিরূপণ করা হয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এ ক্ষমতা সকল মানুষের মধ্যে সমান হয় না। মানুষের আধ্যাত্মিক পূর্ণতা সাধনের জন্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণের উদ্দেশ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান রচনা করা প্রয়োজন। এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা বহুদিন পর পর এমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করেন, যিনি ঐশ বাণী গ্রহণের যোগ্যতা রাখেন। এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে থাকেন। তিনি আল্লাহ্‌র খাস রহমতের ছত্রছায়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রতিপালিত হন। তাঁকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে শরীয়ত দান করা হয় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য লোকদের প্রতি ঐশ আদেশ দেওয়া হয়। এ দিক থেকে যা কিছু হয়, সবই সংঘটিত হয় মানুষের প্রকৃতি ও শ্রেণীগত চাহিদা অনুসারে।"

শাহ্ সাহেব আরো বলেন ঃ

"কেউ যদি বলে, মানুষের জন্য নামায পড়া, পয়গাম্বরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, ব্যভিচার ও চুরি থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি

ফরয করা হলো কেন? তার উত্তরে বলতে হবে যে, এটা এমনি ধরনের ব্যাপার, যেমন তৃণভোজীদের জন্য ঘাস খাওয়া ও গোশ্ত্ না খাওয়া এবং মধু মক্ষিকার জন্য তাদের দলপতির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা অপরিহার্য। পার্থক্য হলো—জীব-জন্তুর মধ্যে যে অভিজ্ঞান রয়েছে, তা প্রকৃতি প্রদত্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান হলো অর্জিত ও চিন্তাপ্রসূত, ওহী ও অনুকরণ উদ্ভূত। তবে এ সব জ্ঞান থাকা উভয় শ্রেণীর জন্যেই আবশ্যক ও অপরিহার্য।

## নুবুওয়াত সম্পর্কে ইমাম গাযালীর অভিমত

ইমাম গাযালী তাঁর 'মাআরিজুল কুদ্স' গ্রন্থে নুবুওয়াতের স্বরূপ সবচাইতে অধিক ফলাও করে বর্ণনা করেন। এখানে সেগুলো হুবহু উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তাই আমি বিষয়টিকে গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করেছি। এখানে তিনি 'আল্-মুনকিয্ মিনাদ্ দালাল' ও 'এহ্ইয়াউল্ উলূম' গ্রন্থে যা লিখেছেন, তার সারমর্ম পেশ করছি। ইমাম গাযালী বলেন ঃ

মানুষ স্বভাবত অজ্ঞরূপেই জন্মগ্রহণ করে। জন্ম হওয়ার সময় সে সৃষ্টি সম্পর্কে কিছুই জানে না। সর্বপ্রথম তার মধ্যে সৃষ্টি হয় স্পর্শন-ক্ষমতা, যার ফলে সে স্পৃশ্য বস্তুসমূহের উত্তাপ, শীতলতা, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, কোমলতা, কাঠিন্য এসব অনুভব করে। এই স্পর্শনের সঙ্গে দর্শন ও শ্রবণের কোন সম্পর্ক নেই। যে বস্তু কেবল শ্রবণীয়, সেখানে স্পর্শন ক্ষমতার কোন স্থান নেই। স্পর্শনের পর মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় দর্শন। এ শক্তির দরুন সে বর্ণ ও পরিমাণ উপলব্ধি করে। অতঃপর সৃষ্টি হয় শ্রবণ ও আস্বাদন শক্তি। এভাবে ক্রমাগত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সীমারেখা অতিক্রান্ত হয় এবং শুরু হয় অন্য একটি নতুন পর্যায়। এই স্তরে মানুষের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞানের উদয় হয় এবং সে এমন সব বস্তুও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, যা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে। এ নতুন ধাপের সূচনা হয় সাত বছর বয়সে। এরপর আসে বুদ্ধির পালা। এর বদৌলতে মানুষ বাস্তব, অবাস্তব, বৈধ, অবৈধ ইত্যাদি অনুধাবন করে। এর পরেও একটি স্তর আছে যা বুদ্ধির গণ্ডি থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। বুদ্ধির মঞ্জিলে বাহ্য ইন্দ্রিয় যেমন অকেজো, তেমনি এ মঞ্জিলে বুদ্ধিও কোন কাজে আসে না। এ স্তরের নাম হলো নুবুওয়াত।

কোন কোন বুদ্ধিবাদী এ স্তরকে অস্বীকার করেন। এটা হলো এমনি ধরনের অস্বীকারোক্তি, যেমন কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তার গুণে গুণান্বিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বুদ্ধিজাত বস্তুসমূহকে অস্বীকার করে থাকে।

**'আল্-মুন্কিয্ মিনাদ্-দালাল্' গ্রন্থে ইমাম গাযালী বলেন ঃ**

"নুবুওয়াত সমর্থন করার মানে হলো—এমন একটি স্তরকে সমর্থন করা, যা বুদ্ধি স্তরের ঊর্ধ্বে, যেখানে পৌঁছলে মানুষের অন্তর চক্ষু বিকশিত হয় এবং সে এমন সব বস্তুও উপলব্ধি করতে পারে, যা বুদ্ধি কখনো পারে না। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি এমনি অপারগ, যেমন বর্ণ উপলব্ধির বেলায় শ্রবণ শক্তি অকেজো।"

সুতরাং নুবুওয়াতকে সত্যিকারভাবে স্বীকার করতে পারেন সেই ব্যক্তি, যিনি স্বয়ং নুবুওয়াতের মর্যাদা অর্জন করেছেন, অথবা যিনি আত্মাকে শোধন করে নিয়েছেন, অথবা যিনি আধ্যাত্মিক সাধনার বলে ঐশ অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হয়েছেন। ইমাম গাযালী 'মুন্কিয্ মিনাদ্-দালাল' গ্রন্থে নিজ অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ

"সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে ব্যক্তি সূফীবাদের স্বাদ গ্রহণ করে নি, সে নুবুওয়াতের স্বরূপ অনুধাবনে অক্ষম। সে কেবল নুবুওয়াতের শব্দটাই জানতে পারে, এছাড়া আর কিছু নয়।"

এরপর তিনি বলেন ঃ

"সূফী পদ্ধতির অনুশীলনের ফলে আমি নুবুওয়াতের হকিকত ও তার বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করেছি।"

## নুবুওয়াত প্রমাণের আরো একটি উপায়

ইমাম গাযালী আরো একটি উপায় অবলম্বনে নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মানবিক গুণাবলী সকল মানুষের মধ্যে এক সমান থাকে না—এটা একটি সর্বসম্মত ব্যাপার। মানুষের মধ্যে যে মেধাশক্তি, ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, তা বিভিন্ন পরিমাণে হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি মেধাবী হলে অন্য ব্যক্তিকে অধিকতর মেধাবী হতে দেখা যায়। তৃতীয় ব্যক্তিকে আরো বেশী মেধাবী দেখা যায়। এ মেধা ও বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম ক'রে এমন এক স্তরে এসে উপনীত হয়, যখন মানুষ এমন কাজও সম্পন্ন করতে পারে, যা বাহ্যত মানবিক ক্ষমতার ঊর্ধ্বে বলেই মনে হয়।

যাঁরা কবিত্বে, বক্তৃতায়, শিল্পে বা আবিষ্কার ক্ষেত্রে জগতে অতুলনীয় ছিলেন, তাঁদের ব্যাপারটাও এমনি ধরনের। এমন উৎকর্ষ সাধিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার এবং প্রকৃতিরই দান। এ ক্ষমতা পড়াশোনা করে অর্জন করা যায় না। বরং ছোট বেলায়ই কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে তা বাসা বাঁধে। এজন্য অন্যান্য লোকেরা যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাদের সমকক্ষ হতে পারে না। এসব অসাধারণ ক্ষমতার মধ্যে একটি হলো বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করা। এ ক্ষমতা কারো মধ্যে কম থাকে, কারো মধ্যে বেশী, আবার কারো মধ্যে খুবই বেশী। উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার ফলে এ শক্তি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়, যখন বিদ্যার্জন ও শিক্ষা ছাড়াই এ ধরনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বস্তুসমূহের হকিকত অনুধাবন করতে পারে। তারা কোন বস্তুর বাহ্য জ্ঞানের অধিকারী না হলেও এ শক্তি বলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত জ্ঞান হাসিল করতে পারে। এ শক্তিকেই বলা হয় নুবুওয়াত। এ জ্ঞানকেই বলা হয় 'ইল্‌হাম' ও 'ওহী'।

ইমাম গাযালী 'এহ্‌ইয়াউল্‌ উলুম' গ্রন্থের প্রারম্ভেও এ বিষয়টি পরোক্ষভাবে বর্ণনা করেন। তাঁর এই আলোচনার শিরোনাম ছিল "মানুষের বুদ্ধি-মাত্রার বিভিন্নতা।" এখানকার কয়েকটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"মানুষের স্বাভাবিক গুণাবলী কি করে অস্বীকার করা যায়? গুণাবলীর পার্থক্য না থাকলে জ্ঞানের মাত্রায় বিভিন্নতা দেখা যায় কেন? কোন কোন ব্যক্তি এত বোকা হয় যে, শিক্ষকের পক্ষে তাদের বোঝানোই মুশকিল। আবার এমন সব মেধাবী ব্যক্তিও রয়েছে, যারা সামান্য ইংগিতেই ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারে। আবার এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক ও বিশেষজ্ঞও রয়েছে, শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াই যাদের অন্তরে বস্তুর স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। নবীদের (আঃ) অবস্থাও তাই। বিদ্যার্জন ছাড়াই তাঁদের অন্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এটাকেই বলা হয় 'ইল্‌হাম' বা অন্তরোদিত জ্ঞান। এ কথাটি রসূল করীম এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ জিব্রাঈল আমার অন্তরে একটি বস্তু ফুঁকে দিয়েছেন।

ইমাম গাযালী রসূল করীমের এই বাণী পেশ করে নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যদি কোন ব্যক্তি বিষেশ সম্পর্কে এ প্রশ্ন উঠে যে, এ ব্যক্তি কি নবী, না কি নবী নয়, তবে তার অবস্থাই এ প্রশ্নের সমাধান করে দেবে। ইমাম শাফেই যে একজন ফকীহ্ ছিলেন, তা আমরা কি করে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি ?

ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর ভাল ভাল রচনা আছে বলেই তাঁকে ফকীহ্ বলে মনে করি। এমনিভাবে আমরা যখন কুরআন মজীদের প্রতি তাকাই এবং বুঝতে পারি যে, নুবুওয়াতের লক্ষণগুলো কোন এক বিশেষ ব্যক্তির শব্দে শব্দে প্রতিফলিত, তখন নিশ্চিতভাবে ধারণা করি যে, এর ধারক ও বাহক পয়গাম্বর বই আর কিছু নন।"

## নুবুওয়াত সম্পর্কে মুহাদ্দিস ইবনে হাযমের অভিমত

মুহাদ্দিস ইবনে হাযম নুবুওয়াতের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন, এ জ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াই অর্জিত হয়। তিনি বলেন ঃ

"এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নুবুওয়াত সম্ভাব্য বিষয়। নুবুওযাতের মানে হলো—আল্লাহ্ এক দল লোক প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব-গুণে ভূষিত করেন। এর জন্য কোন কারণের প্রয়োজন হয় না। বরং আল্লাহ্ স্বেচ্ছায়ই তাঁদেরকে জ্ঞান দান করেন। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা নিতে হয় না; উন্নতির বিভিন্ন স্তরও অতিক্রম করতে হয় না; এর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাঁদের চাইতেও হয় না। এটা এমনি ধরনের কথা, যেমন আমরা স্বপ্নে একটা কিছু দেখতে পাই এবং পরে তা বাস্তবে পরিণত হয়।"

মুহাদ্দিস সাহেব নুবুওয়াতের সম্ভাবনা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, দুনিয়াতে যত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর প্রথম আবিষ্কর্তা শিক্ষাদীক্ষা ব্যতীতই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান লাভ করেন। সুতরাং নবীদের পক্ষেও এমনিভাবে জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব কিছু নয়। এই জ্ঞান লাভকেই বলা হয় 'ওহী'। মুহাদ্দিস সাহেব অনেক শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন ঃ

"সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা এক বা একাধিক লোককে শিক্ষক ছাড়াই কেবল ওহীর সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন। এটাই নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য।"

এ সব ভাষ্যের সার কথা হলো—আল্লাহ্ মানুষকে কতগুলো ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এগুলো কোন কোন লোকের মধ্যে মোটেও

দেখা যায় না। আবার অনেকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়; তবে কারো মধ্যে বেশী, আর কারো মধ্যে কম। এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষকে একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও দান করেছেন, যাকে বলা হয় ঐশিক শক্তি বা নুবুওয়াত। মানব-আত্মার পবিত্রকরণ ও চরিত্র সংস্কারই হলো এর কার্য। যে ব্যক্তির মধ্যে এ শক্তি পাওয়া যায়, চরিত্রের দিক থেকে তিনি হবেন পরিপক্ক এবং অপরাপরকেও পরিপক্ক করে তোলার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকবে। এমন ব্যক্তি কারো কাছে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন না বটে, কিন্তু অর্জিত জ্ঞান ছাড়াই তাঁর কাছে সকল বস্তুর হকিকত বিকশিত হয়।

নবুওয়াতের এই স্বরূপ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমরা স্পষ্টই দেখছি যে, এমন কতক লোকও রয়েছেন, যাঁরা লেখাপড়া শেখেননি, যেমন হোমার, ইমরাউল কায়েস—অথচ এঁরা শক্তিধর কবি, বাগ্মী, শিল্পী বা আবিষ্কারক বলে পরিচিত, যাঁদের নজীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনিভাবে আল্লাহ্ যদি কোন কোন লোককে বিশেষ ঐশিক ক্ষমতা প্রদান করেন এবং শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াই তাঁদের কাছে নৈতিকতার স্বরূপ ও রহস্য উন্মোচিত হয়, তবে তাতে বৈচিত্র্য কোথায়?

একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, অধিকাংশ নবী, যেমন হযরত ইব্রাহীম, ঈসা, মূসা ও নবী করীম (সঃ)—এঁদের মধ্যে কেউই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন নি। তা সত্ত্বেও তাঁরা হেদায়ত ও শিক্ষার প্রভাবে পৃথিবীর কায়া বদলে দিয়েছেন। তাঁরা নীতি-শাস্ত্রীয় এমন সব বিষয় শিক্ষা দেন, প্লেটো ও অ্যারিস্টলের ধারণাও যা স্পর্শ করতে পারে নি।

## নুবুওয়াতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন কিভাবে সম্ভব

নুবুওয়াতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা এবং নবীর বাণীকে সত্য মনে করা—এটা সৎ মানুষেরই প্রকৃতি। যে ব্যক্তি সত্যাগ্রহী, যাঁর রুচি বিশুদ্ধ, যিনি সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন, যাঁর মনে সত্যকথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংকিত হয়, তিনি যখন কোন নবীর শিক্ষা ও হেদায়তসূচক বাণী শুনতে পান, তখন তিনি কুতর্কে লিপ্ত না হয়েই তা বিশ্বাস করে নেন। তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, এটা সত্য এবং এর উৎসও সত্য। মওলানা রুমী একটি তুলনার মাধ্যমে

কথাটি বোঝাতে গিয়ে বলেন, যদি কোন তৃষ্ণার্তকে পানি দেওয়া হয়, তবে সে কি প্রথমে এই প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামাবে যে, এটা পানি কি-না? অথবা কোন স্ত্রীলোক যদি তার সন্তানকে দুধ পান করাতে ডাকে, তবে সে কি সন্দেহ করবে যে, এ ব্যক্তি আমার মা কি-না এবং সত্যিই আমাকে দুধ পানের জন্য ডাকছে কিনা?

ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী বলেন ঃ

নবীদেরকে দু' ধরনের মুজিযা দেওয়া হয় ঃ প্রথম হলো---নবী সৎবংশে জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁর চেহারায় এমন নূর থাকে, যা লোকের মনকে আকৃষ্ট করে ; তাঁর চরিত্র লোকের অন্তরকে মোহিত করে ; তাঁর কথাবার্তা শ্রোতাকে সান্ত্বনা দান করে। এরপর তিনি বলেন ঃ

"এ সব চিহ্ন পাওয়া গেলে জ্ঞানবান লোকের কাছে নবুওয়াতের জন্য আর কোন মুজিযার প্রয়োজন থাকে না; সে আর কোন মুজিযার অন্বেষণ করে না।"

ইমাম গাযালী নবুওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'মুনকিয্ মিনাদ্ দালাল্' গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তি নবীজীর হেদায়ত ও বিধি-নিষেধের উপর বার বার চিন্তা-ভাবনা করে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তির মনে নবুওয়াত সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা জন্মাবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

আপনি এভাবেই নবুওয়াত বিশ্বাস করে নিন। লাঠি সর্পে পরিণত হয়েছে বা চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে—সে দিকে আপনি যাবেন না।

'মাআরিফ্-ফী-শর্হিস্ সাহায়েফ্' ইলমে কালামের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতে নবীজীর নবুওয়াত-কে দু'ভাবে প্রমাণ করা হয়েছে ঃ প্রথম হলো সেই পুরনো পদ্ধতি, অর্থাৎ মুজিযার মাধ্যমে। দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয় ঃ

"নবীজীর নবুওয়াত প্রমাণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো—তাঁর কার্য-কলাপ, কথাবার্তা ও বিধি-বিধান দিয়ে তা প্রমাণ করা।"

অতঃপর এ পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ

বস্তুত এ পদ্ধতিই নুবওয়াতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে।

## নবীদের শিক্ষা ও তাঁদের পথপ্রদর্শন-পদ্ধতি

ধর্ম সম্পর্কে বড় বড় ভুল ধারণা সৃষ্টির কারণ হলো—লোকেরা নবীদের শিক্ষাদান-নীতিকে খতিয়ে দেখছে না। ইলমে কালামের

প্রচলিত গ্রন্থসমূহে এ জরুরী বিষয়টির প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হয় নি। কিন্তু ইমাম রাযী 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে, ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌ 'কাশ্‌ফুল আদিল্লাহ্‌' গ্রন্থে এবং শাহ্‌ ওলীউল্লাহ 'হুজ্জাতুল্লাহিল্‌ বালিগা' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এ নীতিগুলো বর্ণনা করেন।

## প্রথম নীতি

সাধারণ লোক হোক বা অসাধারণ লোকই হোক– সকল শ্রেণীর লোককে হেদায়ত করাই নবীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সাধারণ লোকের তুলনায় অসাধারণ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম বলেই নবীদের শিক্ষা দান-নীতিতে জনসাধারণের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। তবে প্রত্যেক স্থানেই পরোক্ষভাবে আসল বিষয় ও গূঢ় তত্ত্বের প্রতি ইংগিত দেওয়া হয় এবং তা বিশিষ্ট লোকদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়।

কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতসমূহ কেন অবতীর্ণ হলো, তার সব চাইতে বড় কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রাযী বলেন ঃ

সাধারণ লোক হোক, আর অসাধারণ লোকই হোক—কুরআনে সবাইকে সত্যের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। জনসাধারণের অবস্থা হলো এই যে, তাদের মন-মেজাজ সাধারণত পদার্থের হকিকত উপলব্ধি করতে চায় না। সুতরাং এমন সব শব্দে কুরআনের কথাগুলো বিবৃত করা হয়েছে, যাতে জনসাধারণের চিন্তাধারার সঙ্গেও কিছুটা সামঞ্জস্য থাকে, আবার প্রকৃত বিষয়টিও বিবৃত হয়।

আল্লাহ তোমাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এর অনেক আয়াত পরিষ্কার ভাবধারার বাহক। (তফসীর-এ-কবীর, সূরা-এ-আল্‌-ইম্‌রান)

ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌ 'ফস্‌লুল্‌ মাকাল' গ্রন্থে বলেন ঃ

শরীয়তের প্রথম উদ্দেশ্য হলো—জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। কিন্তু এতে বিশিষ্ট লোকদের বাদ দেওয়া হয় নি।

## দ্বিতীয় নীতি

নবিগণ লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার তারতম্যভেদেই তাদের সম্বোধন করেন। কিন্তু জ্ঞানার্জন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলে যে সামান্য পরিমাণ বিদ্যা-বুদ্ধি মানুষের আয়ত্তে আসে, সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে, বেশীর ভাগ মানুষই নবীর বাণী অনুধাবনের পাত্র নয়। ইমাম গাযালী বলেন ঃ

"নবীদের অন্যতম নীতি হলো—লোকের সহজাত বুদ্ধির তারতম্য অনুসারেই তাঁরা তাদের সম্বোধন করেন। বাস্তবক্ষেত্রে নবিগণ তাই করেছেন; লোকের সহজাত জ্ঞানের মাত্রা অনুসারেই তাদের হেদায়ত করেছেন; তাঁরা লোকদের এ আদেশ দেন নি যে, আধ্যাত্মিক সাধনা করে বা যুক্তি প্রয়োগ করে বা অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই আল্লাহ্‌কে চিনতে হবে। তাঁরা এ আদেশও দেন নি যে, আল্লাহ্‌কে প্রত্যেক দিক থেকেই অনুরূপ উপায় অবলম্বনে পবিত্র বলে মনে করতে হবে।"

(হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা)

## তৃতীয় নীতি

সবচাইতে বেশী লক্ষণীয় বিষয় হলো—নবিগণ চরিত্র সংস্কার ও আত্মার সংশোধন ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন নি। যদি করেও থাকেন, তবে লোকের পরম্পরাগত মতামত ও ধ্যান-ধারণা অনুসারেই করেছেন এবং তাও আবার রূপক ও ভাবার্থেই করেছেন। ইমাম গাযালী বলেন ঃ

"নবীদের অন্যতম নীতি হলো—যে সব বিষয়ের সঙ্গে আত্মার সংশোধন ও জাতীয় রাজনীতির কোন সংযোগ নেই, সেগুলো নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন নন। যেমন শূন্য জগত সংক্রান্ত বৃষ্টি, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, রামধনু ইত্যাদি সৃষ্টি কারণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের রহস্য, চন্দ্র-সূর্যের গতির পরিমাণ, দৈনন্দিন ঘটনাবলীর কারণ, নবী, বাদশা ও বিভিন্ন দেশের কাহিনী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নবিগণ আলোচনা করেন না। তবে যে সব মামুলি বিষয়ের সঙ্গে লোকেরা পূর্ব থেকেই পরিচিত এবং যেগুলো তাদের বিবেক-বুদ্ধির কাছে গ্রহণীয়, কেবল সেগুলো নিয়েই নবিগণ আল্লাহ্‌র মহিমা ও শক্তি অনুধাবিত করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ ও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে থাকেন এবং তাও আবার ভাবার্থ ও রূপকার্থে করে থাকেন। লোকেরা যখন রসূল করীমকে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন এ নীতির উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ্ সে বিষয়ের উত্তর দানে বিরত থাকেন এবং তার কারণ বর্ণনার স্থলে মাস গণনার উপকারিতা তুলে ধরেন। যেমন কুরআনে আছে ঃ "আপনার কাছে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞাসাবাদ করছে। হে রসূল! আপনি বলুন, এটা হলো লোকের সময় গণনা ও হজের সময় নির্ধারণের উপায়মাত্র।"

অংক ও অন্যান্য শাস্ত্রের সংগে গভীর পরিচয়ের ফলে অধিকাংশ লোকের ধ্যানধারণা বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং এর ফলেই তারা নবীদের বাণীকে অবাস্তব বলে অভিহিত করছে।

(হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা, পৃঃ ৮৮)

## চতুর্থ নীতি

নবিগণ সব সময় একটি সাধারণ নীতিকে বাস্তবরূপে রূপায়িত করেন। তা হলো—তাঁরা যে লোকালয়ে প্রেরিত হন, তাদের পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ীর প্রস্তুত প্রণালী, সুখ ভোগের সামগ্রী, বিবাহ-পদ্ধতি, দাম্পত্যের রীতি-নীতি, ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, পাপের শাস্তি-বিধি, বিচার নীতি সব কিছুর উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন। যদি দেখতে পান যে, এসব বস্তু ঠিকই আছে, তবে তাঁরা সেগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পেছনে পড়েন না। বরং যা আছে, তার উপর অবিচলিত থাকার জন্যই তাগিদ করেন। কিন্তু চলতি বিধি-বিধানে যদি কোনরূপ দোষ-ত্রুটি দেখতে পান, অর্থাৎ তা যদি কারো কষ্টের কারণ হয়, বা তাতে পার্থিব ভোগ-বিলাসে প্রলুব্ধ হওয়ার আশংকা থাকে, বা সে নীতি যদি জন-মঙ্গল বিরোধী হয় বা তা যদি মানুষকে পার্থিব ও পরকালীন কোন সৎকাজ থেকে বিরত রাখে, তবে তাঁরা তা বদলে দেন। কিন্তু হঠাৎ কোন পরিবর্তন সাধন করা তাঁদের নীতি নয়, বরং তাঁরা এমন ধরনের পরিবর্তন সাধন করেন, যা সেই কওমে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, বা সে সব বস্তু এমন সব লোকের মধ্যে এক সময় প্রচলিত ছিল, যাঁদেরকে তারা পথ প্রদর্শক ও নায়ক বলে সমর্থন করে আসছে।

শাহ্ ওলীউল্লাহ এ নীতিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ

"এজন্যেই নবীদের শরীঅতে বিভিন্নতা দেখা যায়। যাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে পরিপক্ক, তাঁরা জানেন, শরীঅত-এ-ইসলামী বিবাহ, তালাক, লেন-দেন, সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিচার-আচার, শাস্তিবিধি, গনীমতের বণ্টন-নীতি—এসব বিষয়ে এমন কোন নতুন বিধি পেশ করেনি, যে সম্পর্কে লোকেরা মোটেও জানতো না বা যা গ্রহণ করতে তারা দ্বিধাবিভক্ত ছিল। শরীঅত যদি কোন পরিবর্তন করে

থাকে, তবে এতটুকু করেছে যে, ধর্মে যে বিধিটি জটিল ছিল, সেটাকে সহজ করে দিয়েছে, আর যা ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তা শোধরে দিয়েছে।"

**পঞ্চম নীতি**

নবীদের উপর যে শরীঅত অবতীর্ণ হয়, তাতে দু'টি অংশ থাকে: এক অংশে থাকে ধর্মের সার্বিক নীতি অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো। ধর্মের এ অংশটি প্রত্যেক শরীঅতেই এক ও অভিন্ন। এতে থাকে আল্লাহর অস্তিত্ব তওহীদ, পুণ্য, শাস্তি, উপাসনা, আল্লাহর মহিমা প্রকাশক প্রতীকসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদি। শরীঅতের দ্বিতীয় অংশ হলো- সেসব স্থানীয় ও সাময়িক বিধি-বিধান বা আচার-অনুষ্ঠান, যা বিশেষ বিশেষ নবীদের সঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকে। এদিক থেকেই বলা হয়—'ঈসবী শরীঅত', 'মূসবী শরীঅত', অর্থাৎ হযরত ঈসা (রাঃ)-এর শরীঅত ও হযরত মূসা (রাঃ)-এর শরীঅত। মূসবী শরীঅত ঈসবী শরীঅত থেকে স্বতন্ত্র। শরীঅতের এ অংশটুকু বিশেষ বিশেষ কওম ও দেশের সুবিধার্থে রচিত হয়। এর ভিত্তি প্রধানত সে সব চিন্তাধারা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, জীবন ব্যবস্থা ও তহযীব-তমদ্দুনের উপর রাখা হয়, যা পূর্ব থেকেই সেই কওমে বিদ্যমান থাকে। শাহ ওলীউল্লাহ বলেন:

"যে সব বিদ্যা-বুদ্ধি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি সমাজের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রচলিত থাকে, শরীঅতের বিধি-বিধানে সেগুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। এ কারণেই বনী ইসরাইলের জন্য উটের মাংস ও তার দুধ হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু বনী ইসমাঈলের জন্য তা করা হয়নি। ঠিক অনুরূপ কারণে আরবদের রীতি নীতি অনুসারেই তাদের খাদ্যের হালাল-হারাম নির্ধারণ করা হয়েছিল। অনুরূপ কারণেই ভাগনীকে বিয়ে করা আমাদের ধর্মে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু ইহুদী ধর্মে তা করা হয়নি।"

শাহ ওলীউল্লাহ এ নীতির আরো অনেক বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনা এড়াবার জন্য আমি তা বাদ দিলাম।

অতঃপর তিনি বলেন:

"মনে রাখা উচিত, এমন অনেক আচার-অনুষ্ঠান ও জ্ঞান-ভাণ্ডার আছে, যা আরব-অনারব—এক কথায় সুস্থ বিবেকসম্পন্ন যে কোন জাতি ও উচ্চ চরিত্রের অধিকারী লোকের কাছে সমভাবে গ্রহণীয়।

শরীয়তে এসব বস্তুর প্রতি সব চাইতে বেশী লক্ষ্য রাখা হয়। এরপর দৃষ্টিপাত করা হয় সেসব রীতিনীতির প্রতি, যা বিশেষ বিশেষ কওমে প্রচলিত থাকে।”

## ষষ্ঠ নীতি

শরীঅতে কোন বিষয়ের প্রতি আদেশ করা বা কোন বিষয় থেকে বিরত রাখার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো—আদিষ্ট বস্তুর মঙ্গল ও নিষিদ্ধ বস্তুর অমঙ্গল তুলে ধরা এবং সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা দেওয়া—স্বয়ং এই আদেশ বা নিষেধ উদ্দিষ্ট বস্তু নয়। আদিষ্ট বস্তুটি ভাল বলেই তার প্রতি আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিষিদ্ধ বস্তুটি মন্দ বলেই সেখান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ চাপানো হয়েছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো—এমনি বর্ণনা দেওয়া ঃ—এই আদেশেই রয়েছে পুণ্য, আর ঐ নিষেধেই রয়েছে পাপ। যেমন কোন কোন দোয়া সম্পর্কে লোকের ধারণা রয়েছে যে, যদি এর শব্দে কোন প্রকার রদ-বদল করা হয়, তবে দোয়ার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে। এরূপ ক্ষেত্রেই আদেশ বা নিষেধ প্রয়োগের সময় দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথম পদ্ধতিটি আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর বিবেক-বুদ্ধিসম্মত বলে মনে হয়। কিন্তু তা সাধারণ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। এ পদ্ধতি অবলম্বনে যদি বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হয়, তবে প্রত্যেকটি অজ্ঞ লোককে আদিষ্ট বস্তুর মাহাত্ম্য ও নিষিদ্ধ বস্তুর অপকারিতা বুঝিয়ে দিতে হবে। অথচ এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এছাড়া যদি বলা হয় যে, অমুক কাজটি ভাল বলেই তা করা উচিত, তবে কথাটি লোকের মনে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর যদি বলা হয় যে, অমুক কাজের প্রতি আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন, এবং তা সম্পন্ন করা হলে তিনি খুশী হবেন, তবে একথাটি পূর্বকার কথাটির তুলনায় অনেকটা বেশী কার্যকর হবে। মনে করুন, যদি 'ইণ্ডিয়ান প্যানাল কোড' নামক গ্রন্থটির পরিবর্তে অন্যান্য নীতিমূলক পুস্তক প্রচার করা হয়, এবং তাতে লেখা থাকে যে, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খারাপ কাজ, তাই এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত, তবে কি এ গ্রন্থগুলো অপরাধ হ্রাস করার ক্ষেত্রে সেরূপ কার্যকর হবে, যেরূপ 'ইণ্ডিয়ান প্যানাল কোড' প্রচারের ফলে হয়ে থাকে? এজন্য নবিগণ উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রধানত দ্বিতীয় পদ্ধতিই অবলম্বন করে থাকেন এবং আদিষ্ট বস্তুর উপকারিতা ও নিষিদ্ধ

বস্তুর অপকারিতা বর্ণনা না করে স্বয়ং আদেশ পালনকেই পুণ্য ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকেই পাপ বলে অভিহিত করেন। তাঁরা পুণ্যকে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও পাপকে তাঁর অসন্তোষ বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁরা নামায, রোযা ও যাকাতের প্রতি আদেশ দেওয়ার সময় সাধারণ লোকের কাছে একথা বলেন না যে, এসব কাজে ওমুক তমুক মঙ্গল রয়েছে। তাঁরা কেবল একথাই বলেন যে, এসব কাজ করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং না করলে অসন্তুষ্ট হন। মূলত জনসাধারণকে কোন কাজের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য এটাই হলো একমাত্র কার্যকর পন্থা।

উপরিউক্ত নীতিগুলো সব নবীরাই পালন করেন। কিন্তু যে রসূলের রিসালাত্ সার্বজনীন এবং যিনি সারা বিশ্বের সংস্কারের জন্য প্রেরিত হন, তাঁর হেদায়ত ও শিক্ষায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অন্যান্য নবীদের মধ্যে থাকে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নবী যে গোত্র বা সমাজে প্রেরিত হন, শরীঅতে তাদের রীতি-নীতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু যে পয়গাম্বর সারাজাহানের জন্য প্রেরিত হন, তাঁর শরীঅতে এ নীতি চলতে পারে না। কারণ দুনিয়ার সব কওমের রীতি-নীতি এক নয় বলে তিনি সকলের জন্য আলাদা আলাদা শরীঅত রচনা করতে পারেন না। তাই তিনি প্রথমে নিজ কওমকে নিয়েই শিক্ষাদান আরম্ভ করেন এবং তাকেই নৈতিকতার আদর্শস্থলরূপে বেছে নেন। নিজ লোকালয়কে ধর্ম প্রচারের ভিত্তিস্থলরূপে দাঁড় করানোর পর তিনি ক্রমাগত তাঁর প্রচার পরিসরকে প্রশস্ত করার কাজে হাত দেন। তাঁর শরীঅতে বিশ্বজনীন রীতিনীতির প্রতিফলন থাকলেও তাতে নিজস্ব কওমের আচার-অনুষ্ঠান ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। তবে এ সব আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে যে সব নির্দেশ রচিত হয়, সেগুলোর বাস্তব রূপায়ণ মূল উদ্দেশ্য নয় এবং সেজন্য সেগুলোর উপর বিশেষ জোরও দেওয়া হয় না।

শাহ ওলীউল্লাহ্ এ নীতিটি তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা' গ্রন্থে ফলাও করে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ

"যে ইমাম ও যে পথ প্রদর্শক সকল কওমকে একই ধর্মের গণ্ডিতে আনতে চান, তাঁকে উপরিউক্ত নীতি ছাড়া আরো কতগুলো নীতির

অনুসরণ করতে হবে। তন্মধ্যে একটি হলো—তিনি বিশেষ একটি কওমকে সৎপথের দিকে আহবান করবেন; তাদের সংস্কার সাধন করবেন; তাদের বিশুদ্ধ করবেন; তাদের নিজের সহায়করূপে গ্রহণ করবেন। এ কর্মপন্থা অবলম্বনের কারণ হলো—কোন ইমামের পক্ষে এক সাথে দুনিয়ার সব কওমের সংস্কার সাধন করা দুঃসাধ্য। তাই তাঁর কর্তব্য হলো—আরব-অনারব অর্থাৎ সকল মানুষের প্রকৃতিগত ধর্মের উপর নিজ শরীঅতের ভিত্তিমূল স্থাপন করা; তাঁর স্বীয় কওমের আচার-অনুষ্ঠান ও ভাবধারার নীতি গ্রহণ করা, অন্যান্য কওমের তুলনায় নিজ কওমের প্রতি বেশী নজর রাখা; অতঃপর সকল লোকের উপর এ শরীঅত আরোপিত করা। এরূপ করার কারণ হলো—কোন কওমের নায়কই নিজ কওমের জন্য স্বতন্ত্র শরীঅত গড়তে পারেন না। সুতরাং সবচাইতে উত্তম ও সহজ পদ্ধতি হলো ধর্মীয় প্রতীক, অপরাধজনিত আইন-কানুন ও প্রশাসনিক ব্যাপারে ইমামের নিজস্ব কওমে প্রচলিত বিধি-বিধানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং এসব নির্দেশাবলী পালনে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রতি কড়াকড়ি আরোপ না করা।

এ সব নীতির আলোকে এ কথাটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, চুরি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদির ব্যাপারে ইসলাম যে শাস্তি বিধান করেছে, তাতে আরবদের রীতিনীতির প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এতে আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে, বর্তমানে এসব শাস্তি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে প্রয়োগ করা কতখানি সমীচীন বা কতখানি প্রয়োজনীয়।

# অপ্রাকৃত ঘটনাবলী

উপরিউক্ত বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, নবুওয়াতের যথার্থতা অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল নয়। তাই এ বিষয়টি নিয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেখলাম, অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রত্যেক ধর্মেরই একটি জরুরী অংগ হয়ে রয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে, ইসলামেও এর কিছুটা নমুনা রয়েছে। তাই ভাবলাম, এ সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। কুরআন মজীদে এ ধরনের যত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, আধুনিক ভাবাপন্ন সম্প্রদায় সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এসব ঘটনাবলীতে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলতে কিছুই নেই। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, কেবল কুর'আন কেন, প্রত্যেকটি ঐশ গ্রন্থে এ ধরনের অপ্রাকৃত ঘটনাবলী রয়েছে। এটাও বলতে হয় যে, এ ব্যাপারে আশায়েরার বাড়াবাড়ি ছেলেমির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। অন্য দিকে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অস্বীকার করাও কম ঠেঁটামির কথা নয়। এ যুগের লোকেরা এ সম্পর্কে যে সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আমাদের অজানা নয়। এতে সন্দেহ নেই যে, এসব পরোক্ষ ব্যাখ্যা কেবল সে সব হতভাগ্য শিক্ষিত লোকের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, যাঁরা আরবী ভাষা ও তাঁর রচনাবলীর সাথে অপরিচিত। কিন্তু যাঁরা আরবীতে দক্ষ, তাঁদের কাছে এ ধরনের জোড়া তালি দেয়া ব্যাখ্যা কোন কাজে আসবে না।

সত্য কথা হলো, আধুনিক মতবাদসম্পন্ন লোকেরা রুখে দাঁড়িয়েছেন সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁরাও সীমা লংঘন করে গেছেন। একদিক থেকে বাড়াবাড়ি হলো একথা বলা—যে কোন মানুষ থেকে অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা ঘটতে পারে। ওলীদের কারামত সত্য এবং এর পরিমাণের কোন সীমারেখা নেই। অন্য দিক থেকে এই কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে যে, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কিছুই ঘটতে পারে না। কিন্তু আমাদের উচিত হলো—অতি উদারতা ও কঠোরতা বাদ দিয়ে প্রকৃত ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা।

## অপ্রাকৃত ঘটনাবলী অস্বীকারকারীদের যুক্তি ও সে বিষয়ে আলোচনা

অপ্রাকৃত ঘটনাবলী অস্বীকারকারীদের প্রধান যুক্তি হলো—এরূপ কার্যাবলী প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ এবং যে বস্তু প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ, তা অবান্তর। এ যুক্তির দ্বিতীয় আশ্রয় বাক্য সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রথম আশ্রয় বাক্যটি প্রমাণ করার কি পদ্ধতি রয়েছে? প্রকৃতির সকল নিয়ম কি এযাবত স্থিরীকৃত ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে? আমরা কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, যে সব বস্তুকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে অভিহিত করে থাকি, কেবল সেগুলোই বাস্তবিক পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম? আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ এখন প্রকৃতির এমন শত শত নিয়ম উদ্‌ঘাটন করেছে, যা ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আর এখনো নব নব তথ্য ও তত্ত্ব উন্মেষিত হচ্ছে। শত শত বরং হাজার হাজার বছর আগে ফকীর ও সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, তারা কেবল অন্তরের আকর্ষণ দিয়েই মানুষকে মোহিত করে ও প্রভাবান্বিত করতে পারে। বর্তমান বিজ্ঞান এযাবত তা অস্বীকার করতো এবং বলতো, একটি জড় বস্তু অপর একটি জড় বস্তুর সঙ্গে মিলিত না হয়ে কোন নতুন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করবে—এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যাদুবিদ্যার গুণে আত্মিক শক্তি প্রভাবিত হয়—এটা প্রমাণিত হওয়ার পর আগেকার সমস্ত অস্বীকৃত ঘটনাবলীকেও স্বীকার করে নিতে হলো। আজ একজন নিপুণ যাদুকর জনসমক্ষে কেবল দৃষ্টিশক্তির বলে বা আত্মিক শক্তির প্রভাবেই যে কোন লোককে অজ্ঞান করতে পারে; তার মুখ দিয়ে যে কোন কথা বলাতে পারে; যে কোন কাজ তার হাতে করাতে পারে।

প্রাচীন আরবী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে: মিসরে এক প্রকার মাছ আছে, যাকে স্পর্শ করলেই মানুষের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়। কম্পমান ব্যক্তি যদি মাছটি হাত থেকে ছুঁড়ে না ফেলে, তবে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অনেক দিন পর্যন্ত এ ব্যাপারটাকে বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ ব্যাপার বলে মনে করা হতো। বর্তমান বিজ্ঞান এরূপ মাছের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে এবং বলছে যে, এ মাছের গায়ে বিদ্যুৎ রয়েছে।

ইওরোপের বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন যে, যতই গবেষণা-কার্যের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে, ততই তথাকথিত অসম্ভব বস্তু সম্ভব বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

## অপ্রাকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে ইওরোপীয় জ্ঞানীদের অভিমত

বিখ্যাত ফরাসী জ্ঞানী কেমিল ফেলামারিয়ঁ পদার্থ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ বলে সুবিদিত। তিনি "স্পিরিচিউয়্যালিযম্" নামক গ্রন্থে বলেন : "মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস হলো যে বস্তু বাহ্যত সন্দেহযুক্ত বা যে বস্তুকে সে জানে না এবং বুঝতে পারে না, সে বস্তুর অস্তিত্বকে সে অস্বীকার করে বসে। হেরোডোটাসের রচনায় আমরা যখন দেখতে পাই যে, একজন স্ত্রীলোকের উরুতে বক্ষ ছিল এবং সেখান থেকেই সে তার সন্তানকে দুধ পান করাতো, তখন আমাদের হাসি পায় এবং আমরা তা নিয়ে বিদ্রূপও করি। কিন্তু ১৮২৭ সনের ২৫শে জুন প্যারিসে যে জ্ঞান-চর্চামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এ বিষয়টির চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

"অনুরূপভাবে আমাদের নিকট যদি বলা হয় যে, একজন লোক মারা গেছে, মৃত্যুর পর শরীর পরীক্ষা করে তার পেটে একটি সন্তান পাওয়া গেছে, এটা ছিল তার যমজ সন্তান, যা তার পেটে প্রতিপালিত হচ্ছিল, তখন আমরা ঘটনাটিকে গাঁজাখোরী বলে মনে করবো। কিন্তু কয়েকদিন হলো, আমি স্বয়ং দেখেছি যে, একটি সন্তান ছাপ্পান্ন বছর পর্যন্ত উদরে প্রতিপালিত হওয়ার পর ভূমিষ্ট হয়েছে। হেরো-ডোটাসের একজন অনুবাদক লিখেছেন যে, আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী রোকসান একটি সন্তান প্রসব করেছিল, যার মাথা ছিল না—একথাটি লোকেরা বিবেক বিরুদ্ধ বলে মনে করতো। কিন্তু আজ সকল চিকিৎসা-অভিধানে এটা সমর্থন করা হয় যে, অনেক সন্তান মাথা ছাড়াও জন্মগ্রহণ করে।"

"এ সব ঘটনাবলী আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে যে, আমরা যেন সতর্ক হই। কেননা যারা অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগিয়ে এসব ঘটনাকে অস্বীকার করে, তারা অজ্ঞ ও বোকা।"

আমাদের দেশে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইওরোপবাসী সাধারণত অপ্রাকৃত ঘটনাবলী অস্বীকার করে। এ জন্যই আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে প্রত্যেকটি লোক অতীন্দ্রিয় ঘটনাকে অস্বীকার করতে চায়। তাই আমি এ বিষয়ে ইওরোপের নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীদের মতামত ও ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

## আধ্যাত্মিকতা

যাঁরা জড়বাদী, যাঁদের গবেষণা পদার্থ ও তার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাঁরা অস্বাভাবিক ঘটনাবলী অস্বীকার করে আসছেন। বহুকাল পর্যন্ত ইওরোপে এ মনোভাব বিদ্যমান ছিল। অতঃপর দার্শনিকদের একটি দল আত্মা ও তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। এঁরা বহু পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের পর ঘোষণা করলেন যে, আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র একটি বস্তু। এর শক্তি ও উপলব্ধি সম্পূর্ণ আলাদা। আত্মা শতশত ক্রোশ দূরে থেকেও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কোন একটি বস্তুকে দেখতেও পারে, কোন একটি কথা শুনতেও পারে। তা আগাম ঘটনাবলী আঁচ করতে পারে। তা ইচ্ছা করলে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত নিজ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মোট কথা, আত্মার বলে এমন কার্যাবলী সংঘটিত হতে পারে, যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এ সম্প্রদায় তাঁদের ভাবধারা এত জোরালোভাবে প্রকাশ করেন যে, বিশিষ্ট লোকেরা এ গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য লণ্ডনে একটি বড় সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতির সদস্য ছিলেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ :

স্যার জন্ লেক্, পার্লামেণ্ট সদস্য, সমিতির সভাপতি।

অধ্যাপক হাক্সলী। তিনি ছিলেন বড় পদার্থবিদ ও উকিল।

লুইস্—বড় পদার্থ বিজ্ঞানী।

আলফ্রেড্ ওয়েল্স্—ডারউইনের সমসাময়িক। তিনি বিবর্তন মতবাদে বরাবর ডারউইনের সহযোগী ছিলেন।

মর্গন—অংকশাস্ত্র সমিতির সভাপতি।

জন্ কক্স।

এ ছাড়া আরো অনেক জ্ঞানী এ সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আঠার মাস পর্যন্ত এ সমিতি একাধারে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমিতির সদস্যগণ যে রিপোর্ট পেশ করেন, তার কয়েকটি বাক্য এই :

"সমিতি স্বচক্ষে দেখা অভিজ্ঞতা ও সন্দেহাতীত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করেই মতামত স্থির করেছেন। সমিতির পাঁচভাগের চারভাগ সদস্য গোড়ার দিকে এসব ঘটনাবলী অস্বীকার করতেন এবং মনে করতেন যে, এসব ঘটনাবলী হয়তো প্রতারণাপ্রসূত, নয়তো মানুষের

স্নায়ুবিক দুর্বলতাজনিত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ সূক্ষ্ম পরীক্ষণের পর তাঁদের স্বীকার করতে হলো যে, এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা সত্য ও বাস্তব।"

এরপর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এ বিষয়ে গবেষণার জন্য অপর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন হেজলপ ও হড্‌সন্। এ সমিতি প্রায় বার বছর গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন এবং ১৮৯৯ সালে তাঁরা গবেষণা কার্য শেষ করেন এবং এসব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। হেজলপ যে সব মতামত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো এই ঃ

আমি আশা করি, বছর খানেক পর নিশ্চিত প্রমাণ দিয়ে সারা দুনিয়াকে বুঝিয়ে বলতে পারবো যে, এই ধ্বংসশীল জগতের পরপারে আরো একটি জগত রয়েছে। আমি স্বচক্ষে এমন অনেক অতিস্বাভাবিক বস্তু দেখেছি, যাতে যাদু বা প্রতারণার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না।"

হড্‌সনের রিপোর্টের কয়েকটি বাক্য প্রণিধান করুন ঃ

"খুব শিগগির পৃথিবীতে নব নব তথ্য উন্মোচিত হবে। আশা করি, দু'বছরের মধ্যে আমি মানব জীবন সংক্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর নতুন ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবো। অধ্যাপক হেজলপ যদি এ দাবি করে থাকেন যে, তিনি মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথা বলেছেন, তবে তিনি পুরোপুরি সত্য কথাই বলেছেন।"

একজন সাংবাদিক হডসনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ

"আমি এবং অধ্যাপক হেজলপ একসঙ্গে গবেষণা আরম্ভ করেছি। আমরা উভয়ই ছিলাম প্রকৃতিবাদী। আমরা কিছুই বিশ্বাস করতাম না। আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল–আধ্যাত্মিকতার দাবিদারগণ আজব যে খেলা খেলছে, তাদের সেই গোমর ফাঁস করে দেওয়া। কিন্তু আজ আমি বিশ্বাস করি যে, মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যায়। এ বিষয়ে এত প্রকাশ্য যুক্তি রয়েছে যে, এখন সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই নেই।"

অধ্যাপক কক্স ছিলেন ইম্পিরিয়াল সায়েন্টিফিক্ সোসাইটির সভাপতি। তিনি জনসভায় বলেন ঃ "আমি কেবল এ কথাই বলি না যে, অপ্রাকৃত ঘটনা সম্ভব। বরং আমি বলি, এটা বাস্তব সত্য।"

অধ্যাপক কক্স বিশেষ করে অধ্যাত্মবাদের উপর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি প্রচুর সংখ্যায় পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন ঃ আমি বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছি। এখন এগুলো প্রকাশ করলে হয়তো সমালোচকেরা আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করবে—এরূপ কিছু মনে করা নৈতিক কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জড়বাদীদের মধ্যে জর্জ ইস্কাটন ছিলেন একজন বড় বিজ্ঞ লোক। তিনি আত্মার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এর প্রবক্তাকে তিনি ভীষণভাবে আক্রমণ করতেন। তিনি আত্মার বিশ্বাসীদের ধ্যান-ধারণার অসারতা প্রমাণ করার জন্য এ বিষয়টির প্রতি ধ্যান দেন এবং একটানা পনর বছর কাল এই সাধনায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বলে উঠলেন ঃ

আমি আমার ঘরে এ বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা কার্য চালিয়েছি। এ ঘরে আমার বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমি অন্যের সাহায্য না নিয়ে একাই নিশ্চিতভাবে একাজ করেছি। যাঁদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে, তাঁরা বিগত হয়েছেন। তাঁরা ছিলেন আমার আত্মীয় পরিজন।

পার্কস্ ছিলেন একজন প্রখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ। তিনি জ্ঞান-বিষয়ক এক পত্রিকায় লিখেছেন ঃ

"আত্মার বিরোধিতা করে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সে সব আমি পড়েছি এবং রচয়িতাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কও করেছি। আমি আত্মার বহিঃপ্রকাশ স্বচক্ষে দেখেছি এবং দশ বছর যাবত পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছি। এখন আমি বিদ্যা-বুদ্ধির সম্বল নিয়ে এ বিষয়টি আলোচনা করতে পারি।"

অংক শাস্ত্র সমিতির সভাপতি মর্গন বর্ণনা করেন ঃ আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি এবং স্বীয় কানে যা শুনেছি, তা আমাকে এত নিশ্চিত করে তুলেছে যে, এখন আমার কাছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

এ সম্পর্কে বড় সমর্থন রয়েছে রাসেল্ ওয়েল্সের। এই প্রখ্যাত জ্ঞানী ছিলেন ডারউইনের সহযোগী ও সমকক্ষ। ডারউইনের নব মতবাদে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ বিষয়ে 'আত্মার রহস্য' শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি বলেন ঃ

আমি ছিলাম প্রকৃতিবাদী এবং তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। আমি ভাবতেও পারিনি যে, আত্মাকে আমি সমর্থন করতে পারবো বা এটা বিশ্বাস করতে পারবো যে, এ পৃথিবীতে একটি জড় বস্তু অপর কোন জড় বস্তুর সংযোগ ছাড়া প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

'কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাকে এসব বস্তুর সত্যতা ও বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। আমি তখন বিশ্বাস করতাম না যে, এগুলো আত্মারই প্রভাব। কিন্তু স্বচক্ষে দেখা এসব ঘটনা আমার বিবেক-বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। কোন যুক্তি প্রমাণ ইতিপূর্বে আমাকে আত্মায় বিশ্বাসী করে তুলতে পারেনি; কিন্তু আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে আত্মাকে স্বীকার না করে আমার কোন গত্যন্তর ছিল না।"

অধ্যাপক এলিয়ট ছিলেন আমেরিকার সায়েণ্টিফিক সোসাইটির সভাপতি। তিনি এক পত্রিকায় লিখেছেন: আমাকে এ ধরনের একটি মাত্র ঘটনারও উদ্ধৃতি দিতে হবে—একথা চিন্তা করাও কিছু দিন আগে আমার পক্ষে কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু এখন আমি বুঝি যে, এ ধরনের বিশ্বাসকে গোপন করার মানে—আমার বুদ্ধিজাত উন্নতিকে হ্রাস করা। এখন এসব সত্য ঘটনা দেখে আমি আর নিশ্চুপ থাকতে পারছি না। যদি নীরব থাকি, তবে কাপুরুষতার শিকারে পরিণত হবো।

জার্মানির প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ জুল্‌নারও এ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন বিজ্ঞ সহযোগী ছিলেন। তাঁদের নাম:

ওয়েবার।

ফিশ্‌নার—প্রকৃতি-বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ডাস্ট—প্রখ্যাত বিজ্ঞলোক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

যথেষ্ট গবেষণা শেষে এসব বিজ্ঞ লোকেরা আত্মার অনেক রহস্য স্বীকার করেন। জুল্‌নার ছিলেন একজন বড় বিদ্বান। তাঁর স্বীকৃতি দেখে লোকেরা মনে করলো যে, তিনি হয়তো ভুল করেছেন। এতে জুল্‌নার 'জ্ঞানের কয়েকটি পাতা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেন এবং তাতে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বরাত্ দেন। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে সত্য, সে সম্পর্কেও তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন।

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে জ্ঞানমূলক যে সম্মিলনটি অনুষ্ঠিত হয়, তার কোন এক বৈঠকে মহৎ অংকবিদ্ অধ্যাপক লজ একটি ভাষণ দেন। সে সময় আত্মা সম্পর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন: জড় জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের মাঝখানে যে দেয়াল রয়েছে, তা এখন ভেঙ্গে পড়ার সময় এসেছে। কতগুলো বিঘ্ন তো পূর্বেই অপসারিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হবে যে, কত কিছু যে ঘটতে পারে, তার কোন সীমারেখা নেই। আমরা যে পরিমাণ জানি, তা অজানা বস্তুর তুলনায় কত যে কম, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।"

১৮৯৮ সালের ২২শে জুন যে সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অধ্যাপক ভুটিশ বলেন: আমি যেসব অপ্রাকৃত ঘটনা নিয়ে গবেষণা করেছি, সেসব শুনে ওঁরাই চটে যান, যাঁরা আলোচ্য বিষয়ের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি আমার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমার অভিজ্ঞতার ফলে যে অভিজ্ঞান অর্জন করেছি, তাতে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে মায়লন নামক স্থানে একটি বড় কমিটি গঠন করা হয়। এর সদস্যদের মধ্যে জার্মানির একজন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও ফরাসীর মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপকও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞ সদস্যগণ সতরটি অধিবেশনে অপ্রাকৃত বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের গবেষণার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন: আমরা যে সব অপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাতে কোন প্রকার যাদু বা চাতুর্য ছিল না। তাই আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এমনি ধরনের শত শত অভিজ্ঞান রয়েছে। সেগুলোর উদ্ধৃতি দিতে হলে একটি বড় গ্রন্থের প্রয়োজন। তাই 'দায়েরাতুল্ মাআরিফ' নামক বিশ্বকোষের কয়েকটি বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছি:

"আমেরিকা ও ইওরোপের লোকদের মধ্যে যাঁরা সাধারণ জ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে পারদর্শী, তাঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এ ধরনের একটি শক্তি আছে, যা এতদিন উদ্ঘাটিত হয়নি। এ শক্তি দিয়ে অনেক অবিশ্বাস্য কাজ করা যায়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোন প্রকার প্রতারণা বা হাতের সাফাই নেই। তাঁদের ধারণা হলো: এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা

যদি বাস্তবধর্মী নাও হয়, তথাপি কিছুটা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।''

এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে সব অপ্রাকৃত বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো সংখ্যায় হাজারের চাইতেও বেশী। এ গবেষণার উপর ভিত্তি করে যে সব সার্বিক অভিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, ক্যামিল ফেলামারিয় সেগুলো নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণনা করেন ঃ

(১) আত্মার অস্তিত্ব শরীর থেকে স্বতন্ত্র।

(২) আত্মার যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে তা এ যাবত অজ্ঞাত ছিল।

(৩) ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ছাড়াও আত্মা অন্যভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারে এবং তা অন্য বস্তুর উপরও আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

(৪) আত্মা আগাম ঘটনাবলী সম্পর্কেও অবহিত হতে পারে।

উক্ত ভাষ্যগুলোকে আমরা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই না। আমরা শুধু এটাই প্রমাণ করতে চাই যে, মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। সেটাকে আত্মা বলুন বা আঙ্গিক সংযোজনের বৈশিষ্ট্যই বলুন—তার ফলে যে সব অদ্ভুত কার্যাবলী সংঘটিত হয়, সেগুলোকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবক্তাগণ অপ্রাকৃত বলে আখ্যায়িত করেন এবং স্বীকার করেন যে, এ আত্মিক শক্তি পদার্থ ও জড়শক্তির ঊর্ধ্বে। তাই অপ্রাকৃত ঘটনাবলীকে কোন বুদ্ধিমান লোকই অস্বীকার করতে পারে না। তবে পার্থক্য হলো এই যে, সংস্কারাচ্ছন্ন ও সাদাসিধে লোকেরা বিশ্বাস করে যে, কোন কারণ ব্যতীতই সরাসরি আল্লাহর কুদরতে এসব সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু অনন্যসাধারণ লোকেরা মনে করে যে, এই কার্য-কারণের জগতে প্রত্যেকটি বস্তুই কারণনির্ভর। তাই অপ্রাকৃত বিষয়াদির পেছনে কোন না কোন কারণ নিশ্চয়ই থাকবে।

মুসলিম জাহানে যে সব দার্শনিক ও জ্ঞানী বিগত হয়েছেন, যেমন ইমাম গাযালী, ইব্‌নে রুশ্‌দ্‌, শাহ ওলীউল্লাহ—এঁরা এ ধরনের অপ্রাকৃত ঘটনাবলীকে কারণ-প্রসূত বলেই বর্ণনা করেন। তাঁরা সেই সব কারণসমূহের ব্যাখ্যা দেন, যেগুলোর ফলে অপ্রাকৃত ঘটনাবলী সংঘটিত হয়ে থাকে। ইমাম গাযালী মুজিযাকে তিনভাগে বিভক্ত করেন ঃ বাস্তব, কল্পিত ও বুদ্ধিজাত। প্রথম প্রকার মুজিযার কথা ইমাম গাযালী কেবল আশায়েরাপন্থীদের খুশী করার জন্যই বলেছেন।

বাকি দু'টো মুজিযা হলো তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা-প্রসূত। এগুলো পুরোপুরি আধুনিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানসম্মত। আমি ইমাম গাযালীর 'জীবন-চরিত' গ্রন্থে এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব শব্দের উদ্ধৃতি দিয়েছি। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

## অপ্রাকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে বু-আলী সিনার মতামত

বু-আলী সিনাও অনেকদিন পর্যন্ত অপ্রাকৃত কার্যকলাপকে অস্বীকার করে আসছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক সূফীদের অপ্রাকৃত ঘটনাবলী এত বেশী তাঁর নজরে পড়েছিল যে, সেগুলোর কারণ নিয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনা না করে পারেন নি এবং সেগুলো স্বীকার না করেও পারেন নি। **'ইশারাত'** গ্রন্থের ভাষাই তাঁর এ মনোভাবের পরিচায়ক। বু-আলী সিনা অপ্রাকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে বলেন ঃ

"এগুলো ছিল আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এতে যখন অপ্রাকৃত ঘটনার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো, তখন আমি সেগুলোর কারণ সন্ধানের পেছনে পড়লাম। এ সম্পর্কে আমি স্বয়ং যা দেখেছি এবং যাঁদের আমি বিশ্বস্ত বলে মনে করি, তাঁরা যা দেখেছেন, সে সব যদি লিখতে হয়, তবে দীর্ঘ একটি গ্রন্থে পরিণত হবে।"

বু-আলী সিনা বিভিন্ন অপ্রাকৃত ঘটনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে আত্মিক ক্ষমতার প্রভাবকেই তিনি সব চাইতে বড় কারণ বলে অভিহিত করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"এটা স্পষ্টতই বলা যায় যে, কল্পনা ও চিন্তার প্রভাব দেহের উপর এমনিভাবে পড়ে যেমন আনন্দের প্রভাবে চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়। দুশ্চিন্তার ফলে অনেক সময় মানুষ পীড়িত হয়ে পড়ে। এমনিতেই মানুষের মনে কারো সম্পর্কে অশুভ ধারণা জন্মায়। সেই ধারণার ফলে ক্রোধের উদ্রেক হয়। অতঃপর ক্রোধের দরুন দেহে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, এমন কি সে ব্যক্তি ঘর্মাক্তও হয়ে উঠে। জড়বাদীরা বলে থাকেন, জড় বস্তুর উপর কেবল জড় পদার্থই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উক্ত যুক্তিতে জড়বাদীদের সে দাবি অসারতায় পর্যবসিত হয়। কেননা চিন্তা, কল্পনা, ক্রোধ এ সব জড় পদার্থ নয়, বরং অবস্থার নাম। তা সত্ত্বেও দেহের উপর এ সবের প্রভাব পড়তে দেখা যায়।"

"এ সব অবস্থার দরুন মানুষ যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাবান্বিত হয়, তেমনি এসব শক্তি প্রবল হলে তা অপরাপর মানুষের উপরও

প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ শক্তি কারো মধ্যে বেশী থাকে, আবার কারো মধ্যে কম। কারো মধ্যে তা এত বেশী থাকে যে, তাতে অতীব অদ্ভুত ঘটনাও সংঘটিত হয়।"

"যে ব্যক্তির মধ্যে এ শক্তি স্বভাবিক ভাবে বিদ্যমান থাকে, তিনি যদি স্বভাবতই সচ্চরিত্র হন এবং এ শক্তিকে সদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন, তবে হয়তো তিনি নবী হবেন, নয়তো ওলী। আর যদি এ শক্তির অধিকারী লোকটি স্বভাবতই দুশ্চরিত্র ও অসৎ হয় এবং এ শক্তিকে মন্দ কাজে লাগায়, তবে সে ব্যক্তি হবে যাদুকর বা বাজিকর।"

ইমাম গাযালী 'মাআরিজুল্ কুদ্স্' নামক গ্রন্থে নবীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন ঃ

"কোন কোন লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আমাদের আত্মিক ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশী এবং এরূপ হওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। এরূপ ক্ষমতা বলে মানুষ যেভাবে নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তেমনি জগতকেও প্রভাবান্বিত করতে পারে।"

বু-আলী সিনা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেন, তা পুরোপুরি আধুনিক জ্ঞানসম্মত। অধ্যাত্মবাদীরা পরিষ্কার ভাষায় সমর্থন করেন যে, আত্মা একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বস্তু। অতিমানবিক ঘটনাবলী এর প্রভাবেই ঘটে থাকে। যাঁরা আত্মায় বিশ্বাসী নন, তাঁদেরকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি নিহিত আছে, যার বদৌলতে অপ্রাকৃত এমন ঘটনাও ঘটতে পারে, যা জড় পদার্থে সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে ইওরোপের আধুনিক জ্ঞানলব্ধ বড় বড় বিদ্বানের মতামত পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা, অতিপ্রাকৃত ঘটনা এমন বস্তু নয়, যার উপর ভিত্তি করে কোন ধর্মকে বাতিল বলা যেতে পারে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, অপ্রাকৃত ঘটনা সংঘটিত হওয়া মামুলি ব্যাপার নয়। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এর উপর নির্ভর করা উচিত হবে না। কুর'আন মজীদ নিশ্চিত সত্য। তাই তাতে যে সব অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। কিন্তু প্রথমে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে যে, কুরআন মজীদের ভাষায় সেগুলো নিশ্চিতভাবে অপ্রাকৃত ঘটনা কি-না ?

তফসীরকারদের মধ্যে যাঁরা সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন যেমন কাফ্ফাল্, আবু মুসলিম ইস্ফাহানী, আবুবকর আসুম তাঁদের ভাষ্যানুসারে কুরআনে অতিপ্রাকৃত ঘটনা খুব কমই রয়েছে। তবে যেগুলো অতি-প্রাকৃত বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো অস্বীকার করার জো নেই।

সর্বশেষে এটাও বলে রাখা উচিত, আশায়েরাপন্থী ও বর্তমানের সাধারণ মুসলমানেরা অতিপ্রাকৃতের গণ্ডিকে যেভাবে প্রশস্ত করে তুলেছেন, তাতে প্রত্যেক প্রকার অবান্তর ও অবাস্তব বস্তুই এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ছে। আমরা অবান্তর ও অবাস্তব বস্তুর সম্ভাবনার দাবিকে যথার্থ মনে করতে পারি না। বহুদিন পর্যন্ত জলমগ্ন মানুষটিকে দরিয়ার একটি পাথর কণা নিক্ষেপ করে জীবিত করা কেবল অতিস্বাভাবিক কার্যই নয়, বরং অবাস্তব। অতিস্বাভাবিকতার সম্ভাবনাকে বৈধ ও যথার্থ বলার মানে এ নয় যে, এ ধরনের কল্পিত কাহিনীসমূহকেও শুদ্ধ বলে পরিগণিত করতে হবে।

## মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) নুবুওয়াত

"তিনি ( আল্লাহ্ ) অজ্ঞদের মাঝে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত পাঠ করেন এবং তাদের পরিশোধিত করেন।" ( আল্-কুরআন )

সাধারণ নুবুওয়াতের হকিকত জ্ঞাত হওয়ার পর নবীজীর নুবুওয়াতের ব্যাপারটা এমনিতেই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠার কথা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নবীর হকিকত কয়েকটি বিষয়ের সংযোগ সাধনেরই নামান্তর ঃ স্বয়ং নবীকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে হবে এবং অন্যান্যদেরকেও পূর্ণতাপ্রাপ্ত করে তোলার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকতে হবে; তাঁর বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জিত হবে না, বরং তা হবে আল্লাহ্ প্রদত্ত। এসব গুণ যেভাবে পূর্ণ মাত্রায় রসূল করীমের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তার নজীর পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত কারো মধ্যে দৃষ্ট হয় নি।

চিন্তা করে দেখুন, যিনি কোন প্রকার প্রকাশ্য ও প্রচলিত শিক্ষা-লাভ করেন নি, চোখ খুলে চারদিকে মূর্তিপূজা ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি, যাঁর কানে নাকাড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই বাজে নি, যিনি আল্লাহ্‌তত্ত্ব, নৈতিকতা, সামাজিকতা এবং তহযীব-তমদ্দুন সম্পর্কে এমন সূক্ষ্ম শিক্ষা দান করেছেন, যা কোন দার্শনিক, বিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ, এমনকি অন্যান্য নবীর পক্ষেও সম্ভব হয় নি, যিনি অজ্ঞতা, বর্বরতা, জোর-জুলুম, পাপাচার ও রক্তপাতে লিপ্ত জাতির মনে পবিত্রতা ও সত্যতার রুহ ফুঁকে আকস্মিক বিপ্লব সাধন করেছেন, তিনিই মুহম্মদ রসূলুল্লাহ ( সঃ )। তিনি ছাড়া এমন কাজ আর কে করতে পারে?

চিন্তা করুন, রসূল করীমের আবির্ভাবের সময় সারা দুনিয়ায় কি অবস্থা বিরাজমান ছিল? হিন্দুরা ও মিসরীয়গণ শত শত খোদা ও অবতারে বিশ্বাস করতো; খ্রীস্টানেরা ত্রিত্ববাদের সমর্থক ছিল; সায়েবীন সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজক ছিল; অগ্নিপূজকেরা 'ইয়ায্‌দান্' ও

'আহ্‌রিমাম'—এই দুই খোদার বিশ্বাসী ছিল ; ইহুদী তওহীদের সমর্থক ছিল, কিন্তু তারা যে খোদা মানতো, তা ছিল মানুষের সমকক্ষ বা তার চাইতেও নিকৃষ্ট। আরববাসীরাতো আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই মানতো না, আর মানলেও এমন আল্লাহ্‌ মানতো, যা হতো অসংখ্য কন্যার (ফেরেশতার) অধিকারী। অনেক সম্প্রদায় রোজ রোজ স্বতন্ত্র আল্লাহ্‌ মানতো।

মানুষের চতুষ্পার্শে যে সব ধ্যান-ধারণা বিরাজ করে বা যে সব ঘটনা ঘটে থাকে, সেগুলোর প্রতিচ্ছবিই তার মনে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মানুষের স্বভাব হলো, সে তার চতুষ্পার্শস্থ ভাবধারাকে রদবদল ক'রে একটি স্বতন্ত্ররূপে রূপায়িত করে। এখন চিন্তা করুন, সাধারণ মানুষের স্বভাব মাফিক যদি মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) মনেও আল্লাহ্‌র প্রচলিত ধারণা উদিত হতো, তবে তা এমনি ধরনের চিত্র হতো, যা সে সময়কার লোকের মনে অংকিত ছিল। কিন্তু তিনি (রসূল করীম) যে আল্লাহ্‌র চিত্র মানুষের মনে বিধৃত করেন, তা ছিল ভিন্ন ধরনের ; সে আল্লাহ্‌ ছিল একক, যাঁর সত্তা ও গুণাবলীর সংগে মানুষের গুণাবলীর কোন মিল নেই। তাঁর বর্ণিত আল্লাহ্‌ জমিনেও থাকেন না, আকাশেও থাকেন না, উপরে, নীচে, ডানে, বামে বা নির্দিষ্ট কোন স্থানে তিনি নেই, বরং রয়েছেন সর্বত্র। তিনি কণা-অনুকণা সবই জানেন, পিঁপড়ার পায়ের আওয়াজও তিনি শুনতে পান। তিনি আমাদের মনের গোপনীয় কথা জানেন। এত পবিত্র, এত পূর্ণতাপ্রাপ্ত, এত উচ্চ সত্তার অধিকারী আল্লাহ্‌র ধারণা কোন মানুষে দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ্‌ই এ ধারণা কারো মনে উদিত করতে পারেন, যিনি এসব ঐশ গুণে ভূষিত।

## রসূল করীম তওরাত ও ইনজীল শিক্ষা করেছেন— খ্রীস্টানদের এ দাবি সত্য নয়

রসূল করীম শিক্ষিত ছিলেন, তিনি তওরাত ও ইনজীল জানতেন এবং জরজীস নামক জনৈক খ্রীস্টানের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন— এ বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য খ্রীস্টানেরা খুবই চেষ্টা করেন। যদি এটা যথার্থ হতো, তবে রসূল করীমের পক্ষে উপরিউক্ত গুণে গুণান্বিত আল্লাহ্‌র ধারণা দেওয়া একান্ত মুশকিল হয়ে পড়তো। কেননা সে সময়কার তওরাত ও ইনজীলের একজন খ্রীস্টান শিক্ষক তাঁকে

সে আল্লাহ্‌র শিক্ষাই দিতে পারতেন, যা তাঁর (শিক্ষকের) ধারণা মোতাবেক ছিল। বিখ্যাত ফরাসী জ্ঞানী ক্যাণ্ট হেন্‌রী তাঁর 'ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে বলেন ঃ

"যে সব ভাষ্যে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, মুহম্মদ খ্রীস্টান, ইহুদী ও নক্ষত্রপূজকদের নিকট থেকে সামনাসামনি ধর্মীয় বিশ্বাস শিক্ষা করেছেন, সেগুলোর সন্ধান পাওয়া গেলে উপকার হবে। কেননা তাতে প্রতীয়মান হবে যে, কোন্ কোন্ স্থানে কুরআন ও ইনজীলের আয়াতসমূহে ভাবের ঐক্য রয়েছে। তথাপি বলতে হয় যে, এটা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর আলোচনা। কারণ যদিও এটা মেনে নেওয়া হয় যে, কুরআন অন্যান্য ঐশ গ্রন্থ থেকেই গৃহীত, তথাপি তাতে এ প্রশ্নের সমাধান হয় না যে, মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে এই ধর্মীয় প্রেরণা কি করে সৃষ্টি হলো এবং তওহীদের প্রতি তাঁর মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস কি ক'রে জন্মালো? এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর দেহ ও আত্মাকে পুরোপুরি ঘিরে রেখেছিল।"

এ লেখক একটু অগ্রসর হয়ে বলেন ঃ

"তওরাত ও ইনজীল অধ্যয়নের ফলেই মুহম্মদের মনে এ বিশ্বাস শিকড় গজিয়েছিল—এ কথা মোটেও ভাবা যায় না। তিনি যদি এসব গ্রন্থ পাঠ করতেন, তবে তা ছুঁড়ে ফেলতেন। কেননা এসব গ্রন্থ ছিল তাঁর স্বভাব, অভিজ্ঞান ও রুচিবিরুদ্ধ। তিনি তাঁর ভাষা দিয়ে যে বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন, তা ছিল তাঁর জীবনের সব চাইতে বড় অভিব্যক্তি। এতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন সত্য রসূল এবং শান্তিবহ পয়গাম্বর।"

এখন আমি বিস্তারিতভাবে দেখাতে চাই যে, রসূল করীম ওহীর মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাস, উপাসনা, নৈতিকতা ও সামাজিকতা সম্পর্কে যে সব নীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তা এত পূর্ণাঙ্গ ও এত উচ্চমানসম্পন্ন ছিল যে, কোন দার্শনিক বা আইনজ্ঞের মনেই তা উদিত হয় নি এবং ওহীর সাহায্য ছাড়া কারো মনে সে সব ধারণা উদিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না।

## ধর্মীয় বিশ্বাস

( আকায়েদ )

এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রশ্ন হলো—মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও ইজতেহাদ ক'রে ধর্মীয় বিশ্বাস স্থির করবে, নাকি অন্যান্যদের অনুকরণ ক'রে? ইসলামের পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে ধর্ম-বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া অন্য সবাইকে এ ব্যাপারে অনুকরণ করতে হতো। খ্রীস্টানদের মধ্যে পোপ, ইহুদীদের মধ্যে ইহুদীপণ্ডিত (আহ্‌বার), অগ্নিপূজকদের মধ্যে পুরোহিত (দস্তুর) এবং হিন্দুদের মধ্যে ঋষি ছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদিতে কিছু বলার অধিকার আর কারুরই ছিল না। সর্বসাধারণ লোক এ বিষয়ে স্বাধীন মত পোষণ করতে পারতো না।

ইসলাম এ ধরনের অনুকরণকে 'শির্‌ক্' বলে অভিহিত করলো এবং ঘোষণা করলো ঃ

"খ্রীস্টান ও ইহুদীরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত (আহ্‌বার) ও পাদ্‌রীদেরকে আল্লাহ্‌-তে পরিণত করেছে।"

(আল্ কুরআন)

### ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুকরণ করা শির্‌ক্

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আহ্‌লে কিতাবগণ বিস্ময় সহকারে বলতে আরম্ভ করলো ঃ আমরা আহ্‌বার (ইহুদী ধর্ম-নেতা) ও পাদরীদের কি করে আল্লাহ্‌-তে পরিণত করলাম? রসূল করীম উত্তরে বললেন ঃ তোমাদের বিশ্বাস হলো ঃ পাদরিগণ যে বস্তুকে হালাল মনে করেন, তাই হালাল হয়ে যায়, আর তাঁরা যে বস্তুকে হারাম বলে ঘোষণা করেন, তাই হারামে পরিণত হয়।

এ বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

"হে মুহম্মদ, আপনি আহ্‌লে কিতাবদের বলুন—আপনারা এমন একটি কথায় সায় দিন, যা আমাদের ও আপনাদের মধ্যে সাধারণ-

ভাবে গ্রহণযোগ্য। সে কথাটি হলো—আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা না করি, আল্লাহ্র সংগে আর কাউকে শরিক না করি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে একে অন্যকে যেন প্রভুতে পরিণত না করি।"

ধর্মীয় বিশ্বাসের বেলায় ইসলাম পূর্ণ আজাদী দান করেছে। রসূল করীমের সাহাবাদের মধ্যে যদিও মর্যাদার দিক থেকে সকল ব্যক্তি একই পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না, বরং একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষেত্রে কেউ কারো অনুকরণ করতেন না। বরং প্রত্যেকেই নিজ বিবেক বুদ্ধি অনুসারে কাজ করতেন। পরবর্তী সময় ইসলামের অবনতি ঘটলে মুসলমানদের মধ্যে অনুকরণের অভ্যাস দেখা দেয়। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষেত্রে এ অনুকরণ স্থান পায় নি। আজও মনে করা হয় যে, ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুকরণ অবৈধ।

ইসলামের এ নির্দেশটি তার জন্মলগ্নের দীর্ঘ এক হাজার বছর পরেই মার্টিন লুথারের মনে জাগে। ধর্মীয় বিশ্বাসের এই স্বাধীন মনোভাব নিয়ে তিনি দুনিয়াকে পোপদের দাসত্ব থেকে রক্ষা করেন। ইওরোপে ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষেত্রে যে আজাদী পরিলক্ষিত হয়, তা বস্তুত ইসলামের এ নির্দেশেরই ফলশ্রুতি।

## বিস্তারিত ধর্মীয় বিশ্বাস ঃ

## আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলী

ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো—আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলীর বিষয়টি। বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখুন, এমন একান্ত জরুরী বিষয়ে সকল ধর্মাবলম্বী, বলতে গেলে সারা জাহান একটি বড় ভুল ধারণার শিকারে পরিণত ছিল। খ্রীস্টানেরা তিন খোদা মানতো। তারা মনে করতো - তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন রয়েছে। এই যে পরস্পরবিরোধী ধারণা—এটা তাদের জ্ঞানে আসতো না। তারা বলতো—ধর্মীয় বিশ্বাসকে বুঝে নেওয়া জরুরী নয়। মিসরীয় লোকেরা কয়েক কোটি খোদা মানতো।

## আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে ধর্মাবলম্বীদের ভ্রান্তি

পার্সীদের জ্ঞানে এ কথা আসতো না যে, একই আল্লাহ্র হাতে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয় কাজ সাধিত হতে পারে। এ জন্য তারা ভাল ও মন্দের জন্য আলাদা আলাদা আল্লাহ্ স্থির করে নেয়।

হিন্দু ধর্মে কম পক্ষে তিন আল্লাহ ছিল : ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। অবতার ছিল শতে শতে নয়, বরং হাজারে হাজারে। ইহুদীরা অবশ্য এক আল্লাহ্-তে বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা আল্লাহ্র জন্য এমন কতগুলো গুণ নির্ধারণ করেছিল, যাতে তাঁর মহিমা ও মর্যাদা একজন সাধারণ লোকের পর্যায়ে নেমে আসে।

এতো ছিল ওদের অবস্থা, যারা কোন না কোনভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করতো। কিন্তু এমন লোকেরও অভাব ছিল না, যারা সমূলেই আল্লাহ্র অস্তিত্বের বিশ্বাসী ছিল না। এদেরকে বলা হতো 'ধর্মহীন', 'প্রকৃতিবাদী', 'জড়বাদী' ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুনিয়া দিগন্তব্যাপী তিমিরে নিমজ্জিত ছিল। অকস্মাৎ ইসলাম আবির্ভূত হয়ে সমস্ত অন্ধকার, ভুল ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের নিরসন করে দিল। ইসলাম ঘোষণা করলো—আল্লাহ্ এক ; তাঁর জন্য কাল, স্থান, দিক, উচ্চতা ও নিম্নতা—এসব কিছুই নেই। ইসলাম আল্লাহ্র পবিত্রতার যে বর্ণনা দিয়েছে, তাতে ইওরোপও বিস্ময় প্রকাশ করেছে। গিবন বলেন : "আল্লাহ্কে স্থান, কাল, দিক, ইংগিত—এসবের উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। সুতরাং তাঁকে বোঝার জন্য আর কি বাকি রয়েছে ?"

এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামের এমন একটি ব্যাপক ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যা জড় বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

## খাঁটি তওহীদ প্রতিষ্ঠা ও নানাবিধ মূর্তিপূজার উৎখাত সাধন

আল্লাহ্র এই গুণাবলীর উপর ভিত্তি করেই ইসলাম প্রত্যেক প্রকার মূর্তিপূজা উৎখাত করেছে। কেননা আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলাম যে পাকপবিত্র ধারণা সৃষ্টি করেছে, সেটা এমন প্রকৃতির ছিল না যে, তাঁকে কোন একটা রূপে রূপায়িত না করলে মনুষ্য-জ্ঞানে তিনি আসন পেতে পারেন না। হিন্দু, মিসরী, সাবী, রোমান ক্যাথলিক সকল ধর্ম ও সকল দেশের লোকেরা আল্লাহ্র উপলব্ধির জন্য একটি রূপের প্রয়োজন অনুভব করতো এবং এজন্যই তারা মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করতো। ইসলাম ধর্মে শত শত কেন, হাজার হাজার সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ই আজ পর্যন্ত মূর্তিপূজার কথা চিন্তা করে নি। আজ পৃথিবীতে হিন্দু, খ্রীস্টান, পার্সী—সকল ধর্মে প্রগতিভাবাপন্ন লোক জন্মগ্রহণ করছে এবং তারা খাঁটি তওহীদের

দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা যতই প্রসার লাভ করছে, আল্লাহ্ যে অশরীরী ও আকার মুক্ত, ততই তা প্রতিভাত হচ্ছে।

আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে নেওয়ার পর যে প্রশ্নটি দাঁড়ায়, তা হলো—আল্লাহ্‌র সংগে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক কি করে স্থাপিত হতে পারে? প্রত্যেকটি সম্প্রদায় এ উদ্দেশ্যে একটি মাধ্যম অবলম্বন করে এবং অবতার, দেবতা বা পীরের সাহায্য খুঁজে বেড়ায়। ইসলাম ঘোষণা করলো যে, আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝখানে কোন দেয়াল নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং নিজের সকল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে পারে। তাঁর দরবারে চেষ্টা, সুপারিশ ও মধ্যস্থতার অবকাশ নেই। তিনি সকলের কাছে রয়েছেন; সকলের আওয়াজ শুনতে পান; সকল মানুষই তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে।

"আমি মানুষের ঘাড়ের রগের চাইতেও তার অধিকতর নিকটবর্তী।"

(আল্-কুরআন)

## নুবুওয়াত

তওহীদের পরেই হলো নুবুওয়াতের স্থান। এ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী একটি ভ্রান্তি প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকটি দল ও প্রত্যেকটি সম্প্রদায় মনে করতো যে, নবীরা মানুষের অনেক উর্ধ্বে। জোরোয়াস্টার ও হযরত ঈসা (আঃ)-কে হুবহু আল্লাহ্ বা তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে তাদের এ ধারণাই কাজ করেছিল। ইসলাম খুব জোরালো, স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে ঘোষণা করলো যে, নবীরা মোটেই মনুষ্য গণ্ডির বহির্ভূত নয়।

## কুরআন মজীদে আছে

"হে মুহম্মদ, আপনি বলুন, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যে, তোমাদের আল্লাহ্ এক।"

"আল্লাহ্‌র বান্দা সাজতে হযরত ঈসার কোন সংকোচ নেই। হে মুহম্মদ, আপনি বলুন—আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে; এটাও আমি বলছি না যে, অদৃশ্য বিষয়াদি আমি জানি; আবার এটাও দাবি করছি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমি কেবল আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত ওহীরই অনুসরণ করছি। হে মুহম্মদ, আপনি বলুন—আমি যদি অদৃশ্য বিষয়সমূহ জানতাম, তবে আমার অনেক উপকার সাধিত হতো।"

পৃথিবীতে যত ধর্ম বিগত হয়েছে, তন্মধ্যে সব কয়টিই আল্লাহ্ ও নবীকে একই স্তরে উপনীত করেছে, অথবা নবীকে আল্লাহ্র কাছাকাছি নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে ইসলামের কৃতিত্ব হলো—তা উভয়ের সীমারেখাকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছে।

খুব চিন্তা করে দেখুন, আমরা মুসলমান। আমরা রসূল করীমকে নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। তা সত্ত্বেও হযরত ইব্রাহীমকে 'খলীলুল্লাহ্' (আল্লাহ্র বন্ধু), হযরত মূসাকে 'কলীমুল্লাহ্ (আল্লাহ্-সম্ভাষিত), হযরত ঈসাকে রুহুল্লাহ (আল্লাহ্র আত্মা) বলে অভিহিত করি এবং মুহম্মদ (সঃ)-কে রসূলুল্লাহ (আল্লাহ্ প্রেরিত) বলে আখ্যায়িত করি। শুধু এটাই নয়, নামাযে যখন শাহাদত্ (সাক্ষ্য) এর কথা উচ্চারণ করি, তখন রিসালতের প্রতি স্বীকারোক্তি করার পূর্বেই 'আব্দুহু' (তাঁর বান্দা) শব্দটি উচ্চারণ করি এবং বলি— "আশ্হাদু-আন্না-মুহাম্মাদান আব্দুহু-ও-রাসূলুহু।"—অর্থাৎ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (সঃ) প্রথমত আল্লাহ্র বান্দা, এর পরবর্তী পর্যায়ে তিনি হলেন আল্লাহ্র রসূল। এরূপ কেন বলি? তার কারণ হলো, আল্লাহ্র একত্বের পূর্ণতা হলো—তাঁর সামনে কোন মানুষ যেন মনুষ্য-স্তরের ঊর্ধ্বে না উঠে, সে মানুষটি যতই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হোক না কেন। রসূল করীমের কাজ ছিল মানুষের মনে খাঁটি তওহীদ প্রতিষ্ঠিত করা। এজন্যই তিনি সাদাসিধেভাবে বান্দা এবং রসূল বলে আত্মপরিচয় দেন।

### শাস্তি ও প্রতিদান

পরকাল, শাস্তি, পুণ্য ও প্রতিদান সম্পর্কে সকল ধর্মাবলম্বীদের এ ধারণা পূর্বেও ছিল আর এখনো রয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ্র আদেশ মেনে না চললে তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু দুনিয়া কর্ম-ক্ষেত্র বলে এখানে তাদের শাস্তি দেওয়া হয় না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ যখন বিচারের আসনে বসবেন, তখন তাদের সমস্ত ব্যাপার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। সেদিন তিনি প্রত্যেকের কর্মানুসারে অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেবেন। এমনিভাবে অনুগত লোকেরাও তাদের আনুগত্যের পুরস্কার লাভ করবে।

এ ধারণাটি মানুষের মনের সংগে খাপ খায়। সাধারণ লোকদের ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এর চাইতে উত্তম পন্থা আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু শাস্তি ও পুণ্যের এটা আসল হকিকত নয়। এ দু'টোর আসল স্বরূপ বোঝাবার একটি সহজ উপায় আছে। তা হলো জড় পদার্থে যেমন 'কার্য-কারণ-শৃঙ্খল' রয়েছে, যথা বিষ পান হত্যা ডেকে আনে, গোলাপ-জল সর্দি ডেকে আনে, তৈলাক্ত খাদ্য দাস্ত ঘটায়, তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও রয়েছে। ভাল-মন্দ যত কাজ আছে, আত্মার উপর প্রত্যেকটির ভাল বা মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ভাল কাজে আত্মা উৎফুল্ল হয়, আর মন্দ কাজে সংকোচ, দ্বিধা ও অপবিত্রতা সৃষ্টি হয়। এগুলো এমন ফলাফল, যা কার্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি কারো কিছু মাল চুরি করেছে। এখন মালের মালিক যদি চুরির অপরাধ ক্ষমা করেও দেয়, তবুও চুরি করার ফলে চোরের ইজ্জতে যে ব্যত্যয় ঘটেছে, তা কোন রকমেই বিদূরিত হতে পারে না। মোট কথা, ভাল কাজের ফলে আত্মায় সৌভাগ্যের যে ছাপ অংকিত হয় এবং মন্দ কাজের দরুন দুর্ভাগ্যের যে করাল ছায়া প্রতিফলিত হয়, সেটাকে বলা হয় শাস্তি ও পুণ্য, আর এগুলো হলো মানুষের কার্যাবলীর অপরিহার্য ফল। ইমাম গাযালী 'আল-মাদ্‌নূনু আলা গায়রি আহ্‌লিহী' গ্রন্থে বলেন ঃ

আদেশ-নিষেধ অমান্য করার ফলে যে শাস্তি হবে, তার মানে এ-নয় যে, আল্লাহ্ রুষ্ট হবেন এবং প্রতিশোধ নেবেন। বরং এর দৃষ্টান্ত হলো এমনি ধরনের, যেমন—যে ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করবে না, তার সন্তানাদিও হবে না। আনুগত্য ও অবাধ্যতার ফলে কেয়ামতের দিন যে পুণ্য বা শাস্তি হবে, তার অর্থও এমনি ধরনের। সুতরাং গুনাহ্ করলে কেন শস্তি হবে—এ প্রশ্নটি হলো এমনি ধরনের, যেমন কেউ বললো : বিষ খেলে যে কোন প্রাণী মারা যায় কেন?

ইমাম গাযালী এ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন যে, কোন কার্যের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ দেওয়া বা কোন কার্য থেকে বিরত রাখার ব্যাপারটা হলো এমনি ধরনের, যেমন একজন চিকিৎসক কোন রোগীকে ঔষধ সেবনের ও ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়ে থাকেন। এখন রোগী যদি চিকিৎসকের কথানুযায়ী না চলে, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। এ ক্ষতির কারণ হলো—রোগী খাওয়া-দাওয়ায় সতর্কতা অবলম্বন করে নি। কিন্তু সাধারণ লোক বলবে—রোগী চিকিৎসকের কথা মান্য করে নি বলেই তার এ অহিত ঘটেছে। অথচ অহিতের মূল কারণ হলো পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন না করা। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসক যদি রোগীকে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি সতর্কতা

অবলম্বনের আদেশ নাও দিতেন, তবুও অসতর্কতার দরুন তার অহিত নিশ্চয়ই ঘটতো। এমনিভাবে আল্লাহ্ যদি মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ নাও দিতেন, তথাপি এ সব পাপাচারের দরুন তার আত্মাকে কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করতেই হতো।

নাস্তিকেরা প্রশ্ন করে থাকে, মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্র কী লাভ? শাস্তি বা প্রতিশোধ কেবল সে ব্যক্তিই দেয় বা নিয়ে থাকে, যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা যার ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা থাকে। আল্লাহ্ এসবের ঊর্ধ্বে। সারা পৃথিবীও যদি পাপাচারে নিমগ্ন হয়, নামায-রোযা কিছুই না করে, তাতে আল্লাহ্র কি আসে যায়? এমতাবস্থায় প্রতিশোধ নিয়ে তাঁর কী লাভ?

নাস্তিকেরা আরো ব'লে থাকে, বস্তুত প্রত্যেক ধর্মের লোকেরাই মানবোচিত চিন্তাধারার আলোকে আল্লাহ্কে উপলব্ধি করে থাকে। তারা দেখতে পায় যে, দুনিয়াতে বাদশাগণ রায়তের অবাধ্যতায় ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তারা দোষীকে ভীষণ শাস্তি দেয়। এজন্য ধর্মাবলম্বীরাও আল্লাহ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে এবং বলে যে, তিনি পাপের দরুন অসন্তুষ্ট হন এবং কেয়ামতের দিন পাপীদের দোজখে নানাবিধ শাস্তি দেবেন।

কিন্তু শাস্তি ও পুণ্যের যে হকিকত আমি বর্ণনা করেছি, সে বিষয়টির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখা হয়, তবে নাস্তিকদের এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

শাস্তি ও পুণ্য সম্পর্কে ইসলাম সাধারণভাবে ঐ নীতিই অবলম্বন করেছে, যা পূর্ববর্তী সকল ধর্মের লোকেরা করেছিল এবং সর্বসাধারণের জন্য সেটাই ছিল অপরিহার্য। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তা হলো—পরিষ্কারভাবেই হোক, আর ইঙ্গিতেই হোক, ইসলাম শাস্তি ও পুণ্যের আসল হকিকত বর্ণনা না করে ক্ষান্ত হয় নি। এ বৈশিষ্ট্যই ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের উপর স্থান দিয়েছে। অন্যান্য ধর্মে কেবল জনসাধারণের শিক্ষা ও হেদায়তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শাস্তি ও পুণ্যের আসল হকিকত ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাগণও হয়তো জানতেন না। আর জেনে থাকলেও বিশিষ্ট লোকদের তা শিক্ষা দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। পক্ষান্তরে, ইসলাম এসেছে সারা দুনিয়ার হেদায়তের জন্য। এ গণ্ডিতে বিদ্বান, মূর্খ, বোকা, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, দরবেশ, সুফী, প্রকাশ্যবাদী, বিজ্ঞানী—সব শ্রেণীর লোকই রয়েছে।

শাস্তি, প্রতিদান ও পরকালের প্রকৃত স্বরূপ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কোথাও ইঙ্গিতে, আবার কোথাও পরিষ্কার ভাষায় পরিলক্ষিত হয়ঃ

"হাঁ, তোমাদের যদি নিশ্চিত জ্ঞান থাকতো, তবে তোমরা চাক্ষুষ-ভাবেই দোজখ দেখে নিতে।" ইমাম গাযালী 'জওয়াহিরুল কুরআন' গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

অর্থাৎ দোজখ তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।"

কুরআনের অন্য এক স্থানে আছেঃ

"কাফেরগণ আপনাকে বলছে—শাস্তি তাড়াতাড়ি আসুক! অথচ দোজখ এদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।"

ইমাম গাযালী এ আয়াত সম্পর্কে 'জওয়াহিরুল কুরআন' গ্রন্থে বলেনঃ

"আল্লাহ্ এ কথা বলেন নি যে, দোজখ তাদেরকে ভবিষ্যতে ঘিরে রাখবে বরং এ কথা বলেছেন যে, এক্ষনি ঘিরে রেখেছে।"

অন্যত্র কুরআনে আছেঃ

"আমি জালিমদের জন্য এমন আগুন সৃষ্টি করে রেখেছি, যার ঘোমটা তাদের ঘিরে রেখেছে।"

ইমাম গাযালী এ সম্পর্কে বলেনঃ

"আল্লাহ্ এ কথা বলেন নি যে, ভবিষ্যতে ঘিরে আসবে, বরং এ কথাই বলেছেন যে, এক্ষনি ঘিরে রেখেছে।"

এ সব আয়াতের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর ইমাম গাযালী বলেনঃ

তোমরা যদি কুরআনের অর্থ এমনিভাবে না বুঝতে পার, তবে তোমাদের হাতে আসবে কেবল তার খোসাটুকু, যেমন চতুষ্পদ জন্তুর কাছে এসে পৌঁছ কেবল গমের ভুষিটুকু।"

## উপাসনা (ইবাদত)

এ বিষয়ে সকল ধর্মই ভুল করে আসছে এবং এক প্রকার নয়, সেগুলো নানাবিধ ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছে।

## অন্যান্য ধর্মের উপাসনা সংক্রান্ত ভ্রান্তি

সব চাইতে বড় ভ্রান্তি হলো—সাধারণত মানুষ মনে ক'রে থাকে যে, উপাসনাটাই উদ্দিষ্ট বস্তু। কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেই উপাসনা করা হয়। মনে করুন, কোন এক বাদশা তাঁর চাকরের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করছেন। তাই

তিনি আদেশ দিলেন, চাকরটি যেন সারা রাত এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এতে বাদশারও কোন লাভ নেই, চাকরটিরও কোন লাভ নেই। একমাত্র উদ্দেশ্য হলো—চাকরটির আনুগত্য পরীক্ষা করা। এমনি-ভাবে আমরা যে নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ করি—এসবের উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা। আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন, তা আমরা পালন করেছি। আমরা যতই কষ্ট করি, আল্লাহ্ ততই খুশী হন। মাস মাস ধরে পানাহার বন্ধ করা, এক পায়ের উপর সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকা, হাতকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে তা শুষ্ক করে ফেলা, শীতকালে অনাবৃত দেহে খোলা আকাশ-তলে নিদ্রা যাওয়া, চল্লিশ দিন একাধারে উপাসনায় মগ্ন থাকা, বিয়ে-শাদী না করা, সারা জীবন সন্ন্যাসীবেশে যাপন করা—এ ধরনের যেসব মনোভাব হিন্দু, খ্রীস্টান ও অন্যান্য ধর্মে দেখা যায়, সে সবের ভিত্তি হলো উপাসনার উক্ত ব্যাখ্যা ও ভাবধারার উপর।

উপাসনার এই ধারণা এক সময় এত চরমে উঠেছিল যে, মানুষ নিজেকে কোরবানী করতেও প্রস্তুত ছিল। নিজেদের সন্তান-সন্ততিকেও তারা কোরবানী করতো।

আসল কথা হলো—মানুষের মনে সে সব ধারণাই উদিত হয়, যা তার চতুস্পার্শ্বে বিরাজ করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—এমন কোন বস্তুর ধারণা মানুষ করতে পারে না। সে যা দেখে বা শোনে, সেটাকেই বাড়িয়ে-কমিয়ে, রদ-বদল ক'রে উন্নত আকারে প্রকাশ করে। কিন্তু কোন মৌলিক বস্তু সে স্বয়ং সৃষ্টি করতে পারে না।

মানুষের মনে আল্লাহ্‌র ধারণা স্থান লাভ করেছে একজন সর্ব-শক্তিমান সম্রাটরূপে। তাই সম্রাটের যে প্রকৃতি বা মনোভাব থাকে, সে নিরিখেই মানুষ তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করে। মানুষ রাজা-বাদশাদের যেভাবে দেখেছে, বা শুনেছে, সেভাবেই তাদের সম্পর্কে তার ধারণা জন্মেছে। মানুষ জানে যে, রাজা-বাদশা আনুগত্য প্রকাশে সন্তুষ্ট হন, প্রাণ উৎসর্গ করার সংকল্প জ্ঞাপন, আদব, বিনয় ও সম্মান প্রদর্শনকে তাঁরা পছন্দ করেন। এসব খেদমত যে যত বেশী সম্পন্ন করতে পারে, সে ততই রাজকীয় পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জন করে। এসব চিন্তাধারার নিরিখেই মানুষের মনে আল্লাহ্‌র উপাসনা-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা উদিত হয়। এজন্যেই প্রত্যেক ধর্মে যত প্রকার

ইবাদত রয়েছে, তাতে এ নীতিটাই ফুটে উঠেছে। এর উপর ভিত্তি করেই ইওরোপের নাস্তিকেরা বলে থাকে যে, মানুষ নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের ধর্মীয় ভাবধারা সৃষ্টি করে নিয়েছে। ইওরোপের বর্তমান দার্শনিকগণ স্বাভাবিক ধর্মের মূলনীতি ও আনুষঙ্গিক নীতি নির্ধারণের সময় ইবাদতের স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাঁরা ইবাদতের যথার্থতা যাচাই করার জন্য চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন ঃ

১. মানবজীবনে যত কর্তব্য আছে, যেমন জীবিকা অর্জন, সন্তানাদির প্রতিপালন, দেশপ্রেম—এ সবকে ইবাদতের মধ্যে গণ্য করা হোক !

২. ব্যবহারিক ধর্ম যেমন নামায, রোযা ইত্যাদিকে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বলে গণ্য না করা উচিত।

৩. কোন উপাসনাই মানবশক্তি বহির্ভূত হবে না।

৪. এটা মনে করতে হবে যে, উপাসনায় আল্লাহ্‌র কোন উদ্দেশ্য নেই। এতে লাভ রয়েছে আমাদেরই।

দুনিয়া এখন উন্নত স্তরে পদার্পণ করেছে ; স্বভাবের সুপ্ত রহস্য-রাজির দ্বার বর্তমানে পুরোপুরি উন্মোচিত হয়েছে। দুনিয়ার এতগুলো ধাপ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই ইওরোপ মানুষকে উপাসনার এই নীতিগুলো শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে। অথচ ইসলাম তেরশ' বছর পূর্বেই এই রহস্যের কথা শুনিয়েছিল। সর্বপ্রথম ইসলামই ঘোষণা করলো যে, বান্দার ইবাদতে আল্লাহ্‌র কোন উদ্দেশ্য নেই।

কুরআন মজীদ বলে ঃ

"যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে, সে নিজের জন্যেই করে। আল্লাহ্ জগদ্বাসীর কাছে মুখাপেক্ষী নন।"

ইবাদতের নীতি বর্ণনার পর বলা হয়েছে যে, ইবাদতে মানুষেরই লাভ হয়। আল্লাহ্ মানুষের হিতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইবাদতের আদেশ দিয়ে থাকেন। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে, সে নিজ মঙ্গলের জন্যেই তা করে থাকে। আর যদি মন্দ কাজ করে, তবে তার কুফল বর্তাবে তারই উপর। তোমাদের কষ্ট হবে, এমন কোন কার্য আল্লাহ্ ধর্মের

অঙ্গীভূত করতে চান না। বরং তোমাদের পরিশুদ্ধ করতে এবং পূর্ণ নে'মত দিতে তিনি ইচ্ছুক।"

অতঃপর আল্লাহ্ প্রত্যেক উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফল ও মঙ্গল বর্ণনা করেন। নামায সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"নামায লজ্জাকর ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

রোযা সম্পর্কে বলেন ঃ

"খুব সম্ভব তোমরা (রোযা পালনে) আল্লাহ্‌ভীরুতা অবলম্বন করবে।

হজ্জ সম্পর্কে বলেন ঃ

"তাহলে তোমরা যেন নিজেদের লাভজনক স্থানে উপস্থিত হতে পার।"

যাকাতের উপকারিতা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

এ সবের সঙ্গে এ বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, শরীঅতের কোন বিধান যেন সীমারেখা ছাড়িয়ে না যায় এবং তার সম্পাদনে যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমাদের পক্ষে যা কঠিন নয়, বরং সহজ, আল্লাহ্ তাই তোমাদের জন্য করতে চান। তিনি এটাও চান না যে, ধর্মে এমন কোন বিধান রাখা হোক, যা সম্পন্ন করা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর। তিনি তোমাদের বোঝা লাঘব করতে চান। তিনি কাউকে তার শক্তি বহির্ভূত কার্যের জন্য কষ্ট দেন না।"

এর চাইতে মোক্ষম কথা হলো —আল্লাহ্ মানব জীবনের প্রত্যেকটি জরুরী কাজকে ইবাদতরূপে গণ্য করেন এবং তা সম্পন্ন করার জন্য তাগিদও করেন। বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র দান (রিযিক) অনুসন্ধান কর।"

বিশিষ্ট উম্মতের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ কুরআন মজীদে সন্তান লাভের কামনাকে সৎ ও আল্লাহ্ প্রিয় লোকের বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেন ঃ

"আর যাঁরা বলেন, হে আল্লাহ্, আমাদের চোখ জুড়াতে পারে, এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর।"

সকল সাহাবীই ছিলেন ইসলামের নিখুঁত ছবি। তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের জরুরী কার্যাবলী সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করাকে ইবাদত বলে মনে করতেন। আজও মুসলমানেরা মনে করে যে, সাহাবীদের চলাফেরা, পানাহার, বিয়ে-শাদী ও পারিবারিক কাজকর্ম সমাধা করা—এ সবই ছিল ইবাদত। আসল কথা হলো—এ মঙ্গল সাধন সাহাবীদের জন্য খাস নয় অর্থাৎ এই পুণ্য অর্জন সাহাবীদের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেকটি মানুষের এরূপ কাজকর্ম ইবাদত, যদি তা এমনিভাবে করা হয়, যেমন সাহাবিগণ করেছিলেন।

## মানবাধিকার

বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের যে সামাজিক সম্পর্ক থাকে, তাই তার উপর কতগুলো কর্তব্য আরোপ করে। এই কর্তব্যগুলোই হলো নৈতিকতা, আইন ও তহযীব-তমদ্দুন নীতির বুনিয়াদ। পৃথিবীর সব ধর্মেই এ সব কর্তব্যের মোটামুটি আলোচনা হয়েছে। তবে এ আলোচনা ছিল নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। কোন কোন ধর্ম অবশ্য এর গণ্ডিকে আরো কিছুটা প্রশস্ত করেছিল। তারা বিয়ে-শাদী, উত্তরাধিকার, অসিয়ত ইত্যাদিকেও নিজেদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এ সব মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক এত জটিল ও সূক্ষ্ম ছিল যে, সেগুলো নির্ধারণ করতে গিয়ে তাদেরকে অনেক ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হতে হয়। এ সব বিষয়ে ইসলাম যে সূক্ষ্ম দর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, কোন ধর্ম বা দার্শনিকের মতবাদে তার নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। এতেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম যা কিছু দিয়েছে, তা হলো আল্লাহ্-প্রদত্ত ও ওহী প্রাপ্ত। তা না হলে যে সব সূক্ষ্ম বিষয়ের সমাধান বড় বড় দার্শনিক ও দিতে সক্ষম হলেন না, মরু আরবের একজন নিরক্ষর লোক তা কি করে সম্ভব করে তুললেন ?

মানবাধিকারের প্রাথমিক প্রশ্ন হলো মানুষের নিজের উপর তার কি পরিমাণ অধিকার রয়েছে ? ইতিহাস পাঠে যতটুকু জানা যায়, সারা পৃথিবীতে এটা একটি সমর্থিত বিষয় ছিল যে, প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজ প্রাণের অধিকারী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আত্মহত্যা কোন অপরাধ বলে গণ্য হতো না। গ্রীসের বড় বড় দার্শনিক আত্মহত্যা

বৈধ বলে মনে করতেন। এমন কি সে দেশের কোন কোন প্রখ্যাত দার্শনিকও আত্মহত্যা করেছিলেন।

## আত্মহত্যা

সর্বপ্রথম কুরআন মজীদই আত্মহত্যার বিষয়টি তুলে ধরে এবং তা নিষিদ্ধ করে। আল্লাহ্ বলেন :

"তোমরা আত্মহত্যা করো না।"

## ইসলাম আত্মহত্যার বিলোপ সাধন করেছে

আত্মহত্যার ব্যাপারটি সন্তানের আত্ম অধিকারের উপর চরম বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। মানুষ বস্তুত তার সন্তান-সন্ততিকে নিজ অঙ্গ-রূপেই মনে করে। সেজন্যেই তাদেরকে প্রাণসম ভালবাসে। কিন্তু মানুষ যেহেতু নিজ প্রাণের অধিকর্তা এবং নিজ প্রাণের উপর যে কোন হস্ত-ক্ষেপ করার অধিকার তার রয়েছে বলে সে মনে করে, সেহেতু নিজ সন্তানের উপর তার তদ্রূপ অধিকার রয়েছে বলেও সে ধারণা করে। এই মনোভাবের ফলেই বিভিন্ন আকারে সন্তান হত্যার প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

## সারা জাহানে বিভিন্ন আকারে সন্তান হত্যা প্রচলিত ও বৈধ ছিল

ভারতে তহযীব-তমদ্দুন প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরেও সন্তানকে দেব-দেবীর নামে বলি দেওয়া হতো। ভারত ও আরবে কন্যাহত্যা অত্যধিক প্রচলিত ছিল। স্পার্টা ও রোমে কুশ্রী সন্তানকে পথে-ঘাটে ছুঁড়ে ফেলা হতো। অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ন্যায় প্রখ্যাত দার্শনিকও দুর্বল সন্তানকে ধ্বংস করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অ্যারিস্টটল মনে করতেন, বিকলাঙ্গ শিশু লালন-পালনযোগ্য নয়। স্পার্টায় সন্তান জন্ম হলে তাকে জাতির মহৎ ব্যক্তিদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হতো। সন্তান স্বাস্থ্যবান হলে জিন্দা রাখা হতো। তা না হয় টায়জিট্স্ নামক পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলা হতো। অনেক সম্প্রদায়েই এ প্রথা প্রচলিত ছিল। কুরআনই সর্বপ্রথম এই জোর-জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। আল্লাহ্ বলেন :

"নিজ সন্তানকে হত্যা করো না।"

"এবং এমনিভাবে মুশরিকদের সহযোগীরা সন্তান হত্যাকে তাদের নজরে ভাল বলে প্রতিপন্ন করে।"

## স্ত্রী জাতির অধিকার

স্ত্রী জাতি মানব জাতির অর্ধাঙ্গ। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে শত শত নয়, বরং হাজার হাজার আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, পৃথিবীতে ইসলামের ছায়া বিস্তারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীজাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

প্রকৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছে। রোমের অধিবাসীরা আইন প্রণয়নে অভিজ্ঞ ছিল। গ্রীসের খ্যাতি ছিল দর্শনের জন্য। ইটালী ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইরানের সৌখিনতা ছিল সর্বজনবিদিত। এমনিভাবে রোম দেশীয় আইন-কানুন সারা পৃথিবীতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত ছিল। রোমার আইন আজও সমগ্র ইওরোপীয় আইন-কানুনের ভিত্তিরূপে কাজ করছে। এই শ্রেষ্ঠ আইন-কানুন স্ত্রী জাতিকে যে অধিকার দিয়েছিল, তা হলো—স্ত্রীর বিয়ের পর সে তার স্বামীর খরিদা সম্পদে পরিণত হতো। তার সমস্ত ধন-সম্পদ এমনিতেই স্বামীর মালিকানাভুক্ত হয়ে পড়তো। সে ধন-সম্পদ যা কিছু অর্জন করতো, সবই স্বামীর সম্পদে পরিণত হতো। সে কোন পদমর্যাদার অধিকারিণী হতে পারতো না। কারো জামিনও সে হতে পারতো না। সাক্ষ্য দেওয়ারও তার অধিকার ছিল না। সে কারো সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারতো না। এমনকি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করার অধিকারও তার ছিল না।

## রোমান-ল

রোম দেশ যখন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হলো, তখন রোমান-ল-এর কিছুটা সংস্কার করা হয়। কিন্তু সে সংস্কার ছিল সাময়িক ব্যাপার। কিছুকাল পর তা আবার পূর্ববৎ হয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকের আত্মা আছে কি-না—এ বিষয়টি স্থির করার জন্য ৫৮৬ খৃঃ ইওরোপে একটি বড় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সে অধিবেশন বিশেষ বদান্যতা সহকারে এতটুকু সমর্থন করলো যে, স্ত্রীলোকেরা আদমজাতভুক্ত। তাই তাদেরও আত্মা আছে। কিন্তু তাদের সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো—পুরুষের সেবা করা।

ইংলণ্ডে বহুদিন পর্যন্ত এ ধরনের আইন প্রচলিত ছিল : বিয়ের পর স্ত্রীর অস্তিত্ব স্বামীর অস্তিত্বে পরিণত হতো। সে কোন প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারতো না। তার সমস্ত সম্পদ স্বামীর সম্পদে পরিণত হতো। স্বামী তার ইচ্ছামত তা ব্যয় করতে পারতো। রোমান এ্যাক্ট রচিত হয়েছে—এখনও ত্রিশ বছর হয় নি। এতে যদিও উক্ত আইন-কানুনের সংস্কার সাধিত হয়েছে, কিন্তু এখনো তাতে অনিয়ম রয়েছে।

ইহুদী ধর্মে বিয়ের মানে ছিল স্ত্রীকে সত্যিকারভাবে খরিদ করা। খরিদের বিনিময় মূল্য লাভ করতো স্ত্রীর পিতা।

হিন্দু ধর্মে হুবহু 'রোমান-ল' প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর সম্পদ স্বামী লাভ করতো। স্বাধীনভাবে কোন প্রকার চুক্তি বা লেন-দেন করার অধিকার স্ত্রীর ছিল না। স্ত্রী, কন্যা, মা—এদের কেউই উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন ধন-সম্পদের মালিক হতো না।

আরব দেশ ইসলামের উৎসভূমি। সেখানকার অবস্থা ছিল এই যে, স্ত্রীলোকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুরই অধিকারী হতো না। পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের অধিকারী হতো পুত্র। সে পিতার স্ত্রীদেরকে নিজ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতো। বিবাহের চারটি নিয়ম প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে তিনটি হলো : (১) দুই ব্যক্তি নির্দিষ্ট কালের জন্য পরস্পর তাদের স্ত্রীদের বিনিময় করতো। (২) কয়েকজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করতো। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে স্ত্রীলোকটি তন্মধ্যে একজনের কাছে এমর্মে খবর পাঠাতো : তোমার দিক থেকে আমি গর্ভবতী হয়েছি। অতঃপর সে লোকটি সন্তানের পিতা বলে অভিহিত হতো। (৩) কয়েকজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করতো। সন্তান প্রসব করলে হাবভাবে চরিত্র নির্ণয়কারী (পিজিয়নমিস্ট) বলে দিতো যে, অমুক ব্যক্তির বীর্যে এ সন্তানের জন্ম হয়েছে। তদনুসারে সে ব্যক্তিই সন্তানের পিতা বলে সাব্যস্ত হতো। বিবাহের এ তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে 'সহীহ্ বুখারী'তে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা রয়েছে।

## ইসলাম স্ত্রী জাতিকে কি কি অধিকার দিয়েছে

এখন দেখুন, কুরআন মজীদ স্ত্রীজাতির জন্য কি করেছে ? তবে এর পূর্বে এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, ইওরোপের অধিকাংশ

গ্রন্থকারের মতে, ইসলামের যত বিধি-বিধান আছে, তা অন্যান্য ধর্ম থেকেই গৃহীত; ইসলামী শরীঅতের নিয়ন্তা ইসলামের জন্য নিজের পক্ষ থেকে নতুন কিছুই করেন নি। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে খৃস্টধর্ম, ইহুদী ধর্ম ও হিন্দু ধর্মে কিরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, তা আপনারা ইতিপূর্বে পাঠ করেছেন। এখন চিন্তা করে দেখুন, ইসলাম সে সব ধর্মের অনুকরণ করেছে, না-কি স্বয়ং এমন সব দার্শনিক রীতি-নীতি রচনা করেছে, যা কোন দিন কেউ ভাবতেও পারে নি।

কুরআনই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছে যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃতিগত সম্পর্ক রয়েছে। স্ত্রীজাতি মানব সমাজের একটা বিরাট অঙ্গ। তারা পুরুষদের জন্য আরাম ও সান্ত্বনার আধার আল্লাহ্ বলেন ঃ

"এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তাহলে যেন তোমরা তাদের কাছে আরাম পাও। তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহের উদ্রেক করেন।"

অতঃপর ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সমমর্যাদাসম্পন্ন দুইজন বন্ধু, উভয়ই পরস্পর নির্ভরশীল, উভয় দিক থেকে সম্পর্ক সমান, উভয়ের সম্মান ও উভয়ের অধিকার সমান। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"স্ত্রীলোকেরা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাকস্বরূপ।"

"স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষদের যেরূপ অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরেও স্ত্রীলোকদের তদ্রূপ অধিকার রয়েছে।"

আত্মীয়তার সকল স্তরে স্ত্রী-পুরুষ একই পর্যায়ভুক্ত। মা ও বাপের মর্যাদা যেমন এক, তেমনি ভাই ও বোনের মর্যাদাও এক। এমনি-ভাবে চাচা ও ফুফুর মর্যাদাও এক। কুরআনে যেখানে পিতার উল্লেখ রয়েছে, সেখানে মায়েরও আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিও। এদের মধ্যে কেউ যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি রুষ্ট হয়ো না এবং শাসিয়ে কথা বলো না। তাদের সঙ্গে বিনয় সহকারে কথা বলও। তাদের সামনে স্নেহভরে বিনয়ের স্কন্ধ নত করে দাও এবং বল ঃ

আল্লাহ্। তাঁদের উপর রহমত করুন, যেমন তাঁরা ছোটবেলায় (রহমত সহকারে) আমায় লালন-পালন করেছেন।"

মায়ের অধিকার জোরালোভাবে বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন :

"মা সক্লেশে তাকে উদরে বহন করেছে, এবং সক্লেশে তাকে প্রসব করেছে।"

রোম দেশের অধিবাসী ও হিন্দুদের মতে, স্বামী হলো স্ত্রীর মাল-সম্পদের অধিকারী। কিন্তু কুরআন বলে :

"পুরুষেরা যা অর্জন করবে, সেটা তাদেরই, আবার স্ত্রীলোকেরা যা অর্জন করবে, সেটা তাদেরই।"

হিন্দুদের মধ্যে এবং অন্ধ যুগের আরবদের মধ্যেও মেয়েরা উত্তরাধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকতো। কিন্তু ইসলাম ঘোষণা করলো :

"মাতা-পিতা ও আত্মীয়-পরিজনের ধন সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার-সূত্রে যেভাবে পুরুষদের অংশ রয়েছে, তেমনি মেয়েদেরও রয়েছে।"

ইসলাম কন্যা হত্যার প্রথা দূর করেছে এবং এমনিভাবে তা দূর করেছে যে, তেরশ' বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এরূপ একটি ঘটনাও ঘটে নি। কুরআন মজীদ বলে :

"এবং কেয়ামতের দিন যখন জীবিত অবস্থায় সমাহিত মেয়ের নিকট জিজ্ঞেস করা হবে যে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো?"

অন্ধকার যুগে নিয়ম ছিল যে, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হতো, তখন তার ভাই জবরদস্তিমূলকভাবে তার বিধবা পত্নীকে বিয়ে করে নিতো অথবা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রাখতো। কিন্তু তার নিকট থেকে কিছু অর্থ পেলেই তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিতো। ইসলাম এসব প্রথা দূর করেছে। কুরআন বলে :

"জোর-জবরদস্তি স্ত্রীলোকের ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার ফন্দি করা বৈধ নয়। তারা যা পেয়েছে, সেখান থেকে কিছু পাওয়ার আশায় তাদেরকে আটক রেখো না।"

অন্যান্য ধর্মে মেয়ের বিবাহের জন্য যে মহর নেয়া হতো, তা পেতো পিতা। মহরের পরিবর্তে পিতা যেন মেয়েকে বিক্রয় করে দিতো। কিন্তু ইসলাম বললো :

"মেয়েদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের মহর দিয়ে দাও।"

ইসলাম দৈনন্দিন জীবনে মেয়েদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, অনুগ্রহ ও সমতামূলক আচরণ করার শিক্ষা দেয়। কুরআন বলে ঃ

"সামাজিক জীবনে মেয়েদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিও।"

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম ব্যাপার হলো—তালাকের বিষয়টি। সূক্ষ্ম ও মুশকিল বলেই দুনিয়ার সব জাতি এ বিষয়টির সুরাহার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিল। কিন্তু সব-গুলোই ছিল ভ্রমাত্মক। আজ দুনিয়া এতটুকু উন্নতি লাভ করেছে বটে, কিন্তু সে সব গলদ এখনো রয়ে গেছে। খ্রীস্টধর্মে এত কড়াকড়ি রয়েছে যে, ব্যভিচারের অজুহাত ছাড়া কোন অবস্থায়ই তালাক বৈধ নয়। এর ফলেই আজকালকার তহ্‌যীব-তমদ্দুনের কেন্দ্রভূমি ইওরোপে সব সময় খুব অশোভন ও লজ্জাকর ব্যাপার ঘটে থাকে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রয়েছে ভীষণ মন কষাকষি ও অনৈক্য। এই গরমিল তাদের জীবনকে তিক্ত করে তুলেছে। তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য নেই। দাম্পত্য জীবনের যে মঙ্গল ও উদ্দেশ্য, তা মোটেও নেই। বছরের পর বছর তারা এ মনোকষ্ট নিয়েই দিন যাপন করে। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হলো স্ত্রীর ব্যভিচার প্রমাণ করা। বড় বড় লোক এবং রাজ-সভাসদেরকেও আদালতে নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভি-চারের অভিযোগ আনতে হয় এবং শত শত কেন, হাজার হাজার লোকের সামনেও স্বামীকে এ লজ্জাকর ব্যাপারটি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে হয়। অনেক দিন ধরে বিচারটি চলতে থাকে এবং কাগজপত্র স্তূপীকৃত হয়ে উঠে। এ ব্যাপারটি তাদের লজ্জাহীনতা ও অসম্মানের পরিচয় বহন করে। কিন্তু যে কোন মূল্যে এ সব সহ্য করতেই হয়। কারণ এ লজ্জাহীনতা ছাড়া স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর কবল থেকে রেহাই পাওয়ার আর কোন জো নেই। এ বাবদ হিন্দু আইনও খ্রীস্টানদের ন্যায়।

অন্যদিকে রয়েছে ইহুদী ধর্ম। তাদের এখানে তো কথায় কথায় তালাক দেওয়া বৈধ বরং পছন্দনীয়। খাদ্যের মধ্যে নিমক বেশী হলো অথবা অধিকতর সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেলো, তখনি দ্বিধাহীন চিত্তে তালাক দিয়ে দাও—এটাই ছিল তাদের প্রথা। এখন দেখুন, ইসলাম কিভাবে সমাধান করেছে?

কুরআন মজীদই সর্বপ্রথম বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গিতে ঘোষণা করলো যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্কটি গড়ে তোলা হয়, তা কামাসক্তি বা যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয়, বরং এ সম্পর্কটি হলো সুমধুর জীবন যাপন ও স্থায়ী স্নেহ মমতা প্রতিষ্ঠার জন্য।

কুরআন মজীদ বলে :

"কারাগারে থাকার জন্যেও নয়, আবার যৌন উন্মাদনা চরিতার্থ করার জন্যেও নয়।"

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী পয়দা করেছেন। উদ্দেশ্য হলো—তোমরা তার কাছে যেন সান্ত্বনা লাভ করতে পার। তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করেছেন।"

এখন মনে করুন, কোন একজন পুরুষ তার স্ত্রীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট নয়, সে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। এমতাবস্থায় ইসলাম সে পুরুষকে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়। কুরআন বলে :

"তোমরা যদি তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) অপছন্দ কর, তবে এটা বিচিত্র নয় যে, তোমরা এমন একটি বস্তুকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ যথেষ্ট মঙ্গল নিহিত রেখেছেন।" (সূরা-ই-নিসা)

**স্ত্রীলোককেও আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন :**

"কোন স্ত্রীলোক যদি তার স্বামীর ব্যবহারে তাদের মধ্যে অসন্তোষ বা বিমুখতা গড়ে উঠার আশংকা করে, তবে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করা দূষণীয় নয়। মীমাংসা করা মঙ্গলজনক কাজ।"

অতঃপর আল্লাহ স্ত্রীর কুচরিত্র ও রুক্ষ ব্যবহার দূর করার পন্থা বাতলে দেন। কেননা নিত্য নৈমিত্তিক রুক্ষ ব্যবহার একটি অসহনীয় কষ্ট। আল্লাহ্ বলেন :

"যাদের মনে নিজেদের স্ত্রীর অবাধ্যতার আশংকা রয়েছে, তাদের উচিত, স্ত্রীদের উপদেশ দেওয়া, তাদেরকে শয়নকক্ষে একা থাকতে দেয়া ও হালকাভাবে) প্রহার করা। অতঃপর তারা যদি আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে ছুতানাতা দাঁড় করো না।"

এতেও যদি তাদের মধ্যে ঐক্য ও সন্ধি স্থাপিত না হয়, তবে স্বয়ং স্বামী-স্ত্রীর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই ইসলামের নির্দেশ হলো —এ বিষয়ে কওমের (সমাজের) হস্তক্ষেপ করা, কারণ প্রত্যেকটি

মানুষ নিজ কওমের অঙ্গস্বরূপ। তার কাজকর্মের প্রভাব সমাজের উপর না পড়ে পারে না। এজন্যই আল্লাহ্ জনগণ ও কওমকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আদেশ দেন এবং বলেন ঃ

"তোমরা যদি পারস্পরিক মনোমালিন্যের ভয় কর, তবে স্বামীর খান্দান থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর খান্দান থেকে অপর একজন সালিস নির্ধারণ কর।"

এ উপায়টিও যদি ফলপ্রসূ না হয় এবং স্বামী তালাক দিতে বদ্ধ-পরিকর হয়, তবে এ অনিবার্য অবস্থায় ইসলাম তালাকের অনুমতি দেয়। কিন্তু এর সঙ্গে বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখারও নির্দেশ দেয়।

তালাক-পদ্ধতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্দেশ হলো—তিনমাসে ধারা-বাহিকভাবে তিন তালাক দিতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে এক-একটি তালাক দিতে হবে। শরীঅতের পরিভাষায় এ সময়টিকে 'ইদ্দত' বলা হয়। এ সময়টি নির্ধারণ করার পেছনে উদ্দেশ্য হলো—হয়তো এর মধ্যে পুরুষ ভেবে-চিন্তে তার মতের পরিবর্তন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

"তাদেরকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর যথেষ্ট রয়েছে, যদি তারা মিলনের ইচ্ছা পোষণ করে।"

অতঃপর প্রাসঙ্গিক নীতি নির্ধারণ করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"অতঃপর স্বামী যদি তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার জন্য আর বৈধ থাকে না, যতক্ষণ না সে (স্ত্রী) দ্বিতীয় বিবাহ করে (এবং দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দেয়)।"

এ শর্তটি আরোপ করার উদ্দেশ্য হলো—স্বামী যেন এ কথা মনে করে—আমি যদি তাকে তালাক দেই এবং ভবিষ্যতে আমার মন-মেজাজ অকস্মাৎ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে তাকে পুনরায় পাবার মত আর কোন উপায় থাকবে না। একমাত্র উপায় থাকবে ঃ সে অন্যের অধীনে গিয়ে ফিরে আসবে। এটা স্পষ্ট কথা যে, এরূপ অবমাননা কে সহ্য করতে পারে?

এর সঙ্গে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, তালাক দেওয়া কোন ঘরোয়া ব্যাপার নয়। তাই বিষয়টি কওমের সামনে উপস্থিত করতে হবে এবং সাক্ষ্যও পেশ করতে হবে। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"স্ত্রীলোকেরা তাদের ইদ্দতের শেষ প্রান্তে উপনীত হলে তাদেরকে বিবেকসম্মত উপায়ে গ্রহণ করবে, নতুবা বিবেকসম্মত উপায়ে

তাদের পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়বান লোককে সাক্ষী করবে। তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য করে ঠিকভাবে সাক্ষ্য দেবে।"

এর উদ্দেশ্য হলো 'তালাক" প্রশ্নটিকে যদি সামাজিক বিষয় ধরা হয় এবং তা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-সাবুদেরও প্রয়োজন হয়, তবে যাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, তারা তালাক দিতে খুব কমই প্রস্তুত হবে।

এ সব সত্ত্বেও পুরুষ যদি তালাক দিয়ে বসে, তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই পালন করতে হবে :

"ইদ্দতের সময় স্ত্রীলোকদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না।" (সূরা-ই-তালাক)

"তোমরা যেখানে থাক, যথাসম্ভব তাদেরকে সেইখানেই থাকার ঘর দাও। তাদেরকে হয়রান করার জন্য তাদের ক্ষতি সাধন করো না। তারা যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণ কর। তারা যদি তোমাদের খাতিরে সন্তানকে দুধ খাওয়ায়, তবে তাদের বিনিময় শোধ করে দিও। তোমরা পরস্পর সদ্ব্যবহার করো।"

"তালাক দেয়া স্ত্রীলোকদের প্রচলিত প্রথা মোতাবেক পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। আল্লাহভীরুদের এ কাজ করতেই হবে।"

অনেকে তালাক দিয়ে স্ত্রীকে আটকে রাখতো। তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করার সুযোগ দিতো না। এর পেছনে উদ্দেশ্য থাকতো—স্ত্রীকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া বা তাকে উত্যক্ত করে তার প্রাপ্য পূর্ণ মহর বা আংশিক মহর মাফ করিয়ে নেওয়া। আবার কখনো কখনো এ আটক রাখার পেছনে উদ্দেশ্য হতো স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত রাখা, যেটাকে সে নিজের জন্য লজ্জাকর ব্যাপার বলে মনে করতো। আল্লাহ্‌ তাআলা এ মনোভাব পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বলেন :

"যুলুম করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে এরূপ কাজ করলো, সে যেন নিজের প্রতিই যুলুম করলো।" (সূরা-ই-বাকারা)

তালাক দেয়া স্ত্রীলোক যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসবের পর দু'বছর যাবত পুরুষকে তার ভরণ-পোষণ করতে হবে। আল্লাহ্‌ বলেন :

"পুরুষ যদি দুধ পান করাবার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়, তবে মা সন্তানকে দু'বছর দুধ পান করাবে। তবে পুরুষের উপর দস্তুর মোতাবেক তার খাওয়ানো পরানোর ভার থাকবে।" (সূরা-ই-বাকারা)

অনেকে বিয়ের সময় বেশী পরিমাণ টাকার মহর নির্দিষ্ট করতো। কিন্তু স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তার পক্ষে তা শোধ করা মুশকিল হতো। এজন্য সে বিভিন্ন উপায়ে স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে মহরের পরিমাণ কমিয়ে নিতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা যদি এক স্ত্রী ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও, তবে প্রথমা স্ত্রীকে দেয়া সম্পদ থেকে কিছুই ফেরৎ নিও না। অন্যায় ও পাপের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কি তোমরা তা ফিরিয়ে নিতে চাও? কিভাবে তা নিতে পার? তোমাদের মধ্যে তো দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

এসব বিধি-বিধানের সার কথা হলো—পুরুষের পক্ষে যদি অনিবার্য কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে হয়, তবে তিন মাস সময়ের মধ্যে আস্তে আস্তে এক-একটি করে তালাক দিতে হবে। তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়া নাগাদ অর্থাৎ তিন মাস পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণের ভার ন্যস্ত থাকবে স্বামীর উপর। এর মধ্যে স্ত্রী তার নতুন স্বামী খোঁজ করার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে। স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব নাগাদ এবং তার পরেও দু'বছর পর্যন্ত তার যাবতীয় ভরণ-পোষণের ভার ন্যস্ত থাকবে স্বামীর উপর। এ ছাড়া সে নির্দিষ্ট মহরের পুরো অংকটিও পাবে এবং এমনিভাবে আর্থিক অভাবের দরুন তাকে কোন কষ্ট করতে হবে না।

কোন দার্শনিক বা কোন আইন বিশেষজ্ঞ কি স্ত্রীজাতির জন্য এর চাইতে উৎকৃষ্ট আইন রচনা করতে পারবে? ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার আর কোন ধর্মে কি এত দয়া ও এত সুযোগ-সুবিধার নজীর দেখতে পাওয়া যায়?

## উত্তরাধিকার ঃ

যে সব আইন-কানুন সম্পর্কে দুনিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ ছিল, আর এখনো রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো - উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন। খ্রীস্টানদের মধ্যে কেবল বড় সন্তানই স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়। বাকি সন্তানদের কেবল জীবিকা নির্বাহের অধিকার

রয়েছে। সন্তান ছাড়া বাকি আত্মীয়-পরিজন উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকে।

হিন্দুদের মধ্যে কেবল পুরুষ সন্তানেরাই উত্তরাধিকারী হয়। এ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনেরা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুরই মালিক হয় না। মেয়েরা শুধু ভরণ-পোষণ পেয়ে থাকে।

আরব দেশেও মেয়েরা উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুই পেতো না। বরং যতটুকু জানি, পুরুষ সন্তান ছাড়া পিতা, ভাই, মা, বোন প্রমুখও উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুই লাভ করতো না। ইওরোপ আজ তহযীব-তমদ্দুনের দিক থেকে উন্নত আসনে প্রতিষ্ঠিত। অথচ এখনো পূর্ববৎ এই নিয়মই স্থির রয়েছে যে, কেবল বড় সন্তানই উত্তরাধিকারী হবে।

## উত্তরাধিকার কি কি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

এখন ভেবে দেখুন, তমদ্দুন ও প্রকৃতির নিয়মানুসারে উত্তরাধিকারের কিরূপ নীতি হওয়া উচিত? এর উত্তর নির্ভর করে দু'টি প্রশ্নের উপর : প্রথমটি হলো—যথাসম্ভব বেশী লোকের মধ্যে সম্পদ বিভক্ত ও সম্প্রসারিত করা ভাল, নাকি দু-একটি লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা? দ্বিতীয় হলো—কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ধন-সম্পদ আত্মীয় স্বজনেরা পায় কেন?

সমাজবিদ্যার শিক্ষকগণ স্থির করেছেন যে, সম্পদ যত বেশী লোকের মধ্যে সম্প্রসারিত করা যায়, ততই ভাল। সভ্য ও বর্বর দেশের মধ্যে এটাই পার্থক্য। স্বৈরতান্ত্রিক দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—সেখানে বাদশাহ, তাঁর সভাসদ ও তাঁর প্রিয়পাত্র লোকেরাই অর্থশালী হয়ে থাকে। বাকি লোকজন সাধারণত দরিদ্র বা মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। পক্ষান্তরে, সভ্য দেশে বাদশাহ্ থেকে আরম্ভ করে জনসাধারণের স্তর পর্যন্ত মর্যাদা ভেদে সম্পদের বণ্টন হয়ে থাকে এবং তার পরিমাণ উপরের দিক থেকে নিম্ন দিকে ক্রমাগত কমতে থাকে।

## ইসলামের উত্তরাধিকার আইনসঙ্গত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন-কানুনে কেবল ইসলামই বিবেক-বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। ইসলামী কানুনানুসারে মৃত ব্যক্তির সকল আত্মীয়-স্বজনেরা আত্মীয়তার স্তরভেদে উপকৃত হয়। মা, বাপ, চাচা,

দাদা, ভাই, বোন, ফুফু, খালা, মামা, যারা আছেন—সবাই উত্তরাধিকার-সূত্রে ধনসম্পত্তির কিছু না কিছু অংশের মালিক হয়। উত্তরাধিকারের মূল নীতি হলো—মৃত ব্যক্তির সঙ্গে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির সম্পর্ক ও নৈকট্যের মাত্রাভিত্তিক। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল এবং যারা সুখে দুঃখে তার সাহায্য করতো, পাশে এসে দাঁড়াতো, তারাই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত। এ নীতি মোতাবেক এটা খুবই হীনমন্যতা হবে, যদি কেবল এক শ্রেণীর আত্মীয়কে উত্তরাধিকারের জন্য বেছে নেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সব আত্মীয় সমান নয়। সুতরাং এ পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। শুধু এক শ্রেণীর আত্মীয়কে উত্তরাধিকারের জন্য বেছে নেওয়া এবং বাকি সবাইকে বঞ্চিত করা প্রকাশ্য অন্যায়। শুধু বড় সন্তান উত্তরাধিকারী হবে—ইওরোপের এ আইন সম্পূর্ণ বিবেক বিরোধী। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সন্তানের যে সম্পর্ক থাকে, তা সকল সন্তানের বেলায় এক ও অভিন্ন রয়েছে। এ সত্ত্বেও শুধু বড় সন্তানকে বেছে নেওয়া এবং বাকি সব সন্তানকে বঞ্চিত করা পুরোপুরি প্রাকৃতিক আইন-বিরোধী।

ইসলাম খুব সূক্ষ্ম ও নাজুক পার্থক্যের প্রতিও দৃষ্টি রেখেছে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার আত্মীয়দের যে পর্যায়ের আত্মীয়তা থাকে, ঠিক সেই পর্যায় মোতাবেকই তাদের জন্য ছোট-বড় বিভিন্ন অংশ নির্ধারণ করা হয়।

## সর্বসাধারণের অধিকার

সর্বসাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার, উদারতা ও দয়া প্রদর্শনের জন্য ইসলামে তাগিদ রয়েছে। কিন্তু আমি সে বিষয়টি এখনো আলোচনা করতে চাই না। কারণ নৈতিকতার শিক্ষা সব ধর্মেই মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। এতে কোন ধর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের যে মাপকাঠি আছে, তা হলো ঃ এটা দেখতে হবে যে, কোন্ ধর্ম বা সম্প্রদায় অপরাপর ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ ব্যবহারের শিক্ষা দিচ্ছে?

পৃথিবীতে যে সব বড় জাতি বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে তন্মধ্যে হিন্দু, পার্সী, খ্রীস্টান ও ইহুদী জাতি হলো অন্যতম। হিন্দু ধর্ম ভারতীয় সকল অনার্যকে শূদ্র বলে অভিহিত করেছিল। আর্য

ও অনার্য—উভয় এক ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আর্যরা অনার্যদের জন্য এমন সব আইন রচনা করেছিল, যার চাইতে হীন ও কঠিন আইনের কথা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। তাদেরকে প্রত্যেক প্রকার সম্মান, স্বাধীনতা, পদ ও এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। হিন্দুদের চরম ভাবাপন্নতার কথা ভেবে দেখুন, কোন শূদ্র যদি দৈবক্রমে পবিত্র বেদের আওয়াজ শুনতো, তবে তার কানে সীসা গলিয়ে দেওয়া হতো। কারণ তার অপবিত্র কানকে পবিত্র বেদের আওয়াজ শোনার যোগ্য বলেও মনে করা হতো না।

রোম সাম্রাজ্যের যুগ ছিল প্রাচীন খৃীস্টানদের সুবর্ণ যুগ। এ সাম্রাজ্য বহুদিন পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। এর এত জাঁকজমক ছিল যে, দুনিয়ার অন্যান্য অংশে এর নাম শুনেই লোকেরা শিউরে উঠতো। কিন্তু এত বড় সাম্রাজ্যের স্বরূপ কি ছিল? ফরাসী বিশ্বকোষে নিম্নলিখিত শব্দে এর চিত্র অংকিত করা হয়ঃ

"রোমের শাসন ব্যবস্থা কি প্রকৃতির ছিল? সেখানে দয়াহীনতা, ও রক্তপাত আইনের পোশাক ধারণ করেছিল। বীরত্ব, প্রতারণা, দূরদর্শিতা, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক ঐক্য—এগুলো ছিল চোর-ডাকাতেরই গুণাবলী। দেশপ্রেম ছিল বর্বরোচিত। অত্যধিক ক্ষমতার লোভ, অপরাপর কওমের প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ, দয়ার অনুভূতির বিলোপ—এসব বস্তু ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিল না। প্রতাপ-প্রতিপত্তি বলতে বুঝাতো—তলোয়ারবাজি, চাবুকের প্রহার, যুদ্ধ-বন্দীদের শাস্তি দান, ছোট-বড় সকলকে দিয়ে গাড়ী টানার কাজ সম্পাদন ইত্যাদি।"

এখন দেখুন, ইসলাম কি করেছে?

## ইসলাম বিধর্মী ও অমুসলিম জাতিকে কি ধরনের অধিকার দিয়েছে

ইসলাম গোত্রগত ও বংশগত পার্থক্য সমূলে উৎখাত করেছে। ইসলামের উৎসভূমি হলো আরব দেশ। কিন্তু ঈমান গ্রহণের পর ইসলাম পার্সী, হিন্দু, তুর্কী, তাতারী, কাফ্রী, আফগানী—মোট কথা, দুনিয়ার সকল কওমকে আরবদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে পরিগণিত করেছে। ইওরোপ আজ স্বাধীনতার দাবি করছে। কিন্তু তাঁরা অন্যান্য কওমের প্রতি যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে, তা এখন কিছুতেই মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। কোন লোক যদি খৃীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইওরোপীয়দের সহ-ধর্মাবলম্বীতে পরিণত হয়, তখন তাকে

সে ধর্মের-নেতাগণ এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কেয়ামতের দিন সে তাদের সমতুল্য হতে পারবে। কিন্তু এ ধ্বংসশীল জগতে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে, তা থাকবেই।

পক্ষান্তরে ইসলাম গজনবী, দায়লমী, সলজুকী, তুর্কী—এমনকি যাদের দেহে আরবদের এক ফোঁটা রক্তও ছিল না, তাদেরকেও ইসলাম পুনঃ পুনঃ সাম্রাজ্য দান করেছে, এমনকি আরবদেরকেও তাদের শাসনাধীন করেছে।

ধর্ম বিরোধীদেরকে ইসলাম দু'ভাগে বিভক্ত করেছে ঃ

১ যিম্মী (আশ্রয়প্রাপ্ত) ও মুআহিদ্ (চুক্তিবদ্ধ) অর্থাৎ যারা ইসলামী শাসনাধীন থাকে বা মুসলিম শাসনকর্তাদের সঙ্গে চুক্তি ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

২. হর্‌বী (যুদ্ধ-বিজড়িত)—অর্থাৎ যাদের সঙ্গে কোন প্রকার চুক্তি নেই, বরং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে আছে বা লাগার আশংকা রয়েছে।

ইসলাম যিম্মীদেরকে জান, মাল, আযাদী, ইজ্জত—সকল দিক থেকে মুসলমানের সম-অধিকারী বলে ঘোষণা করেছে। আমি 'হুকুকুয্ যিম্মিঈন' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছি। তাই এখানে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই না।

'হর্‌বী'দের সঙ্গে ইসলাম কিরূপ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে, তা কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে প্রতিভাত হবে ঃ

"এমন লোকদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র রাহে' লড়াই কর, যারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু সীমা লংঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে এতটুকু নেবে, যতটুকু তারা নিয়েছে। যদি ধৈর্য ধারণ করতে পার, তবে তা হবে ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম কাজ। কোন কওমের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্রবৃত্ত না করে।"

কুরআনে আরো রয়েছে "কাফেরদের যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা কর"; "সকল কাফেরের সঙ্গে লড়াই কর"; "কাফের আল্লাহ্‌র শত্রু"—এ ধরনের আয়াতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, প্রত্যেক

ধর্মবিরোধী ব্যক্তির প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করাই মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য।

এই পরিপেক্ষিতেই কোন কোন পক্ষপাতদুষ্ট মুসলমান এ মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রথম প্রকারের আয়াতগুলো রহিত করা হয়েছে। কিন্তু এই পরস্পর বিরোধিতার নিরসন আল্লাহ্ নিজেই করেছেন। তিনি বলেন :

"যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত নয় এবং তোমাদেরকে ঘর থেকেও উচ্ছেদ করেনি, তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন। যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্ম-যুদ্ধে লিপ্ত এবং তোমাদেরকে ঘর থেকে উচ্ছেদ করেছে বা এ কাজে অন্যকে সাহায্য করেছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেছেন। যারা এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তারা অত্যাচারী।"

এ সব আয়াতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম বিরোধীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয় বা তাদেরকে (মুসলমান-দেরকে) আপন ঘর থেকে উচ্ছেদ করে বা উচ্ছেদ করার ব্যাপারে অপরকে সাহায্য করে, তবেই তাদের সঙ্গে বন্ধত্ব স্থাপন করা বা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অন্যথা নয়। খৃীস্ট ও অন্যান্য ধর্মে আপাতদৃষ্টিতে এর চাইতেও বেশী উদারতা দেখা যায়। যেমন ইনজীলে আছে—"যদি তোমার এক গালে কেউ চপেটাঘাত করে, তবে তুমি তাকে অপর গালটিও পেতে দেবে।"

এ ধরনের কথাগুলো আপাতদৃষ্টিতে খুবই সুন্দর বলে মনে হয়। বস্তুত তা নিরর্থক। কেননা এসব কথা মানব-স্বভাব বিরুদ্ধ এবং এজন্য তা বাস্তব রূপে রূপায়িত হতে পারে না।

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হলো—এতে চরম কড়া-কড়িও নেই, আবার চরম নমনীয়তাও নেই। এতে যত বিধি-বিধান রয়েছে, সবই মানব-স্বভাব সম্মত।

## অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস

ইসলামের আসল বুনিয়াদ হলো দু'টি বস্তু : তওহীদ ও নুবুওয়াত। "যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ( আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই ) বলেছে, সে-ই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করেছে"—এটাই ছিল ইসলাম। এই ইসলাম ছিল সাদাসিধে, সাফ্ ও সংক্ষিপ্ত ধর্ম। এই সরলতার দরুনই সকল ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এই সরলতা দেখেই ইওরোপের একজন সমালোচক দুঃখ করে বলেছিলেন : "যদি কোন দার্শনিক খ্রীস্টধর্মের সুদীর্ঘ ও জটিল ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে তিনি দুঃখ করে বলে উঠবেন যে, আমার ধর্ম এরূপ সরল ও পরিষ্কার হলো না কেন ? তবেই তো আমি খুব সহজে ঈমান আনতে পারতাম এক আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহম্মদের উপর।" মাত্র এ দু'টি শব্দই ছিল, যা উচ্চারণ ও বিশ্বাস করলেই কাফের মুসলমানে পরিণত হতো, পথভ্রষ্ট সুপথে পরিচালিত হতো, হতভাগ্য ভাগ্যবান ও অভিশপ্ত সুজনে পরিণত হতো। কিন্তু কালপ্রবাহে এবং বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মনোবৃত্তির ফলে এই সরল ইসলামে নানাবিধ টীকা-টিপ্পনীর সৃষ্টি হয়েছে। এখন ইসলাম বলতে এমন একটি গোলকধাঁধাকে বোঝায়, যা আদি যুগের লোকদের শত বোঝালেও তারা এ ধর্ম বুঝতে সক্ষম হতো না। আর যে আরবদের উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তারা তো আজও এই ইসলামকে বুঝতে পারছে না। মজার ব্যাপার হলো, কুরআন নশ্বর, নাকি অবিনশ্বর, আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর সহজাত বস্তু, নাকি সত্তাবহির্ভূত, কর্ম ঈমানের অঙ্গ নাকি বহিস্থ বস্তু এসব নব্য সৃষ্ট বিষয়কেই ধরে নেয়া হয়েছে কুফুর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠিরূপে। ইসলামের আদিযুগে এ সবের নাম-নিশানাও ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলোকে ধরে নেয়া হয়েছে কুফ্‌র ও ইসলামের তুলাদণ্ডরূপে। ইল্‌মে কালামের ইতিহাসে আপনারা এসব পড়ে থাকবেন। এসব বিষয়ের দরুন কত

যে কাণ্ড ঘটেছে, তা কারো অজানা নয়। এখন এ বিষয়গুলো ইলমে কালামের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। আধুনিক ইলমে কালামে এসব বিষয়ের উল্লেখ না করে গত্যন্তর নেই।

এ বিষয়গুলো দু'ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত :

১. এসব বিষয়ের প্রকৃতি ও স্বরূপ কি ?

২. বস্তুত ইলমে কালামের সঙ্গে এগুলোর কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে ?

## ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রকৃতি

আমি যেখানে ইলমে কালামের ইতিহাস আলোচনা করেছি, সেখানে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবেই লিখেছি। এখানে শুধু এতটুকু বলবো যে, আকায়েদ সংক্রান্ত বিষয়াদি দু'প্রকার : এমন কতগুলো বিষয় আছে, যাদের উল্লেখ কুরআন বা হাদীসে মোটেই নেই। কিন্তু মোতাকাল্লিমগণের মতে, তওহীদ ও নবুওয়াতের সঙ্গে জড়িত বলে সেগুলোরও আলোচনা করা আবশ্যক। কেননা সেগুলো ছাড়া তওহীদ ও নবুওয়াতের পূর্ণতা সাধিত হতে পারে না। যেমন কুরআন মজীদের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা—যদিও হাদীস ও কুরআনে প্রকাশ্যভাবে বিষয়টির উল্লেখ নেই, তবুও এর আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যে সব আকায়েদ কুরআনে আলোচিত হয়েছে এটি সেগুলোর সঙ্গেই জড়িত। কুরআন আল্লাহ্র বাণী। আর ঐশবাণী হলো তাঁরই অন্যতম গুণ। গুণ ও গুণের আধার—এ দুটো বস্তু পরস্পর সংযুক্ত। এমতাবস্থায়, কুরআন মজীদ যদি নশ্বর হয়, তবে আল্লাহ্র সত্তাও নশ্বর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা নশ্বর গুণাবলীর আধারও নশ্বর। অথচ আল্লাহ্ যে চিরন্তন ও অবিনশ্বর—এটা অনস্বীকার্য। এ ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে।

## ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত যে সব বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে নেই

এমন কতগুলো বিষয় আছে, যেগুলোর উল্লেখ কুরআনে অবশ্য আছে, কিন্তু সেগুলোর বিশ্লেষণ নেই। এজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ইজতেহাদ মাফিক সেগুলোর বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলে অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষয় সৃষ্টি হয়েছে। যেমন পরকালের উত্থানের বিষয়টি। কুরআন মজীদে অনেক স্থলে এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু

এর প্রকৃতির উল্লেখ নেই। আশায়েরা এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, পৃথিবীতে যে মানুষের কায়া থাকে, পরকালে অবিকল সেই কায়াকেই পুনঃ সৃষ্টি করা হবে। মুসলিম হুকামার মতে, কায়ার সঙ্গে পরকালের উত্থানের কোন সম্পর্ক নেই। শাস্তি ও প্রতিদান—সবকিছুই হবে আত্মার উপর। আত্মাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রয়োজন নেই। কেননা আত্মা হলো অমিশ্র মৌলিক বস্তু। সেটা একবার সৃষ্টি হওয়ার পর আর ধ্বংস হয় না।

প্রথম প্রকারের ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি অর্থাৎ যেগুলোর উল্লেখ কুরআন মজীদ ও যথার্থ হাদীসে মোটেই নেই, সেগুলো মূলত ইলমে কালামের বিষয়ই নয়। কিন্তু ছয়-সাতশ' বছর ধরে সেগুলো যেন ইসলামের অঙ্গে পরিণত হয়ে আছে। তাই সেগুলোরও আলোচনা প্রয়োজন। বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

| আশায়েরার মতে | অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে |
|---|---|
| ১. আল্লাহ্ বিশেষ কোন দিক বা স্থানে অবস্থিত নন। | হাম্বলীপন্থী ও অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ এ মতের বিরোধী। |
| ২. আল্লাহ্র কোন আকার নেই। | কার্‌রামিয়া এ মতের বিরোধী। ইবনে তাইমিয়াও সাকার আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী। |
| ৩. আল্লাহ্ দ্রব্যও নন, গুণও নন। | ইবনে তাইমিয়া প্রমুখের মতে, আল্লাহ্ দ্রব্য ও স্বমূর্ত। |
| ৪. আল্লাহ্ কালের উর্ধ্বে। | |
| ৫. আল্লাহ্ কোন পদার্থের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন না। | মায়াবাদীদের মতে, প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্। |
| ৬. আল্লাহ্র সত্তায় কোন নশ্বর বস্তু নেই। | কার্‌রামিয়া এ মতের বিরোধী। |
| ৭. আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁর সত্তাভুক্ত বস্তু নয়। | মুসলিম হুকামা ও অধিকাংশ মুতাযিলার মতে, তা আল্লাহ্র সত্তাভুক্ত বস্তু। |

| | |
|---|---|
| ৮. আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি কোন কাজের ইচ্ছা করলে করতে পারেন, আবার না-ও করতে পারেন। | বু-আলী সিনা প্রমুখের মতে, আল্লাহ্‌র সত্তা থেকে কার্য সম্পন্ন হওয়া অনিবার্য। অর্থাৎ সূর্য থেকে যেমন আলোর বিকীরণ হয়, তেমনি আল্লাহ্‌র সত্তা থেকেও কার্য সম্পন্ন হয়। |
| ৯. আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির প্রত্যক্ষ স্রষ্টা। | বু-আলী সিনা প্রমুখের মতে, আল্লাহ্‌র সত্তা একক বস্তু। যে বস্তু সত্তাগতভাবে একক, তা থেকে একটি মাত্র বস্তু উৎপন্ন হতে পারে। তদনুযায়ী আল্লাহ্ কেবল 'আক্‌লে আও-ওয়াল' (প্রথম জ্ঞান) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর 'আক্‌লে আও-ওয়াল' থেকে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। |
| ১০. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা চিরন্তন। | মুতাযিলাপন্থীদের মতে, অচিরন্তন। |
| ১১. আল্লাহ্‌র বাণী চিরন্তন এবং সেটা হলো তাঁর সত্তাজাত বস্তু। | হাম্বলীদের মতে, আল্লাহ্‌র বাণী চিরন্তন বটে, কিন্তু তা সত্তাজাত বস্তু নয় বরং তা হলো অক্ষর ও আওয়াজের নামান্তর। মুতাযিলার মতে, ঐশ বাণী নশ্বর এবং তা অক্ষর ও আওয়াজের নামান্তর। |
| ১২. মানুষ থেকে যে সব কার্যাবলী সংঘটিত হয়, তা আল্লাহ্‌র এখতিয়ারের অধীনেই হয়, এতে মানব-শক্তি ও তার এখতিয়ারের কোন ভূমিকা নেই। | মুতাযিলার মতে, মানুষের ইচ্ছা ও তার শক্তিবলেই কার্যাবলী সংঘটিত হয়। অবশ্য এ ইচ্ছা ও শক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত। |
| ১৩. আল্লাহ্‌র কার্যাবলীর পেছনে তাঁর কোন উদ্দেশ্য নেই। | মুতাযিলার মতে, আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি কাজের পেছনে কোন একটি উদ্দেশ্য থাকে। |

১৪. স্থায়িত্ব অস্তিত্বের একটি গুণ। এটা মৌল অস্তিত্বের উপর একটি অতিরিক্ত বস্তু।

১৫. শ্রবণ ও দর্শন—আল্লাহ্‌র এ গুণ দুটো সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে।

১৬ আল্লাহ্‌র বাণীতে একাধিক্য নেই। তা একক।

১৭. আল্লাহ্‌র সত্তাগত বাণী শ্রবণীয়।

এ ছাড়া আরো অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু এগুলোই প্রধান। তাই এখানেই ক্ষান্ত হলাম।

দ্বিতীয় প্রকারের আকায়েদ হলো সেগুলো, যাদের উল্লেখ কুরআনে রয়েছে।

## কুরআনে ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত যে সব বিষয়ের কেবল উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতি ও স্বরূপের আলোচনা নেই

এ সকল ধর্মীয় বিশ্বাস প্রধানত আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্য জগত সম্বন্ধীয়। যেমন—আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, ফেরেশতা, হাশর, নশর, বেহেশ্‌ত, দোযখ, পুলসিরাত, দাঁড়ি পাল্লা ইত্যাদি—এ সবের উল্লেখ কুরআন মজীদে আছে বলে সকল সম্প্রদায়ই এগুলো মোটামুটি মেনে নিয়েছে। কিন্তু এগুলোর প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণের প্রশ্নে মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন সম্প্রদায় এসব পরিভাষার প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন। আবার কোন কোন সম্প্রদায় সেগুলোকে ভাবার্থ ও রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন। আবার কোন কোন সম্প্রদায় বিশেষ বিশেষ শব্দের মোটেও ভাবার্থ করেন নি। বরং তাঁরা বলেছেন যে, এটা হলো আধ্যাত্মিক বিষয়াদি বোঝাবার বিশেষ একটি পদ্ধতি। এ মতভেদ অবশ্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু কুরআনেও এ মতভেদের বীজ ও ইংগিত নিহিত ছিল। এই বীজ ও ইংগিতই এ বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টির একটি বড় কারণ। কুরআন মজীদে আছে:

"এর (কুরআনের) কোন কোন আয়াত পরিষ্কার এবং সেগুলোই এর প্রাণকেন্দ্র। আবার কতগুলো আয়াত আছে অস্পষ্ট। এমতাবস্থায়

যাদের মনে কুটিলতা আছে, তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা দেওয়ার অজুহাতে অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে। অথচ এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর ঝানু-আলিমেরা বলেন, আমরা এগুলো বিশ্বাস করলাম।" (আলে-ইম্‌রান, রুকূ'—১)

এখানে কুরআনের শব্দ হলো—"মা-ইয়ালামু তাবীলাহু ইল্লাল্লাহ্ ওয়ার্-রাসিখুনা ফিল্-ইল্‌মে ইয়াকুলুনা আমান্নাবিহি "

মতভেদ সৃষ্টির কারণ হলো এক সম্প্রদায় "ওয়ার্-রাসিখুনা ফিল্ ইল্‌মে"—এই শব্দগুলোকে স্বতন্ত্র বাক্য বলে গণ্য করেন। তাতে অর্থ হয়, যে সব আয়াত অস্পষ্ট, সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর যাঁরা ঝানু আলিম, তাঁরা শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হন যে, আমরা সেগুলো বিশ্বাস করলাম। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতে, "ওয়ার্-রাসিখুনা ফিল্ ইল্‌মে" স্বতন্ত্র বাক্য নয়, বরং তা পূর্ব বাক্যের সঙ্গে যুক্ত। তদনুসারে আয়াতটির অর্থ হবে—অস্পষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ এবং ঝানু আলিম ব্যতীত আর কেউ জানে না। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার পক্ষে রয়েছেন হযরত আয়েশা, হাসান বস্‌রী, মালেক ইব্‌নে আনাস, কিসাই, ফার্‌রা ও জব্বাই প্রমুখ। শেষোক্ত ব্যাখ্যার পক্ষে রয়েছেন মুজাহিদ, রাবি' ইব্‌নে আনাস ও অধিকাংশ মুতাকাল্লিমগণ। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস থেকে দু'ধরনের ভাষ্য পাওয়া যায়। এসব মতভেদের দরুন অপর একটি মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। তা হলো—কোন্ আয়াতগুলো পরিষ্কার অর্থবোধক, আর কোনগুলো অস্পষ্ট ? এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আকায়েদে অনেক মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে ঃ

১. যে সব আয়াতে উপরোক্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে, তা অস্পষ্ট বলে পরিগণিত হবে কি-না ?

২. যদি অস্পষ্ট হয়, তবে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা উচিত হবে কি-না ?

৩. যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে কিভাবে করতে হবে ?

পরবর্তী আলোচনায় 'তাবীল' ( অপ্রকাশ্য ও পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ ) -এর কথা বারবার আসবে। তাই আমাদের স্থির করতে হবে যে, তাবীলের স্বরূপ কি ? তাবীল করা সর্বত্র অবৈধ, নাকি কোথাও বৈধ,

আর কোথাও অবৈধ ? যদি কোথাও কোথাও বৈধ হয়, তবে কোন্ নীতির উপর ভিত্তি করে তা করা হবে ? তাবীলকে কুফ্র ও ইসলাম -- এ দুটোর মধ্যে তারতম্যের মাপকাঠিরূপে গণ্য করা কতটুকু সমীচীন হবে ?

## তাবীলের স্বরূপ

( অপ্রকাশ্য ও ভাবার্থ গ্রহণ)

'তাবীল'এর মূল আভিধানিক অর্থ হলো—অনুধাবন ও ভ্রমণ। কিন্তু পরিভাষায় ব্যাখ্যা করাকে 'তাবীল' বলা হয়। কুরআন মজীদে শব্দটি প্রধানত শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন শরীফে আছে ঃ 'সাউনাব্বিউকা-বি-তাবীলি মা-লাম-তাস্তাতি' আলাইহি সাব্রান্।"—যা জানতে আপনি অস্থির, তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনাকে আমি শিগগিরই অবহিত করছি। (অনুবাদ) কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিদ্যার সংজ্ঞায় ও তফসীরের পরিভাষায় তাবীলের মানে হলো—প্রকাশ্য ও আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করে অন্য কোন মানে গ্রহণ করা।

'হাশ্বিয়া' ছাড়া ইসলামের বাকি সব সম্প্রদায় তাবীলকে বৈধ বলে মনে করেন। ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি তাবীলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনিও তিন জায়গায় তাবীলকে বৈধ মনে করেন। মোটকথা, হাশ্বিয়া ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ই তাবীল বিরোধী নন। মতবিরোধ থাকলে তা রয়েছে তাবীলের স্থল নিয়ে, অর্থাৎ কোথায় তা বৈধ, আর কোথায় অবৈধ। ইসলামী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রকাশ্য অর্থেরও সমর্থক রয়েছেন, আবার সূক্ষ্ম পর্যালোচকও রয়েছেন। এঁদের পরস্পর বিরোধী মনোভাবের দরুন তাবীলের গণ্ডি একদিকে যেমন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে আবার তাতে বেশ প্রশস্ততা এবং ব্যাপকতা স্থান লাভ করেছে। কঠোরতার দিক থেকে সর্বপ্রথম স্থান হলো প্রকাশ্যবাদীদের (আরবাব-এ-যাহিরদের)। এঁদের মতে, তাবীল কোথাও বৈধ নয়। যেমন কুরআন মজীদে আছে—'আমি (আল্লাহ্) আকাশ-জমিনকে এ মর্মে আদেশ দিলাম—খুশীতে হোক আর অখুশীতেই হোক, তোমরা উপস্থিত হও। উভয়ই বললো ঃ আমরা অনুগত হয়ে উপস্থিত হলাম।"

কুরআনে অন্যত্র আছে ঃ "আমি যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চাই, তখন বলি ঃ 'হও' এবং তখনি তা হয়ে যায়।" প্রকাশ্যবাদীদের

মতে, এসব আয়াতে আভিধানিক অর্থই উদ্দিষ্ট। তার মানে বস্তুত জমিন ও আসমান এসব শব্দ মুখে উচ্চারণ করেছিল এবং বস্তুত প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করার সময়ই আল্লাহ্তাআলা 'হও'—এ শব্দটি প্রয়োগ করে থাকেন। ইমাম আবুল হাসান আশ্আরীর অভিমতও এর কাছাকাছি। তিনি 'কিতাবুল ইবানাত্' গ্রন্থে বলেছেন যে, এসব শব্দের মৌলিক অর্থই উদ্দিষ্ট। এতে ভাবার্থ বা রূপকার্থ করা উদ্দিষ্ট নয়।

'আরবাব-এ-যাহির' ছাড়া এ বিষয়ে সাধারণ আশায়েরা; মাতুরিদিয়া, মুতাযিলা ও হুকামা-এ-ইসলাম-এরও মতামত রয়েছে। এ আলোচনায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাবীলের নীতি নির্ধারণের প্রশ্নটি। অর্থাৎ কোথায় তা বৈধ, আর কোথায় বৈধ নয়, তা নিরূপণ করা। ইমাম গাযালী 'এহ্ইয়াউল উলূম' ও 'ফস্লুত্ তাফ্রিকা বাইনাল্ ইসলামে ওয়ায্-যানাদিকাহ্' গ্রন্থে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। এজন্য আমি তাঁর ভাষ্যের শাব্দিক অনুবাদ পেশ করছি। 'এহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড হলো 'কিতাবু ফওয়াইদিল্ আকায়েদ'। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনামে রয়েছে ঃ

## তাবীল সম্পর্কে ইমাম গাযালীর অভিমত

'আপনারা হয়তো বলবেন, এতে (পূর্বোক্ত আলোচনায়) প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্ঞানের দু'টো দিক আছে ঃ একটি প্রকাশ্য, অপরটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য দিকের মধ্যে কতক বিষয় রয়েছে, যা খুবই পরিষ্কার এবং প্রথম নজরেই তাদের ভাব উপলব্ধি করা যায়। অপ্রকাশ্য দিকটি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও পরিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমেই হাসিল করা যায়। আরো পরিষ্কার কথায়, সকল বস্তু থেকে নজর এড়িয়ে সে দিকটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই তা সহজে অনুধাবন করা যায়। অথচ আপাতদৃষ্টিতে একথা শরীঅত বিরোধী বলেই মনে হয়। কেননা শরীঅতে যাহির ও বাতিন, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিধি বলে আলাদা আলাদা দু'টো বস্তু নেই। শরীতাতে যা যাহির, তাই বাতিন, আবার যা বাতিন, তাই যাহির।''

''আপনারা যদি এ কথা বলতে চান, তবে আমি তা মানতে বাধ্য নই। কারণ জ্ঞানের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট—এ দুটো দিক আছে। একথা কোন জ্ঞানী অস্বীকার করতে পারেন না। এ বিষয়টি কেবল তারাই অস্বীকার করে, যারা ছোটবেলায় কোন কথা শুনেছে এবং সেটার

উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা সামনের দিকে মোটেও অগ্রসর হয়নি। আলিম ও ওলীদের আধ্যাত্মিক মনজিলগুলোও তারা বুঝতে চেষ্টা করেনি। জ্ঞানের যে দু'টো দিক আছে, এ কথার প্রমাণ শরীঅতেও রয়েছে। রসূল করীম (সঃ) বলেছেন ঃ কুরআনের অর্থ দু' প্রকার ঃ একটি যাহির, অপরটি বাতিন ; একটি প্রাথমিক, অপরটি চরম পর্যায়ের। ( এ হাদীসটি শুদ্ধ নয়—অনুবাদক )। হযরত আলী তাঁর বক্ষের দিক ইংগিত করে বলেছেন ঃ এতে বড় বড় জ্ঞান নিহিত রয়েছে। কত ভাল হতো, যদি কেউ তা গ্রহণ করতে পারতো! রসূল করীম (সঃ) বলেছেন ঃ আমি পয়গাম্বর। আমাদের প্রতি আদেশ রয়েছে যে, আমরা যেন লোকের সঙ্গে তাদের বুদ্ধি মাফিক কথা-বার্তা বলি। ( এ হাদীসটিও মরফু' নয় )। হযরত আলী রসূল করীম (সঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ যদি কোন কওমের সামনে এমন কথা বলা হয়, যা তাদের বুদ্ধি-সীমার ঊর্ধ্বে, তবে সেটা তাদের পক্ষে হবে ফ্যাসাদ স্বরূপ। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষকে বোঝাবার জন্যই দিয়ে থাকি। এগুলো আলিম ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।" রসূল করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "আমি যা কিছু জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী।" তিনি (সঃ) আরো বলেছেন ঃ "কতক জ্ঞানমূলক বিষয় রয়েছে, যা কেবল আল্লাহ্র আরিফেরাই জানেন।"

এখন বলুন, এগুলো যদি রহস্যাবৃত না হতো, তবে রসূল করীম (সঃ) কেনই বা সেগুলো প্রকাশ করলেন না? এটা স্পষ্ট কথা যে, এ কথাগুলো যদি রসূল করীম (সঃ) প্রকাশ করতেন, তবে লোকেরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা বুঝতে পারবে না বা তাতে অন্য কোন মঙ্গল নিহিত ছিল বলেই তাঁকে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়। কুরআন শরীফে আছে ঃ আল্লাহুল্লাযী খালাকা সাব্আ সামাওয়াতিও-ওয়া-মিনাল্ আর্দি মিস্লাহুন্না"—"আল্লাহ সপ্ত আকাশ ও তদরূপ সপ্ত জমিন সৃষ্টি করেছেন।" ইব্নে আব্বাস এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ "আমি যদি এ আয়াতের ব্যাখ্যা করি, তবে তোমরা আমাকে পাথর মারবে।" অন্য বর্ণনায়, "তোমরা বলবে —আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস কাফের।" আবু হুরায়রা বলেন ঃ "আমি রসূল করীমের নিকট দু'প্রকারের কথা শিক্ষা করেছি। তন্মধ্যে একটা প্রকাশ করেছি। অপরটা যদি প্রকাশ করি, তবে আমার গর্দান

কাটা যাবে।" রসূল করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের উপর আবু বকরের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তা নামায-রোযা বেশী করার দরুন নয়, বরং তাঁর বক্ষে যে রহস্য নিহিত আছে, সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।" এতে প্রকাশ্যে বোঝা যায় যে, এ রহস্য ছিল ধর্মনীতি সংক্রান্ত। অথচ যে বস্তু ধর্মনীতিভুক্ত, তা সাধারণতঃ গোপন রাখা হয় না। সহল তসতরী বলেছেন, উলামা তিন ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হন ঃ

১. প্রকাশ্য জ্ঞান, যা তাঁরা প্রকাশ্যবাদীদের সামনে প্রকাশ করেন।

২. অন্তর্নিহিত জ্ঞান, যা শুধু যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে ব্যক্ত করা হয়।

৩ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যার সংযোগ থাকে কেবল আল্লাহ্‌র সঙ্গে। অপর কারো কাছে তা প্রকাশ করা হয় না। কোন কোন আরিফ্ (আল্লাহ্ প্রেমিক) বলেন ঃ ঐশিক রহস্য প্রকাশ করা কুফ্র। কোন কোন লোক বলেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব এমন একটি রহস্য, তা যদি প্রকাশ করা হয়, তবে নুবুওয়াত অর্থহীন হয়ে পড়ে। আবার নুবুওয়াত এমন একটি রহস্য, তা যদি প্রকাশ করা হয়, তবে জ্ঞান অর্থহীন হয়ে পড়ে। আবার আল্লাহ্‌র সঙ্গে উলামার এমন একটি রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে, তা যদি প্রকাশ করা হয়, তবে সমস্ত বিধি-বিধান নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।" খুব সম্ভব এ প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা—মস্তিষ্কহীনদের কাছেই নুবুওয়াত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি এ উদ্দেশ্য না হয়, তবে তাঁদের এ উক্তি ভ্রমাত্মক বলে পরিগণিত হবে।

যে ব্যক্তি বলে, শরীঅত ও হকিকত, অন্য কথায়, যাহির ও বাতিন পরস্পর বিরোধী, সে ইসলামের চাইতে কুফরেরই বেশী নিকটবর্তী। যে সব রহস্য আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ জানেন, কিন্তু জনসাধারণ জানে না এবং যা তাদের কাছে প্রকাশ করাও নিষেধ, সেগুলো পাঁচ প্রকার ঃ

১. প্রথম প্রকার রহস্য হলো—যা মূলতই সূক্ষ্ম এবং যা বেশীর ভাগ লোকেই বুঝে না। এ রহস্য কেবল আল্লাহ্‌র প্রিয়জনরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। সুতরাং তাঁদের কর্তব্য হলো এগুলো অযোগ্য লোকের কাছে প্রকাশ না করা। তা না হয় এ রহস্য তাদের জন্য

ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ তাদের ধ্যান-ধারণা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। লোকেরা যখন নবীজীকে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দেন নি। কারণ আত্মার স্বরূপ সাধারণ লোকের ধারণাতীত।

এখানে কারো এ ধারণা করা উচিত নয় যে, নবীজীও হয়তো আত্মার হকিকত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কেননা যে ব্যক্তি রুহের হকিকত জানে না, সে নিজের হকিকতও জানে না। আর যে ব্যক্তি নিজ হকিকত সম্পর্কে অনবহিত, সে আল্লাহ্‌কে কি করে চিনতে পারে? অনেক আলিম আর ওলীও আত্মার হকিকত উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা শরীঅতের চিরাচরিত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তা প্রকাশ করেন না। তাঁরা মনে করেন, যেখানে নবিগণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সেখানে তাঁদের অন্যরূপ করা শোভা পায় না। আত্মার কথা বাদই দিলাম। আল্লাহ্‌র গুণাবলীতেও এমন মাহাত্ম্য আছে, যা সাধারণ লোক বুঝতে সক্ষম নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নবীজী কেবল আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য গুণাবলী যেমন, জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এই গুণগুলো বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ তারা নিজেরাও জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। তাই তারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শক্তিকে নিজের জ্ঞান ও শক্তির উপর আন্দাজ করে নেয়। আর আল্লাহ্‌র যে গুণগুলো মানুষের গুণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেগুলো যদি বর্ণনা করা হয়, তবে সাধারণ মানুষ তা অনুধাবন করতে পারবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো এমনি ধরনের, যেমন কোন শিশু বা খোজাকে যদি স্ত্রী-সহবাসের আনন্দের কথা বুঝাতে হয়, তবে খাওয়া-দাওয়ার আনন্দ ও স্বাদ দিয়ে বোঝানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এ উপলব্ধি বাস্তব উপলব্ধি নয়। এই দুই উপলব্ধির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শক্তি এবং মানুষের জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার আনন্দ ও স্ত্রী-সহবাসের আনন্দের মধ্যে যে পরিমাণ পার্থক্য রয়েছে, তার চাইতেও তা অনেক বেশী।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো মানুষ কেবল নিজের সত্তা ও গুণেরই ধারণা করতে পারে। অতঃপর সে নিজের উপর অনুমান করে অন্যের সত্তা ও গুণের অনুমান করতে পারে। এক্ষেত্রে সে এটাও বুঝতে পারে

যে, তার নিজের ও অন্যের মধ্যে পূর্ণতার দিক থেকে কতটুকু পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং মানুষ স্বয়ং কর্ম, শক্তি, জ্ঞান এরূপ যত গুণের অধিকারী, কেবল সেগুলোকেই সে আল্লাহ্‌র জন্য প্রমাণ করতে পারে। শুধু পার্থক্য হলো—সে আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে নিজ গুণাবলীর চাইতে অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করে। সুতরাং অনুসিদ্ধান্তে বলা যায় যে, বস্তুত মানুষ নিজের গুণেরই প্রতিষ্ঠা করে থাকে। আল্লাহ্‌র খাস গুণাবলীকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই নবীজী বলেছিলেন: "হে আল্লাহ্! তুমি স্বয়ং যেভাবে তোমার প্রশংসা করেছ, তদ্রূপ আমি করতে পারি না।" এই হাদীসের অর্থ এ নয় যে, নবীজী আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রতি অনবহিত ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করতে অক্ষম ছিলেন। তার মানে হলো তিনি স্বয়ং স্বীকারোক্তি করেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলীর হকিকত অনুধাবনে তিনি অক্ষম। কোন কোন আল্লাহ্ ভীরু লোক বলেন, আল্লাহ্‌র হকিকত কেবল আল্লাহ্‌ই বুঝতে সক্ষম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেন: সেই আল্লাহ্‌ই প্রশংসার যোগ্য, যিনি নিজ পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন যে, মানুষের বোধগম্য না হওয়াই হলো তাঁর পরিচয়।"

আমি আবার আসল উদ্দেশ্যে ফিরে আসছি। সেই পাঁচ প্রকার রহস্যের মধ্যে এক প্রকার হলো—এমন সব বিষয়, যা জ্ঞান-গণ্ডি বহির্ভূত। তন্মধ্যে একটি হলো—আত্মা। আল্লাহ্‌র কোন কোন গুণও এ শ্রেণীভুক্ত। পরবর্তী হাদীসটিও এ মর্মে ইংগিত বহন করছে: নবীজী বলেন: আল্লাহ্ সত্তরটি নূরের পর্দার মধ্যে অবস্থিত। সেগুলো খুলে গেলে অবলোকনকারী দগ্ধ হয়ে যাবে।"

২. দ্বিতীয় প্রকারের রহস্য নবী ও সত্যিকার বান্দাগণ প্রকাশ করেন না। এ বিষয়গুলো অনুধাবনযোগ্য বটে, কিন্তু সেগুলোর প্রকাশ অনেকের পক্ষে ক্ষতিজনক। অবশ্য নবী ও সত্যিকার বান্দাদের পক্ষে ক্ষতিজনক নয়। যেমন 'জব্‌র' ও 'কদ্‌র'—এ বিষয়টি। এ ব্যাপারটি প্রকাশ করার অধিকার উলামারও নেই। এটা বিচিত্র নয় যে, কোন কোন হকিকতের প্রকাশ কতক লোকের পক্ষে ক্ষতিকর, আবার কতকের পক্ষে তদ্রূপ নয়। যেমন সূর্যের কিরণ বাদুড়ের পক্ষে এবং গোলাপের সুগন্ধ গুব্‌রে পোকার জন্য ক্ষতিকর। অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, কুফ্‌র, ব্যভিচার, গুনাহ্, অন্যায়—এসবই আল্লাহ্‌র আদেশে

সম্পন্ন হয়—এ বিশ্বাস সত্য বটে, কিন্তু অনেকের পক্ষে তা ক্ষতিকর। কেননা তাদের মতে, এটা অন্যায় ও হেক্‌মত-বিরোধী এবং এ বিশ্বাস করার মানে—যেন অন্যায় ও যুলুমের বৈধতা স্বীকার করা। এসব কথা ভেবেই ইব্‌নুর রাবিন্দী ও কতক অথর্ব লোক বিধর্মী হয়ে গেছে। 'কাযা-কদর' (নির্ধারিত ভাগ্য) এর ব্যাপারটিও তদ্রূপ। যদি এর রহস্য প্রকাশ করা হয়, তবে অধিকাংশ লোক আল্লাহর অক্ষমতার কথা ভাবতে শুরু করবে। অন্যদিকে, এ সন্দেহ দূর করার জন্য যে প্রকৃত উত্তর রয়েছে, তা জনসাধারণের ধারণাতীত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রহস্যটি এমনিভাবেও বোঝানো যায়ঃ যদি বলা হতো যে, কেয়ামত সংঘটিত হতে এখনো এক হাজার বছর বা তার চাইতে বেশী বা কম সময় বাকি আছে, তবে প্রত্যেকটি মানুষ অবশ্য তা বুঝে নিতে পারতো। কিন্তু এর জন্য সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হলে তা হতো মঙ্গলের পরিপন্থী এবং তাতে মানুষের ক্ষতিই সাধিত হতো। কেননা কেয়ামতের আগমন যদি দূরবর্তী বলে ঘোষিত হতো, তবে লোকেরা এর তেমন পরোয়াই করতো না। আর যদি নিকটবর্তী বলে ঘোষিত হতো, তবে লোকেরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো যে, কাজ-কর্মই তারা ছেড়ে দিতো। ফলে দুনিয়াটা অচল হয়ে পড়তো।

৩. তৃতীয় শ্রেণীর রহস্য হলো—এমন কতগুলো বিষয়—তা যদি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হতো, তবে মানুষ অবশ্য সেসব বুঝতে পারতো এবং তাতে তাদের কোন ক্ষতিও হতো না। কিন্তু সেগুলোকে রূপকভাবে বা ইংগিতে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাদের মনে সে বিষয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করা। যেমন কেউ যদি বলে, "আমি অমুককে শূকরের গলায় মুক্তার হার পরাতে দেখছি", আর তার একথা বোঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, শিক্ষক অনুপযুক্ত লোকদের শিক্ষা দিচ্ছে, তবে সাধারণ শ্রোতাগণ অবশ্য এ বাক্যের প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করবে। কিন্তু একজন পণ্ডিত লোক যখন চিন্তা করে দেখবে যে, সেখানে শূকরও নেই, মুক্তাও নেই, তখন তাঁর ধারণা ধাবিত হবে সেই আসল তথা রূপক অর্থের দিকে।

এ ধরনের আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো নবীজীর একটি হাদীস। তা হলো—"থুথু ফেলার দরুন মসজিদ দুঃখিত হয়ে এমনি সংকুচিত হয়, যেমন চর্ম সংকুচিত হয় অগ্নি দাহনে।" থুথু ফেলার দরুন

মসজিদ-দেহে প্রকাশ্যে কোন সংকোচন দৃষ্ট না হলেও তাতে হাদীসের যথার্থতায় গায়ে আঁচড় লাগতে পারে না। কেননা হাদীসের উদ্দেশ্য হলো—মসজিদ সম্মানের বস্তু—একথা বোঝানো। এ হাদীসে থুথু ফেলার মানে মসজিদের অবমাননা করা। তাই এ কাজটি মসজিদের সম্মানের এত পরিপন্থী যেন চর্মকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করা। আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো—নবীজীর সেই হাদীসটি, যাতে তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উঠায়, আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করলেও যেন সে তাতে ভয় পায় না।" যদিও প্রকাশ্যভাবে কখনো মানুষের আকারের এরূপ কোন পরিবর্তন ঘটেনি, আর ঘটবেও না। তবুও এতে হাদীসের গায়ে আঁচড় লাগতে পারে না, কারণ আসল উদ্দেশ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে কথাটি ঠিকই আছে। কেননা আকৃতির দিক থেকে গাধার মাথায় কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। তার যেটুকু বৈশিষ্ট্য আছে, তা হলো বোকামি ও আহাম্মকির দিক থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমামের আগে রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে, আহাম্মকির দিক থেকে তার মাথা যেন গাধারই মাথা। যে ব্যক্তির কারো পেছনে থাকার কথা, সে যদি অগ্রে চলে যায়, তবে তা কি চরম আহাম্মকি নয়? এখানে যে প্রকাশ্য অর্থ উদ্দিষ্ট নয়, তা বুদ্ধিজাত যুক্তিতেই বোঝা যায়। তাছাড়া শরীঅত ভিত্তিক যুক্তিতেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়। বুদ্ধিজাত যুক্তি হলো—এখানে প্রকাশ্য অর্থ করা সম্ভব নয়। নবীজীর অন্য একটি বাণীতেও এরূপ রূপক অর্থ দেখা যায়। তা হলো—"মুসলমানদের অন্তর আল্লাহ্র দুই অঙ্গুলির মাঝখানে অবস্থিত।" অথচ বাস্তবে মুসলমানদের অন্তরে কোথাও অঙ্গুলি দেখা যায় না। এতে বোঝা যায় যে, অঙ্গুলির অর্থ এখানে শক্তি। কেননা অঙ্গুলির আসল হকিকত হলো শক্তি। অঙ্গুলি শব্দটি উচ্চারণ করে শক্তির অর্থ করা—এটাই হলো পরিপূর্ণ শক্তি বর্ণনার সর্বোত্তম পন্থা। তাই হাদীসের ভাবার্থ হবে ঃ মুসলমানদের অন্তর ঐশ শক্তির প্রতীক। এভাবে শক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চাই, তখন বলি—'হও' আর তখনি তা হয়ে যায়।" এখানে প্রকাশ্য অর্থ কিছুতেই করা যায় না। কেননা যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই, তাকে কি করে সম্বোধন করা যায়? সম্বোধনই যদি ঠিক না হলো, তবে আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর যদি

কোন বস্তুর সৃষ্টি হওয়ার পর এ সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে তা হবে নিরর্থক। কিন্তু এটাই হলো আরবী ভাষায় অতুলনীয় শক্তি বর্ণনার উত্তম পদ্ধতি। তাই এখানে সে পদ্ধতিটাই প্রয়োগ করা হলো। শরীঅত ভিত্তিক যুক্তিতেও বোঝা যায় যে, এরূপ স্থলে প্রকাশ্য অর্থ করা সম্ভব নয়। যেমন কুরআনে আছেঃ "তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর উপত্যকাসমূহ তাদের ধারণ ক্ষমতা মোতাবেক নিজেদের জন্য পানি চেয়ে নিয়েছে।" 'পানি' শব্দে অর্থ করা হয়েছে—'কুরআন', আর 'উপত্যকা' শব্দে বোঝানো হয়েছে—অন্তর। কোন কোন উপত্যকায় খুব বেশী তৃণ-লতা জন্মায়, আবার কোন কোনটায় কম, আবার কোনটায় মোটেও থাকে না। পানি থেকে উদ্ভূত ফেনা দিয়ে বোঝানো হয়েছে—কুফ্‌র্‌ ও কপটতা। কেননা যদিও তা স্পষ্টত দেখা যায় এবং পানির উপরই ভাসমান থাকে, তবুও মূলত তা অস্থায়ী। কুফর ও কপটতাও ঠিক তেমনি ধরনের। পক্ষান্তরে হেদায়ত, যা মানুষের উপকারে আসে, তা হলো দীর্ঘস্থায়ী।

লোকেরা কেয়ামতের দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত ইত্যাদিকেও তৃতীয় শ্রেণীর রহস্যের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এগুলোকে তারা রূপক অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু এ ধরনের ব্যবহার বেদা'ত। কেননা এর সমর্থনে কোন হাদীস দেখা যায় না। দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত ইত্যাদির বাহ্য অর্থে প্রয়োগে কোন অযৌক্তিকতা সৃষ্টি হয় না। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রকাশ্য অর্থ করাই প্রয়োজন।

৪. চতুর্থ প্রকার রহস্য হলো—মানুষ কোন বস্তুকে প্রথমত মোটামুটিভাবে বুঝে নেয়। অতঃপর মনোনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করে তার স্বরূপ এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, যা সর্বক্ষণ তার অন্তর-চোখে ভাসতে থাকে। কোন বস্তুকে মোটামুটি দেখা ও গভীরভাবে উপলব্ধি করা—এ দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে এত বড় পার্থক্য রয়েছে, যেমন পার্থক্য থাকে খোসা ও শাঁসের মধ্যে, অন্য কথায়, জাহির ও বাতিনের মধ্যে। এর দৃষ্টান্ত হলো কোন ব্যক্তি যদি অন্ধকারে থেকে বা দূর থেকে কোন বস্তু অবলোকন করে, তবে সেই জ্ঞান হবে এক ধরনের। কিন্তু যদি আলোতে থেকে বা নিকট থেকে সেই বস্তুটি দেখে, তবে সেই জ্ঞান হবে অন্য ধরনের। দ্বিতীয় অবস্থা প্রথম অবস্থার পরিপন্থী নয়, বরং তা হলো প্রথম অবস্থারই পূর্ণতা সাধন। ঈমানের ব্যাপারটিও তদ্রূপ। মানুষ প্রেম, পীড়া, মৃত্যু—

এ সবই বিশ্বাস করে। কিন্তু সে যখন নিজেই এসবের ভুক্তভোগী হয়, তখন তার বিশ্বাস পূর্বকার বিশ্বাসের চাইতে অধিকতর গভীর না হয়ে পারে না। মানুষের কামাসক্তি, প্রেম এবং অন্যান্য ভাবাবেগের বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এসব ব্যাপারে ভুক্তভোগী হওয়ার পূর্বে এক ধরনের অবস্থা থাকে, ভোগের অবস্থায় তা অন্য ধরনের হয় এবং ভোগ অবসানের পর তার ভিন্ন অবস্থা দাঁড়ায়। বিভিন্ন স্তরে এসব বিষয়ে বিশ্বাসের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। আমরা দেখতে পাই, ক্ষুধা নিবারিত হলে সেই অনুভূতি আর থাকে না, যা ক্ষুধার সময় হয়ে থাকে। ধর্মীয় জ্ঞানের অবস্থাও তদ্রূপ। জ্ঞান যদি স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির পর্যায়ে উপনীত হয়, তাকেই বলা হয় পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। এ পূর্ণতা লাভের পূর্বাবস্থাকে বলা হয়—বাহ্যজ্ঞান (যাহিরী ইল্‌ম্)। আর তার পূর্ণতা লাভের পর দৃঢ় জ্ঞানকে বলা হয় অন্তর্নিহিত জ্ঞান (বাতিনী ইল্‌ম)। একজন রোগীর মনে সুস্থতার যে ধারণা থাকে, তা একজন স্বাস্থ্যবান লোকের ধারণা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র।

এ চার শ্রেণীর রহস্যে মানুষের জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই অন্তর্নিহিত জ্ঞান বাহ্য জ্ঞানের পরিপন্থী হয় না। বরং অন্তর্নিহিত জ্ঞান বাহ্য জ্ঞানের এমনি পরিপূরক, যেমন শাঁস খোসার পরিপূরক।

৫. এমন কতগুলো বিষয় আছে, যেখানে জড় বস্তুকে মানব মূর্তিরূপে কল্পনা করা হয় এবং তার ব্যঞ্জনাসূচক কথাকে বাস্তবিক মানুষের কথারূপে অভিহিত করা হয়। সংকীর্ণমনা লোকেরা বাহ্য দিকটা নিয়ে আটকে পড়ে। তারা এই রূপক কথাবার্তাকেই সত্যিকার কথাবার্তা বলে মনে করে। কিন্তু গূঢ়তত্ত্বের অনুধাবকেরা আসল রহস্য উপলব্ধি না করে ক্ষান্ত হন না। প্রবাদ আছেঃ "দেয়াল পেরেককে বললো, তুমি আমাকে ছেদ কর কেন? পেরেক বললো, ওর কাছেই জিজ্ঞেস কর, যে আমাকে ঘা দিচ্ছে। কারণ আমি স্বাধীন নই।" এখানে পেরেককে মানব মূর্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং তার মুখে মানুষের ভাষা দেওয়া হয়েছে। পেরেকের ভাবভঙ্গি-মূলক ভাষাকে তার মৌখিক ও উচ্চারণমূলক ভাষারূপে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে এর একটি দৃষ্টান্ত অনুধাবন করুন। আল্লাহ্ বলেনঃ ،

"অতঃপর আল্লাহ্ আকাশ পানে এমতাবস্থায় লক্ষ্য করলেন, যখন তা ছিল ধূম্রময়। তিনি আকাশ ও জমিনকে সম্বোধন করে বললেন, খুশিতে হোক, আর অখুশিতেই হোক, তোমরা উপস্থিত হও ; তখন উভয়ই বললো ঃ আমরা খুশি সহকারেই হাযির হলাম।"

আহাম্মকদের মতে, এর অর্থ হলো আকাশ-জমিনেরও বিবেক-বুদ্ধি আছে। তাই অক্ষর ও আকার যোগে আল্লাহ্ আকাশ ও জমিন-কে এ কথাগুলো বলেছিলেন। তারা সেগুলো বুঝেছিল এবং উত্তরে বলেছিল যে, আমরা উপস্থিত আছি। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা জানেন, এটা ছিল ব্যঞ্জনাসূচক ও রূপক কথা। এতে এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, আকাশ-জমিন আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন। কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ্র এমনি ধরনের আরো আরো বাণী রয়েছে ঃ

"এমন একটি বস্তুও নেই, যা আল্লাহ্র প্রশংসায় তস্বীহ্ পাঠ করছে না।"

আহাম্মক লোকেরা এ আয়াতের যে অর্থ করে, তা হলো এই ঃ জড় বস্তুতেও জীবন, বুদ্ধি ও বাক্শক্তি রয়েছে এবং তা সত্যিই 'সুব্হানাল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা জানেন, এখানে উচ্চারণীয় কোন ভাষার কথাই বলা হয় নি বরং আল্লাহ্র এ কথা বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, জড় বস্তুর অস্তিত্বটাই তাঁর তস্বীহ্ স্বরূপ এবং তা তাঁর পবিত্রতা ও একত্ববাদের সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন কোন কবি বলছেন ঃ

"প্রত্যেক বস্তুতেই আল্লাহ্র এমন নিদর্শন রয়েছে, যা তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য বহন করছে।" রূপক ভাষায় বলা হয় ঃ "এ উৎকৃষ্ট শিল্পটি কারিগরের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছে।" এর মানে এ নয় যে, সেই শিল্পই নিজ মুখে কথা বলছে, বরং তার অবস্থা ও লক্ষণে এ অর্থটি অনুমিত হয়। এমনিভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল। স্রষ্টা কোন বস্তুকে সৃষ্টি করে, সেটাকে ও সেটার গুণকে সে স্থায়িত্ব দান করে এবং তার অবস্থারও পরিবর্তন সাধন করে। সৃষ্ট বস্তুর এই নির্ভরশীলতাই হলো স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও তার পবিত্রতার প্রতি সাক্ষ্যদান। কিন্তু প্রকাশ্যবাদীদের দৃষ্টি কেবল বাহ্য দিকটার উপরই পড়ে। তাই তারা এ সাক্ষ্য বুঝতে অক্ষম। কেবল অন্তর্বাদীরাই এ সাক্ষ্য অনুধাবন করতে পারে। এজন্য আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

"কিন্তু তোমরা ( প্রকাশ্যবাদীরা ) তাদের তস্‌বীহ্‌ বুঝতে পারছো না।"

অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তো এর অর্থ মোটেই বুঝে না। ঝানু আলিম ও আল্লাহ্‌র প্রিয়জনেরা অবশ্য বুঝেন। কিন্তু তাঁরাও গূঢ়তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝতে অক্ষম। কেননা জড়বস্তু আল্লাহ্‌র পবিত্রতা সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেয়, তা নানা ধরনের। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি মাফিক সেগুলো উপলব্ধি করে থাকে। এ সাক্ষ্য দানের রকমারি বর্ণনা করা সমাজবিদ্যার কাজ নয়।

মোটকথা, এটা এমন একটা মনযিল, যেখানে প্রকাশ্যবাদী ও অন্তর্বাদীদের মধ্যে নিহিত পার্থক্য ধরা দেয়। তাই প্রতীয়মান হয় যে, যাহির ও বাতিনের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে।

এ মনযিলে লোকেরা চরম কড়াকড়িও করে, আবার চরম নমনীয়তাও অবলম্বন করে। কেউ কেউ এত অগ্রসর হন যে, তাঁরা যাহির ও বাহ্য দিকটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন। যেমন আল্লাহ্‌র নিম্নলিখিত বাণীকেও তাঁরা বাহ্য অর্থে ব্যবহার করতে রাজী নন ঃ

"এবং আমার সঙ্গে তাদের হাত কথা বলবে; তাদের পা সাক্ষ্য দেবে, তারা আপন ত্বককে বলবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? ত্বক বলবে ঃ আমাকে আল্লাহ্‌ বাক্‌শীল করেছেন, যিনি সব বস্তুকে বাক্‌শীলতা দান করেছেন।"

এমনিভাবে মুন্‌কির-নকীরের প্রশ্নোত্তর, দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত, হিসাব-কিতাব, দোযখবাসী ও বেহেশতবাসীদের মধ্যে বিতর্ক, দোযখীদের সামান্য পানির জন্য আকুল আবেদন—এ সবকে তাঁরা রূপক অর্থেই ব্যবহার করেন।

আবার অন্য সম্প্রদায় এত বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তাঁরা আক্ষরিক অর্থ করতে গিয়ে রূপক অর্থের দ্বারই বন্ধ করে দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল এ সম্প্রদায়ের অন্যতম। তিনি সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র 'হও' (কুন্‌) বলা, অতঃপর "তা হয়ে যায়" (ফা-ইয়াকুন্‌)—এ বাণীতেও তাবীল করতে নিষেধ করেন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেন, প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ্‌ 'কুন্‌' শব্দ বলে থাকেন। আমি ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বলের কোন কোন অনুবর্তীকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম সাহেব নাকি তিনটি হাদীস ছাড়া আর

কোথাও 'তাবীল' করা বৈধ মনে করতেন না। সেই তিনটি হাদীস হলো ঃ (১) "কালো পাথর (হাজর-এ-আস্ওয়াদ্) দুনিয়াতে আল্লাহ্র ডান হাত স্বরূপ।" (২) "মুসলমানের অন্তর আল্লাহ্র দুই অঙ্গুলির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।" (৩) "আমি ইয়েমেন থেকে আল্লাহ্র গন্ধ পাচ্ছি।" ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল সম্পর্কে এ ধারণা করা যায় না যে, তিনি আরশের প্রতি আল্লাহ্র ধাবিত হওয়াকে আরশের উপর তাঁর আসীন হওয়া অর্থ করেছেন বা আকাশ থেকে কোন কিছুর অবতরণকে স্থানীয় অবতরণের অর্থে গ্রহণ করেছেন। তবে হয়তো তিনি জনসাধারণের উপকারার্থে আগেভাগেই তাবীল করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ কোন বস্তুর জন্য দ্বার খুলে দিলে শেষ পর্যন্ত তা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, তিনি যদি তাবীলের প্রশ্নে বাধা-বিঘ্ন আরোপ করে থাকেন, তবে অন্যায় কিছু করেন নি। পূর্বসূরীদের কাজ-কর্মেও এ নীতির সমর্থন মেলে। তাঁরা এ ধরনের জায়গায় বলতেন ঃ যেভাবে আল্লাহ্-রসূলের বাণী বিবৃত হয়েছে, সেভাবেই থাকতে দিন।

ইমাম মালিকের নিকট কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আরশের প্রতি আল্লাহ্র ধাবমান হওয়ার অর্থ কি? তিনি বল্লেন, ধাবমান হওয়ার কথাতো জানি। কিন্তু কিভাবে ধাবিত হলেন, তা জানি না। তবুও এটা বিশ্বাস করা কর্তব্য। কিন্তু এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিদা'ত।

কোন কোন লোক চরম প্রকাশ্যবাদ ও চরম অন্তর্বাদের মধ্যে সমতা ও মধ্যবর্তিতা সৃষ্টির জন্য কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত আল্লাহ্র গুণাবলীর তাবীল করে থাকেন এবং কেয়ামত সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তা স্পর্শ করতে ও তাতে তাবীলের আশ্রয় নিতে নিষেধ করেন। এঁরা হলেন আশায়েরা। মুতাযিলা সম্প্রদায় আরো কিছুটা অগ্রসর হন। তাঁরা আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে তাঁর দর্শন ও শ্রবণের তাবীল করেন এবং নবীজীর মে'রাজকে অশারীরিক মেরাজ বলে পরিগণিত করেন। তাঁরা কবরের শাস্তি, দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত ইত্যাদিরও তাবীল করেন। তথাপি তাঁরা এতটুকু স্বীকার করেন যে, পরকাল হবে শারীরিকভাবে। বেহেশতের পানাহার, সুগন্ধ গ্রহণ, বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য উপভোগও হবে বস্তুনিষ্ঠভাবে। এমনিভাবে দোযখের শাস্তি

হবে শারীরিকভাবে। এরূপ আগ্নেয় উপাদান থাকবে, যাতে শরীরের ত্বক পুড়ে যায়। মুসলিম দার্শনিকগণ এ ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়ে যান। তাঁরা বলেন, কেয়ামত সম্পর্কিত যত উপভোগ ও কষ্টের কথা বর্ণিত হয়েছে, সবই আধ্যাত্মিক। এঁরা দৈহিক পরকালে অবিশ্বাসী এবং আত্মার স্থায়িত্বে বিশ্বাসী। এঁরা বলেন, আত্মাকে যে শান্তি বা শাস্তি দেয়া হবে, তা ইন্দ্রিয়গম্য হবে না।

এঁরা সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। দার্শনিকদের অতিআজাদী ও হাম্বলীদের কঠোরতার মাঝখানে অপর একটি পথ আছে, যা খুবই সূক্ষ্ম। তাঁরাই সে পথের সন্ধান লাভ করতে পারেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তওফীক বা ঐশ ক্ষমতা দান করেন। তাঁরা বস্তু সমূহকে রেওয়াইয়াত (পরম্পরাগত বর্ণনা) দিয়ে বিচার না করে আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকেই বিচার করে থাকেন। বস্তুর গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটিত হওয়ার পরেই তাঁরা শাব্দিক বর্ণনা ও শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তখন যেসব বর্ণনা ও ধারণা তাঁদের কাছে ঐশ জ্ঞান মাফিক বলে মনে হয়, সেগুলোকেই তাঁরা সঠিক অর্থ বলে ধরে নেন। আর যেগুলো বাহ্য বর্ণনার পরিপন্থী বলে মনে হয়, সেগুলোর তাবীল করেন। যাঁরা কেবল শব্দকে আঁকড়ে ধরে রাখেন, তাঁদের কোথাও ঠাঁই নেই। তাঁদের আশ্রয়স্থল কোথাও নেই। তাঁদেরকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পথই ধরতে হবে। আর যদি সত্যিকার সমতা ও মধ্যবর্তী পথের সন্ধান লাভ করতে হয়, তবে আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-জগতে প্রবেশ করতে হবে। এর জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। তাই আমি সেদিকে যেতে চাই না।

এখানে শুধু এতটুকু প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, যাহির ও বাতিন পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। উক্ত পাঁচ প্রকার রহস্যের বিস্তারিত আলোচনার ফলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

## তাবীল সম্পর্কে ইমাম গাযালীর 'ফসলুত্‌তাফ্‌রিকা' গ্রন্থের সারমর্ম :

ইমাম গাযালী উক্ত সূক্ষ্ম প্রবন্ধে বিতর্কমূলক ও অস্পষ্ট বিষয়াদিকে যেভাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করেছেন, তাতেই তাবীল-সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। তথাপি তাবীল কত প্রকার, তাবীলের বৈধতার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে, গুরুত্বের দিক

থেকে কোন্ ধরনের তাবীলের কোথায় অবস্থান—এসব বিষয়ে তিনি 'ফসলুত্তাফরিকা' নামক বিশেষ একটি পুস্তিকা রচনা করে জটিলতার অনেকটা সুরাহা করে দিয়েছেন। তাই এর সারাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করি।

তিনি বলেন, বস্তুর অস্তিত্ব পাঁচ প্রকার ঃ

১. বাস্তব অস্তিত্ব, যেমন আকাশ-জমিনের অস্তিত্ব।

২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব, অর্থাৎ যে অস্তিত্ব কেবল বিশেষ ইন্দ্রিয় শক্তির অধিকারীর কাছে বোধগম্য—যেমন স্বপ্নে দেখা ঘটনাবলী, রোগীর জাগ্রত অবস্থায় দেখা ছবি, নবীর দেখা ফেরেশতার ছবি। ইমাম সাহেব এসব অস্তিত্বকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে অভিহিত করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বের আলোচনায় তিনি বলেন ঃ

"বরং কখনো কখনো নবী আর ওলীরাও জাগ্রত ও সুস্থ অবস্থায় দেখতে ফেরেশতার ন্যায় মনে হয়, এমন সুন্দর ছবি দেখতে পান। এ ছবির মাধ্যমেই নবী ও ওলীদের উপর ওহী ও এলহাম (অন্তরঢালা জ্ঞান) অবতীর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং যেসব অদৃশ্য বস্তু অন্যান্য মানুষেরা নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পায়, নবী ও ওলীদের অন্তর সাফ বলে তাঁরা সেগুলো জাগ্রত অবস্থায়ই দেখতে পান। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ মরিয়ম (আঃ)-এর সামনে জিব্রাঈল (আঃ) অবিকল মানুষের আকার ধারণ করে এসেছিলেন। এ অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরো বলা যায় যে, রসূল করীম জিব্রাঈলকে বহুবার দেখেছিলেন।

৩. কাল্পনিক অস্তিত্ব।

৪. বুদ্ধিসম্মত অস্তিত্ব। যেমন আমরা বলি, এ বস্তুটি আমার হাতে আছে এবং তাতে এ অর্থ করা যায় যে, এটি আমার অধিকারে আছে। এ ধরনের হস্তগত অস্তিত্ব হলো বুদ্ধিসম্মত অস্তিত্ব। কেননা হস্তগত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হলো অধিকারভুক্ত হওয়া এবং শক্তি অর্জন করা।

৫. সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব, অর্থাৎ স্বয়ং সে বস্তুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে, এমন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। ইমাম সাহেব এর দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করেছেন আল্লাহ্র ক্রোধ ইত্যাদিকে। ক্রোধের আসল অর্থ হলো—অন্তরের খুন উথলে উঠা। এটা জানা

কথা যে, আল্লাহ্ এরূপ মতি-গতি থেকে মুক্ত। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি বস্তু আছে, যা ক্রোধ-সদৃশ।

অস্তিত্বের এ রকমারি বর্ণনা করার পর ইমাম গাযালী বলেন ঃ

"মনে রাখুন, যে ব্যক্তি শরীঅতের কোন বিষয়কে এসব অস্তিত্বের মধ্যে যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করে, তাকে শরীঅতের বিশ্বাসী বলে গণ্য করতে হবে। যে ব্যক্তি এসব অস্তিত্বের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে শরীঅতকেই অস্বীকার করে।"

এর পর ইমাম গাযালী গুরুত্বের দিক থেকে এসব অস্তিত্বের স্ব-স্ব অবস্থান নির্ধারণ করেন। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কুরআন-হাদীসে যে সব বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, সে সবের অস্তিত্বকে বাস্তব অস্তিত্ব বলে ধরে নিতে হবে। যদি কোন প্রমাণে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তা বাস্তব অস্তিত্ব হতে পারে না, তবে সে ক্ষেত্রে তাকে হয়তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নয়তো কাল্পনিক, নয়তো বুদ্ধিসম্মত, নয়তো সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব বলে সাব্যস্ত করতে হবে। অতঃপর ইমাম সাহেব এসব অস্তিত্বের স্ব-স্ব অবস্থান ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকটির উদাহরণ পেশ করেন এবং বলেন যে, তাবীল থেকে কোন সম্প্রদায়ের গত্যন্তর নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—হাদীসে আছে "মানুষের কর্ম ওজন করা হবে।" কর্ম হলো একটি গুণ বিশেষ। এটা জানা কথা যে, গুণ কখনো ওজন করা যায় না। তাই কর্মের পরিমাপ করাও সম্ভব নয়। এজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই তাবীল করতে হয়।

আশায়েরাপন্থী তাবীল করে বলেন, কর্ম নয়, বরং কর্ম সংক্রান্ত কাগজ-পত্রেরই ওজন করা হবে। মুতাযিলার মতে, এখানে দাঁড়ি-পাল্লার পরিমাপ বোঝানো হয় নি, বরং পরিমাপের অর্থ হলো— পাপ-পুণ্যের অনুমান করা। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোন দাঁড়ি-পাল্লা হবে না।

ইমাম গাযালী যেভাবে অস্তিত্বের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন এবং সেগুলোর হকিকত তুলে ধরেছেন, তাতে তাবীলের বিষয়টি পরিষ্কার না হয়ে পারে না। এজন্য শেষ যুগীয় ইমামগণ, যেমন ইমাম রাযী, আল্লামা আমুদী প্রমুখ ইমাম গাযালী প্রণীত নীতি অনুসারেই তাবীলের

বিষয়টি সুরাহা করেন। কিন্তু একটি বিষয় অস্পষ্ট থেকে গেল, যার ফলে এ যাবত শত শত ভ্রান্তি সংঘটিত হচ্ছে। তা হলো— ইমাম সাহেব তাবীলের নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, যেখানে প্রকাশ্য অর্থ করা ঠিক হবে না বলে নিশ্চিত প্রমাণ থাকবে, কেবল সে ক্ষেত্রেই অপ্রকাশ্য তথা অন্যান্য অর্থের চিন্তা করা যেতে পারে। এ নীতি অবশ্য পুরোপুরি ঠিক। তবে কথা হলো —'নিশ্চিত প্রমাণ' শব্দগুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এ শব্দ দুটো সম্পর্কে ভুল বোঝা-বুঝির ফলেই শত শত ভুলের অবতারণা করা হয়েছে।

ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী প্রমুখ 'নিশ্চিত প্রমাণ' বলতে একথাই বুঝিয়েছেন যে, বাস্তব ও প্রকাশ্য অর্থ নিলে যদি কোন প্রকার অসম্ভাব্য কিছু দেখা দেয়, তবেই তাবীল করা যাবে। অন্যথা নয়। এখন প্রশ্ন হলো 'অসম্ভাব্য শব্দটি নিয়ে। যে ব্যাপারটির ঘটে যাওয়া বিবেক বিরোধী, সেটাকে 'অসম্ভাব্য' বলা হয়। আবার যা বিবেক বিরোধী নয়, কিন্তু সাধারণত ঘটে না, সেটাকেও 'অসম্ভাব্য' বলে পরিগণিত করা হয়। ইমাম গাযালীর মতে, যদি প্রকাশ্য অর্থ বিবেক বিরোধী হয়, তবেই তাবীল করা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি শারীরিক হাশ্‌র অস্বীকারকারীকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ তাঁর নিকট কেয়ামতের দিন মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়া বুদ্ধি বিরুদ্ধ নয়। তাই তাঁর মতে, এক্ষেত্রে তাবীলের কোন প্রয়োজন নেই।

## ইমাম গাযালীর ভাবধারার সমালোচনা

আমাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, স্বয়ং ইমাম গাযালী ও ইল্‌মে কালামের অন্যান্য ইমামগণ উক্ত নীতিকে কতটুকু বাস্তবায়িত করেছেন? হযরত মরিয়মের সম্মুখে হযরত জিব্রাঈলের উপস্থিতিকে ইমাম গাযালী বাস্তব অস্তিত্ব বলে স্বীকার করেন না। এ অভিমতটি তিনি তাঁর 'ফস্‌লুত্‌তাফ্‌রিকা' নামক পুস্তিকায় ব্যক্ত করেন। অথচ তাঁর মতে, জিব্রাঈলের অস্তিত্ব হলো প্রকৃত ও বাস্তব। কুরআন শরীফে জড় বস্তুর তসবীহ্ পাঠের কথা রয়েছে। ইমাম গাযালী সেখানে প্রকাশ্য অর্থ করেন না। বরং তস্‌বীহ্ পাঠকে রূপক অর্থে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁর কথানুযায়ী জড় বস্তুর তসবীহ্ পাঠ বিবেক বিরুদ্ধ নয়। কুরআন শরীফে আছে, আল্লাহ্ যখন কোন

বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে থাকেন—'হও',। একথা বলা মাত্রই তা হ:য় যায়'। এখানেও ইমাম গাযালী আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন না। বরং রূপক অর্থেই তা ব্যবহার করেন। অথচ আল্লাহ্‌র পক্ষে এরূপ কথা বলা 'অসম্ভব' কিছু নয়। এভাবে শত শত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে।

এখন আমাদের নিজেদের খতিয়ে দেখতে হবে যে, এ নীতি কতটুকু যথার্থ? আমরা যখন কারো সম্পর্কে বলি—'অমুক ব্যক্তির হাত খোলা', তখন কি প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করলে কোন অযৌক্তিকতা দেখা দেয়? তার হাত সত্যিকার খোলা হওয়া কি অসম্ভব? এ সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি এ বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ করে না। বরং এর অর্থ করা হয় দানশীলতা ও বদান্যতা। প্রত্যেক ভাষায় শত শত স্থানে ভাবার্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেসব স্থানে আক্ষরিক অর্থ করা হলে কি অসম্ভাব্য কিছু দাঁড়ায়?

এখন রয়েছে বুদ্ধি বিরুদ্ধ অসম্ভাব্যের প্রশ্নটি। এটা আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। এক ব্যক্তি যে বস্তুটিকে অসম্ভাব্য বলে মনে করে, অন্য ব্যক্তি সে সম্পর্কে অন্যরূপ ধারণা পোষণ করে। আল্লাহ্‌র দিক-বিশিষ্ট হওয়া ইমাম গাযালীর কাছে অসম্ভাব্য। কিন্তু হাম্বলীদের কাছে তা সম্ভব। মৃত্যুর ভেড়ার আকার ধারণ করা আশায়েরার নিকট অসম্ভাব্য। কিন্তু অনেক মুহাদ্দিসের কাছে তা সম্ভব। ইমাম গাযালী এসব মতামতের প্রতি ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন। তিনি হাম্বলী-দেরকে কাফের রূপে আখ্যায়িত করেন নি। তিনি মনে করতেন, হাম্বলিগণ সেসব বস্তু স্বীকার করেন, যেমন আল্লাহ্‌র দিক-বিশিষ্ট হওয়া বা ইংগিত যোগ্য হওয়া—এগুলো যদিও প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব, তবুও হাম্বলিগণ এগুলোকে সম্ভব মনে করছে বলে তাঁরা এ ব্যাপারে ক্ষমার যোগ্য। ইমাম গাযালীর এ মনোবৃত্তিকে নিঃসন্দেহে উদারতা বলা যায়। তবে প্রশ্ন হলো এ উদারতা হাম্বলীদের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? 'হুকামা-এ-ইসলাম'-এর মতে, বিলীন পদার্থের পুনঃ অস্তিত্ব লাভ করা বিবেক বিরুদ্ধ ব্যাপার। তাই তাঁরা সশরীরে হাশর হওয়ার কথা অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে ইমাম গাযালী 'কাফের' বলছেন কেন?

## 'অসম্ভাব্য' শব্দটির ভুল ব্যাখ্যার দরুন অনেক ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হয়েছে

এ বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির দরুন অনেক ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি রচিত হয়েছে। ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী প্রমুখ বুদ্ধির দিক থেকে অসম্ভাব্য (মহাল-এ-আক্‌লী) বলতে যা বুঝিয়েছেন, তাতে দু'একটা বস্তু ছাড়া সবই সম্ভাব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য সব জায়গায়ই প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে হয় এবং শত শত কল্পনা-প্রসূত বিষয়কেও স্বীকার করে নিতে হয়। এই যে কল্পনা-প্রসূত বস্তুর স্বীকারোক্তির দ্বার উন্মোচিত হলো, তা ক্রমেই বেড়ে চললো।

বিভিন্ন রেওয়াইয়াতে (বর্ণনা) আছে ঃ

"সূর্য প্রত্যহ আরশের নীচে গিয়ে তাকে (আল্লাহ্‌-কে) সেজ্‌দা করে।" "আকাশে এত বেশী ফেরেশতা আছেন যে, তাঁদের বোঝার চাপে আকাশ থেকে ত্রাহি ত্রাহি আওয়াজ শ্রুত হয়।" "আল্লাহ্‌ আদিতে যখন হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর বাম পাঁজরের হাড় বের করে সেখান থেকে হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন।" "পৃথিবীর আদিমুহূর্তে আল্লাহ্‌ হযরত আদমের পিঠ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তান সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাদের নিকট থেকে নিজ প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি আদায় করে পুনরায় তাদেরকে তাঁর পিঠে অনুপ্রবিষ্ট করেন।" "সামিরী জিব্রাঈলের ঘোড়ার খুর থেকে ধূলি-কণা কুড়িয়ে নিল। অতঃপর মাটির একটি বাছুর প্রস্তুত করে সেই ধূলি-কণা তার পেটে প্রবেশ করালো। ফলে বাছুরটি হাম্বারব করতে লাগলো।" ইত্যাদি ইত্যাদি। উক্ত বর্ণিত হাদীস সমূহে যদি প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে আশায়েরার মতে, বিবেকের দিক থেকে অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন উঠে না। এ জন্য তাঁরা এসব স্থলে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

বিবেক-বিচারিত অসম্ভাব্যতার এ প্রশ্নটি সমস্ত মুসলমানকে আজ সংস্কারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ অমুক দরবেশ দরিয়ার সমস্ত পানিকে দুধে পরিণত করেছেন; অমুক আল্লাহ্‌-প্রেমিক তাঁর শরীরের ত্বক খুলে ফেলেছেন; অমুক কামিল লোকটি শত শত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেছেন। আশায়েরার ব্যাখ্যানুসারে এসব অসম্ভব কিছু নয়। তাই তাঁদের কাছে এসব বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন প্রকার সমালোচনা বা পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় না। এগুলো তাঁরা

এ বলে স্বীকার করে নেন যে, এসব ক্ষেত্রে অসম্ভাব্যতার কিছুই নেই। তাই মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়?

কুরআন মজীদ অবশ্যই আল্লাহ্‌র বাণী। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তা আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য তাদের ভাষাগত সব বৈশিষ্ট্যই তাতে পাওয়া যায় এবং এর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। এতে ভাবার্থ, রূপকার্থ, উপমা সব কিছুই রয়েছে এবং তা আরবী ভাষার সাধারণ রীতিনীতি অনুসারেই রয়েছে।

ভাবার্থ ও রূপক অর্থ গ্রহণ করার জন্য এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হলে যদি অসম্ভাব্যতা দেখা দেয়, কেবল তখনি ভাবার্থ বা রূপকার্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে। এরূপ কোন শর্ত মোটেও নেই। "হাম্মালাতাল হাতাব্"-এর অর্থ হলো কাষ্ঠ সংগ্রহ করা। কিন্তু কুৎসা রটানোর অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআন মজীদ আবু লাহাবের স্ত্রীকে 'হাম্মালাতাল্ হাতাব্' খেতাবে আখ্যায়িত করেছে। এখানে মৌলিক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু অভিধান রচয়িতাগণ এ শব্দটিকে কুৎসাকারীর অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। অথচ কোন ব্যক্তিই প্রকাশ্য অর্থ লংঘিত হয়েছে বলে তাঁদেরকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে না।

প্রকাশ্য অর্থ পরিহার করার জন্য এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, তা করা হলে অসম্ভাব্য কিছু একটা এসে দাঁড়াতে হবে। বরং অনেক স্থলে রচনার ভাবভঙ্গি বলে দেয় যে, এখানে মৌলিক অর্থ উদ্দিষ্ট নয়। কুরআন শরীফে আছে: "আমি আকাশ ও জমিনকে বলেছিলাম, খুশীতে হোক, আর অখুশীতে হোক, তোমাদেরকে আমার সামনে উপস্থিত হতে হবে। তখন উভয়ে বললো, আমরা খুশী মনে উপস্থিত আছি।" এখানে রচনাশৈলী বলে দিচ্ছে যে, শক্তিমত্তা প্রকাশের এটাই উত্তম পন্থা।

কোন কোন রচনার ভাবভঙ্গিতে এ ব্যাপারে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণে অসম্ভাব্যতা দেখা দেয় বলেই ভাবার্থ গ্রহণ করা হয়।

## তাবীল বস্তুত তাবীল নয়

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মর্তব্য বিষয় রয়েছে। তা হলো—যে সব অর্থকে তাবীল বলে অভিহিত করা হয়, তা বস্তুত তাবীলের

পর্যায়ে পড়ে না। তাবীলের অর্থ হলো—প্রকাশ্য অর্থ পরিহার করে দ্বিতীয় অর্থ অবলম্বন করা। এখানে প্রকাশ্য অর্থ বলতে যা বোঝায়, তার ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ব্যবহারিক ও পরিভাষাগত অর্থও প্রকাশ্য অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু লোকেরা এটাকে তাবীল বলে আখ্যায়িত করেছে। অভিধানের নীতি হলো—একটি শব্দের একটি মাত্র অর্থ হওয়া। তবে একটি অর্থ নির্ধারিত হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে সামঞ্জস্যমূলক অন্যান্য অর্থও তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়। যেমন, 'ইখ্বাত্' (আরবী) শব্দটি। এর আসল মানে হলো—নুয়ে পড়া। কিন্তু এখন বিনয় ও শিষ্টাচারকেও 'ইখ্বাত্' বলা হয়। কারণ বিনয় প্রদর্শনটাই যেন নুয়ে পড়া। আরবীতে 'লফ্য্' শব্দটির মৌলিক অর্থ হলো—নিক্ষেপ করা। এখন এর অর্থ হলো—শব্দ বা উচ্চারণ। কেননা কোন শব্দের উচ্চারণ করা যেন তাকে মুখ থেকে নিক্ষেপ করা। এসব মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থ। এটাকে ইংরেজী ভাষায় 'সেকেণ্ডারী অর্থ' বলা হয়। এ ধরনের অর্থকেও অভিধানে শামিল করা হয়েছে এবং মৌলিক অর্থ রূপেই ব্যবহার করা হচ্ছে। আরবীতে এক-একটি শব্দের দশ-বিশটি অর্থ থাকে। এর মধ্যে মৌলিক অর্থ হলো মাত্র একটি। কিন্তু সে অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে, এমন আরো অর্থ সৃষ্টি হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে সেগুলো মৌলিক অর্থে পরিণত হয়। তা না হয়, যদি অভিধান গ্রন্থকে কেবল মৌলিক অর্থে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে সেসব গ্রন্থের আকার হ্রাস পেয়ে অর্ধেক বরং এক-চতুর্থাংশে পরিণত হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে যে সব অর্থকে তাবীল বলে অভিহিত করা হয়, তা তাবীলই নয়। কেননা সেগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রকাশ্য অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, শরীঅতে যে সব বস্তু আপাতদৃষ্টিতে আলোচ্য বিষয় বলে মনে হয়, সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। কতক বিষয় আছে, যা সাধারণ লোকের জ্ঞান বহির্ভূত। শরীঅত এসব বিষয়ের হকিকত বর্ণনা থেকে হয়তো সম্পূর্ণরূপে বিরত রয়েছে, নয়তো এমন উপমা ও রূপকের মাধ্যমে সেগুলো বর্ণনা করেছে, যাতে সে সম্পর্কে লোকের মোটামুটি ধারণা জন্মে।

আর কতগুলো বিষয় আছে, যা ততটা সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু সেগুলোর গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করা জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর।

আবার এমন কতগুলো বিষয়ও রয়েছে, যা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করা যেতো। কিন্তু তা না করে সেগুলো উপমা ও রূপকের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো—বিষয়গুলোকে হৃদয়গ্রাহী ও মনোপূত করে তোলা। যেমন আল্লাহর পরম ও চরম শক্তির বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "তিনি যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলেন, 'হও'; তখনি তা হয়ে যায়।" ইমাম রাযী এ বিষয়টিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন ঃ "অধিকাংশ লোক কেয়ামত সংক্রান্ত ঘটনাবলী যেমন—দাঁড়ি-পাল্লা, পুলসিরাত ইত্যাদিকে অর্থের দিক থেকে এ শ্রেণীভুক্ত করেছে। কিন্তু এটা হলো বেদা'ত। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণে কোন অসম্ভাব্যতা দাঁড়ায় না।"

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, ইমাম গাযালীর এ অভিমত কেবল তাঁর 'এহ্ইয়াউল্ উলুম' ও 'ইলমে কালাম' গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'জওয়াহিরুল্ কুরআন' ও 'আল-মাদ্নূন' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি কেয়ামত সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করেন নি। বিস্তারিত বিবরণ পরে দেওয়া হচ্ছে।

কোন কোন স্থলে বিশেষ একটি অবস্থাকে মানব মূর্তিরূপে রূপায়িত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন জড় বস্তুর তসবীহ পাঠের বিষয়টি।

শরীঅতে যে সব বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, সব খানেই যে তাদের বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকতে হবে, এমন কোন শর্ত ধর্মের বিধি-বিধানে নেই। সে সব বস্তুর বাহ্যিক অস্তিত্ব না হয়ে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, কল্পিত, বুদ্ধিজনিত বা সাদৃশ্যমূলক অস্তিত্বও হতে পারে। ইমাম গাযালী এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ভূমিকার পর এখন আসল উদ্দেশ্য বর্ণনায় হাত দিচ্ছি।

## আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয়াদি

### ( ফেরেশ্তা, ওহী, কেয়ামতের ঘটনাবলী ইত্যাদি )

কুরআনে এসব বস্তুর উল্লেখ রয়েছে বলে তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। অন্যকথায়, মুসলমান হওয়ার জন্য এগুলো শর্ত। এজন্য প্রত্যেকটি মুসলিম সম্প্রদায়ে এসব ধর্মীয় বিশ্বাস মোটা-মুটি সমর্থিত। কিন্তু কুরআনে এসব বস্তুর হকিকত বর্ণিত হয়নি বলে বিভিন্ন সম্প্রদায় এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আশায়েরার মতে, প্রত্যেক বস্তুর গোচরীভূত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই এমনও হতে পারে যে, উল্লিখিত বস্তুগুলো বিদ্যমান আছে। কিন্তু গোচরীভূত হয় না।

আল্লাহ্র সাক্ষাৎ সম্পর্কে 'শরহে মওয়াকিফ' গ্রন্থে বলা হয়েছে:

"আমরা এটা মানতে চাই না যে, দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য যে আটটি শর্ত রয়েছে, সেগুলো পাওয়া গেলেই তা গোচরীভূত হবেই।"

এ দাবি যতটা অদ্ভুত, এর যুক্তি তার চাইতেও অদ্ভুত। আশায়েরা তাঁদের দাবির প্রতিষ্ঠায় বলেন:

"আমরা বড় পদার্থকে দূর থেকে ছোট দেখতে পাই। এর কারণ এটা হতে পারে যে, আমরা যে বস্তুর কতকাংশ দেখতে পাই, তার অন্য কতকাংশ দেখতে পাই না। অথচ কোন বস্তুর দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য যতগুলো শর্তের প্রয়োজন, তা সব অংশেই সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে।"

এরূপ শিশুসুলভ যুক্তি ও অনুমানের ফলেই আজ সমগ্র জাতি কল্পনাপ্রসূত ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারক ও বাহক হয়ে বসেছে।

কিন্তু আমাদের এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকাশ্যবাদী আশা-য়েরা ছাড়া অন্যান্য লোক এরূপ কল্পনাপ্রসূত ভাবধারার শিকারে পরিণত হবে কিরূপে? ইমাম গাযালী, শায়খুল ইশ্রাক, শাহ ওলী উল্লাহ ও অন্যান্য পর্যালোচকগণ এসব বস্তুর গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটনের প্রতি লক্ষ্য

করেছেন এবং সমস্যার সমাধানও করেছেন। তাঁরা যে নীতি পেশ করেছেন, তা হলো—শরীঅতে যত বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, তা দু'প্রকার : সর্ব-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সর্ব অতীন্দ্রিয়। দর্শন, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা—এসব বস্তু সর্বসাধারণের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এসব বস্তুর সাথে অতীন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। এতদসত্ত্বেও এটা বলতে হবে যে, অতীন্দ্রিয় বস্তুও বাস্তব অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এমনও হতে পারে যে, একটি বস্তু প্রকাশ্যে নেই এবং সাধারণ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, অথচ তার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। বাস্তব অস্তিত্বের জন্য প্রকাশ্য অস্তিত্ব শর্ত নয়।

বাস্তব সত্যের জন্য প্রকাশ্য অস্তিত্বের প্রয়োজন না হলেও অন্য যে কোন প্রকার অস্তিত্বের প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন অস্তিত্বকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

## আধ্যাত্মিক বস্তুর অস্তিত্ব কি ধরনের ?

ইমাম গাযালী এ অস্তিত্বকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব বলে অভিহিত করেন। এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে আমি তাবীলের অধ্যায়ে ইমাম সাহেবের মূলভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি। তিনি বলেন : এ অস্তিত্ব কোন বিশেষ বিশেষ মানুষের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

নবিগণ ফেরেশতার যে ছবি দেখতে পেয়েছিলেন, রসূল করীম, হযরত জিব্রাঈলের যে আকৃতি দেখতে পেয়েছিলেন, হযরত মরিয়ম হযরত জিব্রাঈলের যে আকার অবলোকন করেছিলেন, ইমাম গাযালী সে সবকে এ অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাবীলের অধ্যায়ে আমি ইমাম সাহেবের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছি।

'আল্-মাদ্নূনু-বিহি আলা গায়রি আহ্লিহি' নামক গ্রন্থে ইমাম সাহেব মুজিযার আলোচনায় এ ধরনের অস্তিত্বকে কাল্পনিক অস্তিত্ব বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন :

"অতীন্দ্রিয় বিষয়ও বিশেষ আকার ধারণ করার ফলে চাক্ষুষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠে। এটা হলো নবী ও রসূলদের বৈশিষ্ট্য। সাধারণ লোক নিদ্রাভিভূত অবস্থায় যেরূপ বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পায়, তাদের আওয়াজ বা কথাবার্তাও শুনতে পায়, তেমনি নবিগণ জাগ্রত অবস্থায়ও বিভিন্ন বস্তুর আওয়াজ ও কথাবার্তা শুনতে পান। এসব বস্তু তাঁদের প্রতি জাগ্রত অবস্থায় সম্বোধনও করে থাকে।"

ইমাম গাযালী কবর সংক্রান্ত ঘটনাবলীর অস্তিত্বকেও এ ধরনের অস্তিত্ব বলে অভিহিত করেন। 'আল-গাযালী' নামক পুস্তিকায় আমি ইমাম সাহেবের মূল ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছি।

## শায়খুল ইশরাকের মতামত:

শায়খুল ইশরাকের অভিমত হলো—ইন্দ্রিয় জগত ছাড়া আরো একটি জগত রয়েছে। তা 'সদৃশ জগত' (আলম-এ আশ্‌বাহ্‌ বা আলম-এ-মিসাল) নামে অভিহিত। তাঁর যুক্তি হলো—কল্পনা জগতে বা দর্পণে যে সব আকৃতি দৃষ্ট হয়, বস্তুত সেগুলোর কোন জড়াত্মক অস্তিত্ব নেই। বরং কল্পনা ও দর্পণ হলো এসব আকৃতি প্রতিফলিত হওয়ার একটি উপায় মাত্র। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, এসব হলো সত্যিকার আকৃতি, ভিত্তিহীন নয়। তাই সদৃশ জগত বলে অন্য একটি জগত মেনে নিতেই হবে, যেখানে থাকবে এসব আকৃতির মৌলিক ও প্রকৃত অস্তিত্ব। শায়খুল ইশ্‌রাক জিন ও শয়তানের অস্তিত্বকে এ জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, শারীরিক হাশর বেহেশ্‌ত, দোযখ ইত্যাদির অস্তিত্বও এ পর্যায়ভুক্ত। 'হিক্‌মাতুল ইশ্‌রাক' গ্রন্থে সাদৃশ জগতের উল্লেখ করে শায়খুল ইশ্‌রাক বলেন:

"কেয়ামত-দিবসের দৈহিক পুনরুত্থান, আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ও নবীদের ওয়াদা—এসবই সদৃশ জগত দ্বারা প্রমাণিত।"

এ গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেন:

"অন্তরিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী (আহ্‌লে কাশ্‌ফ্‌) লোকেরা, অর্থাৎ পয়গাম্বর ও ওলিগণ যেসব ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পান, সেগুলোকে মস্তিষ্কের বাতাস-তরঙ্গ-সৃষ্ট বলে অভিহিত করা মোটেই ঠিক হবে না। কেননা বাতাস-তরঙ্গ এত প্রবলভাবে মস্তিষ্কে ধাক্কা দেবে—এটা অভাবনীয় ব্যাপার। বরং এটা হলো সদৃশ জগতে বিদ্যমান আওয়াজেরই প্রতিধ্বনি।"

অন্যস্থানে তিনি বলেন:

"পয়গাম্বর ও ওলীদের সঙ্গে অদৃশ্য জগত থেকে যেসব কথাবার্তা বলা হয়, সেগুলো কখনো লিখিত আকারে দৃষ্ট হয়, কখনো সমধুর আওয়াজ, আবার কখনো ভয়াবহ কণ্ঠে শ্রুত হয়। তাঁরা কোন কোন সময় পার্থিব দৃশ্যাবলীও দেখতে পান। তাঁরা কখনো কখনো

সুন্দর সুন্দর মানুষের আকৃতিও দেখতে পান। এসব সুন্দর আকৃতি-বিশিষ্ট লোকেরা পয়গাম্বর ও ওলীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁদেরকে অদৃশ্য জগত সম্পর্কে অবহিত করেন। এসব মানবাকৃতি কখনো কখনো তাঁদের কাছে অদ্ভুত সুন্দর ও শিল্প সুষমামণ্ডিত বলে মনে হয়। আবার কখনো কখনো তারা ভয়াল আকারও ধারণ করে। নবী ও ওলিগণ জ্বলন্ত আকৃতিও দেখতে পান। মানুষ নিদ্রিত অবস্থায় পাহাড়, সাগর, জমিন, কর্কশ আওয়াজ, মানবাকৃতি—যা কিছু দেখতে পায়, সবই সদৃশ জগতের প্রতিচ্ছবি। এগুলোর মৌলিক অস্তিত্ব রয়েছে অন্য এক জগতে।"

## শাহ ওলীউল্লার অভিমত

শাহ ওলীউল্লাহ অতিন্দ্রিয় অস্তিত্বের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। কুরআন-হাদীসের যেসব জায়গায় এসব ধরনের অস্তিত্বের কথা আছে, শাহ সাহেব সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, হাদীস-কুরআনে উল্লেখিত এসব বিষয়ের প্রতি যাঁরা লক্ষ্য করেন, তাঁদেরকে নিম্নের তিনটি বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে: হয়তো মানতে হবে যে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগত ছাড়া সদৃশ জগত (আলম-এ-মিসাল) নামে আরো একটি জগত আছে (শাহ সাহেবের এ সদৃশ জগত মুহাদ্দিসগণের সদৃশ জগতের অনুরূপ), নয়তো স্বীকার করতে হবে যে; কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিই এ অস্তিত্বের দর্শন লাভ করতে পারে, যদিও তাদের অনুভূতির বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই, নয়তো বলতে হবে যে, এসব ঘটনা রূপকাকারে বর্ণিত হয়েছে। এই বিকল্পগুলো উল্লেখের পর শাহ সাহেব বলেন: "যাঁরা তৃতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করবেন, তাঁদেরকে আমি ন্যায় পথের পথিক বলে মনে করি না।" শাহ সাহেব কেবল তৃতীয় বিকল্পটিকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেন। আমাদের ধর্মবেত্তাগণ যদি প্রথমোক্ত বিকল্প দু'টি মেনে নিতেন, তবে বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। আমি শাহ সাহেবের ভাষ্যের পূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

## সদৃশ জগতের আলোচনা

মনে রাখতে হবে, অনেক হাদীসে প্রতীয়মান হয় যে, অস্তিত্ব জগতে এমন একটি অস্তিত্বও রয়েছে, যা অজড় এবং যাতে বিষয়-

বস্তু নিজ বৈশিষ্ট্য ও গুণের অনুসারে এমন আকার ধারণ করে, যা তার জন্য শোভা পায়। প্রত্যেক বস্তুর প্রাথমিক আকার সৃষ্টি হয় সদৃশ জগতে। অতঃপর তার দ্বিতীয় সংস্করণ হয় এ পৃথিবীতে। এ পার্থিব আকারটি এক হিসেবে সদৃশ জগতের আকারেরই পুনঃ-রূপায়ণ। জনসাধারণ যেসব বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না, সেগুলো সদৃশ জগত থেকেই নির্গত হয় এবং পার্থিব জগতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তা দেখতে পায় না।

নবীজী বলেছেনঃ "আল্লাহ্ যখন আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সৃষ্টি করলেন, তখন সে দাঁড়িয়ে বললো, এটা সে ব্যক্তিরই আশ্রয়-স্থল, যে লোকটি আত্মীয়দের অবহেলায় অবহেলিত হয়ে তোমার (আল্লাহ্র) কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।"

নবীজী আরো বলেছেনঃ "সূরা-এ-বাকারা ও সূরা-এ-আল-ইম্‌রান্ কেয়ামতের দিন মেঘ বা তাবু বা দলবদ্ধ পাখীর আকার ধারণ করবে এবং তা সেসব লোকের জন্য সুপারিশ করবে, যারা সেগুলো পাঠ করেছিল।"

নবীজী অন্যত্র বলেছেনঃ "কেয়ামতের দিন মানুষের কৃতকর্ম বিশেষ আকার ধারণ করে উপস্থিত হবে। সর্বপ্রথম উপস্থিত হবে নামায, অতঃপর দান, অতঃপর রোযা।

তিনি (সঃ) আরো বলেছেনঃ "পুণ্য ও পাপ দু'টো সৃষ্ট বস্তু। এগুলো কেয়ামতের দিন লোকের সামনে দণ্ডায়মান হবে। অতঃপর পুণ্য পুণ্যবানদের সুসংবাদ দেবে এবং পাপ পাপীদের বলবে, 'দূরে হট, দূরে হট'। কিন্তু তারা তার সঙ্গে জড়িয়েই থাকবে।"

নবীজী অন্য এক স্থলে বর্ণনা করেছেনঃ "কেয়ামতের দিন দুনিয়াকে একজন বৃদ্ধার আকারে উপস্থিত করা হবে। তার চুলগুলো হবে এলোমেলো; দাঁতগুলো হবে নীল এবং আকার হবে কুৎসিৎ।"

তিনি (সঃ) আরো বলেছেনঃ "আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বিপদ তোমাদের ঘরের উপর এমনিভাবে বর্ষিত হচ্ছে, যেমন বৃষ্টিকণা বর্ষিত হয়ে থাকে।"

মে'রাজের হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে রসূল করীম (সঃ) বলেনঃ হঠাৎ চারটি ঝরনার উপর আমার নযর পড়লো। দু'টি ছিল ভেতরে,

আর দু'টি বাইরে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলো কি?" উত্তরে তিনি বললেন, "ভেতরকার ঝরনা দু'টো হলো বেহেশতের, আর বাইরের দু'টো নীল ও ফোরাত।"

সূর্য গ্রহণের নামায সংক্রান্ত হাদীসে নবীজী বলেন: "বেহেশত ও দোযখ আমার সামনে দেহ ধারণ করে উপস্থিত হলো; আমি হাত বাড়ালাম, যেন বেহেশত থেকে আঙ্গুরের থোকা চয়ন করতে পারি। কিন্তু দোযখের আগুনের উত্তাপে থেমে গেলাম।"

অন্য এক হাদীসে আছে: "রসূল করীম (সঃ) হাজীদের মাল হরণকারী একজন চোর ও একজন মেয়ে লোককে দোযখে দেখেছেন। মেয়ে লোকটি একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে বধ করেছিল। তিনি একজন ব্যভিচারিণী মেয়ে লোককেও বেহেশতে দেখেছেন। কেননা সে একটি কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল।"

এটা প্রকাশ্য কথা যে, সাধারণ লোকের ধারণায় বেহেশত ও দোযখের প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা এত বেশী যে, কাবার চার দেয়ালের মধ্যেও তাদের স্থান সংকুলান হয় না।

অন্য হাদীসে আছে: "বেহেশতকে ঘিরে রেখেছে কষ্ট, আর দোযখকে ঘিরে রেখেছে কামুকতা।" অন্য এক স্থানে রসূল করীম (সঃ) বলেন: "বিপদ-আপদ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু দোআ তা ফিরিয়ে রাখে।" অপর হাদীসে রয়েছে: "মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে তাকে জবাই করা হবে।"

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমি আমার রুহ্‌কে মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং তা তার সামনে অবিকল মানুষের আকার ধারণ করে উপস্থিত হলো।"

হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে: জিব্রাঈল রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে উপস্থিত হতেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। অথচ কেউ তাঁকে (জিব্রাঈলকে) দেখতো না।

অন্য হাদীসে আছে: কবর এদিক থেকে সত্তর গজ, আবার ওদিক থেকে সত্তর গজ প্রশস্ত হয় অথবা তার উভয় দিক এমনভাবে মিলিত হয় যে, কবরস্থ ব্যক্তির পাঁজরের হাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

অন্যত্র রসূল করীম (সঃ) বলেন ঃ "ফেরেশতা কবরে অবতীর্ণ হন এবং মৃত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মৃত ব্যক্তির কৃতকর্ম আকার ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয়। মানুষের মৃত্যুর সময় ফেরেশতা রেশম বা সূতার কাপড় পরিধান করে আসেন এবং মৃত ব্যক্তিদের লোহার লাঠি দিয়ে প্রহার করেন। মৃত ব্যক্তিরা চিৎকার করে এবং সে আওয়াজ পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তের প্রত্যেকটি বস্তু শুনতে পায়।

অন্য হাদীসে আছে ঃ কাফেরের কবরে নিরানব্বইটি অজগর বাসা বাঁধে। সে সাপগুলো কেয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকে।

অন্যত্র আছে ঃ মৃত ব্যক্তি যখন কবরে আসে, তখন তার কাছে মনে হয় যে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে। তখন সে বসে পড়ে এবং বলে, হে সূর্য ! তুমি একটু থাম। আমি নামাযটুকু পড়ে নিই।

হাদীসের অনেক জায়গায় আছে ঃ "কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ বিভিন্ন আকারে লোকের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন। এমন অবস্থায় রসূল করীম (সঃ) আল্লাহ্‌র সামনে যাবেন, যখন তিনি (আল্লাহ্) নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন এবং মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি কথাবার্তা বলবেন।"—এ ধরনের অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এসব হাদীস যাঁদের নযরে পড়বে, তাঁদেরকে নিম্নের তিনটি বিকল্পের যে কোন একটি অবশ্যই মেনে নিতে হবে ঃ

১. হয়তো তাঁরা এসব হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ করবেন। যদি তাই করেন, তবে তাঁদেরকে এমন একটি জগত স্বীকার করতে হবে, যার স্বরূপ পূর্বে বর্ণনা করেছি। সেটা হলো সদৃশ জগত বা 'আলম-এ-মিসাল্'। আহলে হাদীসও অনুরূপ মত পোষণ করেন। আল্লামা সুয়ূতীও এদিকেই ইংগিত করেন। আমার নিজের অভিমতও তাই।

২. নয়তো প্রকাশ্য অর্থ করবেন না। যদি প্রকাশ্য অর্থ না করেন, তবে হয়তো এটা স্বীকার করবেন যে, দর্শকদের চোখে সে সব ঘটনা এরূপ আকারই ধারণ করবে, যদিও তাদের অনুভূতির বাইরে সেগুলোর প্রকাশ্য কোন অস্তিত্ব না থাকে। কুরআন মজীদে আছে ঃ "আকাশ সে দিন ধোঁয়াময় হয়ে উঠবে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ যে অর্থ করেছেন, তা শাব্দিক অর্থেরই কাছাকাছি। অর্থাৎ

লোকের উপর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়েছিল। তাদের কেউ যখন আকাশের দিকে দেখতো, তখন ক্ষুধার আতিশয্যে তা তাদের কাছে ধোঁয়াময় বলে মনে হতো।

ইব্‌নে মাজিশুন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র অবতরণ ও গোচরীভূত হওয়ার যে কথাটি বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে, তার মানে হলো- আল্লাহ্‌ মানুষের দৃষ্টিতে এমন একটি পরিবর্তন সাধন করবেন, যাতে তার কাছে মনে হবে যে, তিনি (আল্লাহ্‌) অবতরণ করেছেন এবং নিজ বান্দাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। বস্তুত এতে আল্লাহ্‌র মহিমায় কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না এবং তিনি সত্যিকারভাবে অবতরণও করবেন না। এরূপ করার উদ্দেশ্য হলো লোকেরা যেন মনে করে, আল্লাহ্‌ প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

৩. তৃতীয় বিকল্পটি হলো—এসব কথা রূপকাকারে বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো–প্রকাশ্য অর্থ থেকে ফিরিয়ে স্বতন্ত্র অর্থের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বত্র কেবল এ অর্থই গ্রহণ করে ক্ষান্ত হবে, আমি তাকে ন্যায় পথের পথিক বলে মনে করি না।

শাহ ওলীউল্লাহ আরো একটি জগতের সমর্থক। সেটা হলো—সদৃশ জগত এবং ইন্দ্রিয় জগতের মাঝামাঝি এবং তা 'আলম-এ-বর্‌যখ্‌' (বিরতি বা দুটি বিপরীত অবস্থার মাঝামাঝি বস্তু) নামে অভিহিত। শাহ সাহেব ওহী, ফেরেশতার সাক্ষাৎ, মে'রাজ, বুরাক, সিদ্‌রাতুল্‌ মুন্‌তাহা, বেহেশ্‌তের ঝরনা—এসবের ব্যাখ্যা করেছেন 'আলম-এ-বরযখ'-এর আলোকেই। 'হুজ্জাতুল্লাহিল্‌ বালিগা' গ্রন্থে শাহ সাহেব রসূল করীমের জীবন চরিত লিখতে গিয়ে ওহী সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন, তা হলো—"রসূল করীমের উপর ওহী অবতীর্ণ হতো কখনো ঘণ্টা-ধ্বনির আকারে, আবার কখনো ফেরেশতা ঐশ বাণী নিয়ে আসতেন মনুষ্যের রূপ ধারণ করে।" অতঃপর ঘণ্টা-ধ্বনির স্বরূপ বর্ণনা করে শাহ সাহেব বলেন ঃ

"ঘণ্টা-ধ্বনির স্বরূপ হলো—ইন্দ্রিয়ের উপর যখন কোন প্রবল শক্তির চাপ পড়ে, তখন তা বিহ্বল হয়ে পড়ে। দর্শন শক্তির বিহ্বলতা হলো চোখে লাল, হলদে ও সবুজ বর্ণ দেখা। শ্রবণ শক্তির বিহ্বলতা হলো—অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসা। অতঃপর ঐশ শক্তি যখন

পুরোপুরিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তখনই জ্ঞান অর্জিত হয়। ফেরেশতার দেহ ধারণ করে উপস্থিত হওয়া এটা হলো সে জগতের কার্য, যাতে সদৃশ জগত ও ইন্দ্রিয় জগত উভয় দিক থেকে কোন কোন প্রভাব এসে মিলিত হয়। এজন্য কোন কোন নবী ফেরেশতাকে দেখতেন, আবার কেউ কেউ হয়তো দেখতেন না।

অতঃপর মে'রাজ সম্পর্কে শাহ্ সাহেব বলেন ঃ

এসব ঘটনা রসূল করীমের দেহের উপর দিয়ে জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। এগুলো সংঘটিত হওয়ার সময় তিনি সদৃশ জগত ও ইন্দ্রিয় জগত-এ দুটির মধ্যবর্তী স্তর অর্থাৎ 'বর্‌যখে' ছিলেন। এই স্তরে উভয় দিকের প্রভাব এসে মিলিত হয়। এজন্যই রসূল করীমের দেহের উপর আধ্যাত্মিক জগতের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তিনি রুহানী ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি প্রকাশ্যরূপে দেখতে পেয়েছিলেন। খারকীল ও মূসা (আঃ) প্রমুখের বেলায়ও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ওলীদের সঙ্গে অনুরূপ ঘটনা ঘটে থাকে।

এরপর শাহ সাহেব এ নীতি অনুসারে বুরাক, নবীদের সঙ্গে রসূল করীমের সাক্ষাৎ, বিভিন্ন আকাশে তাঁর উত্তরণ, সিদ্‌রাতুল্ মুন্‌তাহা, বাইতুল্ মা'মূর ইত্যাদির ব্যাখ্যা করেন।

শাহ সাহেবের বক্তব্য দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও তাতে কিছুটা অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি সদৃশ জগত ও মধ্যবর্তী জগত (আলম-এ-বরযখ্)-এর গণ্ডিকে এত বেশী প্রসারিত করেছেন যে, তাতে সমস্ত ভাবার্থ আর রূপকার্থও সদৃশ জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। রসূল করীমের এ হাদীসটি দেখুন ঃ "কেয়ামতের দিন মৃত্যু ভেড়ার আকার ধারণ করে উপস্থিত হবে এবং তাকে জবাই করা হবে।" এখানে আক্ষরিক অর্থ উদ্দিষ্ট নয়। এটা হলো এক ধরনের বর্ণনা শৈলী। মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু নেই—এ কথাটা বোঝানোই ছিল এ বর্ণনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য। শাহ সাহেব এ কাজটিকেও সদৃশ জগতের একটি ঘটনা বলে বর্ণনা করেন।

ইমাম গাযালী, শায়খুল ইশরাক ও শাহ্ ওলীউল্লাহ্ বর্ণনার মধ্যে যেসব ছোটখাট পার্থক্য রয়েছে, তা বাদ দিলে তাঁদের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তদনুসারে শরীঅতের বুদ্ধি-বিরুদ্ধ

(আপাত-দৃষ্টিতে) বিষয়াদিকে নিম্নশ্রেণীগুলোতে বিভক্ত করা যায় ঃ

**শরীঅতের যে বিষয়গুলো আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিবিরুদ্ধ, তাদের শ্রেণীবিভাগ**

১. এরূপ বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবার্থ ও রূপকার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন জড় বস্তুর তস্‌বীহ্ পাঠ, আকাশ ও জমিনের প্রতি আল্লাহ্‌র সম্বোধন ও তাদের পক্ষ থেকে উত্তর দান, সৃষ্টির গোড়ায় আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের প্রতি আদম সন্তানদের স্বীকারোক্তি, আর্‌শের উপর আল্লাহ্‌র আসন গ্রহণ ইত্যাদি এ পর্যায়ে পড়ে।

২. আধ্যাত্মিক বিষয়াদিকে আল্লাহ্ জড় পদার্থের রূপ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এ পদ্ধতি সব ধর্মেই আছে। মানুষ কেবল সে সব বস্তুই উপলব্ধি করতে পারে, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং যদি এমন সব বস্তুর বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যা পরকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যা মানুষের ধারণাতীত, তবে অবশ্যই সেগুলোকে জড় পদার্থের রূপ দিয়ে বর্ণনা করতে হবে। যেমন মৃত্যুর পর যে সুখ-দুঃখ ভোগ করা হবে, তার বিবরণ দিতে হলে বাগান, ঝরনা, বৃশ্চিক, সাপ ইত্যাদির বর্ণনা ছাড়া আর কি উপায় আছে? আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ছিলেন ঘোর প্রকাশ্যবাদী। তাঁকেও এ কথাগুলো স্বীকার করতে হলো। তিনি বলেন ঃ

অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে সেসব সুখ-দুঃখের প্রতি অবহিত করেছেন, যা তিনি কেয়ামতে ভোগ করতে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। তিনি সুখ-দুঃখের বিবরণ দিতে গিয়ে পানাহার, স্ত্রী সম্ভোগ ও ফরশ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। আমরা যদি পৃথিবীতে এসব বস্তু সম্পর্কে অবহিত না হতাম, তবে সেসব প্রতিশ্রুত বস্তু সম্পর্কে কিভাবে অনুমান করতে পারতাম? কিন্তু আমরা একথাও জানি যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত বস্তুগুলো কোনমতেই পার্থিব বস্তুর মত নয়। ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ দুনিয়া ও পরকালের বস্তুসমূহের মধ্যে একমাত্র নামের সামঞ্জস্য ছাড়া আর কোন দিক থেকেই সামঞ্জস্য নেই।

মওলানা রুমীর চাইতে শরীঅতের রহস্য আর বেশী কে জানে? তিনি এ বিষয়টি বিভিন্ন স্থানে চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন, "শিক্ষক যদি কোন শিশুকে শিক্ষা দিতে চান, তবে তাকে শিশুর ভাষায়ই কথা-বার্তা বলতে হয়।"

৩. নবিগণ আধ্যাত্মিক বিষয়াদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকারে অনুভব করেন। এ বস্তুটিকে শাহ্ ওলী উল্লাহ ও শায়খুল ইশ্‌রাক সদৃশ জগত (আলম-এ-মিসাল বা আলম-এ-আশ্‌বাহ) নামে অভিহিত করেন। ইমাম গাযালী এর নাম রেখেছেন—'কাল্পনিক রূপ" (তামসীল-এ-খেয়ালী)। নাস্তিকেরা এ বিষয়টির প্রতি বেশী অভিযোগ এনে থাকে। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করে বলছি।

সর্বপ্রথম এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, বর্তমান দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করলে কাল্পনিক রূপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন দাঁড়ায় না। কাল্পনিক রূপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম গাযালী বলেন, ভাবের রূপ ধারণ করার ফলে তা দৃষ্ট হয় ও তার শব্দও শ্রুত হয়—যেমন স্বপ্নজগতে হয়ে থাকে। স্বপ্নের এ অবস্থাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এখন চিন্তা করা দরকার, স্বপ্নে এরূপ হয় কি করে? এর এক মাত্র কারণ হলো—স্বপ্নে প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখন কেবল রুহ্ বা আত্মা বা চিন্তাশক্তি একাই কাজ করে যায়। যদি কোন ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় বিশেষ ভাবাবেশ ও তন্ময়তার ফলে স্বপ্নলোকে উপনীত হয় এবং তার কাছে অতীন্দ্রিয় বিষয়াদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুরূপে অনুভূত হয়, তবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে? তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের অনুভূতি সাধারণ অনুভূতি নয়। তা না হয় এরূপ অনুভূতি সকলের হয় না কেন? কেবল নবী ও ওলীরাই তো এরূপভাবে অনুভব করে থাকেন। সাধারণ লোকের জন্য এরূপ অনুভূতির প্রয়োজন নেই।

ইমাম গাযালী ও অন্যান্য সূক্ষ্মদর্শিগণ এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম। তাই ভাষায় সামান্যতম পরিবর্তনের দরুন এর ভাব বিকৃত হতে পারে - এ ভয়ে আমি সূক্ষ্মদর্শীদের মূলভাষ্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ পেশ করে ক্ষান্ত হচ্ছি।

রাগিব পাশা রচিত 'মাকাসিদুল মারাসিদ' গ্রন্থে মুসলিম দার্শনিকদের মতানুসারে, স্বপ্ন, ওহী, ইলহাম ও কারামত ইত্যাদির গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষের মধ্যে একটি শক্তি আছে, যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের আকারসমূহ প্রতিবিম্বিত হয়; যেমন মানুষ পায়েস দেখে বলে—এটা সাদা। যদি তার মধ্যে এমন একটি শক্তি না থাকতো, যা ইন্দ্রিয় অনুভূত বাস্তব আকারসমূহকে পুঞ্জীভূত

করে রাখে, তবে সে কি করে পায়েস দেখে তার বর্ণনা দিতে সক্ষম হতো? এ শক্তিকেই বলা হয় সাধারণ অনুভূতি বা সাধারণ জ্ঞান। এতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকারসমূহ দুইভাবে অংকিত হয়ঃ (ক) কোন কোন সময় কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহবা, ত্বক—এসব অঙ্গ পরিদৃশ্যমান বস্তুর আকার গ্রহণ করে তা সাধারণ জ্ঞানের নিকট সরাসরি পাঠিয়ে দেয়। (খ) দ্বিতীয়ত মস্তিষ্কের কল্পনাশক্তি বলে কথিত আরো একটি শক্তি আছে। এর কাজ হলো বিভিন্ন আকারগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। এ শক্তি কোন কোন সময় মানুষের জন্য দু'টি মাথারও কল্পনা করে। আবার কখনো কখনো এমন মানুষেরও কল্পনা করে, যার কোন মাথাই নেই। এ শক্তি যখন বিভিন্ন কল্পিত আকারকে সাধারণ জ্ঞানের কাছে পৌঁছে দেয়, তখন তা দৃষ্ট হয়, যেমন বাস্তব জগতে বিভিন্ন আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। কোন আকারের দৃষ্ট হওয়ার জন্য এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, তার অস্তিত্ব বাস্তব জগতেও থাকতে হবে। সাধারণ অনুভূতির মধ্যে অঙ্কিত থাকলেই তা দৃষ্ট হতে পারে। চিন্তাশক্তিতে পুঞ্জীভূত আকারসমূহ সাধারণ অনুভূতির পরশ পেয়ে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে।

তাই আমরা বলতে পারি যে, স্বপ্নযোগে যে সব ছবি মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলোতে দু'টি সম্ভাবনা থাকেঃ হয়তো সেগুলো পরিদৃশ্যমান জগতে আছে, নয়তো নেই। প্রথম বিকল্পটি অবান্তর। কেননা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যদি তাদের অস্তিত্ব থাকতো, তবে প্রকৃতিস্থ যে কোন মানুষ নিশ্চয়ই সেগুলো জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেতো। তাই বোঝা গেল যে, সেগুলো বাহ্য জগতে নেই। বরং সেগুলো কল্পনাশক্তিরই কাজ। কল্পনাশক্তি যদি সব সময় মৌলিক অবস্থায় অবিঘ্নিত থাকতো, তবে মানুষ নিত্যই সে ধরনের দৃশ্য দেখতে পেতো। কিন্তু দু'টো বস্তু কল্পনা শক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করেঃ (১) প্রথম হলো সাধারণ অনুভূতি, তা কেবল সে সব আকার গ্রহণে ব্যস্ত থাকে, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে মানুষের কাছে অনুভূত হয়। (২) দ্বিতীয় হলো—বিবেক বুদ্ধি অনেক সময় কল্পনাশক্তিকে দাবিয়ে রাখে। তাই যখন এ দু'টো বিঘ্ন বা তন্মধ্যে একটি অপসারিত হয়, তখনি কল্পনাশক্তি থেকে ঐ সব কাজের উদ্ভব হয়। কল্পনাশক্তির প্রথম বিঘ্নটি নিদ্রার সময় অপসারিত হয়। কেননা তখন বাহ্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং সাধারণ অনুভূতি বহিস্থ আকার গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। দ্বিতীয় বিঘ্নটি পীড়ার সময় দূরীভূত

হয়। কেননা পীড়ার অবস্থায় বিবেক পীড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন কল্পনাশক্তি বিভিন্ন প্রকার আকারের কল্পনা করে এবং সেগুলো সাধারণ অনুভূতির মাধ্যমে পরিদৃষ্ট হয়।

## ওহী ( প্রত্যাদেশ ) ও ইল্‌হাম ( অন্তর ঢালা জ্ঞান )

এর স্বরূপ হলো এই যে, মানুষের আত্মা যখন এতখানি শক্তিশালী হয়ে উঠে, যার ফলে সে কায়িক বন্ধন সত্ত্বেও ঐশ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, বা তার কল্পনাশক্তি যখন এত বেশী ক্ষমতা লাভ করে, যার ফলে সে তার সাধারণ অনুভূতিকে জড় জগতের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তখন সে ( মানবাত্মা ) জাগ্রত অবস্থায়ও ইন্দ্রিয়াতীত জগত ও স্বর্গীয় সত্তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে তখন অদৃশ্য জগতের কথাবার্তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে থাকে। অতঃপর কল্পনাশক্তি সামঞ্জস্যমূলক একটি খণ্ড প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। এই প্রতিচ্ছবি সাধারণ অনুভূতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একটি দর্শনসাধ্য রূপ ধারণ করে। কোন কোন লোক এই কল্পিত বস্তুটি দেখতে পান এবং তাঁর সঙ্গে বরাবর কথাবার্তাও বলেন। আবার কোন কোন সময় উন্নত আত্মাবিশিষ্ট লোকেরা অতি সুন্দর আকৃতিও লক্ষ্য করে থাকেন। সেই আকৃতি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে থাকে। এ কথাবার্তা হয়তো তাঁদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, নয়তো তাঁদের গণ্ডিভুক্ত লোকদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

## ইমাম গাযালী 'মাআরিজুল্ কুদ্‌স্' গ্রন্থে ওহীর যে স্বরূপ বর্ণনা করেন, তা নিম্নরূপ ঃ

ইমাম গাযালী 'মাআরিজুল্ কুদ্‌স্' গ্রন্থে 'নুবুওয়াত' শীর্ষক যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন, তাতে তিনি নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন ঃ

'নুবুওয়াতের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ তন্মধ্যে একটি হলো—কল্পনা-শক্তি। বুদ্ধিজাত শক্তি কর্ম শক্তিরই অধীন।"

ইমাম গাযালী এ বৈশিষ্ট্যটি ফলাও করে বর্ণনা করেন। তাঁর যে কথাগুলো এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেগুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"অতঃপর কল্পনাশক্তি সে কাজই করে থাকে, যা সে মানুষের নিদ্রার সময় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ স্বপ্নের বেলায় করে থাকে। অর্থাৎ কল্পনাশক্তি ঘটনাবলীকে গ্রহণ করে এবং তাদের প্রতিচ্ছবিকে সাধারণ

অনুভূতিতে উপস্থাপিত করে। তাই এই প্রতিচ্ছবি বাহ্য ইন্দ্রিয় শক্তিকে প্রভাবিত করে। আরো পরিষ্কার কথায়, এই কল্পনাশক্তি ইন্দ্রিয়ের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করে যে, কল্পনাশক্তি প্রসূত দৃশ্যগুলো সাধারণ জ্ঞান ও অনুভূতির উপর বিধৃত হয়। এ সময় কল্পনাশক্তির অধিকারী এ মানুষটি অদ্ভুত ঐশ দৃশ্য দেখতে পান এবং ঐশ আওয়াজও শুনতে পান। এটা হলো এমনি অবস্থা, যেমন ওহী উপলব্ধি করার সময় হয়ে থাকে। এটা হলো নুবুওয়াতের চাইতে নিম্নতর পর্যায়। এর চাইতে শক্তিশালী পর্যায়ে ঐশ দৃশ্যগুলো মানুষের কল্পনাশক্তিকে এত ব্যস্ত করে রাখে যে, সে তখন অন্যান্য জড় বস্তুর দৃশ্য গ্রহণ করার সুযোগই পায় না। এর চাইতে শক্তিশালী পর্যায় হলো—কল্পনাশক্তি নিত্য তার কাজ চালিয়ে যায়। চিন্তাশক্তি ও সাধারণ অনুভূতি তার পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। তাই কল্পনাশক্তি যে আকৃতি গ্রহণ করে, তাই স্মরণশক্তিতে অটুট থাকে। কল্পনাশক্তি সাধারণ জ্ঞান ও অনুভূতির উপর এতখানি গভীর প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে সেই কল্পিত অদ্ভুত দৃশ্যগুলোর ছবি সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিবিম্বিত না হয়ে পারে না। এটা হলো নুবুওয়াতের সেই স্তর, যেখানে তার সঙ্গে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির সম্পর্ক রয়েছে।

ইমাম গাযালী জটিল বর্ণনার মধ্য দিয়ে সে কথাটাই ব্যক্ত করেছেন, যা 'মাকাসিদুল্ মারাসিদ'-গ্রন্থ-রচয়িতা সাদাসিধে ভাষায় তুলে ধরেছেন। আবুল বাকা-বু-আলী সিনার বরাত দিয়ে এ কথাগুলো খুব সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি 'তা'রীফাত্' গ্রন্থে ওহীর সংজ্ঞায় বলেন ঃ

আমরা তো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুনিচয় দেখতে পাই। কিন্তু পয়গাম্বরগণ তা দেখতে পান অন্তর্নিহিত শক্তির আলোকে। আমরা প্রথমে একটি বস্তু দেখতে পাই; তার পর তা উপলব্ধি করি। কিন্তু পয়গাম্বরগণ প্রথমে কোন বস্তু উপলব্ধি করেন, অতঃপর প্রকাশ্যে তা দেখতে পান।

হাকীম আবু নসর ফারাবী, বু-আলী সিনা প্রমুখও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে এঁদেরকে অনুসরণীয় ইমাম বলে মনে করা হয় না। তাই আমি এঁদের ভাষ্যের উদ্ধৃতি থেকে বিরত রইলাম।

## ইসলাম তমদ্দুন ও উন্নতির পরিপন্থী নয় বরং সহায়ক

এ মাপকাঠি দিয়েই ধর্মের অশুদ্ধতা ও বিশুদ্ধতা বিচার করা যায়। ধর্ম-অবিশ্বাসীদের মতে, যে ধারণাটি তাদেরকে ধর্মের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন করে তুলেছে, প্রধানত তা হলো—সকল ধর্মই পার্থিব উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তারা বলেঃ

### কি-কি কারণে ধর্মকে পার্থিব উন্নতির পরিপন্থী বলা হয়?

১. কেবল বিশ্বাস ক্ষেত্রেই নয়, বরং আমরা যা কিছু বলি, যা কিছু করি—সর্বস্থলেই ধর্ম হস্তক্ষেপ করে। চলা ফেরা, শয়ন করা, জগ্রাত হওয়া, উঠা-বসা, পানাহার করা—কোন একটি বস্তুই তার গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না। এরূপ কোণঠাসা হয়ে মানুষ কি করে উন্নতি লাভ করতে পারে? কোন জাতি উন্নতি করে থাকলে ধর্মীয় কড়াকড়ি থেকে মুক্ত হয়েই তা করেছে।

২. ধর্মীয় বিধি এত কঠিন যে, তার বাস্তবায়ন মানুষকে সামাজিক ও তামদ্দুনিক উন্নতির সুযোগ দেয় না।

৩. প্রত্যেকটি ধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও বিদ্বেষ শিক্ষা দেয়। ফলে কোন জাতিই কোন সময় অন্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায়ানুগভাবে শাসন করে নি। এজন্যই মানবজাতির এক বিরাট অংশ সব সময় লাঞ্ছিত ও তহযীব-তমদ্দুন থেকে বঞ্চিত ছিল।

### ইসলাম ধর্মে এ বিষয়গুলো নেই

সাধারণ ধর্মের বেলায় এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, ইসলাম ধর্ম এসব অভিযোগে কতটুকু অভিযুক্ত বা এগুলো থেকে কতটুকু মুক্ত?

এতে সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ ধর্মই মানুষের জীবনের ছোট-খাট ব্যাপারকেও ধর্মীয় বিধি-বিধানের আওতায় টেনে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে এসব সংকীর্ণতা মুছে দেওয়ার জন্য। ইহুদীদের ধর্মে প্রত্যেকটি বস্তুই ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। মানুষকে এসব বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ্ রসূল করীমকে নবীরূপে পাঠিয়েছেন। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"যারা উম্মী (আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন) পয়গাম্বরের অনুসরণ করে, তারা নিজেদের তওরাত ও ইনজীলে তাঁর নাম লিখিত পাবে। তিনি তাদের ভাল কাজের প্রতি আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখেন। তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম বলে ঘোষণা করেন। তাদের উপর যে বোঝা চাপানো ছিল এবং যে শৃংখল তাদের আবদ্ধ করে রেখেছিল, তা তিনি তাদের উপর থেকে অপসারিত করেন।" (আ'রাফ, রুকু'—১৮)

খুব চিন্তা করে দেখুন, ইহুদীদের উপর কি বোঝা ছিল, যা রসূল করীম লাঘব করেছেন এবং তাদের পায়ে কি শৃংখল ছিল, যা তিনি উন্মুক্ত করেছেন ?

কুরআন মজীদে, বিশেষ করে ইহুদী ও খৃীস্টানদের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ "ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না।" ধর্মে বাড়াবাড়ি হতে পারে দু'ভাবে ঃ ছোট-খাট প্রত্যেকটি ব্যাপারকে ধর্মের গণ্ডিভুক্ত করা বা ধর্মীয় বিধি-বিধানকে কঠিন এবং বাস্তবায়নের সাধ্যাতীত করে তোলা। ইসলাম উভয় প্রকার বাড়াবাড়িকেই দূর করেছে। লোকেরা অযথা ধর্মের গণ্ডিকে প্রসারিত করে তাতে জীবনের ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ, উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ—সব কিছুকেই ধর্মের আওতাভুক্ত করে নিয়েছিল এবং এসবকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিল। এর প্রতি লক্ষ্য করে কুরআন মজীদ বলে ঃ

"হে পয়গাম্বর! আপনি তাদের বলুন, ভোগ-বিলাস ও উত্তম আহার্যকে আল্লাহ্ বান্দার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোকে কে হারাম করলো ?"

আল্লাহ্র এসব বিধি-বিধানের উপর ভিত্তি করেই রসূল করীম পার্থিব সমাজ ব্যবস্থা ও তমদ্দুনকে ধর্মের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখেছেন এবং বলেছেন "বৈষয়িক ব্যাপারে তোমরাই ভাল জান।"

দ্বিতীয় অভিযোগটির সঙ্গে ইসলামের দূর সম্পর্কও নেই। ইসলাম দাবি করছে এবং যথার্থই দাবি করছে যে, তার ধর্মীয় বিধি-বিধান খুবই নমনীয়, সহজ ও বাস্তব ধর্মী। আল্লাহ্ বলেনঃ

"ধর্মীয় ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ করেন নি।"

"তোমাদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা আল্লাহ্রই ইচ্ছা নয়। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছা হলো তোমাদের পরিশুদ্ধ করা এবং তোমাদেরকে তাঁর নিয়ামত পুরোপুরিভাবে প্রদান করা।"

"আল্লাহ্ তোমাদের সহজসাধ্যতা কামনা করেন। তোমাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা তাঁর ইচ্ছা নয়।"

"আল্লাহ্ কারো উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না।"

"তোমাদের বোঝা লাঘব করাই আল্লাহ্র ইচ্ছা। কারণ মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এগুলো শুধু দাবি নয় বরং ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান এ দাবি বাস্তবায়নের সাক্ষ্য বহন করছে।

**ধর্মীয় কাজে নানাভাবে কড়াকড়ি আরোপিত হতে পারেঃ**

১. অবশ্য কর্তব্য কার্যের সংখ্যা বেশী হওয়া বা এমনি ধরনের হওয়া যা বাস্তবায়িত করা মুশকিল বা যা পালন করতে সময় বেশী লাগে।

ইসলামে কেবল পাঁচটি বড় কর্তব্য আছেঃ সওম (রোযা), সালাত (নামায), যাকাত, হজ্ ও জিহাদ। হজ্ ও যাকাত বিত্তশালীদের সঙ্গে সীমাবদ্ধ। জিহাদ কেবল তখনি ফরয, যখন আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়। কেবল দুটো ফরয সকলের প্রতি প্রযোজ্য। তা হলো সালাত ও সওম। রোযা বছরে এক মাস, আবার তাও মুসাফির, পীড়িত ও নিতান্ত দুর্বল লোকদের জন্য নয়। নামায অবশ্য কোন সময় মাফ নেই। ঘোড়ায় অথবা জাহাজে সওয়ার হলে কেবলা রোখ হওয়া শর্ত নয়। এ সময় প্রয়োজন অনুসারে দাঁড়িয়ে, বসে, শু'য়ে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে—মোটকথা নানাভাবে নামায আদায় করা যায়। সফরে চার রাক্আতের স্থলে মাত্র দু' রাক্আত পড়তে হয়। নামায পড়ার জন্য যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, তন্মধ্যে এমন বিষয় খুবই কম, যা অবশ্য পালনীয়।

হাত খুলেও নামায পড়া যায়, আবার হাত বেঁধেও পড়া যায়। হাত বুকেও বাঁধা যায়, আবার নাভির উপরেও বাঁধা যায়। 'আমীন' সশব্দেও বলা যায়, আবার মনে মনেও বলা যায়। মোটকথা, কয়েকটি বিষয় ছাড়া কোথাও বিশেষ নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় নয়। তাই ইমামগণ বিভিন্ন মত ও পথ অবলম্বন করেছিলেন।

২. ফরয কার্য সম্পাদনের জন্য খুব ছোটখাট শর্ত আরোপ করা এবং সেগুলোকে অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করা। অন্যান্য ধর্মে এ ধরনের কতটুকু কড়াকড়ি ছিল, তা তওরাতের বিধি-বিধান পাঠে প্রতীয়মান হয়। যেমন কুরবানী ইসলাম ধর্মে খুব সাদাসিধে উপায়ে সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু এর জন্য কিরূপ শর্তাদি আরোপিত ছিল, তওরাতে তার সংক্ষিপ্ত নমুনা দেখুন:

"এবং হারুন পবিত্রতম জায়গায় উপস্থিত হবেন। তিনি পাপের কুরবানীর জন্য একটি বাছুর এবং অগ্নিদহনের কুরবানীর জন্য একটি ভেড়া আনবেন। তিনি পবিত্র কাত্তানী (এক প্রকার মিহিন কাপড়) জামা ও পাজামা পরিধান করবেন। তাঁর কোমরে থাকবে একটি কাত্তানী পেটি, মাথায় থাকবে কাত্তানী পাগড়ী। তিনি সারা শরীর পানি দিয়ে ধৌত করবেন। অতঃপর এ সব জামা কাপড় পরিধান করবেন এবং বনী ইসরাঈলের গোত্র থেকে পাপের কুরবানীর জন্য দুটো ছাগল ছানা আনবেন। প্রত্যেকদিন তিনি সেগুলো তাঁর কাছে রাখবেন এবং নিজ ঘরের জন্য কাফ্ফারা দেবেন। অতঃপর সেই উৎসর্গীকৃত বলি দুটোকে বনি ইস্রাঈলের শিবির-দ্বারে প্রভুর সামনে উপস্থিত করবেন এবং প্রত্যেক দিন সে দুটো নৈবেদ্য নিয়ে গুটিকাপাত (লটারী) করবেন। একবার গুটিকাপাত করবেন প্রভুর জন্য, আবার করবেন মনের আনন্দের জন্য প্রভুর নামে যে গুটিকাপাত হবে, সে নৈবেদ্যটি নিয়ে আসবেন এবং পাপের কুরবানীতে জবাই করবেন।

এ ধরনের ছেলেসুলভ শর্তাবলী হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মে পরিলক্ষিত হয়। এসব ধর্মে কেউই একজন ধর্মীয় নেতার তত্ত্বাবধান ছাড়া স্বয়ং আল্লাহ্‌র কোন উপাসনা সম্পন্ন করতে পারে না। হিন্দুদের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন, খ্রীস্টানদের জন্য পাদ্রীর প্রয়োজন এবং ইহুদীদের জন্য ইহুদী ধর্মনেতার প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমানের ইবাদতের জন্য কোন পীরের সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

ইসলাম যদি কোথাও কর্ম-পদ্ধতির নমুনাস্বরূপ কোন শর্ত আরোপ করে থাকে, তবে সেখানে এটাও বলে দিয়েছে যে, এ ধরনের শর্ত মূলত জরুরী নয়। নামাযের জন্য যেখানে কেবলার দিকে রোখ্ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এটাও বলা হয়েছে, "যেদিকেই রোখ্ কর না কেন, সেদিকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রয়েছে।" যেখানে কুরবানীর আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ পর্যন্ত কুরবানীর গোশ্‌তও পৌঁছে না, রক্তও পৌঁছে না, বরং পৌঁছে থাকে আল্লাহ্‌ভীরুতা।"

তৃতীয় অভিযোগের উত্তর পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

আমাদের দাবি শুধু এটাই নয় যে, ইসলাম তমদ্দুনসম্মত ধর্ম, বরং আমাদের দাবি হলো এ ধর্ম তমদ্দুনের পরিপোষক। এ ধর্ম তমদ্দনকে তার চরম সীমায় পৌঁছে দেবে।

এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, বর্তমানে জাগতিক তমদ্দুনের দিক থেকে ইওরোপ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ইতিপূর্বে তা কোন সময় সেখানে পৌঁছতে পারেনি। এজন্য আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে, এ তমদ্দুনের মৌলিক নীতি কি?

ইওরোপীয় তমদ্দুনের মৌলিক নীতিসমূহকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণী-গুলোর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুনিয়াতে যত জাতি তমদ্দুন ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, তাদের সবাই একই নীতি অবলম্বন করেছে বা করবে।

## তামদ্দুনিক উন্নতির জন্য যেসব নীতির প্রয়োজন, সবই ইসলামে বিদ্যমান রয়েছে

১. মানুষের যাবতীয় উন্নতির প্রাথমিক বুনিয়াদ হলো—সে নিজেকে সৃষ্টির সেরা বলে মনে করবে। সে আরো মনে করবে যে, সারা বিশ্বে যা রয়েছে, তা তারই উপকারার্থে রয়েছে।

কুরআনই সর্বপ্রথম এ নীতির শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

"আমি মানুষকে অতি সুন্দর আকারবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছি।"

"তিনি আকাশ ও জমিনের বস্তু সমুদয় তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।"

এ ধরনের আরো অনেক আয়াত পরে বর্ণিত হবে।

২. মানব জাতির সার্বিক উন্নতির দ্বিতীয় বুনিয়াদ হলো—তাকে এ মর্মে বিশ্বাস করতে হবে যে, তার মঙ্গলামঙ্গল, উন্নতি-অবনতি সবই নির্ভর করে চেষ্টার উপর। দীন-দুনিয়ার সমস্ত সাফল্য এ চেষ্টার উপরই নির্ভরশীল। কুরআন মজীদ এ নীতিকে খুব পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছে ঃ

"মানুষ তাঁর চেষ্টা অনুপাতেই ফল লাভ করে থাকে।"

"মানুষ যা লাভ করে, তা তার অর্জনেরই ফল ; পক্ষান্তরে তার যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা তার কর্মেরই প্রতিফল।"

"যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে, তার পরিণাম ফল তাকেই ভোগ করতে হবে।"

"আল্লাহ্ কোন জাতিকে নিয়ামত দিলে তা আর পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে স্বয়ং তা পরিবর্তন করে।"

"লোকের কর্ম দোষে জল-স্থলে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে।"

"তোমাদের উপর যে বিপদ আসে, তা' তোমাদেরই কর্মফল।"

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, বান্দা যখন কোন কাজে হাত দেয়, তখন আল্লাহ্ তার সহায়তা করে ঃ

"যারা ঈমান এনেছেন ও সৎকাজ করেছেন, আল্লাহ্ তাঁদেরকে তাঁদের ঈমানের বদৌলতে পথ প্রদর্শন করছেন।"

"যারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান গ্রহণ করে না, আল্লাহ্ তাদের পথ প্রদর্শন করেন না। যাঁরা আমার জন্য আত্মিক সাধনা করেন, আমি তাঁদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি।"

"হে মুসলমানেরা, আল্লাহ্কে ভয় করো এবং ঠিক কথা বল। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মকে পরিশুদ্ধ করবেন।"

"হে মুসলমানেরা! তোমরা যদি আল্লাহ্র সাহায্য কর, তবে আল্লাহ্ও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।"

"যখন লোকেরা বাঁকা পথ অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দেন।"

"আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে তার অবস্থার পরিবর্তন করে।"

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ নিজের ভূমিকাকে বান্দার ভূমিকার পরে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "লোকেরা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ও তখন তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিয়েছেন।" উপরিউক্ত অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "হে মুসলমানেরা! আল্লাহ্-ভীরুতা অবলম্বন কর এবং ঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের কর্মকে পরিশুদ্ধ করবেন।" অথচ পরিশুদ্ধির কাজকেই বলা হয় আল্লাহ্-ভীরুতা। কেউ যদি আল্লাহ্-ভীরুতা অবলম্বন করে, তবে তার জন্য সততা ও পরিশুদ্ধির দ্বিতীয় কাজ করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এতে প্রতীয়মান হয় যে, বান্দার চেষ্টার ভূমিকাই কর্মের-সাফল্যের চাবিকাঠি। বান্দা তার ভূমিকা গ্রহণ করলেই আল্লাহ্ নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এখানে এ কথা বলারও প্রয়োজন আছে যে, কুরআন মজীদে এমন অনেক আয়াত আছে, যাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম। সে যা কিছু করে, তা আল্লাহ্রই কাজ। কুরআন মজীদ বলে ঃ

"তিনি তাঁর বান্দাদের উপর আধিপত্য করে থাকেন।"

"হে মুহম্মদ! আপনি বলুন, সব কিছুই আল্লাহ্র তরফ থেকে হয়।"

খ্রীস্টানেরা প্রায়শ অভিযোগ করে থাকেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যে অলসতা ও ভীরুতা দেখা যায়, তা তাদের সর্বসমর্থিত বাঁধা-ধরা তকদীরেরই ফলশ্রুতি। তারা যে অবনতির শিকারে পরিণত, সেটা তাদের ধর্মনীতিরই অনিবার্য ফল।

যদিও তওক্কুল্-এর সমর্থক অর্থাৎ ভাগ্য-নির্ভর আলিম ও সূফীদের কর্ম ফলে অভিযোগটি প্রকট হয়ে উঠেছে, বস্তুত এটা সম্পূর্ণ অহেতুক।

এর মোটামুটি উত্তর হলো—এই তকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ফলেই সাহাবীদের মধ্য থেকে একা একটি মানুষ দ্বিধাহীন চিত্তে হাজার হাজার শত্রুর ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করতেন এবং শত শত লোককে চিরতরে ধূলায় মিশিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতেন। আজ এই মূল্যবান ও অতুলনীয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলতাকে আমাদের উলামা ও

সূফীরা যদি নিজেদের অকর্মন্যতা ও অলসতার বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করে থাকেন, তবে তাতে ইসলামের কী অপরাধ?

এর সূক্ষ্ম দৃষ্টিসুলভ উত্তর হলো—এতে সন্দেহ নেই যে ইসলাম মানুষকে সর্ব বিষয়ে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সতর্কতামূলক বাণীও উচ্চারণ করেছে যে, স্বাধীনতার এ বিশ্বাস যেন নাস্তিকতার সীমারেখায় প্রবেশ না করে। মানুষ স্বাধীনতার অধিকারী এর দুটো অর্থ হতে পারে: একটি হলো স্রষ্টা ও আল্লাহ্ বলে কিছুই নেই; মানুষ পুরোপুরি এখতিয়ারসম্পন্ন; সে যা চায় তাই করে, যা চায় না, তা করে না। দ্বিতীয় অর্থ হলো—আল্লাহ সর্বশক্তিমান। কিন্তু তিনি মানুষকে কাজের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সুতরাং মানুষ যা চায়, তাই করে। ইসলাম প্রথম অর্থের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এজন্যই কুরআন বলছে:

"তোমরা কিছুই চাইতে পার না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ চান।"

এর অর্থ হলো—তোমাদেরকে ইচ্ছা করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহ্‌রই দেওয়া। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হলে তোমরা এতটুকু ক্ষমতাও পেতে না।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন:

"হে মুহম্মদ! আপনি বলুন, সব কিছু আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই হয়ে থাকে।"

অর্থাৎ সব কিছুর মূল কারণ হলো আল্লাহ্‌র সত্তা।

ইসলাম সক্ষমতার শিক্ষা দিয়েছে নাকি অক্ষমতার—এ ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় হলো—আমাদের দেখতে হবে যে, যাঁরা ইসলামের প্রাণবিন্দু ছিলেন, যাঁরা ইসলামের জীবন্ত ছবি ছিলেন, যাঁরা ইসলামের প্রতিটি রহস্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাঁরা তথা সাহাবিগণ এ বিষয়ে কি বুঝেছিলেন এবং তাঁদের উপর ইসলামী শিক্ষার কি প্রভাব পড়েছিল? ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলামের শিক্ষা তাঁদেরকে স্বাধীনতা, প্রতিজ্ঞা, আত্মনির্ভরশীলতা—এসব গুণের প্রতিচ্ছবি করে তুলেছিল।

৩. তামদ্দুনিক উন্নতির সবচাইতে বড় নীতি হলো—সমতা সাধন অর্থাৎ সকল মানুষের অধিকার সমান। কোন দার্শনিক

বলেছেন : মানবাধিকার অনুধাবনের প্রথম ভূমিকা হলো—সমতা। আর সমতাই যাবতীয় সচ্চরিত্রের বুনিয়াদ।

কিন্তু ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্বে কোন জাতিতে বা কোন দেশে এ ধারণার উদয় হয়নি। অপরাধজনিত কাজের জন্য অতি সভ্য জাতির মধ্যেও অপরাধীর মর্যাদা ও তার শ্রেণীগত গুরুত্ব অনুসারেই শাস্তি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। লরাউস তাঁর বিশ্বকোষে বলেন : "রোমান সাম্রাজ্যে একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেওয়া হতো অর্থাৎ অপরাধীর মর্যাদাও শ্রেণীগত গুরুত্ব মোতাবেক শাস্তি দেওয়া হতো।" এরপর এই গ্রন্থকার অন্যায়-অবিচারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে গিয়ে রোমান সাম্রাজ্য থেকে আরম্ভ করে ফরাসী দেশের সব ঘটনার উদ্ধৃতি দেন। সর্বশেষে তিনি লিখেন যে, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লব এ সমস্ত পার্থক্য মুছে দেয়। যে সমস্ত পদবী বা উপাধি মানুষের ব্যক্তিগত সম্মান বা বংশগত মর্যাদার প্রতীক ছিল, এ বিপ্লব সেসব পার্থক্যের মূলোৎপাটন করে দেয়।

দার্শনিক ফ্রাঙ্ক বলেন : পঞ্চাশ বছর পূর্বে ইওরোপের কোন কোন জাতিতে সাম্যের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। এখন অন্যান্য অংশেও তা প্রসারিত হচ্ছে।

উক্ত দার্শনিকের মতে, সাম্যের সূচনা হয় মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। অথচ ইসলামে বার শ' বছর পূর্বেই এ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুরআন মজীদে আছে :

"হে মানুষেরা! আমি তোমাদেরকে নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পারস্পরিক পরিচিতির জন্য খান্দান ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। আল্লাহ্‌র কাছে বেশী সম্মানিত হলেন সে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে বেশী আল্লাহ্‌ ভীরু।"

এগুলো কেবল মৌখিক কথাই ছিল না। এ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ইসলামী সমাজব্যবস্থা। ইসলাম যতদিন সত্যিকার ইসলাম ছিল, ততদিনই এ নীতি কার্যকর ছিল। আরব দেশে বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন মর্যাদা ছিল। যে গোত্রটি বেশী ভদ্র ও বেশী সম্মানিত বলে পরিগণিত ছিল, তার একজন লোককে অন্য গোত্রের কয়েকজন লোকের সমান বলে ধরা হতো। অন্য কথায়, সম্মানিত গোত্রের একজন লোকের রক্তের বিনিময়ে অন্য গোত্রের কয়েকজন লোককে

হত্যা করা হতো। পক্ষান্তরে, একজন দাসের রক্তের বিনিময়ে তার প্রভুকে হত্যা করা হতো না। সাম্যনীতি মোতাবেক ইসলাম এসব পার্থক্য মুছে দেয়। কুরায়েশ বংশের এত বেশী অংহকার ছিল যে, তারা আনসারের গায়ে হাত তোলাকেও নিজেদের জন্য অপমানজনক কাজ বলে মনে করতো। এজন্যেই তারা বদরের যুদ্ধে আনসারদের সঙ্গে লড়াই করতে অস্বীকার করেছিল। সেই কুরায়েশদেরকে ইসলাম আবিসিনিয়া ও ইরানের ক্রীতদাসের সমতুল্য করে দেয়। আবু সুফিয়ান ছিলেন সমস্ত আরবদের নেতা। তিনি নিজেকে রসূলুল্লাহ্ বিরোধী বলে দাবি করতেন। কিন্তু তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁকে বেলাল ও সুহায়েব-এর সমকক্ষ হয়ে থাকতে হয়েছিল। অথচ বেলাল ও সুহায়েব ছিলেন অনাবর ক্রীতদাস।

জাবালা ইবনুল আইহাম আরবের বিখ্যাত বাদশাহ ছিলেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর আকাংখা ছিল এই যে, সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁকে বেশী ইজ্জত দেওয়া হোক। কিন্তু ইসলামের জীবন্ত ছবি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তা' সহ্য করেন নি। বাদশাহ জেদের বশবর্তী হ'য়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ ক'রে খ্রীস্টানদের সঙ্গে মিলিত হন।

ওমর ফারুক (রাঃ) যখন সিরিয়া সফর করেন এবং বায়তুল্ মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দাস উটের উপর সওয়ার ছিল। আর তাঁর স্বহস্তে ছিল উটের লাগাম। অথচ এটা ছিল এমন একটি মুহূর্ত, যখন সমস্ত মানুষ ইসলামের খলীফার শৌর্য-বীর্য দেখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

এ ধরনের হাজার হাজার ঘটনা আছে। সেগুলোর বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এ সাম্যের ফলাফল সহজেই অনুমেয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম অবিচার ও অসাম্য আরম্ভ হয় সে সময় থেকে, যখন সাধারণ মানুষকে বলা হলো—"রাস্তা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াও।" ইসলামের আদি যুগে মহৎ থেকে মহৎ লোক একজন মামুলি মানুষকেও একথা বলতে পারতো নাঃ "একটু সরে দাঁড়াও।" এ শব্দগুলোর সূত্রপাত হলো আর সঙ্গে সঙ্গে যুলুমেরও সূচনা হলো।

## ধর্ম নিরপেক্ষতা

তামদ্দুনিক বিকাশ সাধনের একটি বড় উপায় হলো—ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ধর্ম প্রচারে বল প্রয়োগ রহিত করা। সামাজিক দুনিয়ার গোড়া

থেকে সব সময় সবদেশে, সব জাতিতে ও সব শাসনে বিধর্মীদের প্রতি বল প্রয়োগ করা হতো। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হতো না। তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণের শিক্ষা দেওয়া হতো। নানাভাবে তাদেরকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করা হতো। প্রাক-ইসলাম যুগে সারা দুনিয়ায় এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। তখনকার দিনে মানুষের স্বভাব ছিল এই যে, যখনি দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ ঘটতো, তখনি তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তো সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে অর্থাৎ দুই ব্যক্তির মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতো এবং তা সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতো।

ইসলামই সর্বপ্রথম ধর্মীয় ও ধর্মবহির্ভূত বিষয়াদির সীমারেখা নির্ধারণ করে। ইসলাম নির্দেশ দিল যে, কারো সঙ্গে যদি ধর্ম নিয়ে মতবিরোধ ঘটে, তবে তার প্রতিক্রিয়া যেন সামাজিক জীবনের উপর না পড়ে। পিতামাতার অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তারা (পিতামাতা) যদি আমার (আল্লাহ্‌র) সঙ্গে এমন একটি বস্তুকে শরিক করার জন্য চাপাচাপি করে, যে সম্পর্কে তোমার আদৌ জ্ঞান নেই, তবে তাদের (শির্ক্ অবলম্বনের আদেশ) অনুসরণ করো না। তবে দুনিয়াতে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"

অতঃপর সাধারণভাবে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং তোমাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কারও করেনি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। তিনি ন্যায়পরায়ণদের পছন্দ করেন।"

ইসলাম এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তা এ বিষয়টির মূল দর্শনও বাত্লে দিয়েছে। আকৃতি, চরিত্র, ধ্যান-ধারণা ও মতামতের দিক থেকে সকল মানুষ এক হতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ই মানুষের স্বভাবকে তেমন করে সৃষ্টি করেন নি। সুতরাং সকল মানুষ একই ভাবাপন্ন হবে—এ আশা করা যেন মনুষ্য স্বভাবকে বিলুপ্ত করা। এ সূক্ষ্ম কথাটি কুরআন মজীদ এমনিভাবে বলেছে ঃ

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে এক জাতিভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু মানুষ সব সময়ই বিভিন্ন মত পোষণ করবে।

তবে যাঁদের উপর আপনার (নবীজী) আল্লাহ্‌র রহমত রয়েছে, কেবল তাঁরাই একমতাবলম্বী থাকতে পারেন। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তাঁদের সৃষ্টি করেছেন।"

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমরা শির্‌ক্ করতে না।"

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে হেদায়াতের উপর ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন।"

"আল্লাহ্ চাইলে তোমাদের সবাইকে সত্যপথে আনতে পারতেন।"

"আমি চাইলে প্রত্যেকটি মানুষকে হেদায়ত করতে পারতাম।"

রসূল করীম (সঃ) ছিলেন একজন মানুষ। তাই মানবসুলভ মন-মেজাজের অধিকারী হওয়াই তাঁর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। কাফেরদের অবাধ্যতা ও অনমনীয়তা দেখে কোন কোন সময় তিনি দুঃখিত হতেন। এ উপলক্ষে কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন :

"হে মুহম্মদ! তাদের অবাধ্যতা যদি আপনার কাছে বেদনাদায়ক হয়, তবে সম্ভব হলে জমিনের অভ্যন্তরে সুরঙ্গ তালাস করুন, নয়তো আকাশের সঙ্গে সিঁড়ি লাগিয়ে দিন, তা'হলে যেন তাদেরকে কোন একটা মুজিযা দেখাতে পারেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকলকে সত্য পথে আনতে পারতেন। দেখুন, যেন অজ্ঞ না হয়ে পড়েন।"

ওয়াষ-নসীহত শুনে সত্য কথা গ্রহণ করবে—এটা অধিকাংশ মানুষেরই স্বভাব। এজন্য ইসলামও ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে ধর্মের প্রতি আহবান করার অনুমতি প্রদান করে। আল্লাহ্ বলেন :

"তুমি কৌশল ও উপদেশের মাধ্যমে লোকদেরকে তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহবান কর এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা কর।"

"লোকদের উপদেশ দিন! আপনি হলেন একজন উপদেশক মাত্র ; আপনি বল প্রয়োগকারী নন। সুতরাং যার ইচ্ছা, সে আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন করুক।"

"আপনি কি জোরপূর্বক লোকদের মুসলমান করতে চান?"

বিশ্বাসের সম্পর্ক হলো অন্তরের সঙ্গে। তাই কারো মনে জোরপূর্বক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এ কারণে ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তি করা অর্থহীন। এ কথাটি জগদ্বাসীর জ্ঞানে আসেনি, যতক্ষণ না ইসলাম বলেছে :

"ধর্মে জবরদস্তি নেই।"

ঝুল সীমন ছিলেন একজন বড় ফরাসী জ্ঞানী। তিনি বলেন ঃ "লোকেরা ধর্মীয় আযাদী লাভ করেছে, বেশী দিন হয়নি। দুনিয়ার সমস্ত ইতিহাস বস্তুত ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব ও হিংসা-বিদ্বেষেরই ইতিহাস।" অতঃপর উক্ত ফরাসী জ্ঞানী প্রথম যুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্য যুগ পর্যন্ত ধর্মীয় কুসংস্কারের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। সর্বশেষে তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত ৪ঠা আগস্ট, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে দার্শনিকগণ ধর্মীয় আযাদী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। মনে রাখা দরকার, ধর্মীয় আযাদীর এ ধারণা কেবল তখনি বাস্তবায়িত হয়, যখন ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে ইহুদীদেরকে যুলুম থেকে রেহাই দেওয়া হয়। তথাপি ফরাসী বিপ্লবের প্রশাসন-ব্যবস্থা ভাল না থাকায় তিনি ধর্মীয় আযাদীর দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হননি।

মহাজ্ঞানী সীমন যে বস্তুটির (ধর্মীয় স্বাধীনতা) সূচনা ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল বলে বর্ণনা করেন, ইসলাম সে আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছে বার শ' বছর পূর্বে। সীমন ইসলামের হকিকত ও ইতিহাসের প্রতি অবহিত ছিলেন না। তিনি অন্যান্য জাতির অবস্থার নিরিখে সারা পৃথিবী সম্পর্কে মোটামুটি একটি অভিমত স্থির করেন। এছাড়া তাঁর গত্যন্তরও ছিল না।

৫. তামদ্দুনিক উন্নতির অন্যতম বড় উপায় হলো—স্ত্রী ও পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়া। প্রাক-ইসলাম যুগে সারা পৃথিবীর কাজ-কর্ম ছিল এ নীতির পরিপন্থী। ইসলামই সর্বপ্রথম নরনারী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের শিক্ষা দান করে।

৬. জাতীয় উন্নতির বড় একটি নীতি হলো—প্রত্যেকটি মানুষকে জাতিগতভাবে আত্মসম্মান লাভের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। ইসলাম প্রথম থেকেই এদিকে লক্ষ্য রেখেছে। মুসলমানদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরাই সেরা জাতি।"

"সম্মান হলো আল্লাহ্‌র জন্য, তার রসুলের জন্য ও মুমিনদের জন্য।"

প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ ইসলাম যখন সত্যিকার ইসলাম ছিল, তখন সমস্ত মুসলমানের মনে আত্মসম্মানবোধ বদ্ধমূল ছিল। প্রত্যেকটি মুসলমান জাতিগতভাবে নিজেকে বিশ্বের সেরা মানুষ বলে মনে করতো। এটাকেই বলা হয় আত্মসম্মানবোধ। এর ফলেই

মুসলমানদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা ও উচ্চ চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল। আপনারা ইতিহাস গ্রন্থে অবশ্যই পড়ে থাকবেন যে, একজন মামুলি মুসলমানও রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের দরবারে সাহসিকতা ও স্বাধীন চিন্তা সহকারে প্রশ্নোত্তর করতে দ্বিধাবোধ করতো না।

৭. উন্নতির সর্বপ্রধান নীতি হলো—জ্ঞানার্জন। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে তার অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে পরিগণিত করে। কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে জ্ঞানার্জনের প্রতি ভূরি ভূরি তাগিদ রয়েছে। সেগুলো বাদই দিলাম। বাস্তবতার দিকে দেখুন, প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলাম সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলাম যেখানেই পদার্পণ করেছে, সেখানেই জ্ঞান সঙ্গে নিয়ে গেছে। যে সব জাতি আদি থেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ছিল, তারাও ইসলামে দীক্ষিত হওয়া মাত্রই জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিভূষিত হয়ে উঠে। আরবেরা প্রথম থেকেই মূর্খ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়ও বড় বড় কবি লেখাপড়াকে লজ্জাকর বলে মনে করতেন। বিখ্যাত আরব কবি রাবি-ইয়াহ্ ছিলেন একজন শিক্ষিত লোক। কিন্তু এক জায়গায় যখন তাঁকে কিছু লিখতে বলা হলো, তখন তিনি অনুনয়-বিনয় করে বললেন, এ গোপন কথাটা যেন কোথাও প্রকাশ না পায়। আমি যে লিখতে পারিনি, এটা জানাজানি হলে আমার খুবই অখ্যাতি হবে। কিন্তু এ আরব দেশই ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে উঠে। ইমাম শাফেই, ইমাম মালেক ও যুহ্রীর ন্যায় মুজ্তাহিদ সেখানে জন্মগ্রহণ করতে আরম্ভ করে। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই তুর্কী জাতির অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে তাদের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না। তবুও এই তুর্কী জাতির ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে হাকীম আবু নসর ফরাবী, আমীর খুসরু ও অন্যান্য শত শত বিদ্বান ও কবি জন্মগ্রহণ করতে আরম্ভ করে। যে সব জাতি পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জ্ঞান-ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা কি ছিল এবং পরে কি দাঁড়িয়েছে।

## গণতান্ত্রিক শাসন

৮. উন্নতির একটি বড় পন্থা হলো —গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করা। ইসলাম এ পদ্ধতির উপর এত গুরুত্ব আরোপ

করে যে, রসূলুল্লাহ্ স্বয়ং এর বাস্তবায়নের জন্য আদিষ্ট হন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"হে মুহম্মদ! আপনি লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।"

**কর্ম বণ্টন**

৯. উন্নতির অপর একটি বড় নীতি হলো—কর্ম বণ্টন পদ্ধতি মোতাবেক কাজ করা। অর্থাৎ এক-একটি সম্প্রদায়কে এক-একটি বিশেষ কাজে নিয়োজিত করা, তাহলে যেন প্রত্যেকটি কাজে বিশেষভাবে উন্নতি সাধন করা যায়। ইওরোপে এ পদ্ধতি খুবই উন্নতি লাভ করেছে। সেখানে বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য আলাদা আলাদা চিকিৎসক রয়েছেন। তাঁরা বিশেষ বিশেষ রোগ ছাড়া অন্যান্য পীড়ার চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। প্রকৃতিতেও এ নিয়ম দৃষ্ট হয়। হাত, পা, মাথা, অন্তর, মস্তিষ্ক—প্রত্যেক অঙ্গেরই আলাদা আলাদা ক্রিয়া রয়েছে। ইসলাম এ নীতির প্রতি ইঙ্গিত করে বলে ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে, যাঁরা মঙ্গলের প্রতি আহবান করবেন, সৎকাজের প্রতি আদেশ দেবেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবেন। সব মুসলমানকে এ কাজে উদ্যোগ নিতে হবে না। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে কিছু লোককে অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।"

১০. প্রত্যেক যুগে এমন একটি দল পরিলক্ষিত হয়, যারা মানুষ আর মানুষের মধ্যকার ব্যবধান মুছে দিতে চান। ইওরোপের 'অ্যানার্কিস্ট নিহিলিস্ট' মতাবলম্বী (যাদের মতবাদ হলো—বর্তমান সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে দিয়ে জমি ও সম্পত্তির উপর সকলের সমান অধিকার স্থাপন করা এবং সে ভিত্তির উপর নতুন সমাজ গঠন করা) লোকেরাও এ ধরনের চিন্তাধারা পোষণ করেন। বস্তুত এ চিন্তাধারা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যদি এ নীতিকে বাস্তবায়িত করা হয়, তবে প্রত্যেক প্রকার উন্নতি আকস্মিকভাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইসলাম এ দর্শনটি নিম্নলিখিত শব্দে তুলে ধরেছে ঃ

**মর্যাদার নিরিখে মানুষের শ্রেণীবিভাগ**

আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আমি পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি এবং একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। উদ্দেশ্য হলো, একে অপরকে তার কাজে নিয়োজিত করবে।"

## জ্ঞান লাভের সীমা নেই

৯১. উন্নতির মহত্তর নীতি হলো জ্ঞানের গণ্ডিকে সীমিত না করা। অর্থাৎ উন্নতির কোন একটি সীমায় পেঁৗছে থেমে না যাওয়া। মানুষের এ কথাই ধারণা করতে হবে যে, উন্নতির আরো অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হবে। ইসলাম এ বিষয়টির উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, বিশ্বনায়ক হযরত (সঃ) মুহম্মদ রসূলুল্লাহ ঐশ জ্ঞান বিভূষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা নিম্মশব্দে সম্বোধন করেছেনঃ

"বলুন ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে আরো জ্ঞান দান করুন।"

## দীন-দুনিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক

কোন্ ধর্ম সত্য আর কোন্‌টি অসত্য—এ বিষয়টি বিচার করার প্রধান তুলাদণ্ড হলো দীন-দুনিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক। পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত সকল ধর্ম ও সকল জাতিই (ইসলাম ছাড়া) দীন-দুনিয়ার সঠিক সম্পর্ক নিরূপণে ভুল করে আসছে। 'ইবাহিয়া' সম্প্রদায় ও এপিকিউরাসের অনুগামীরা কেবল পার্থিব ভোগ-বিলাসের পক্ষপাতী ছিল। বাকি সব ধর্মই পার্থিব উপভোগকে অর্থহীন মনে করেছে। মানুষ যতই পার্থিব উপভোগ থেকে বিরত থাকতো, সমাজে তাকে ততই কামিল ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক বলে মনে করা হতো। এই ভাবধারাই পৃথিবীতে দুনিয়াবিমুখ, পাদ্রী, মঠাধ্যক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে। এই চিন্তাধারার পুঁজি নিয়ে এ সব লোকেরা জনমনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এদের প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা ও ইজ্জত রয়েছে যে, একজন লাঞ্ছিত ও ছেঁড়া কাপড় পরিহিত লোকের সামনেও বড় বড় বাদশা মাথা নত করছে।

ইওরোপের জনৈক খ্যাতনামা লোক বলেন, ধর্মের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কাজ হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিহার করে চলা, দুনিয়ার কাজ-কর্ম ছেড়ে বিনয় সহকারে বেহেশতের অপেক্ষায় জীবনকে বিলীন করে দেওয়া, প্রত্যেক প্রকার প্রাকৃতিক ভাবাবেগ ও আশা-আকাঙ্খাকে নির্মূল করা।

লওরুস্ বলেন ঃ "দরবেশদের উদ্দেশ্য হলো সম্ভোগেচ্ছার মূলোৎপাটন করা।" কেবল ধর্মই নয়, দর্শন ও বিজ্ঞানক্ষেত্রেও এ ধ্যান-ধারণা পরিলক্ষিত হয়। সক্রেটিস, প্লেটো, কল্‌বী, আবু নসর ফরাবী প্রমুখও পুরোপুরি সন্ন্যাসীদের ন্যায় জীবন যাপন করতেন। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এ মনোভাবটি সারা দুনিয়ায় কিভাবে জাল বিস্তার করে রেখেছে। আমরা যখন শুনতে পাই যে, অমুক ব্যক্তির নজরে দুনিয়া কিছুই নয়, সে মাটিতে পড়ে থাকে, শাক-ভাত খেয়ে জীবিকা নির্বাহ

করে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের অন্তরে তার প্রতি ইজ্জত বৃদ্ধি পায়। অথচ আমরা খতিয়ে দেখি না যে, এ সব কাজ ছাড়া তার মধ্যে আর কোন যোগ্যতা আছে কি-না ?

দীন (ধর্ম) ও দুনিয়াকে তুলনামূলকভাবে দেখা এবং এ দুটোর মধ্যে যথাযথ ও সুষম সম্পর্ক বজায় রাখা জটিল ব্যাপার। ইওরোপের বড় বড় চিন্তাবিদেরা এ দুটোর মধ্যে সুষম সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব বলে মনে করেন এবং এজন্য দুঃখও প্রকাশ করেন। হেন্‌রী ব্রাজিয়া 'রিভিউ অব্ রিভিউ'-এর চব্বিশতম খণ্ডে বলেন ঃ যদি কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি ধর্মীয় কুসংস্কার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে ধর্মের প্রতি যে বিরূপ আচরণ রয়েছে, এ সব নিরসন করে উভয়ের মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্কটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, তবে বিরাট মঙ্গল সাধিত হতো। এটা সম্ভব হলে এ দুটোর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে টানা-হেঁচড়া চলছে, তার অবসান ঘটতো।

এখন দেখুন, ইসলাম কিভাবে দীন ও দুনিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম বৈরাগ্য ও সংসার বিমুখতার ধারণাকে নির্মূল করে দিয়েছে।

## বৈরাগ্য উৎখাত

আল্লাহ্ বলেন ঃ

"খ্রীস্টানেরা যে বৈরাগ্য প্রবর্তন করেছে, তা আমি তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করিনি। পৃথিবীতে তোমাদের (উপভোগ্য) যে অংশ আছে, তা ভুলে যেও না।"

"হে মুসলমানেরা! যে সব উত্তম বস্তু তোমাদের জন্য আল্লাহ্ হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম করো না। হে মুহম্মদ! আপনি বলুন—যে সব উপভোগ্য বস্তু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো কে হারাম করলো ? উত্তম আহার্যসমূহকে কারা হারাম করলো ?"

"আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজ আচরণ করতে চান, কঠিন আচরণ নয়।"

অন্যান্য ধর্ম এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, এই ব্যাপক দুনিয়ায় মানুষের করণীয় হলো—প্রাণ বাঁচাতে পারে এমন পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা

এবং দুই গজ কাপড় পরিধান করা। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো—জমিন, ময়দান, পাহাড়, সাগর, বৃক্ষ, চতুষ্পদ জন্তু, রত্নরাজি, ফলফুল, সুরভি—দুনিয়াতে যা কিছু আছে, সব কিছুই মানুষের জন্য। মানুষের উচিত, সেগুলো বৈধ উপায়ে উপভোগ করা। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আল্লাহ্ আকাশ ও জমিনের সবকিছু তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রত্যেক প্রকার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নিয়ামত পুরোপুরি প্রদান করেছেন।"

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্যকে বশীভূত করেছেন। নক্ষত্রও তোমাদের আদেশের অনুগামী।"

"টাটকা গোশ্ত খাওয়ার জন্য সেই আল্লাহ্ সমুদ্রকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। তোমরা যে অলংকার পরিধান করছ, তা সেখান থেকে কুড়িয়ে আন। তোমরা সেখানে নৌকা প্রত্যক্ষ করছ যা পানি চিরে অগ্রসর হয়। সমুদ্রকে বশীভূত করার আরো উদ্দেশ্য হলো তোমরা যেন আল্লাহ্‌র দান (ব্যবসা) অনুধাবন করতে পার।"

"ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরকে তোমাদের আরোহণ ও উপভোগ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রং বে-রংগের অনেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তোমাদের জন্য ফসল, জলপাই, খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল সৃষ্টি করেছেন।"

এ ধরনের শত শত আয়াত রয়েছে। সে সবের উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

এ সব আয়াতে আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে যা কিছু আছে, সবই মানুষের হিতার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই তিনি যাবতীয় বস্তুকে মানুষের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, কুরআনের এই সর্বজনীন করায়ত্তকরণ রূপকার্থে বা কবিজনোচিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কাল-প্রবাহ প্রত্যেক দিনই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, এটা রূপকথা নয়, কবিজনোচিত বাক্য প্রয়োগও নয়, বরং এটা বাস্তব সত্য। বাষ্প, বিদ্যুৎ, তড়িৎ, আওয়াজ,—এসব বস্তুকে কিভাবে বশীভূত করা হয় এবং বিস্ময়কর কাজে লাগানো হয়, তা সবাই দেখতে পাচ্ছে।

এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, যদিও পৃথিবীতে লাখো লাখো উপভোগ্য বস্তু রয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে বিভক্ত করার ইচ্ছা করলে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) ধন-সম্পদ, (২) সন্তান-সন্ততি, (৩) জনপ্রিয়তা ও চিরস্থায়ী খ্যাতি। এখন দেখুন, ইসলাম এগুলো সম্পর্কে কি বলেছে ?

বিত্ত ও মান-ইজ্জত আল্লাহ্‌র নিয়ামত। তিনি নবীদের সেগুলো দান করে তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ যে সব ইহ্‌সান করেছেন, তার উল্লেখ করে কুরআন বলে :

## দুনিয়ার মর্যাদা

"আল্লাহ্ আপনাকে রিক্তহস্ত পেয়েছিলেন। তাই সঙ্গতিসম্পন্ন করেছেন।"

হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে যে রাজত্ব ও ইজ্জত-দৌলত প্রদান করা হয়েছে, কুরআন মজীদে ধুমধামের সঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়। তাতে আরো বলা হয় যে, সুলায়মান (আঃ) স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট সে দৌলত কামনা করেছিলেন। কুরআনে আছে :

"হে আল্লাহ্! আমাকে এমন একটি রাজত্ব দিন, যা আমার পরে যেন কেউ না পায়।"

বনু-ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্ যে সব সদয় ব্যবহার করেছেন, তন্মধ্যে বড় বড়গুলোর প্রতি ইংগিত করে তিনি বলেন :

"আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে পয়গাম্বর ও বাদশাহ সৃষ্টি করেছেন।"

"আমি বনু-ইসরাঈলকে কিতাব, শাসনক্ষমতা ও পয়গাম্বরী প্রদান করেছি।"

অন্য এক আয়াতে আছে :

"তাই আমি (আল্লাহ্) ইব্রাহীমের বংশধরকে কিতাব ও শাসনাধিকার দিয়েছি এবং তাদেরকে খুব বড় রাজ্যও প্রদান করেছি।"

সর্বোপরি মোক্ষম কথা হলো—আল্লাহ্ তাআলা সৎ কাজের বিনিময়ে উম্মত-এ-মুহম্মদিয়াকে খেলাফত্ ও বাদশাহী দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কুরআন মজীদ বলে :

"যাঁরা ঈমান গ্রহণ করেন এবং সৎ কাজ করেন, তাঁদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত (আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব) দেবেন বলে আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন।"

যে সব স্থানে মানুষকে সেরা সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেখানে উন্নতির কথাটি যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সেরা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে বৈষয়িক উন্নতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

"এবং আমি বনি-আদমকে সম্মান দিয়েছি এবং জল-স্থলে পৌঁছে দিয়েছি। তাদেরকে উত্তম আহার্য দিয়েছি এবং আমার অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌ মাল-দৌলতকে যে সব প্রতিশব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন, তাতে অনেকটা বোঝা যায় যে, ইসলাম ধন-সম্পদের কতখানি মর্যাদা দেয়।

## কুরআনে কি কি শব্দ প্রয়োগ করে মাল-দৌলত অর্থ করা হয়েছে?

ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার পর বোঝা গেছে যে, কুরআন মজীদ ২৫ স্থানে ধন-সম্পদকে 'আল্লাহ্‌র রহমত' (ফয্‌লুল্লাহ), ২১ স্থানে 'মঙ্গল' (খয়ের), ১২ স্থানে 'সৎকাজ' (হাসানাহ্‌) এবং ১২ স্থানে দয়া (রহমত) বলে আখ্যায়িত ক'রেছে।

আল্লামা আহমদ ইব্‌নে মুহম্মদ আল্‌ রাযী এসব আয়াতের পুরোপুরি উদ্ধৃতি দেন। আমি এখানে কেবল সে সব আয়াতের উদ্ধৃত দিচ্ছি, যেখানে 'খয়ের' শব্দে ধন-সম্পদের অর্থ করা হয়েছে ঃ

"তোমরা যে 'খয়ের' ব্যয় কর, তা তোমাদেরই জন্য।" "তোমরা যে 'খয়ের' ব্যয় কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ অবগত আছেন।" "হে মুহম্মদ! আপনি বলুন, তোমরা যে 'খয়ের' ব্যয় করেছ এবং যে 'খয়ের' ব্যয় করছ, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে।" "তোমাদের মৃত্যু যখন আসন্ন বলে মনে হবে, তখন অসিয়ত অবশ্যই করতে হবে, যদি তোমাদের কোন 'খয়ের' রেখে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে।"

"তোমাদের নিজেদের জন্যই 'খয়ের' ব্যয় কর।" "মানুষ 'খয়েরের' মোহে ভীষণভাবে প্রলুব্ধ।"

পার্থিব উপভোগের দ্বিতীয় বস্তু হলো—সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদের এক জায়গায় তাঁর বিশেষ বান্দাদের বিশিষ্ট গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন ঃ

"এবং আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যাঁরা মাটির উপর নম্রভাবে চলেন, এবং বলেন—হে আল্লাহ্! স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়ে আমাদের চোখ জুড়িয়ে দিন।"

তৃতীয় বস্তু হলো—জনপ্রিয়তা ও চিরস্থায়ী খ্যাতি। বান্দার প্রতি সদ্ব্যবহার ও উপকার সাধনের জন্য আল্লাহ্ রসূল করীম (সঃ)-কে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে বলেন ঃ

"আপনার খ্যাতিকে আমি উচ্চে তুলে ধরেছি।"

সর্বশেষে একথাও বলতে হয় যে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ধন-সম্পদের কুৎসাও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশংসা ও কুৎসা উভয় ধরনের কথাগুলোকে তুলনামূলকভাবে দেখলে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হবে যে, অনুচিতভাবে যে ধন-সম্পদ ব্যবহৃত হয়, কুরআনে কেবল তারই কুৎসা করা হয়েছে। এ ধরনের ধন-সম্পদের অপকারিতা কে অস্বীকার করতে পারে?

# পরিশিষ্ট

## নুবুওয়াত

[ইমাম রাযী-রচিত 'মাতালিবে আলিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত
'নুবুওয়াত' শীর্ষক অধ্যায়ের সারমর্ম ]

**প্রথম অনুশীর্ষ**

নুবুওয়াতের সমর্থকদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় রয়েছেঃ এক সম্প্রদায়ের অভিমত হলো—নুবুওয়াতের যথার্থতা নিরূপিত হয় মুজিযার মাধ্যমে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি নুবুওয়াতের দাবি করে, তবে আমরা দেখবো যে, তার কাছে মুজিযা আছে কি না? যদি থাকে, তবে তিনি সত্য নবী। নুবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি যেটাকে সত্য বলবেন, সেটা সত্য বলেই পরিগণিত হবে। আর যেটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবেন, সেটা হবে মিথ্যে। এটাই প্রাচীন ও সাধারণ ধর্মসমূহের রায়।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অভিমত হলো—প্রথমে স্বয়ং আমরা এটা স্থির করে নেবো যে, সত্য বলতে কি বোঝায়, আর অসত্য বলতেই বা কি বোঝায়? অতঃপর যখন দেখবো যে, এক ব্যক্তি সত্যের দিকে লোকদের আহ্বান করছেন এবং তাঁর ডাকে তারা অসত্য ছেড়ে সেই সত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন আমরা ধরে নেবো যে, ইনি সত্য পয়গাম্বর। এ পন্থাটি যুক্তিসংগত। এতে সন্দেহের অবকাশ কম।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বিশদভাবে বলছি। কিন্তু এর পূর্বেই নিম্ন সূত্রগুলো মনে রাখতে হবেঃ

১. মানুষের পূর্ণতা লাভের জন্য—তার চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি উভয়কেই পূর্ণ হতে হবে। চিন্তাশক্তির পূর্ণতার মানে হলো—তার মধ্যে বস্তুনিচয়ের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকতে হবে অর্থাৎ

তার মনে বস্তুর যে ধারণা অংকিত থাকবে, তা হবে সেটির নিখুঁত চিত্র। কর্মশক্তির পূর্ণতার অর্থ হলো—আত্মায় এমন একটি শক্তি সৃষ্টি হবে, যার ফলে ভাল কাজের উৎপত্তি হতে থাকবে।

২. পৃথিবীতে তিন ধরনের লোক আছেঃ (১) অপরিপক্ক, অর্থাৎ যাদের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি—উভয়ই অপূর্ণাঙ্গ। এরা হলো সাধারণ লোক। (২) স্বয়ং পরিপক্ক; কিন্তু অন্যকে পরিপক্ক ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত করে তোলার ক্ষমতা রাখেন না। এঁরা হলেন ওলী ও সৎলোক। (৩) স্বয়ং পরিপক্ক এবং অন্যান্যদেরকেও পরিপক্ক ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সক্ষম। এঁরা হলেন নবী।

৩. চিন্তাশক্তি এবং কর্মশক্তির পূর্ণতা ও অপূর্ণতার বিভিন্ন স্তর আছে। এগুলোর মধ্যে মাত্রার দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবধান রয়েছে। এগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করা যায় না।

৪. সব লোকের মধ্যেই সাধারণত অপূর্ণতা তথা দোষত্রুটি দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও এমন পরিপক্ক লোক দেখা যায়, যাঁরা অপূর্ণাঙ্গ লোক থেকে অনেক মঞ্জিল উর্ধ্বে রয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করা যায়ঃ

(ক) এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষের মধ্যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। অপূর্ণতা ও ঘাটতির বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে মানুষ এমন এক সীমারেখায় অবতীর্ণ হয়, যেখানে সে বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে নিছক জন্তুর কাছাকাছি হয়ে পড়ে। অপূর্ণতার দিক থেকে যেমন অবনতির চরম পর্যায় রয়েছে, তেমনি পূর্ণতার দিক থেকেও চরম উৎকর্ষের একটি মন্‌জিল রয়েছে, যেখানে পৌঁছে মানুষ ফেরেশতার গণ্ডিতে প্রবেশ করে।

(খ) অবরোহ পদ্ধতিতেও এ তত্ত্বের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। উপাদানবিশিষ্ট পদার্থ তিন প্রকারঃ খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ। এগুলোর মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ হলো—প্রাণীজ, অতঃপর উদ্ভিজ্জ, অতঃপর খনিজ। প্রাণীজগতে অনেক শ্রেণী রয়েছে। তন্মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। আবার মানুষের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন মিসরীয়, ভারতীয়, রোমান, সিরীয়, ফরাসী, ইটালীয়, তুর্কী ইত্যাদি। এদের মধ্যে মধ্য-এশিয়ায় বসবাসকারী লোকেরা সব চাইতে উত্তম।

এ নীতি অনুসারে আবার মধ্য-এশিয়ার লোকদের মধ্যেও পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক থেকে বিভিন্ন ব্যবধান অবশ্যই থাকবে। এঁদের মধ্যে এমন একটি লোক অবশ্যই দৃষ্ট হবেন, যিনি সব চাইতে শ্রেষ্ঠ।

যুগে যুগে একজন সর্বসেরা মানুষ পয়দা হন। সূফীদের ভাষায় তাঁকে 'কুত্‌ব' (ওলী) বলা হয় এবং সত্যিকারভাবেই বলা হয়। কেননা জড়জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ হলো এ মানুষটি। তিনি তাঁর চিন্তা-শক্তি বলে আধ্যাত্মিক জগত (আলম-এ-আর্‌ওয়াহ্‌) থেকে ঐশ শক্তি লাভ করেন এবং কর্মশক্তিবলে পৃথিবীতে উত্তম শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং এ মানুষটি হলেন দুনিয়ার প্রাণ ও আসল উদ্দেশ্য। ইনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম। এজন্য এ লোকটিকে 'বিশ্বকুত্‌ব' বলা পুরোপুরি সংগত হবে। শিয়া সম্প্রদায় এ লোকটিকে 'নিষ্পাপ ইমাম' 'যুগের অধিপতি' ও 'অদৃশ্য মানব' বলে আখ্যায়িত করে। তাদের এ আখ্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কেননা তিনি সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, তাই নিষ্পাপ। অন্য দিকে যুগের আসল উদ্দেশ্য বলে তিনি যুগেরও অধিপতি। আবার সাধারণ লোকেরা তাঁর পূর্ণতা সম্পর্কে ওয়াকিফ্‌হাল নয় বলে তিনি চক্ষু থেকে যেন অদৃশ্য।

এ ধারণানুসারে এমন এক ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে হবে, যিনি হবেন সেরাদের চাইতে সেরা। এমন মানুষ শত বছরে বা হাজার বছরে একবার জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই সত্য নবী ও শরীঅত প্রতিষ্ঠাতা। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁরা নবীদের চাইতে নিম্নস্তরের মর্যাদার অধিকারী, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁরা হলেন ইমাম ও পয়গাম্বরের প্রতিনিধি। ইমাম ও নবীর সম্পর্ক এমনি ধরনের, যেমন চাঁদ ও সূর্যের সম্পর্ক। যাঁরা ইমাম থেকে নিম্ন পর্যায়ের মর্যাদার অধিকারী, তাঁদের ও নবীদের মধ্যে এমনি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে, যেমন সূর্যের সঙ্গে রয়েছে সাধারণ নক্ষত্ররাজির। বাকি রইলো জনসাধারণের কথা। তাদের অস্তিত্ব হলো স্বর্গমণ্ডলের আবর্তে উদ্ভূত দৈনন্দিন ঘটনাবলী মাত্র।

পয়গাম্বর মানবোৎকর্ষের চূড়ায় অবস্থিত। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানব জাতির প্রত্যেকটি শ্রেণী উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করে অন্য শ্রেণীর সীমারেখায় প্রবেশ করে। মানবোৎকর্ষের চরম সীমা হলো আধ্যাত্মিক জগতে উপনীত হওয়া। এজন্যই পয়গাম্বরদের মধ্যে

আধ্যাত্মিক গুণাবলী দৃষ্ট হয়। জড়জগতের প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণ থাকে না। তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাই প্রবল হয়। তাঁদের চিন্তাশক্তির দর্পণে ঐশ জ্ঞান প্রতিফলিত হয়। তাঁদের কর্মশক্তি জড়জগতে বিভিন্ন ধরনের ওলট-পালট তথা বিপ্লব সাধন করতে পারে। এটাকেই বলা হয় মু'জিযা।

পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মার শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। কোন কোন আত্মার চিন্তাশক্তি খুবই উচ্চ হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের কর্মশক্তি হয় দুর্বল। আবার কতগুলো হয় তার বিপরীত। কোন কোন আত্মা চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি উভয় দিক থেকেই উচ্চ হয়। কিন্তু এরূপ আত্মা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। আবার কোন কোন আত্মা উভয় দিক থেকেই দুর্বল হয়, যেমন আমরা সাধারণ লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই।

উক্ত সূত্রগুলোর আলোকে এটা বুঝে নিতে হবে যে, আত্মার পীড়া হলো আল্লাহ্ বিমুখতা ও দুনিয়া-প্রলুব্ধতা। যে ব্যক্তি এ পীড়ার চিকিৎসক অর্থাৎ যিনি লোকদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান করেন এবং দুনিয়া প্রলুব্ধতা থেকে তাদের সরিয়ে রাখেন, তিনিই পয়গাম্বর। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, এ গুণের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ গুণ অতি মাত্রায় পরিলক্ষিত হবে, তিনি হবেন সর্বোচ্চ নুবুওয়াতের অধিকারী। আর যে ব্যক্তির মধ্যে এ গুণ কম মাত্রায় থাকবে, তাঁর নুবুওয়াতের মর্যাদাও হবে তুলনামূলকভাবে নিম্ন পর্যায়ের।

## দ্বিতীয় অনুশীর্ষ

কুরআন মজীদের ভাষ্যানুসারে বোঝা যায় যে, নুবুওয়াতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই সর্বোত্তম পন্থা। কুরআনের কোন কোন সূরার উদ্ধৃতি দিয়ে আমি সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছি। তাতে এ দাবির সত্যতা প্রমাণিত হবে। কুরআন মজীদে আছেঃ "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল্ আ'লা.....।" আল্লাহ্-তত্ত্ব হলো কুরআনের আসল বস্তু এবং নুবুওয়াত হলো তার শাখা বিশেষ। এ জন্য কুরআন মজীদের সাধারণ পদ্ধতি হলো—প্রথমে আল্লাহ্-তত্ত্ব বর্ণনা করা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সূরায় আল্লাহ্-তত্ত্বযোগে বিষয়টি আরম্ভ করেন এবং বলেনঃ "তুমি নিজ আল্লাহ্‌র তস্‌বীহ্ পাঠ কর, যিনি সবার উর্ধ্বে" অর্থাৎ জড়জগতের সঙ্গে যাঁর কোন সামঞ্জস্য নেই।

কেননা জড়জগত হলো উপাদানবিশিষ্ট ও আকারের যৌগিক। এগুলোর সত্তা বা গুণ পরিবর্তনীয় ও ধ্বংসনীয়। কিন্তু আল্লাহ্ এ সবের উর্ধ্বে।

"আল্লাযী খালাকা ফা-সাও-ওয়া"—"আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন ও সুষমামণ্ডিত করেছেন।" এর উদ্দেশ্য হলো—কায়ার সৃষ্টি কৌশল বর্ণনা করা।

"ওয়াল্লাযী কাদ্দারা ফা-হাদা"—এবং যে আল্লাহ্ নিরূপণ করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন।"—এখানে আত্মার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

"ওয়াল্লাযী আখ্‌রাজাল্ মার্‌আ"—"এবং যে আল্লাহ্ পশুর আহার্য সৃষ্টি করেছেন"—এখানে উদ্ভিদ জগতের প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে। সার কথা হলো—জড়জগত, উদ্ভিদ জগত, প্রাণীজগত ও আত্মা—এসবই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ।

আল্লাহ্-তত্ত্ব বর্ণনার পর আল্লাহ্ তাআলা নুবুওয়াতের বর্ণনা দেন। আগেই বলা হয়েছে যে, নবীদের পূর্ণাঙ্গতা নির্ভর করে চারটি বস্তুর উপরঃ চিন্তাশক্তি, কর্মশক্তি, অন্যান্যদের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তির পূর্ণতা সাধন। তাই আল্লাহ্ তাআলা ক্রমানুসারে এ চারটি বস্তু বর্ণনা করেনঃ

"সা-নুক্‌রিউকা ফালাতান্‌সা"—"আমি আপনাকে পড়িয়ে দেবো। এরপর আপনি তা আর ভুলবেন না।"—এটা হলো চিন্তাশক্তির পূর্ণতার বর্ণনা অর্থাৎ হে পয়গাম্বর! আপনাকে পবিত্র আত্মা দান করা হয়েছে, যা ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তবে মনুষ্যসুলভ কোন ভুল-ভ্রান্তি যদি হয়, তা স্বতন্ত্র কথা।

"ওয়া-নুইয়াস্‌সিরুকা লিল্-ইউস্‌রা"—"এবং আমি আপনাকে আস্তে আস্তে সহজ পথে নিয়ে যাবো।" এতে কর্মশক্তির পূর্ণতার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে অর্থাৎ আপনার মধ্যে এমন একটি শক্তি সৃষ্টি করবো, যাতে আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও সৌভাগ্যের কাজ করতে পারেন।

"ফা-যাক্‌কির্ ইন্-নাফাআতিয্-যিক্‌রা"—"যদি আপনার উপদেশ উপকারে আসে, তবে তাদের বুঝিয়ে বলুন!" এখানে অপূর্ণাঙ্গ লোকদের পরিশোধনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কারণ

উপদেশ দান ও উপলব্ধি করানোর উদ্দেশ্য হলো—অপূর্ণাঙ্গদের সংশোধিত করা। এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, সকল ব্যক্তি সংশোধনযোগ্য নয়। কেননা মানব আত্মার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কোন কোন লোককে বুঝালে লাভ হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয় না। এমনও লোক আছে, যাদের বুঝালে উল্টো ফল হয়। কেননা তাদের বুঝালে বিবাদ, ক্রোধ ও হঠকারিতা আরো বেড়ে যায়।

এরপর আল্লাহ্ উভয় প্রকার লোকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন :

"সাইয়ায্যাক্কারু মাঁয়্যাইয়াখ্শা"—"যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, সে শিগগির উপদেশ গ্রহণ করবে"—অর্থাৎ যারা সংশোধনযোগ্য, তারাই উপদেশ গ্রহণ করবে। এদের চিহ্ন হলো—এরা সব সময় আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পমান থাকবে।

"ও-ইয়াতাজান্নাবুহাল্ আশ্কাল্লাযী ইয়াস্লান নারাল্ কুব্রা"—"উপদেশ থেকে সেই হতভাগ্যই দূরে থাকে, যে মহাআগুনে প্রবেশ করবে"—অর্থাৎ যে ব্যক্তি হতভাগ্য, সে-ই উপদেশের প্রতি বিরাগ-ভাজন হয়ে থাকে। ফলত সে দুনিয়াতেও বিপদগ্রস্ত হয়, পরকালেও।

"সুম্মা লাইয়ামূতু ফীহা ওয়ালা ইয়াহ্ইয়া"—"অতঃপর এ হতভাগ্য মরবেও না, বাঁচবেও না"—তার মানে হলো—মানুষ মরলেও মূলত মরে না। কেননা আত্মা সব সময় জীবিত থাকে। 'বাঁচবেও না'—এর মানে এরূপ বাঁচা সত্যিকার অর্থে বাঁচা নয়।

"কাদ্আফ্লাহা মান্ তাযাক্কা"—"সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে পরিশুদ্ধি অর্জন করেছে।" নবীদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দু'টো : অন্যায় দূর করা ও ন্যায়ের শিক্ষা দেওয়া। "মান্ তাযাক্কা" দিয়ে প্রথম উদ্দেশ্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কেননা পরিশুদ্ধি অর্জনের অর্থ হলো কুচরিত্র দূর করা।

"ওয়া-যাকারাস্মা রাব্বিহী ফাসাল্লা"—"এবং তার আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেছে ও নামায সম্পন্ন করেছে"—এ আয়াতে মঙ্গলের শিক্ষা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের পূর্ণতার বর্ণনা রয়েছে। কেননা সেরা জ্ঞান হলো—আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ এবং সেরা ইবাদত হলো—নামায।

"বাল্ তুসিরুনাল্ হাইয়াতাদ্ দুনিয়া"—"বরং এরা পার্থিব জীবনকে উত্তম বলে মনে করে"—অর্থাৎ লোকেরা নবীর শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এর কারণ হলো—তারা দুনিয়ার ভালবাসায় প্রলুব্ধ।

"ওয়াল্ আখিরাতু খাইরোঁও-ওয়া-আব্কা"—"এবং পরকাল অধিকতর ভাল ও চিরস্থায়ী।" আল্লাহ্ পরকালের শ্রেষ্ঠত্ব দু'ভাবে প্রমাণ করেন। প্রথম হলো—আধ্যাত্মিক উপভোগ পার্থিব উপভোগ থেকে অনেক শ্রেয়। দ্বিতীয় হলো—পরকালীন উপভোগ স্থায়ী ও স্থিতিশীল।

সারকথা হলো—উক্ত আয়াতসমূহে চারটি বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: (১) আল্লাহ্‌র গুণাবলী (২) নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য (৩) হতভাগ্য ও ভাগ্যবান—এই দুই শ্রেণীতে লোকদের বিভক্ত করা ও তাদের পরিণাম ফল বর্ণনা করা (৪) দুনিয়ার উপর পরকালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এ চারটি বস্তু হলো—জ্ঞান ও কর্মের ভিত্তি। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন: "ইন্না হাযা লাফিস্সুহুফিল্ উলা"—"এ কথা-গুলো আগেকার গ্রন্থসমূহেও রয়েছে।"—অর্থাৎ পূর্বে যত নবী বিগত হয়েছেন, সকলেরই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এ চারটি বস্তু।

এমনিভাবে সূরা-এ-'ওয়াল্-আস্‌রে'-এর মধ্যেও এসব বস্তুর বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য আমি এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করছি:

"ইন্নাল্ ইন্সানা লাফী খুস্‌রিন"—"নিঃসন্দেহে মানুষ লোকসানে আপতিত।" আগেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র ১৯টি শক্তি আছে। ১০টি হলো বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। দু'টো হলো—কাম ও ক্রোধ। ৭টি হলো উদ্ভিজ্জ শক্তি। দেহ-নরকে এই ১৯টি চৌকিদার রয়েছে। এসব শক্তি মানুষকে দুনিয়ার দিকে আকর্ষণ করে। কেবল মাত্র বিবেক-বুদ্ধিই মানুষকে এ আকর্ষণ থেকে বিরত রাখতে চায়। কিন্তু এ শক্তি সে সবের তুলনায় দুর্বল। এতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত মানুষ ঘাটতিতে আপতিত। কেবল তাঁরাই এর ব্যতিক্রম, যাঁরা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির ক্ষমতা রাখেন। এ ক্ষমতা চারটি বস্তুর যৌগিক: (১) প্রথম হলো চিন্তা শক্তির পূর্ণতা। এ শক্তির প্রতি ইংগিত করে আল্লাহ্ বলেন:

"ইল্লাল্লাযীনা আমানূ"—"কিন্তু যাঁরা ঈমান গ্রহণ করেছেন।" (২) দ্বিতীয় হলো কর্মশক্তির পূর্ণতা। এ দিকে ইংগিত করে আল্লাহ্ বলেন: "ওয়া-আমিলুস্ সালিহাতি"—"এবং যাঁরা সৎকাজ করেছেন"।

(৩) তৃতীয় হলো—চিন্তাশক্তির পূর্ণতা সাধনের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন। এর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন : "ওয়া-তওয়াসাও বিল্ হাক্কি"—"এবং যাঁরা লোকদের সততার উপদেশ দেন।" (৪) চতুর্থ হলো—কর্মশক্তির পূর্ণতা সাধনের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ "ওয়া-তওয়াসাও বিস্‌সাব্‌রি"—"এবং যাঁরা লোকদের ধৈর্যের উপদেশ দেন"। এখানে সন্দেহ হতে পারে এবং এ ধারণা কারো মনে জাগতে পারে যে, শুধু ধৈর্য দিয়ে কর্মশক্তির পূর্ণতা কিভাবে সাধিত হতে পারে? এর উত্তর হলো—মানুষ যত রকমের অসৎ কাজ করে, তা' মাত্র দু'টি বস্তুর ফলশ্রুতি : কাম ও ক্রোধ। কামুকতা হলো প্রত্যেক প্রকার কুপ্রবৃত্তিজনিত কর্মের মূল কারণ। আর ক্রোধ হলো—রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের উৎসমূল। এজন্যেই আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন ফেরেশতাগণ বললেন, "আপনি (আল্লাহ) কি পৃথিবীতে এমন একটি লোক সৃষ্টি করতে চান, যে ব্যক্তি তথায় ফ্যাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে?" সুতরাং মানুষ যদি ধৈর্য-বলে কাম ও ক্রোধকে দাবিয়ে রাখতে পারে, তবে কর্মশক্তির গুণাবলী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিকশিত হবে।

অনেক আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য এ চারটি গুণই যথেষ্ট, মুজিযার কোন প্রয়োজন নেই। কাফেরগণ যখন রসূলুল্লাহ্‌র নিকট মুজিযার দাবী করে বললোঃ আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যতক্ষণ না আপনি জমিন থেকে ঝরনা প্রবাহিত করেন। তখন আল্লাহ্ উত্তরে বললেনঃ "হে মুহম্মদ! আপনি বলুন, আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি তো কেবল একজন মানুষ ও পয়গাম্বর"—অর্থাৎ পয়গাম্বরীর জন্য এসব ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। শুধু পূর্ণাঙ্গ চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তিই এর জন্য যথেষ্ট।

'শুয়ারা' নামক এই সূরায় আল্লাহ্ যেখানে বলেছেন যে, কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র বাণী, শয়তানের বাণী নয়, সেখানে একথাও বলেছেন যে, আমি কি তোমাদের বাতলে দেবো যে, শয়তান কার কাছে আসে? আল্লাহ্ বলেন : "শয়তান মিথ্যাবাদী ও পাপীদের কাছেই আসে"—অর্থাৎ কুরআনের বাণী যদি শয়তানের দিক থেকে হতো, তবে এ বাণীর প্রচারক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীরাই হতো এবং আল্লাহ্ এসবের শিক্ষা দিতেন না। কারণ শয়তানই মিথ্যা ও পাপাচারের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

রসূলুল্লাহ্ তো দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হওয়ারই শিক্ষা দিতেন। এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌র নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য কেবল একথাই বলা হয়েছে যে, তিনি দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হওয়ার শিক্ষাই দেন। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, নুবুওয়াতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, মুজিযার প্রয়োজন নেই।

কাফেররা বলতো, মুহম্মদ একজন কবি এবং প্রত্যেক কবির কাছেই একজন শয়তান থাকে সে তাকে তার কাব্য রচনায় সাহায্য করে। তদুত্তরে আল্লাহ বলেন, কবিরা অলি-গলিতে মাথা কুটে মরে—অর্থাৎ তারা পার্থিব ভোগ-বিলাসের শিক্ষা দেয় এবং সেদিকেই উৎসাহিত করে। অথচ রসুলুল্লাহ দিচ্ছেন আল্লাহ্‌ভীরুতার শিক্ষা। তাই শয়তান তাঁর দোসর ও সাহায্যকারী হতেই পারে না। এসব আয়াতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, নুবুওয়াতের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই উত্তম পন্থা।

### তৃতীয় অনুশীর্ষ

## পয়গাম্বরের প্রচার পদ্ধতি

নুবুওয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো—লোকদের পার্থিব মোহ থেকে বিরত রাখা, এবং এর পরিণামের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। কিন্তু মানুষ পার্থিব সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না বলেই পয়গাম্বর-দেরকেও বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে পয়গাম্বরের যে কর্তব্য রয়েছে, তা প্রধানত তিনটি নীতিতে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. নবিগণ শিক্ষা দেবেন যে, বিশ্ব অস্থায়ী এবং এর একজন স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান আছেন এবং অনন্ত-কাল থাকবেন। তাঁর সঙ্গে জড় জগতের কোন সাদৃশ্য নেই। তাঁর মধ্যে পূর্ণতার সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটেছে সমস্ত সম্ভাব্য সৃষ্টির উপর তাঁর শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী। তিনি একক ও অতুলনীয় অর্থাৎ তাঁর কোন অঙ্গ নেই, সহযোগী নেই, প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। তাঁর স্ত্রীও নেই, সন্তান-সন্ততিও নেই। এরপর নবিগণ এ শিক্ষা দেন যে, বিশ্বে যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহ্‌র আদেশ ও তাঁর ইচ্ছায়ই ঘটে থাকে। আল্লাহ যুলুম ও অপ্রয়োজনীয় কাজ করেন

না। এসব বস্তু শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবিগণ নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন :

২. নবিগণ ধর্মীয় বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিতর্কের পথ বেছে নেন না। কেননা এতে অভিযোগের পথই প্রশস্ত হয়। তাঁরা যদি অভিযোগ খণ্ডনে রত হন, তবে তা বেড়েই চলবে, আর আসল উদ্দেশ্য পড়ে থাকবে পেছনে। এজন্য নবিগণ সম্বোধন-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এতে উৎসাহ দান এবং ভয় প্রদর্শনের কাজও সম্পন্ন হয়। উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শনের দরুন মানুষের মন বিমোহিত হয় এবং তাতে সমালোচনারও অবকাশ থাকে না। এ ধরনের প্রমাণ স্বভাবতই দৃঢ়ভিত্তিক হয়। তাই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তা গ্রহণ না করে পারেন না।

৩. পয়গাম্বরগণ হঠাৎ এ কথা বলেন না যে, সবদিক থেকে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিরাজি থেকে স্বতন্ত্র। কারণ সাধারণভাবে এরূপ কিছু বলা হলে তা মানুষের জ্ঞান আসতে পারে না। তাই তাঁরা প্রথমে বলেন, জড় বস্তুর সঙ্গে আল্লাহ্‌র কোন তুলনা হয় না। যেমন কুরআনে আছে : "লাইসা কামিস্‌লিহি শাইউন্"—"তাঁর আল্লাহ্‌র মত আর কোন বস্তু নেই।" অতঃপর তাঁর শিক্ষা দেন যে, আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান। সমস্ত ভাল কাজের উৎস হলেন তিনি। তিনি আর্‌শের উপর অবস্থিত। কিন্তু এসব জটিল ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে তাঁরা লোকদের বিরত রাখেন। তবে যদি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি হয়, তবে এরূপ চিন্তা-ভাবনায় দোষের কিছু নেই। অতঃপর তাঁরা শিক্ষা দেন যে, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা যা ইচ্ছা করে, তাই করতে পারে। যা করার ইচ্ছা নেই, তা ছেড়ে দিতে পারে। অন্যদিকে নবিগণ এ শিক্ষাও দেন যে, আল্লাহ্ মানুষকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা দান করলেও পৃথিবীতে যা কিছু হয়, সে সব আল্লাহ্‌র হুকুমেই হয়। একটি ধূলিকণাও তাঁর আদেশ ছাড়া নড়তে পারে না। এ দু'টো ধারণা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও নবিগণ সেগুলোকে যেমনি অবস্থায় আছে, তেমনি অবস্থায় রেখে দেন। তাঁরা লোকদেরকে এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) তালীমের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এ পদ্ধতিই সর্বোত্তম। তিনি সর্বপ্রথম জোরালোভাবে

আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করেন এবং এ আয়াতগুলো পেশ করেনঃ "ওয়াল্লাহুল্ গনিইউ-ওয়া-আন্‌তুম্ ফুকারাউ" —"আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু তোমরাই মুখাপেক্ষী।" এ আয়াতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র কোন বস্তুরই প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি মুখাপেক্ষী নন, আর মুখাপেক্ষী না হলে কোন বস্তুরই প্রয়োজন হয় না। তাঁর যখন কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই, তাই তিনি যৌগিকও হবেন না; আবার স্থান জুড়েও থাকবেন না। যৌগিক হলে বা স্থান জুড়ে থাকলে তাঁর জন্য অঙ্গ ও স্থানের প্রয়োজন হতো। "লাইসা কামিস্‌লিহি-শাইউন্" —"তাঁর মত আর কোন বস্তু নেই"—এ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ শরীরী নন। কারণ শরীর থাকলে কোন পদার্থের সাথে তাঁর সাদৃশ্য থাকতো। এর সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে বারবার তাগিদ দিয়ে বর্ণনা করেন। এরূপ করার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। কারণ এরূপ না করা হলে লোকেরা মনে করতো যে, আল্লাহ্‌র যখন শরীর নেই, দিক্‌ও নেই, তখন তিনি মূলতই নেই। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন। কুরআন মজীদে আছেঃ "তাঁর (আল্লাহ্‌র) কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি, যে সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" "স্ত্রীলোক কিরূপ সন্তান গর্ভধারণ করে, তা আল্লাহ্‌ই জানেন"—কিন্তু আল্লাহ্‌র এ অবগতি তাঁর সত্তাভুক্ত, নাকি সত্তাবহির্ভূত—এ নিয়ে রসূলুল্লাহ্ আলোচনা করেন নি। অতঃপর তিনি বলেন, মানুষ কর্মকর্তা, শিল্পী, স্রষ্টা—এ সবই হতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন, ভাল-মন্দ যা কিছু হয়, সব আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই হয়। এ দুই ধরনের কথার মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ ও গরমিল দেখা যায়, সে দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নি। বরং তিনি এগুলোর প্রতি মোটামুটি বিশ্বাস স্থাপন করতে আদেশ দেন।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্‌র শিক্ষার মূল কথা হলো—আল্লাহ্‌কে দোষ-মুক্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মেনে নিতে হবে। এতে পারস্পরিক বিরোধ বা গরমিল দেখা দেয় কিনা—এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। এতে রহস্য হলো এই যে, মানুষকে যদি কুকাজের স্রষ্টা বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে আল্লাহ্ জুলুম ও অন্যায়ের অভিযোগ থেকে রেহাই পান। কিন্তু এতে তাঁর ক্ষমতা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আর যদি

বলা হয় যে, মন্দ কাজের স্রষ্টাও আল্লাহ্, তবে অবশ্য আল্লাহর শক্তির ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাঁর প্রতি যুলুম ও অবিচারের অভিযোগ এসে বর্তায়। এ জন্য রসূলুল্লাহ এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ্কে যাবতীয় কর্মের স্রষ্টাও মানতে হবে, আবার জোর-যুলুম থেকে মুক্ত বলেও বিশ্বাস করতে হবে।

নবীদের শিক্ষার দ্বিতীয় নীতি হলো—মানুষ তিনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে ঃ অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধন-সম্পদের মাধ্যমে। প্রথম প্রকার ইবাদত হলো আল্লাহ্র পরিচিতি লাভ ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। দ্বিতীয় হলো—নামায, রোযা ইত্যাদি। তৃতীয় হলো যাকাত ইত্যাদি।

নবীদের শিক্ষার তৃতীয় নীতি হলো—কেয়ামত ও তদ্সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এ তিনটি বস্তু হলো নবীদের শিক্ষার মৌলিক নীতি।

প্রধান প্রধান ধর্মীয় কর্তব্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ সৎ কাজ সম্পন্ন করা এবং অসৎ কাজের পথ রুদ্ধ করা। দ্বিতীয় প্রকার কর্তব্য প্রথমেই পালনীয়। কেননা বোর্ডের উপর যদি ভুল লেখা থাকে, তবে তা আগেই মুছে ফেলতে হয়। এ জন্যেই সূরা-এ-বাকারার মধ্যে যে সাত প্রকার ধর্মীয় কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, তন্মধ্যে তাক্ওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্ভীরুতার কথাই সর্বাগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ "হুদাল্ লিল্মুত্তাকীন"--"কুরআন আল্লাহ্ভীরুদের জন্য পথ-প্রদর্শক।" কারণ কুকাজ থেকে বেঁচে থাকাই হলো আল্লাহ্ভীরুতা। বাকী ধর্মীয় কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে আত্মার গুরুত্ব অনুধাবন করা। এটা মানতেই হবে যে, আত্মার মর্যাদা, দেহ ও ধন-সম্পদের মর্যাদার চাইতে অনেক বেশী। এজন্য আল্লাহ্ভীরুতার পর সর্বপ্রথম বলা হয়েছে ঃ "ইউমিনূনা-বিল্-গাইবি"—"তাঁরা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান গ্রহণ করে।" কেননা ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা আধ্যাত্মিক ব্যাপার।

অতঃপর আল্লাহ নামাযের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ "ওয়া-ইউ-কীমূনাস্সালাতা"—"এবং তাঁরা সুচারুরূপে নামায আদায় করেন।" কেননা নামায শারীরিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আল্লাহ যাকাতের বিষয় বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ "ওয়া-মিম্মা রাযাক্নাহুম ইউন্ফিকূন"—"এবং আমি তাঁদেরকে যে

জীবিকা দিয়েছি, সেখান থেকে তাঁরা ব্যয় করেন।" কেননা যাকাত হলো ধন সম্পর্কিত ব্যাপার।

এ চারটি বিষয় ছিল আল্লাহ্‌তত্ত্ব সম্পর্কিত। এ গুলো বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ নুবুওয়াত সম্পর্কিত বিষয়াদি বর্ণনা করেন এবং বলেনঃ

"ওল্লাযীনা-ইউমিনূনা বিমা উন্‌যিলা ইলাইকা"—"এবং যাঁরা আপনার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন।" এখানে রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

"ওমা উন্‌যিলা মিন্‌কাবলিকা"—"এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে (অন্যান্য নবীদের প্রতি)"—অর্থাৎ আগেকার নবীদের প্রতি ঈমান গ্রহণ করাও শর্ত। আল্লাহ্‌তত্ত্ব ও নুবুওয়াতের বর্ণনার পর আল্লাহ্‌তাআলা অতীতের কথা স্মরণ করিয়েছেন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য যা করণীয় রয়েছে, সেগুলোরও বিবরণ পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

"উলাইকা আলা হুদাম্ মির্‌রাব্বিহিম্ ওয়া-উলাইকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন"—"এঁরাই তাদের প্রভুর নির্ধারিত সত্য পথে রয়েছেন এবং এঁরাই সফলকাম হবেন।" এখানে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, যতদিন মানুষ পৃথিবীতে আছে, ততদিনই সে মুসাফির। মুসাফিরের জন্য প্রয়োজন পথের চিহ্ন ও অবস্থা জেনে নেওয়া। এজন্যই যাঁরা উক্ত কর্তব্য পালন করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ এঁরা পথের সঙ্গে পরিচিত এবং এঁরাই মৃত্যুর পর সফলকাম হবেন অর্থাৎ উদ্দিষ্ট মনজিলে পৌঁছতে পারেন। এ উক্তির পর ইমাম রাযী বলেন, ইসলামের প্রতি আহবান করার এটাই সর্বোত্তম পন্থা। আমি যদি ইসলামী শরীঅতের রহস্যের আরো বর্ণনা দিই, তবে তা একটি বড় গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। এজন্য সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি বলে এখানেই ক্ষান্ত করছি।

## চতুর্থ অনুশীর্ষ

### মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

আগেই বলা হয়েছে যে, পয়গাম্বরের কাজ হলো মানবাত্মার চিকিৎসা করা। তাই এ গুণ যে নবীর মধ্যে যত বেশী থাকবে, তিনিই

নুবুওয়াতেও ততবেশী কামিল ও পূর্ণাঙ্গ হবেন। এখন পূর্বসূরী নবীদের কথা ভেবে দেখুন। হযরত মূসা (আঃ)-এর শিক্ষার প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল বনীইসরাইলের মধ্যে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষা বলতে গেলে অকার্যকরই ছিল। যারা আজ খ্রীস্টধর্মের দাবী করছে, তারা ত্রিত্ববাদের পক্ষপাতী। এটা স্পষ্ট কথা যে, হযরত ঈসা (আঃ) ত্রিত্ববাদের শিক্ষা দেন নি। তাই যারা নিজেদের খ্রীস্টান বলে পরিচয় দিচ্ছে, বস্তুত তারাও খ্রীস্টান নয়। এখন রসূলুল্লাহ্‌র নুবুওয়াত সম্পর্কে ভেবে দেখুন।

রসূলুল্লাহ্‌র পূর্বে সারা বিশ্ব বিপদগামী ছিল। মূর্তিপূজকেরা পাথরের পূজা করতো। ইহুদীরা আল্লাহ্‌কে শরীরী বলে মনে করতো। অগ্নিপূজকেরা দুই আল্লাহ্ মানতো এবং মাতা ও কন্যাকে বিয়ে করতো। খ্রীস্টানেরা ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসী ছিল। সায়েবীন নক্ষত্র পূজা করতো। এভাবে সারা দুনিয়া পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত ছিল। রসূলুল্লাহ্‌র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাতিল ধর্ম ধূলোর মত উড়ে গেল এবং তওহীদ-সূর্যের আলো সারা পৃথিবীতে বিচ্ছুরিত হলো। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ্‌র প্রচার ও হেদায়তের প্রভাব পূর্ববর্তী নবীদের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর ছিল। এজন্য নুবুওয়াতের দিক থেকে তিনি হলেন নবীদের সেরা।

## পঞ্চম অনুশীর্ষ

### নিম্ন পদ্ধতিতে নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা

### মুজিযা দিয়ে প্রমাণ করার চাইতে অধিকতর শ্রেয়

মুজিযা দিয়ে নুবুওয়াত প্রমাণ করার মানে হলো—কর্ম দিয়ে কর্মকর্তাকে প্রমাণ করা। পূর্বক্ষণে নুবুওয়াতের যে সব প্রমাণ দেওয়া হলো, তাতে তার হকিকত সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে থাকবে। সে প্রমাণগুলোর সার হলো—রসূলুল্লাহ্ হলেন আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসক। আর আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসককেই বলা হয় পয়গাম্বর।

এ বর্ণনায় এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, রসূলুল্লাহ্‌র জন্য তর্কশাস্ত্র, দর্শন, জ্যামিতি, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা এসব বস্তু আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এ বিবরণের ফলে নুবুওয়াতের প্রতি

আনীত অভিযোগগুলো খণ্ডিত হওয়ার কথা। নুবুওয়াতের প্রতি এ অভিযোগ করা হয় যে, প্রত্যেক নবী পূর্ববর্তী নবীদের শরীঅতকে নাকচ করে দেন। এটা হলো একটি অকাজ। এর উত্তর হলো—শরীঅতের দু'টো দিক আছে ঃ চিন্তামূলক ও ব্যবহারিক। চিন্তামূলক দিকটার কোন রদ-বদল নেই। তা হলো—কেবল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করা ও মানবতার হিত কামনা করা। এতে রদ-বদল মোটেও নেই। কুরআন বলছে ঃ

"আসুন, আমরা এবং আপনারা এমন একটি মতে ঐক্যবদ্ধ হই, যা আমাদের উভয়ের কাছে সমর্থনযোগ্য। তা হলো—আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না।"

শরীঅতের দ্বিতীয় দিক হলো ব্যবহারিক বিধি-বিধান অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ ও আইন-কানুন। এটা অবশ্য রদ-বদলযোগ্য। এর তাৎপর্য হলো এই যে, মানুষ যখন কোন কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করতে থাকে, তখন তাতে আর কোন প্রেরণা থাকে না। তখন সে অভ্যাস-বশতই সে কাজ করতে থাকে—প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে নয়। বিধি-বিধানের রদ-বদলের দরুন নতুনত্বের সৃষ্টি হয়। তখন লোকেরা উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে সে কাজ করতে আরম্ভ করে।

শরীঅতের প্রতি আরো একটি অভিযোগ হলো এই যে, এতে যুগে যুগে যে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়, তা করতে গিয়ে হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত ঘটানো মোটেও সমীচীন নয়। এর উত্তর হলো শরীঅতের অঙ্গ বিশেষ বজায় রাখার জন্য যদি এরূপ না করা হয়, তবে লোকেরা মৌলিক ধর্মকেও অমান্য করবে। কিন্তু আমার মতে, ইসলামী শরীঅতে আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ ছাড়া অন্য কোন অবস্থায়ই হত্যা ও রক্তপাতের অনুমতি নেই। (শিবলী নুমানী)

সর্বশেষ অভিযোগ হলো এই যে, কুরআন মজীদে তুলনাবোধক বহু শব্দ রয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ শরীরী ও স্থানী। এর উত্তর হলো—মানবিক ধ্যান-ধারণার উর্ধ্বে উঠে আল্লাহ্‌র ধারণা দেওয়া হলে সাধারণ লোকের জ্ঞানে তা আসতে পারে না। এজন্যই মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হলো।

# ইমাম গাযালীর 'মাআরিজুল্ কুদ্স্' থেকে কিছু কথা

## 'নুবুওয়াত ও রিসালত' শীর্ষক অধ্যায়ের সারকথা

এ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে :

১. নুবুওয়াতের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বর্ণনা করা কি সম্ভব ?
২. নুবুওয়াত কি অর্জন করার বস্তু, না কি তা আল্লাহ্ প্রদত্ত ?
৩. নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ
৪. নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য তথা মুজিযার বর্ণনা
৫. নুবুওয়াতের প্রচার

## প্রথম আলোচ্য বিষয়

নুবুওয়াতের অর্থ বোঝার জন্য যুক্তিবিদ্যাসম্মত পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা শত শত বরং হাজার হাজার বস্তুর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা ও স্বরূপ জানি না। তথাপি সেগুলোর মর্ম আমরা বুঝে নিচ্ছি। এতে বোঝা গেল যে, কোন বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধি, আত্মা ও অজড় পদার্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণা রয়েছে নিশ্চয়ই। অথচ সেগুলোর গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। মনে করুন, কোন ব্যক্তি যদি কোন পয়গাম্বরকে নুবুওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, তবে তিনি কি তার পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বাত্লে দিতেন ? আর যদি বাত্লে না দিতেন, তবে সে ব্যক্তির পক্ষে নুবুওয়াতের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা না পাওয়া পর্যন্ত ঈমান থেকে বিরত থাকা কি সমীচীন হতো ?

মনুষ্যত্ব যেমন পশুত্বের ঊর্ধ্বে, তেমনি নুবুওয়াত হলো সাধারণ মনুষ্যত্বের ঊর্ধ্বে। মানুষ প্রাণীজগতকে বশীভূত করে। কিন্তু প্রাণী-জগত এ ওজর দিতে পারে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে মানুষের গূঢ় তত্ত্ব বাতলানো না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তার আনুগত্য স্বীকার করবো না। সাধারণ মানুষ এবং পয়গাম্বরের মধ্যেও এ ধরনের

সম্পর্ক রয়েছে। ফিরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে বারবার আল্লাহ্‌র স্বরূপ জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, বরং তিনি আল্লাহ্‌র শক্তির নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন। কেননা আল্লাহ্‌র স্বরূপ বর্ণনা করাই ছিল অসম্ভব। ঈমান গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌র হকিকত জানার প্রয়োজনও ছিল না।

## দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় ঃ

নুবুওয়াত অর্জন করার বস্তু নয়, বরং আল্লাহ্ যে ব্যক্তির মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি করেন, তিনিই নবী হতে পারেন। কুরআন শরীফে আছে ঃ "পয়গাম্বরীর জন্য কা'কে বাছাই করা হবে, তা আল্লাহ্ই জানেন।" তবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধ্যানের অনুশীলন—এসব নুবুওয়াতের জন্য আবশ্যক। এগুলো পাওয়া গেলে নবী ওহী প্রাপ্তির উপযুক্ত হন। এর উদাহরণ হলো —মানুষের জন্য মনুষ্যত্ব লাভ করা অর্জনীয় বস্তু নয়। কিন্তু তার হাতে যে সব কর্ম সম্পন্ন হয়, তাতে তার চেষ্টা ও সাধনার অংশ থাকবে নিশ্চয়ই। এমনিভাবে নুবুওয়াত অর্জনীয় বস্তু নয়। কিন্তু নবী যদি ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনা করেন, তবেই তো তাঁর কাছে নুবুওয়াতের নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে। এজন্য নবীজী এত বেশী ইবাদত করতেন, যার ফলে তাঁর পা ফুলে যেতো।

নবী স্বভাবতই সুমতি-গতিসম্পন্ন ও সুশ্রী হয়ে থাকেন। তাঁর লালন-পালন যথাযথভাবেই হয়। তাঁর চরিত্র পরিমার্জিত হয়। তাঁর চেহারা থেকে যেন নূর বিচ্ছুরিত হয়। ধৈর্য, আত্মসম্মানবোধ, বিনয়, সত্যবাদিতা, সততা—এসব গুণ তার স্বভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি প্রত্যেক প্রকার কুকাজ ও অশোভন আচার-আচরণের দোষ থেকে মুক্ত। ক্ষমা, ইহ্সান, প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ, উৎপীড়িতের সাহায্য-দান—এসব গুণ তাঁর মধ্যে স্বভাবতই দেখা যায়। তিনি প্রকৃতিগত-ভাবেই ভাল কাজ পছন্দ করেন এবং মন্দ কাজকে ঘৃণা করেন। নবী কখনো অহংকারী, যালিম, নিষ্ঠুর ও দুশ্চরিত্র হন না। তিনি নিশ্চুপ থাকলেও লোকের উপর তাঁর প্রভাব না পড়ে পারে না। তাঁর কথা বলার সময় কেউ হস্তক্ষেপ করে না। তাঁর চাল-চলনে গাম্ভীর্য পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত লোক, সন্তুষ্ট চিত্তে হোক বা অসন্তুষ্ট চিত্তেই হোক, তাঁর কাছে মাথা নত করে।

## তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ঃ

নুবুওয়াতের প্রমাণ ঃ

নুবুওয়াত প্রমাণের দুটি পদ্ধতি আছে ঃ মোটামুটি প্রমাণ ও বিস্তারিত প্রমাণ। আমি উভয় প্রকার প্রমাণ আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করছি। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষের আত্মাই তাকে প্রাণীজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। এটাই মানুষকে পশুর উপর প্রাধান্য দেয়। এর বলেই মানুষ প্রাণীজগতকে বশীভূত করে; তাদের উপর হস্তক্ষেপ করে। এমনিভাবে নবীদের মধ্যেও এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধিমত্তা থাকে। এর বদৌলতে তাঁরা মানব সমাজে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন। সমস্ত মানুষ তাঁদের আদেশ ও পরিচালনাধীন থাকে। মানুষের কাজ-কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান যেমন প্রাণীদের জন্য মুজিযাস্বরূপ, তেমনি নবীদের কাজ-কর্মও সাধারণ মানুষের জন্য মুজিযাস্বরূপ অর্থাৎ সাধারণ লোক থেকে এরূপ মুজিযা ঘটতে পারে না।

নবীদের বুদ্ধিমত্তা যেমন অন্যান্যদের বুদ্ধিমত্তা থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি তাঁদের আত্মা, স্বভাব, আর মতিগতিও সমস্ত লোক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। কারো সঙ্গে যদি তাঁদের সামঞ্জস্য থাকে, তবে রয়েছে ফেরেশতাদের সঙ্গে।

প্রত্যেকটি প্রাণী যেমন মানুষ হতে পারে না, তেমনি সকল মানুষও নবী হতে পারে না। আল্লাহ্ জানেন, কার মধ্যে নুবুওয়াতের যোগ্যতা রয়েছে এবং কার মধ্যে নেই। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ নুবুওয়াতের জন্য বাছাই করেন, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর মতিগতি—সবই স্বতন্ত্র ধরনের হয় অর্থাৎ অন্যান্য লোকের বুদ্ধি ও মেজাজের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই হয় না। আকারের দিক থেকে অন্যান্য মানুষের মত হলেও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর দিক থেকে তিনি সকল মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। তিনি মানুষ বটে; কিন্তু তাঁর মধ্যে বিদ্যমান মানবিক গুণ ওহী গ্রহণের যোগ্যতা। কুরআন মজীদে আছে ঃ "হে মুহম্মদ ! আপনি বলুন, আমি আপনাদের মতই একজন মানুষ, তবে আমার কাছে ওহী অবতীর্ণ হয়।" এ আয়াতে উক্ত কথাগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

বিস্তারিত প্রমাণের তিনটি পদ্ধতি আছে ঃ

**প্রথম প্রদ্ধতি ঃ**

মানুষের মধ্যে তিনটি শক্তি আছে ঃ চিন্তাশক্তি, প্রকাশ শক্তি ও কর্ম শক্তি। এসব শক্তি বলে যে কাজ সম্পন্ন হয়, তা ভালও হয়, আবার খারাপও হয়। এই পরস্পর বিরোধী কাজের নামও ভিন্ন ভিন্ন। চিন্তা-ধারার ভাল-মন্দ হওয়াকে বলা হয় ন্যায় বা অন্যায়। প্রকাশ-প্রাপ্ত কথাবার্তাকে বলা হয় সত্য বা মিথ্যা এবং কর্মকে ভাল-মন্দ বলে অভিহিত করা হয়। এটা স্পষ্ট কথা যে, সকল কাজ করণীয় নয়, আবার সকল কাজ পরিত্যাজ্যও নয়। বরং কতক কাজ করণীয়, আর কতক পরিত্যাজ্য।

এখন প্রশ্ন হলো—কোন্ কাজ করণীয়, আর কোন্টা পরিত্যাজ্য—এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, না-কি কোন ব্যক্তিই এ বিষয়ে সক্ষম নয়? না-কি কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব আর কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয়? প্রথম বিকল্প দু'টো স্পষ্টতই বাতিল। এখন বাকি রইলো তৃতীয় বিকল্পটি অর্থাৎ কতক লোক এটা যাচাই করতে পারে যে, কোন্ কাজটি করণীয় আর কোন্টি পরিত্যাজ্য।

**দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ**

এটা স্পষ্ট কথা যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পারস্পরিক সহানুভূতি না হলে কোন মানুষই বাঁচতে পারে না। মানব জাতির ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত কিছুই টিকে থাকতে পারে না। সমাজ ব্যবস্থা ও পারস্পরিক সহানুভূতির জন্য যে বিধি-বিধান রয়েছে, সেটাকেই বলা হয় শরীঅত। আরো পরিষ্কার কথায়, মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য, তার জান-মালের হেফাযতের জন্য দু'টো ব্যবস্থার প্রয়োজন ঃ পারস্পরিক সাহায্য ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমেই তারা আহার্য, পোশাক, বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটায়। প্রতিরোধ ব্যবস্থার দরুন মানুষের জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায়। তাই পারস্পরিক সাহায্য ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য একটি সংবিধান থাকা আবশ্যক।

এটা পরিষ্কার কথা যে, যে কোন ব্যক্তি এ সংবিধান রচনা করতে পারে না। গোটা মানব জাতির অবস্থানুরূপ ও প্রত্যেকটি মানুষের প্রয়োজন মোতাবেক একটি সংবিধান কেবলমাত্র সে ব্যক্তিই রচনা করতে পারেন, যিনি ঐশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, যিনি আধ্যাত্মিক জগত থেকে সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন এবং যাঁর হাতে রয়েছে বিশ্ব-শৃঙ্খলার ডোর। ঐশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধর্মের রহস্যাবলী জানেন। তিনি প্রত্যেক কাজে ন্যায়নীতির অনুসরণ করেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জ্ঞানমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে সম্বোধন করেন; মানুষের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। এ ব্যক্তিই হলেন পয়গাম্বর ও রসূল।

## তৃতীয় পদ্ধতি ঃ

এ পদ্ধতি বুঝতে হলে নিম্নলিখিত সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে ঃ

১. যে বস্তু সম্ভাব্য, তা অস্তিত্ব লাভ করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। তাই তার অস্তিত্ব লাভের জন্য কোন একটি প্রয়োজন অবশ্যই থাকতে হবে। এই প্রয়োজনই তার অস্তিত্বের কারণ।

২. প্রত্যেক প্রকার গতির জন্য একজন গতিস্রষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। সেই স্রষ্টা নিত্য নতুনভাবে গতি সৃষ্টি করতেই থাকে। গতি দুই প্রকার ঃ স্বাভাবিক ও ঐচ্ছিক। ঐচ্ছিক গতির জন্য গতি-স্রষ্টার মধ্যে অবশ্যই ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকতে হবে। ঐচ্ছিক গতি দুই প্রকার ঃ ভাল ও মন্দ। প্রথম প্রকারের জন্য গতিস্রষ্টাকে অবশ্যই বুদ্ধিমান ও শৃঙ্খলা-শক্তির অধিকারী হতে হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে আকাশে তাঁর আদেশ পাঠিয়েছেন।"

৩. গতি সৃষ্টির জন্য যেমন মানুষের মধ্যে ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োজন, তেমনি সে গতিকে ঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য এমন একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন, যিনি ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন।

৪. আল্লাহ্র আদেশ দুই প্রকার ঃ শৃঙ্খলামূলক ও কার্যমূলক। প্রথম আদেশটি বিশ্ব-জোড়া। সে আদেশের ফলেই সমগ্র বিশ্বে শৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যায়। কুরআন মজীদে আছে ঃ

"সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র—সবই তাঁর হুকুমের তাবেদার। মনে রাখুন, সৃষ্টি ও আদেশ আল্লাহ্র জন্যই।"

উক্ত সূত্রগুলো থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের সমস্ত গতি সম্ভাব্য। তাই সেগুলোর অস্তিত্বের জন্য কোন একটির প্রয়োজন থাকতেই হবে। যে গতি ঐচ্ছিক, তার জন্য বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োজন। এই বুদ্ধির ফলে ভাল-মন্দ উভয়ই সাধিত হতে পারে। এজন্য একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। এই পথপ্রদর্শককে বলা হয় পয়গাম্বর। বিশ্বে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আল্লাহ্র যে শৃঙ্খলামূলক আদেশ রয়েছে, তা ফেরেশতাযোগেই প্রচারিত হয়। তেমনি মানুষের কাছে আল্লাহ্র কার্যমূলক (কাজে নিয়োজিত করার) আদেশ পৌঁছানোর জন্যেও একটি মাধ্যমের প্রয়োজন। সেই মাধ্যম হলেন পয়গাম্বর। কতক লোকের ধারণা হলো এই যে, আদেশ, নিষেধ, উৎসাহদান, ভয় প্রদর্শন, সতর্কবাণী উচ্চারণ, তিরস্কার—এসব কাজ নবিগণ নিজের তরফ থেকেই করে থাকেন; এসবের সঙ্গে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নেই; আল্লাহ্র সঙ্গে এসব কাজের যে সম্পর্ক সাধারণত জুড়ে দেওয়া হয়, তা কেবল মৌল সৃষ্টির দিকটি বিবেচনা করেই দেওয়া হয়। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই এরা নবিগণকে মিথ্যাবাদী ও আত্মসাৎকারীতে (আল্লাহ্ মাফ করুন!) পরিণত করেছে। এটা সবাই সমর্থন করে যে, আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বের বাদশাহ্ এবং বাদশাই সাধারণত আদেশ, নিষেধ, সতর্কবাণী, তিরস্কার, উৎসাহদান, ভয় প্রদর্শন—এ সবই করে থাকেন। তা হলে আল্লাহ্র পক্ষে এসব করানো অসম্ভব কোথায়?

## নুবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য

নুবুওয়াতের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে : (১) কল্পনা শক্তিভিত্তিক (২) চিন্তাশক্তিভিত্তিক (৩) কর্মশক্তিভিত্তিক। প্রথম বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :

কল্পনাশক্তিতে বস্তুসমূহের আকার অঙ্কিত হওয়ার যে যোগ্যতা রয়েছে, তা বিভিন্ন পর্যায়ের। কতক মানুষের মধ্যে এ যোগ্যতা খুবই দৃঢ় হয়; কতকের মধ্যে দুর্বল, আবার কতকের মধ্যে মোটেই থাকে না। কল্পনাশক্তি দৃঢ় ও গভীর হলে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বস্তুর ঊর্ধ্বে চলে যায় এবং তাতে আকারসমূহ প্রতিবিম্বিত হতে আরম্ভ করে। কল্পনাশক্তির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা একই অবস্থায় থাকে না, বরং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়

উপনীত হয়। পরবর্তী অবস্থাটি পূর্ববর্তী অবস্থার অনুরূপও হতে পারে, আবার স্বতন্ত্র ধরনেরও হতে পারে। যেমন একজন মানুষ কোন একটি বস্তুকে বাহ্য চোখে দেখছে। এ দেখার মধ্য দিয়ে তার খেয়াল সামান্য একটুখানি সূত্র ধরে অন্য একটি বস্তুর দিকে ছুটে চলে। অতঃপর সে বস্তু ছেড়ে তার ধারণা অন্য একটি বস্তুর দিকে ধাবিত হয়। এমন কি সে প্রথম বস্তুর কথাটাই ভুলে যায়। এমতাবস্থায় সে ভাবতে শুরু করে যে, তার মনে এমন ধারণার উদয় কেনই বা হলো? এই সূত্র ধরে সে আবার পেছনে ফেলে আসা স্তরগুলো পুনঃঅতিক্রম করে প্রথম বস্তুতে ফিরে যায়।

এ শক্তি কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে এত প্রবল হয় যে, যেই আকৃতি তার ধারণায় একবার প্রতিবিম্বিত হয়, তা পরেও অক্ষুণ্ণ থাকে। তার কল্পনাশক্তি এ ছবিটিকে দূরে সরিয়ে অন্য বস্তুর ছবি গ্রহণ করতে পারে না। এরূপ শক্তিযোগে মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

কল্পনাশক্তি সাধারণত সে সময়েই কাজ করে, যখন বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলো অকেজো হয়ে পড়ে। এজন্যই নিদ্রার সময় এ শক্তি বেশী প্রবল হয়ে উঠে। কারণ সে সময় বাহ্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোন কোন লোকের মধ্যে এ শক্তি এত বেশী দৃঢ় হয় যে, বাহ্য ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও তা নিজ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে থাকে। তাই জাগ্রত অবস্থায়ও এ শক্তির অধিকারী ব্যক্তি এমন সব বস্তুও দেখতে পায়, যা অন্যান্য লোকেরা স্বপ্নলোকে অবলোকন করে থাকে।

কল্পনাশক্তি বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ ক'রে সেগুলোকে নিজ আয়ত্তে এনে রদ-বদল সহকারে সাধারণ জ্ঞান বা অনুভূতির কাছে সোপর্দ করে। এমতাবস্থায় মানুষ আশ্চর্য ধরনের ঐশ আকৃতি ও ঐশ আওয়াজ দেখতে পায়, শুনতেও পায়। এসব আকৃতি ও আওয়াজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকৃতি ও আওয়াজের মতই দৃষ্ট ও শ্রুত হয়। এটা হলো নুবুওয়াতের নিম্ন পর্যায়। এর চাইতে উন্নত পর্যায় হলো— কল্পনাশক্তি সেগুলোতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। বরং সেই আকৃতিগুলো হুবহু সাধারণ জ্ঞান বা অনুভূতিতে রূপায়িত হয়।

এর চাইতেও উন্নত স্তর হলো—কল্পনাশক্তির সঙ্গে চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তির সমন্বয় সাধিত হওয়া। নুবুওয়াতের এ পর্যায়ে উক্ত তিনটি শক্তির সমাবেশ ঘটে। কুরআন মজীদে বর্ণিত কাহিনীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখতে পাবেন, রসূলুল্লাহ্ এক-একটি খণ্ড ঘটনাকে কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন! মনে হয় যেন তিনি সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং সেগুলোকে তিনি সম্পূর্ণ সত্য বলেই উপলব্ধি করেছেন।

এটা সকলেই স্বীকার করে যে, কল্পনাশক্তিতে যে সব রূপ অঙ্কিত হয়, সে সবই সাধারণজ্ঞান বা অনুভূতির স্তরে নেমে এসে চোখের সামনে ধরা দেয়। পাগলদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তারা যা কিছু কল্পনা করে, সেটাই তাদের নজরে ভেসে উঠে। আসল কথা হলো কল্পনাশক্তিটি চিন্তাশক্তি ও সাধারণ অনুভূতি—এ দু'টোর মাঝখানে অবস্থিত। সাধারণজ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূত রূপগুলোকে কল্পনাশক্তির সামনে উপস্থিত ক'রে সেগুলোকে পুনরায় নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। চিন্তাশক্তির কাজ হলো কল্পনাশক্তিকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে বিরত রাখা। সাধারণ অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি—এ দুটোর টানা-হেঁচড়া ও পারস্পরিক বিরোধের ফলে কল্পনাশক্তি তার কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে না। কিন্তু যখনই এ দু' শক্তির মধ্যে একটার জোর কমে যায়, তখনি কল্পনাশক্তি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ অনুভূতির চাপ যখন কল্পনাশক্তির উপর পড়ে না, তখন তা ( কল্পনাশক্তি ) চিন্তাশক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং নিজেকে কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত করে। আরো পরিষ্কার কথায়, কল্পনাশক্তি তখন তার সঞ্চিত রূপগুলোকে হুবহু সাধারণ অনুভূতির কাছে সোপর্দ করে। নিদ্রালোকে এই অবস্থাই ঘটে। আরো বিস্তারিত বিবরণে বলা যায় যে, যখন কল্পনাশক্তি চিন্তাশক্তির প্রাধান্য থেকে রেহাই পায় এবং সাধারণ অনুভূতির উপর তার আধিপত্য অর্জিত হয়, তখন তা' কাল্পনিক রূপগুলোকে সাধারণ অনুভূতির কাছে এমনিভাবে পাঠিয়ে দেয়, যাতে সেগুলোর দৃশ্য নজরে ভেসে উঠে। উন্মাদ ও ভীতির সময় এমনি অবস্থাই ঘটে থাকে। এজন্যই পাগলেরা উন্মত্ততার ভয়াল রূপসমূহ দেখতে পায়।

উক্ত বিবরণ থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, অদৃশ্য বস্তুর (গায়েবের) খবর দেওয়া কারো পক্ষে কেবল সে সময়েই সম্ভব, যখন তার ইন্দ্রিয় শক্তি অকেজো হয়ে পড়ে এবং তার উপর তন্ময়তা বিরাজ করে।

কোন কোন সময় কল্পনাশক্তি অত্যধিক কাজ করার দরুন দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সম্পূর্ণ বাদ দেয় এবং বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা তথা বিবেকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এমতাবস্থায় তা অজড় রূপসমূহ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে। গণকেরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে, তা এমনি অবস্থায়ই করে থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠে যে, পাগল, গণক ও ভূতাবিষ্ট লোকেরা যদি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, তবে নুবুওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব রইলো কোথায়?

এর উত্তর হলো—কল্পনার বিভিন্ন পর্যায় আছে এবং সেগুলো পরস্পর বিরোধীও হয়। কোন কোন দার্শনিকের মতে, এর সর্বোচ্চ পর্যায় হলো—চন্দ্রলোকের নিয়ন্তার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটা এবং তাতে সেখানকার জ্ঞান-রূপ আকারগুলো প্রতিফলিত হওয়া।

কল্পনার সর্বনিম্ন অস্তিত্ব জীবজন্তুর মধ্যে দৃষ্ট হয়। কোন কোন জন্তুর মধ্যে এ শক্তি মোটেও দেখা যায় না। বিভিন্ন লোকের কল্পনার মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, তার কারণ হলো—কোন কোন কল্পনা সত্য ও সঠিক হয়, কারণ সেগুলোর উৎস হলো পবিত্র আত্মা। আবার কোন কোন কল্পনা নিছক মিথ্যা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। কারণ সেগুলোর উৎস হলো—কলুষিত আত্মা। আবার কোন কোন কল্পনার অবস্থান এ দুটোর মাঝামাঝি। এখানে মনে রাখা উচিত, চিন্তা, কল্পনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে রকমারি রয়েছে:

১. নিছক চিন্তা, যাতে কল্পনার কোন আমেজ নেই।
২. নিছক কল্পনা, যাতে চিন্তার লেশমাত্র নেই।
৩. এমন চিন্তা, যা পুরোপুরি কল্পনাপ্রসূত।
৪. এমন কল্পনা, যা পুরোপুরি চিন্তাপ্রসূত।
৫. এমন ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যা কল্পনা থেকে উদ্ভূত।
৬. এমন কল্পনা, যা ইন্দ্রিয় জ্ঞান থেকে উদ্ভূত।

এমনিভাবে কোন কোন জ্ঞান পুরোপুরি অনুমানের পর্যায়ভুক্ত। আবার কোন কোন অনুমান জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত।

কুরআন মজীদে যেখানে 'জিন্'-এর কথা আছে, সেখানে 'অনুমান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিনের অস্তিত্ব ও সে সম্পর্কে বিদ্যমান ধারণা কল্পনাপ্রসূত। এদের আকার কেবল কল্পনার চোখেই দেখা যেতে পারে। কল্পনা, ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও চিন্তা-

শক্তি— এ দুটোর মাঝখানে অবস্থিত। তাই যে বস্তু কাল্পনিক, তার অবস্থান হবে জড়াত্মক ও আধ্যাত্মিক—এ দুটির মাঝামাঝি, যেমন জিন ও শয়তান। আর যে বস্তু মাঝামাঝি ধরনের হয়, তা হয়তো দু'দিকের যৌগিক হবে, নয়তো দু'দিক থেকে স্বতন্ত্র।

## নুবুওয়াতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

এ বৈশিষ্ট্যটি চিন্তাশক্তির আওতাভুক্ত।

অজ্ঞাত বস্তু উপলব্ধি করার পদ্ধতি হলো—কয়েকটি জ্ঞাত বস্তুকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে অজ্ঞাত নতুন একটি বস্তু জ্ঞাত হয়। যেমন, আমরা জানতাম, বিশ্বে নিত্য পরিবর্তন সাধিত হয়। আরো জানতাম, যে বস্তুতে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা ধ্বংসনীয়। এ দু'টি ভূমিকাকে (অবলম্বনকে) আমরা যখন এভাবে সাজালাম—বিশ্ব পরিবর্তনীয় এবং যা পরিবর্তনীয়, তা নশ্বর, তখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম—'বিশ্ব নশ্বর'। এ অনুসিদ্ধান্তটি আমাদের কাছে জ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আশ্রয়বাক্যগুলো (ভূমিকা)-পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল। নবীর জ্ঞান লাভের জন্য এরূপ অবলম্বনের (ভূমিকার) প্রয়োজন নেই। বস্তুসমূহের জ্ঞান তাঁর অন্তরে এক দফায়ই ঢেলে দেওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়ঃ এ শক্তি তো নবী ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। কেউ যদি কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে, তবে সংশ্লিষ্ট বেশীর ভাগ জ্ঞান তার অন্তরে একবারেই উদিত হয়। তা হলে নবীর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এর উত্তরে বলা হবে যে, এ শক্তির বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। নবীর বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁর এ শক্তি উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হয়।

## নুবুওয়াতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, দেহের উপর মানুষের ধ্যান-ধারণার প্রভাব অনিবার্য। মানুষ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, তখন তার দেহে বিশেষ এক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ক্রোধান্বিত হলে তখন তার দেহ অন্য একটি অবস্থা ধারণ করে। বন্ধুর রূপ মনে উদিত হলে তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষ ধরনের স্পন্দন অনুভূত হয়। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মিক শক্তি দেহের উপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। এখন কথা হলো—কোন ব্যক্তির আত্মা যদি নিজ

দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে কোন কোন শক্তিশালী আত্মার পক্ষে অন্যান্য পদার্থের উপর প্রভাব বিস্তার করা— যেমন শীতল করা, গতিশীল করা, গতিহীন করা, ঘনীভূত করা, কোমল করা (এবং এর ফলে মেঘ সৃষ্টি হওয়া, ভূমিকম্প হওয়া, ঝরনা প্রবাহিত হওয়া)—এসব মোটেও বিস্ময়কর নয়।

এরূপ শক্তির অধিকারী আত্মা যদি পূত-পবিত্র হয়, তবে তার অতিপ্রাকৃতিক কার্যাবলীকে বলা হয়—'মুজিযা' বা কারামত। আর যে আত্মা পূত-পবিত্র নয়, তার এসব কাজকে যাদু বা মন্ত্ররূপে অভিহিত করা হয়। আত্মার পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ফলেই এ শক্তি উন্নতি লাভ করে।

এখানে এটাও বলে রাখা উচিত, এ বিষয়গুলো কাল্পনিক নয়, বরং অভিজ্ঞতালব্ধ। তাই এগুলোর কারণ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হয়ে থাকে। কেউ যদি আত্মিক ক্ষমতার অধিকারী ও এরূপ আলোচনার যোগ্য হন এবং এসব ঘটনার পেছনে নিহিত কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাও করেন, তবে তিনি ভাবাবিষ্টও হবেন এবং এসবের যৌক্তিকতা অনুধাবনেও সক্ষম হবেন।

## সমাপ্তি

মানবগোষ্ঠীতে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যাঁর ধারণাশক্তি এত প্রবল যে, শিক্ষা-দীক্ষার কোন প্রয়োজনেই তাঁর হয় না এবং তাঁর কল্পনাশক্তি এত নিখুঁত ও বলিষ্ঠ যে, জড় জগত তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না; আত্মিক ক্ষমতা-বলে তিনি যা উপলব্ধি করেন, তাই তাঁর সামনে রূপ ধরে উপস্থিত হয়; তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি এত প্রবল যে, কেবল জড় জগতের উপরই তিনি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম নন, বরং স্বর্গমণ্ডলও তাঁর ক্ষমতাধীন।

এর পরবর্তী মর্যাদা হলো সে ব্যক্তির, যিনি প্রথমোক্ত দু'টি ক্ষমতার অধিকারী। অতঃপর স্থান হলো সে ব্যক্তির, যাঁর শুধু চিন্তা-শক্তিই প্রবল। এর চাইতে নিম্নতর মর্যাদার অধিকারী হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর কাছে রয়েছে কেবল প্রবল কর্মশক্তি।

যিনি একাধারে এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তিনি যেন সম্রাট। ঊর্ধ্ব জগতের সঙ্গে তাঁর এত গভীর সম্পর্ক থাকে যে, তিনি ইচ্ছা করলেই সেই জগতের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।

আধ্যাত্মিক জগতের তো তিনি বাসিন্দাই। জড় জগতের উপর তিনি যেমন ইচ্ছা, তেমন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

এর চাইতেও যাঁর মর্যাদা কম, তিনি হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর বাদশাহ্। এর পরবর্তী শ্রেণীর লোকেরা উম্মত-এ-মুহম্মদীর মধ্যে 'শরীফ' বলে পরিগণিত।

যাঁদের মধ্যে কোনরূপ শক্তি নেই, কিন্তু সচ্চরিত্রের গুণে গুণান্বিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, তাঁরা হলেন জাতির সমঝদার লোক। তাঁরা জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র।

---

* আল্-হাম্দু লিল্লাহি রব্বিল্ আলামীন ওয়াল ওল্-আকিবাতু লিল্ মুত্তাকীন *

IFP—81-82—P—3250—1.9. 1981